শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত।

চতুর্থ খণ্ড।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক

গ্রন্থিত।

কলিকাতা—২নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেনে

পত্রিকা-প্রেসে,

শ্রীকেশবলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লোমকূপে যাঁর।
পরমাণু মাঝে বিরাজ যাঁহার॥
নিরাশ্রয়ে ভাসে যত জীবগণ।
জীব দুঃখে যাঁর দ্রবীভূত মন॥
মনুষ্যে অভয় দান করিবারে।
উদিলেন ভবে মানুষ আকারে॥
রূপে আর গুণে ভুবন মোহিয়া।
লুকালেন যিনি জীবে আশ্বাসিয়া॥
এ হেন ঠাকুর সুন্দর সুজন।
বলরাম দাস করয়ে ভজন॥

ভূমিকা।

আমাকে অনেক সময় একটি ভাবে অভিভূত করে। সেটি এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে অদ্যাপি হয় নাই। দেখুন, শ্রীভগবানের ন্যায় বৃহৎ বস্তু কিছুই নাই; বলিতে কি, তিনিই সব, তাঁহা ব্যতীত এ সংসারে কিছুই নাই। সেই বৃহৎ বস্তুটি, সংসারের সেই কেবল মাত্র বস্তুটি, আমাদের নিকট গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান, ইহার ন্যায় বহুমূল্য সম্পত্তি জীবের আর কিছু হইতে পারে না। কত বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন হইতেছে, কত প্রকাণ্ড সমর হইতেছে, কত নৈসর্গিক বিপ্লব হইতেছে, এমন কি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত লয় পাইতেছে। এ সমুদায় বৃহৎ ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু বলিতে কি, সে সমুদায় ঘটনার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। যদি আমাদের গতি শ্রীভগবান হইলেন, অর্থাৎ যদি মৃত্যুর পরে জীবন থাকে, তবে এই সৌরজগৎ নাশ হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? তবে এ জগতে মহারাজ্য পাইলেই বা আমাদের লাভ কি? কারণ এ জড় জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্ষণিক বই নয়।

অতএব শ্রীভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহাই আমাদের কেবল একমাত্র সম্পত্তি; এমন কি, ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন সম্পত্তি হইতে পারে না। এই সংসারের অনিত্যতা যাঁহাদের সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা অস্থির হইয়া সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া "কোথা যাব, কি করিব" করিয়া দিবা নিশি যাপন করেন। এইরূপে চেতন জীবমাত্রেই যে কেন অস্থির না হয়েন ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। কারণ সংসার যে অনিত্য ইহা জীবমাত্রেই প্রতি-ক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেছেন। তাই আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাগণ মায়া বলিয়া একটী কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই মায়ারূপ শক্তি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া জীব নিশ্চিন্ত হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। এই মায়া না থাকিলে জীব ক্ষণমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। দেখুন, প্রীতিতে বিচ্ছেদ হইবে জানিয়াও লোক স্বচ্ছন্দে উহা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইতেছে; আপনি অতি ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রয় জানিয়াও অন্যের উপর আধিপত্য করিতেছে; মরিবে নিশ্চিত জানিয়াও অমরের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

দেখিবেন, জগতে অনেক বুদ্ধিমান, বিদ্বান, পণ্ডিত লোক আছেন। তাঁহারা সব বুঝেন, কেবল আপনার প্রকৃত স্বার্থের বেলা অন্ধ থাকেন। প্রকৃত কথা,

পরম পণ্ডিত লোক যিনি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন, অতি বিদ্বান্ যিনি সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিতেছেন, অতি চতুর যিনি আপন বুদ্ধিবলে জগৎ করতলে আনয়ন করিতেছেন, অথচ আপনি যে মরিবেন তাহা ভুলিয়া সেই মহাপ্রস্থান পথের সম্বল করিতেছেন না, তিনি পণ্ডিতও নয় বুদ্ধিমানও নয়। তিনি প্রকৃত পক্ষে অতি অন্ধ ও অভাগ্য। তাঁহার বৃথা জ্ঞানকে আমরা প্রশংসা করি না।

জীবমাত্রে প্রায় এইরূপ। বাজারে যাও, পথে বেড়াও, সভায় যাও, দেখিবে জীবে কেবল বাজে কথা বলিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের এক উপদেশ এই যে, "গ্রাম্য কথা কহিও না, গ্রাম্য কথা শুনিও না।" কিন্তু এই জগৎ কেবল গ্রাম্য কথা লইয়া বিভোর। আলু, পটল, মকদ্দমা, আপনার আধিক্য, পরের কুৎসা, এই সমুদয় লোকের সময় কাটাইবার উপায়। কিসে স্বার্থ-সাধন হইবে, কিসে শত্রু দমন করিবে, ইহা লইয়া জীবমাত্রেই ব্যস্ত।

যাঁহারা মায়ারূপ কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া একটু অগ্রে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা সমুদয় কার্য্য ফেলিয়া, আমি কে, আমি কার, আমার গতি কি, ইত্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। ইঁহাদের কেহ কেহ পরিশেষে জগতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করেন। যাঁহাদের কিছু প্রাপ্তি হয়, তাঁহারা সরস, যাঁহাদের তাহা না হয়, তাঁহার নীরস শাস্ত্র প্রচার করিয়া থাকেন। সংসার অনিত্য, এ জ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোথাও নহে, সুতরাং এখানে এই ধর্ম্মশাস্ত্র বহুল পরিমাণে কর্ষিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণকে আমরা মুনি বলিয়া থাকি। ইঁহারা সাধন বলে ধর্ম্মশাস্ত্র আবিষ্কার ও বিকসিত করেন। জীবের প্রকৃতি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং এই বহুল পরিমাণ শাস্ত্র মধ্যে নাস্তিকতা আছে, আস্তিকতা আছে, ভক্তির কথা আছে, ভক্তির বিরোধী কথাও আছে। লোকে আপনার প্রকৃতি, কি শিক্ষা, কি অধিকার অনুসারে, এই সমুদায় আবিষ্কৃত ধর্ম্মের মধ্যে আপনার ধর্ম্ম বাছিয়া লয়। এইরূপে আমাদের দেশে নাস্তিকতা হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

কিন্তু জীবে অন্য আর এক উপায়ে ধর্ম্ম কথা শিখিয়া থাকে, সে অবতার দ্বারা। কোন জীব বনে না যাইয়া, তপস্যা না করিয়া, এমনি কোন অননুভবনীয় শক্তি কর্ত্তৃক চালিত লইয়া জীবকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বহুতর শিষ্য হইল। পরিশেষে তিনি অবতার বলিয়া, অর্থাৎ ভগবানের

কৃপাপাত্র, কি তাঁহার প্রেরিত বলিয়া, পরিগণিত হইলেন। অবতার কি না, যিনি শ্রীভগবানের দূত, কি সমাচার-বাহক, কি কোন নিজজন, কি তিনি স্বয়ং। যেমন উদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীমতী রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি অবতারগণ শ্রীভগবানের সংবাদ লইয়া জীব-গণকে তাঁহার প্রকৃতি ও তাহাদের কর্ত্তব্য কি, অবগত করিয়া থাকেন। গীতা গ্রন্থখানি এখন সর্ব্বত্র গ্রাহ্য। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি হিন্দু, কি অহিন্দু, সকলেই শ্রীগীতা গ্রন্থখানিকে পূজা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ইহাতে প্রকাশিত কথাগুলিকে পরম শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই গীতা গ্রন্থ বলিতে-ছেন যে, যেখানে ধর্ম্ম গ্লানি হয়, সেখানে জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের অবতার হইয়া থাকে।

এ কালের তিনটি অবতারের কথা বলিব,—প্রথমে যীশু, পরে মহম্মদ, তাহার পরে গৌরাঙ্গ। যীশুর মতাবলম্বীরা বলেন যে, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের পুত্র; মুসলমানগণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের বন্ধু কি দূত; গৌরাঙ্গের গণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

অবতারের নাম শুনিয়া আপনারা অবজ্ঞা করিবেন না। এই জগতের মধ্যে সকলেই অবতারের অনুগত। রুষিয়ার সম্রাট ও গ্লাডষ্টোন অবতার মানেন, জাপান দেশের সম্রাট্ অবতার মানেন, তুর্কীর স্থলতান অবতার মানেন, আর হিন্দুগণ যাঁহারা জগতে গীতা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, অবশ্য তাঁহারা অবতার মানেন। অতএব জগতের যখন সকল জাতি অবতার মানেন, তখন অবতারকে অবজ্ঞা করিবার কাহারও অধিকার নাই। যেহেতু যে বিষয়ে সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব সময়ে একরূপ বিশ্বাস, তাহা অবশ্য সত্য ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

এই সমস্ত অবতার একই স্থানের (পরকালের) সংবাদ একই স্থানে (এই জগতে) প্রচার করেন। স্থতরাং যদি অবতার প্রকরণ সত্য হয়, তবে অবতারগণ যে সমুদায় সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, তাহা একরূপ হওয়া উচিত। মনে ভাবুন, যীশু শ্রীভগবানের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছেন, মহম্মদও আনিয়াছেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের বাক্যের অনৈক্য হয়, তবে বিষম গণ্ডগোল হইবে। তাহা হইলে, হয় উভয়েই কৃত্রিম, না হয় অন্ততঃ একজন কৃত্রিম, ইহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু অবতারগণের কথায় অমিল

নাই। শ্রীভগবান আছেন, পরকাল আছে, ও ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, ইহা অবতার মাত্রের শিক্ষা।

ভগবান মানে ঈশ্বর নহেন, ভক্তের উপাস্য ধন, অর্থাৎ পরিমিত কি সাকার পুরুষ। অবশ্য খ্রীষ্টিয়ান কি মুসলমানগণ শ্রীভগবানকে অপরিমিত নিরাকার বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু সে মুখে, হৃদয়ে নয়। যখন তাঁহারা শ্রীভগবানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার পাত্র মিত্র সহিত সদালাপ বর্ণনা করেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ভগবানকে পরিমিত বলিয়া স্বীকার করেন। অবতার প্রকরণ যে সত্য, ইহার অতি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতারের উদয় দেখা যায়, তবুও তাঁহাদের শিক্ষা এক জাতীয়। আর এই শিক্ষার অনেক অননুভবনীয় নূতন সামগ্রী পূর্ব্বে জগতে ছিল না। মুনিগণ এবং অবতার কর্ত্তৃক ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া থাকে। মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম জগতে আর কোথাও নাই, কেবল ভারতবর্ষে আছে। পৃথিবীর অন্য সকল স্থানে যে সমুদায় ধর্ম্ম প্রচলিত, ইহা অবতার কর্ত্তৃক। ভারতে মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত বহুতর ধর্ম্ম শাস্ত্ররূপে প্রচলিত আছে, যথা—বৈদান্তিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি। একটু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এ সমুদায় ধর্ম্মের সহিত অবতার প্রচারিত ধর্ম্মের বিশেষ ঐক্য নাই। তাহার কারণ, অবতার প্রচারিত ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ভগবান ও ভক্তি, অন্যান্য ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি শক্তি ও প্রক্রিয়া।

এই অবতারগণের মধ্যে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্ব্ব প্রধান বলি, কারণ :—

১। তিনি যখন নবদ্বীপে উদয় হয়েন, তখন পাণ্ডিত্যে সে নগরের যেরূপ উন্নত অবস্থা হইয়াছিল এরূপ কোন স্থানে কোন কালে হয় নাই। সেখানে তখন আবাল বৃদ্ধ, নর নারী, বড় ছোট কেবল বিদ্যা, শুধু বিদ্যা নয়, অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম চর্চ্চা, লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। তখন যে সমুদায় অতি দুর্ব্বোধ্য, অতি সূক্ষ্ম চর্চ্চা, সাধারণের খেলার সামগ্রী ছিল, বালকগণ পর্য্যন্ত যাহা লইয়া তর্ক ও বিচার করিতেন, এখন মহা পণ্ডিত লোকে উহা বুঝিতে পর্য্যন্ত পারেন না। সেই সময় সেই সমাজের মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত হয়েন। অন্যান্য অবতারগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোক কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

২। তখনকার যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি, সকলেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন। যথা, শ্রীহরিদাস—যিনি বেত্রাঘাতে যখন মরিতে-

ছেন তখন আপনার বেদনা ভুলিয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার হত্যাকারিগণের মোচন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত,—যিনি জগতের যত জীব সকলের পাপ নিজ স্কন্ধে লইয়া তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিবেন, এই প্রার্থনা শ্রীভগবানের নিকট করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম,—যিনি তখনকার সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। প্রকাশানন্দ সরস্বতী,—যিনি তখন ভারতবর্ষের শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য—যিনি গৌড়ের, ও বল্লভাচার্য্য—যিনি পশ্চিমের, বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া এই সমস্ত লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা হিন্দু হইয়া গঙ্গাজল তুলসী লইয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন।

৩। তিনি বল দ্বারা, কি তর্ক দ্বারা, কি বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার করেন নাই। জীবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, কি তাঁহার দুই একটি কথা শুনিয়া, কি তাঁহা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিত।

প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া বিরাজ করিতেন, ও তখন ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী বলিয়া পূজিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় প্রেমধন পাইয়া বলিতেছেন, যথা—

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে,
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্।
যদ্দত্ত শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যর্থ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্॥

"যে জনকে কদাপি পূণ্য স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা উৎকট পাপাসক্ত, এবং যে কোন সাধুজন দৃষ্ট পথ বা সজ্জনরচিত স্থান গত হয় নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীকৃষ্ণ রসরূপ সুধাস্বাদনে প্রমুগ্ধ হইয়া নৃত্য, গীত ও বিলুণ্ঠন করে, সেই অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরকে (গৌরাঙ্গকে) আমি স্তুতি করি।"

তাঁহার আর এক শ্লোক শ্রবণ করুন—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতোবা, দূরস্থৈরপ্যানতো বা দৃতো বা।
প্রেম্ণঃ সারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্॥

"যিনি একমাত্র দৃষ্ট ও আলিঙ্গিত বা কীর্ত্তিত হইলেই, অথবা দূরস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নমস্কৃত বা বহু মানিত হইলেই, প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব প্রদান করেন, সেই একমাত্র দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি।"

৪। তিনি প্রকট থাকিতে লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতেন। এরূপ কোন অবতার জীবকে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

৫। যাঁহারা অবতার, তাঁহারা আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যীশু বলিতেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া চিন্ময় রত্ন সিংহাসনে শতশত ভক্তের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া বারংবার বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান, আদি ও অন্ত, তিনি জীবের দুঃখ দেখিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা ও অভয় প্রদান করিতে মনুষ্য সমাজে আগমন করিয়াছেন। এরূপ অদ্ভুত অননুভবনীয় ঘটনা কোন অবতার সম্বন্ধে শুনা যায় না।

৬। অবতারের যত কাহিনী আছে তৎসমুদায় জনশ্রুতি হইতে সংকলিত, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কি বিশ্লেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গৌরাঙ্গ প্রভুর কাহিনী তাঁহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অতি বিস্তার রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, আমরা নবদ্বীপে দেখিতেছি, প্রভুর অবতারের চিহ্ন চারি দিকে ছড়ান রহিয়াছে; আমরা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত বংশ দেখিতেছি; আমরা প্রভুর বিগ্রহ দেখিতেছি; আমরা দেখিতেছি প্রভু যেখানে গমন, অবস্থান, কি উপবেশন করিয়াছেন, তাহা তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সার্ব্বভৌম কৃত অঙ্কিত ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি রহিয়াছে।

৭। প্রভুর লীলা ও চরিত্র বড় মধুর। সাধুসঙ্গ জীবের উপকারী ধন। সাধুসঙ্গ অপেক্ষা ভগবৎ সঙ্গ আরও উপকারী। কিন্তু ভগবৎ সঙ্গ সম্ভবে না। তাই জীবে শ্রীভগবানের লীলার দ্বারা তাঁহার সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন। যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার লীলা খেলা অতি অল্প। মহম্মদেরও ঐরূপ, তিনি ঈশ্বরের সখা। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ, যিনি স্বয়ং বলিয়া আপনি পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে লীলা রহিয়াছে, ইহা জলধির ন্যায় বিস্তীর্ণ, এবং চুমুকে চুমুকে সমান মিষ্ট। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন না এমন জীব কোথা আছেন?

৮। অন্যান্য ধর্ম্মের যাহা শেষ, শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের তাহা আরম্ভ। অন্যান্য ধর্ম্মে ব্রজের নিগূঢ় রস নাই। শ্রীনন্দনন্দন বলিয়া শ্রীভগবান অন্য কোন ধর্ম্মে পূজিত হয়েন না। আমরা যীশুকে অবতার বলি, ও তাঁহার উপদেশ মান্য করি। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ ব্রজের নিগূঢ় রস অবগত নহেন, তাঁহারা মাধুর্য্যময় নন্দসুতকে উপাসনা করেন না, ঐশ্বর্য্য সম্বলিত ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। আমরা খ্রীষ্টিয়ান মন্দিরে যাইয়া মনের

সাধে ভজনা করিতে পারিব, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ আমাদের রস-কীর্ত্তনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অন্যান্য ধর্ম্মে যাহা আছে, উহা বৈষ্ণব ধর্ম্মে আছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে যাহা আছে, তাহা অন্য ধর্ম্মে নাই।

তাহার পর আর এক কথা বলি, যেখানে রোগ, ঔষধ সেইখানেই পাওয়া কর্ত্তব্য। কারণ শ্রীভগবানের কার্য্যে জটিলতা নাই। আমরা ভারতবর্ষীয়, আমাদের যদি অবতার মানিতে হয়, তবে আমাদের য়িহুদীর দেশে কি আরব দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের অবতার এখানেই পাইব। সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যে অবতার হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় হওয়া উচিত।

গৌরাঙ্গ অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে নাই বলিয়া এই প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি। যদি আমরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ পাই, তবে আমাদের কিসে বা কে, কি করিতে পারে? যদি না পাই, তবে সাম্রাজ্যে কি ঐশ্বর্য্যে কি লাভ? অতএব যিনি গৌর অবতার সত্য ভাবেন, তাঁহার ইহার ন্যায় বৃহৎ ঘটনা আর অনুভূত হইবে না। এই গৌর অবতার বর্ণনরূপ বৃহৎ ভার আমার ঘাড়ে পড়িল।

আমি ইচ্ছা করিয়া এ ভার লই নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে শক্ত, আমি তাঁহাদিগকে উপাসনা করিলাম, কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করিলেন না। ভাবিলাম যে, এরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার কি জগতে চিরদিন লুপ্ত থাকিবে? অতএব যাহা পারি লিখিব, তাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি জীবগণকে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে পশ্বাচার হইতে দেবাচারে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কালে ভক্তিযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জগতে কেবল কাটাকাটি ও মারামারি। আধিপত্যের নিমিত্ত জীবে ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরকাল ভুলিয়া গিয়াছে। ইউরোপে এইরূপ শ্রীভগবান সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তাহাদের দেখাদেখি এ দেশেও প্রায় সেইরূপ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা আস্বাদন কর, নিয়ত চিন্তা কর, পবিত্র ও শান্ত হইবে। যিনি দুঃখী ও তাপী, তিনি এই মধুর লীলারূপ সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করুন, অবশ্য জুড়াইবেন।

এই চতুর্থ খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স সাতাইস বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিন বৎসরের, অর্থাৎ সন্ন্যাস লইয়া মাতৃভূমি বা শ্রীনবদ্বীপ দর্শন পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত আছে।

প্রথম অধ্যায়।

মুখ খানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সন্নাস গ্রহণ করিয়া দুই বৎসর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। করিয়া, তাঁহার শুভাগমন বৃত্তান্ত লোক দ্বারা নবদ্বীপ-ভক্তগণকে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা বলিয়া তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি, এবং গ্রন্থ সমাপন কালে, প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণের যে মিলন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে নবদ্বীপ-ভক্তগণের অবস্থা ও নীলাচলে তাঁহাদের আগমন উদ্যোগ, ইত্যাদি বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উপরে যে দুই চরণ দেওয়া গেল, উহা গদাধরের শিষ্য নয়নানন্দের কৃত, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনার পদ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ।" সেই গদাধরের পশ্চাতে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় শিষ্য নয়নানন্দ দাঁড়াইয়া, নানা ছলে প্রভুর মুখ দর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন যে, মুখ খানি এমন সুন্দর যে উহার তুলনা কেবল চন্দ্র হইতে পারে। শুধু চন্দ্র নয়, পূর্ণিমার চন্দ্র। নয়নানন্দ দেখিতেছেন যে, প্রভুর ঠোঁট দুটি যেন হিঙ্গুলে রঞ্জিত, আর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। নয়নানন্দ ভাবিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট কাঁপিতেছে কেন? উনি কি কোন মন্ত্র জপ করিতেছেন? উনি কাহার নিমিত্ত এরূপ উতলা হইয়াছেন? প্রভুর মুখ দেখিয়া, তাঁহার মনে যে প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহা নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।

কথা হইতেছে, প্রভুর অন্তর দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ সরল ও নম্র, ও সেইরূপ লাজুক। তাঁহার অন্তরে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা তিনি অবশ্য লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইতেছে, অর্থাৎ সেই তরঙ্গের বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। এত বাড়িতেছে যে, সে বেগ সমুদায়ই মুখে, কি প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গিতে প্রকাশ

পাইতেছে। প্রভুর এই ঠোঁট কম্পন দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা তিনি নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

নয়নানন্দের উপরের দুটি চরণ উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, উহার দ্বারা, নবদ্বীপবাসিগণ প্রভুতে কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা কতক বুঝা যাইবে। বাসুঘোষ তাঁহার এক পদে বলিতেছেন, "গোরা গোরা, পরাণের পরাণি।" প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসিগণের "পরাণের পরাণ" ছিলেন। যখন শুকদেব বলিলেন যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের নিজ পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতেন, রাজা পরীক্ষিত এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহাতে শুকদেব বুঝাইয়া বলিলেন যে শ্রীভগবান প্রাণের প্রাণ, তাহাতে ও জীবে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, জীবে জীবে সেরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কাজেই ব্রজবাসিগণের তাঁহাদের নিজ সন্তান অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উপর অধিক প্রীতি ছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে নদেবাসীগণের ঠিক ঐরূপ ভাব ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের হৃদয় এরূপে অধিকার করিয়াছিলেন যে, সেরূপ কেহ কস্মিন্ কালে করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ শত বার প্রাণ দিতে পারিতেন। তখনকার শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি স্বরূপ সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী, তাঁহার চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থে বলিতেছেন—

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকীভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজঃ স্যাদ্বপু
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রান্মনঃ॥

"যদি দুর্ল্ভ সিদ্ধি সকল (আনিমা লঘিমা অর্থাৎ নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা) আপনা আপনি আমার করতলগত হয়, অর্থাৎ হঠাৎ যদি আমি বিনা চেষ্টায় সিদ্ধপুরুষ হইয়া পড়ি, যদি দেবগণ আপনারা আসিয়া আমার কিঙ্কর হন, অধিক আর কি বলিব, আমার এই বপু যদি চতুর্ভুজ হয়, অর্থাৎ আমি সশরীরে যদি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারি, তথাপি আমার মন শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।

এই "প্রাণের প্রাণ" শ্রীনবদ্বীপ হইতে হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন। যাঁহাকে "দণ্ডে দণ্ডে, তিলে তিলে" না দেখিলে ভক্তগণ বাঁচিতেন না, তিনি

এখন একেবারেই অদর্শন। শুধু তাহা নয়, তিনি নীলাচলে বাস করিবেন এই ভরসায় ভক্তগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রভু যদি এরূপ প্রতিশ্রুত না হইতেন, তবে বহুতর ভক্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। তাহার পর নবদ্বীপবাসিগণ শুনিলেন, প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া গিয়াছেন, শুধু তাহা নয় কোথা গিয়াছেন ঠিক নাই। তাহার পর আরো শুনিলেন, প্রভু গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কোন ভক্তকে লয়েন নাই। অর্থাৎ যে প্রভুকে নবদ্বীপে তাঁহারা শত লোকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি এখন, দু একটি ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া, কৌপীন করঙ্গ সম্বল করিয়া, কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিক নাই। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, কে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে? তিনি প্রেম-বিহ্বলতায় উপবাস করিলে, কে তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক খাওয়াইতেছে? ঝড় বৃষ্টিতে তিনি কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন?

যাঁহারা প্রভুর ভক্ত, তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপে এক প্রকার উন্মাদ অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। তবুও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে ভক্তগণ প্রেমভক্তিতে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ঘোর বিয়োগ যেরূপ কষ্টকর, সেইরূপ উহার মত উপকারী সামগ্রী আর জগতে নাই। যেমন সুবর্ণ উত্তাপে পরিস্কৃত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা ঘোর বিয়োগানলে ক্রমে নির্ম্মল দশা প্রাপ্ত হয়।

আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা আনন্দময়। উহা মলিন হইলে, সেই আনন্দ-লহরী চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়, তাহাতে উহা দ্বারা, আনন্দ খেলিতে পারে না। বিয়োগানলে, যোগ প্রক্রিয়া কি অন্য উপায় দ্বারা, এই আত্মার মলিনতা দূরীকৃত হইলে, অন্তরে আপনা আপনি আনন্দের উদয় হয়। অতএব ঘোর বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আনন্দ আপনি আসিয়া থাকে। এই গেল শ্রীভগবানের আশ্চর্য্য রঙ্গ। তাই লোকে বলে, যতটুকু কাঁদিবে তত টুকু হাসিবে। অতএব যাঁহারা কথঞ্চিৎ নির্ম্মলতাও লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া সামগ্রী জগতে কিছুই নাই। এই যে শ্রীনবদ্বীপ-বাসিগণ ঘোর বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছেন, তবু তাঁহারা মাঝে মাঝে আবার আনন্দের তরঙ্গেও পরিপ্লুত হইতেছেন।

কিন্তু কেহ কেহ গৌরশূন্য নদীয়ায় আর বাস করিতে পারিলেন না। যখন প্রভু নীলাচলে গমন করেন, তখন অবশ্য গদাধর সঙ্গে যাইতে চাহেন।

গদাধর গৌর-মুখ না দেখিলে এক দণ্ড বাঁচেন না। কিন্তু তিনি অতি নবীন, কখন কোন সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন নাই। প্রভু তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। প্রভু নীলাচলে গমন করিলে, গদাধর বিরহ জ্বালায় প্রভুকে দর্শন করিতে সে মুখো ছুটিলেন। শ্রীনরহরিরও ঠিক সেইরূপ। তিনিও শ্রীগৌর-মুখ না দেখিলে এক তিল বাঁচেন না। এই কারণে উভয়ে পরম সম্প্রীতি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে ও অন্যান্য প্রেমে এই বিশেষ বিভিন্নতা। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে ঈর্ষাভাব নাই, তাই নরহরি ও গদাধর একত্রে ছুটিলেন। অনেক গৃহী-ভক্ত প্রভুর সহিত শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করিতেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই। এ সম্বন্ধে জীবের ধর্ম্ম কি, তাহা আমাদের প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যিনি গৃহী, তাঁহার সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাতুলতা করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। তাঁহাকে অবশ্য স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পালন করিতে হইবে। যিনি সংসারে আদৌ মন নিবিষ্ট করিতে না পারেন, তিনি সন্ন্যাসী হউন কোন আপত্তি নাই। যিনি একবার সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কঠোররূপে পালন করিতে হইবে। কিন্তু জীবের সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের সর্ব্ব প্রধান পুরুষার্থ। উহার নিমিত্ত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ প্রয়োজন করে না।

এইরূপে শ্রীনরহরি, শ্রীগদাধর, ও শ্রীভগবান প্রভৃতি জন কয়েক নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন! শ্রীভগবান আচার্য্যকে পাঠক চিনেন না। চন্দ্রোদয় নাটকে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—

> ন্যায় আচার্য্য একজন ভগবান নামে।
> যাবজ্জীবন আসি রহিলেন পুরুষোত্তমে॥
> প্রভু সনে সখ্য ভাব না দেখিলে মরে।
> গৃহ বন্ধু সব ছাড়ি রহে নীলাচলে॥

সেখানে যাইয়া তাঁহারা শুনিলেন যে প্রভু দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতিকে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহারা যেন সেখানে প্রতীক্ষা করেন। তাঁহারা প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নীলাচলে প্রভুর প্রতীক্ষায় বাস করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা নীলাচলে গমন করিয়া, তথায় প্রভুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা অবশ্য কতকটা শান্ত হইলেন, কিন্তু যাঁহারা নদীয়ায় রহিলেন তাঁহারা

নিরাশ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। আর কি তিনি ফিরিয়া আসিবেন? আর কি তাঁহার নদীয়া মনে আছে? এই সমুদায় দুর্ভাবনায় নবদ্বীপবাসিগণ মৃতবৎ হইয়া থাকিলেন। মরিলেন না কেন, তাহার কারণ এই যে, দুর্ভাবনার সঙ্গে মনে মনে প্রবল আশাও ছিল যে প্রভুকে আবার দেখিবেন। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি এই পদের রস আস্বাদন করুন, যথা—

কোন্ দেশে প্রভু গেল মোর। ধ্রু

যাঁহারা নবদ্বীপে রহিলেন, তাঁহারা অর্দ্ধ-মৃতের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। ভক্তগণের কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা বাসুঘোষ তাঁহার গীতে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির আর বলিবার কিছু রাখিয়া যান নাই। যথা পদ—

গোরা গুণে প্রাণ কান্দে, কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥ ইত্যাদি।

বাসুঘোষ বলিতেছেন যে, প্রভু ভক্তগণকে "ধনে প্রাণে" মারিয়া গিয়াছেন। একে তিনি অদর্শন হইয়া মর্ম্মে আঘাত করিয়াছেন। আবার প্রভু ব্যতীত আমাদের ন্যায় পতিতগণকে দয়া আর কে করিবে? কে আর পতিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁন্দিয়া উঠিবে? এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা তখনই সংবাদ আসিল যে প্রভু পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে আছেন, ও ভক্তগণের দ্বারা রক্ষিত হইতেছেন!

তখন সকলে তাঁহাদের পূর্ব্বকার যত দুঃখ ছিল সমস্ত ভুলিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তখন সকলে এক-বাক্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা প্রভুকে নীলাচলে দর্শন করিতে যাইবেন। রথযাত্রাও নিকটে। যদিও নীলাচল নবদ্বীপ হইতে বহু দূরের পথ, কিন্তু তাহা তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। স্বয়ং প্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের জন্য পথ বন্ধ ছিল, তাহাও এখন নাই। যখন সকলেই নীলাচলে যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন প্রধান উদ্যোগী-গণ ভাবিলেন যে, এ সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। প্রভু যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন ভক্তগণকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। অন্য প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি তখন নীলাচলে মহাপ্রভুর

সঙ্গে আছেন। কাজেই সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট চলিলেন। ভক্তগণ তখন এরূপ চঞ্চল হইয়াছেন যে, সকলেরই মনের ভাব যেন ঐ পথেই অমনি নীলাচলে গমন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, প্রভুর শুভ প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিয়া, সুখে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখনই নৃত্য আরম্ভ হইল। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। এইরূপ প্রথমে দুই তিন দিবস ভক্তগণ আনন্দোৎসব করিলেন। সকলে স্থির হইলে পরামর্শ করিতে বসিলেন। ইহা স্থির হইল যে শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীশচীমাতার পদ-ধূলি লইয়া নীলাচলে যাইবেন। তখন আবার সেই সমস্ত ভক্তগণ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও তাঁহার ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া, প্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুর নিজ বাটীতে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। যদিও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পত্তিহীন, তবু তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। প্রভু, যাইবার সময়, শচীমাতাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "তোমার সাংসারিক ও পারমার্থিক সমুদায় ভার আমার উপর রহিল।" প্রভু গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহার অসংখ্য ভক্তগণ ভারে ভারে তাঁহার আলয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে শুধু শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার অভাব দূর হইল এমন নয়, তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ যে বহুতর লোক প্রভুর স্থান দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহারাও প্রসাদ পাইতেন। প্রভুর বাড়ীতে যখন মহোৎসব আরম্ভ হইল, তখন নবদ্বীপের নিকটস্থ ভক্তগণ নীলাচল যাইবেন বলিয়া একে একে আসিয়া জুটিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কাচনাপাড়া হইতে শিবানন্দ সেন, কুলীনগ্রাম হইতে গুণরাজ ও সত্যরাজ প্রভৃতি, আর শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনরহরির জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ, সুলোচন প্রভৃতি আসিলেন। এইরূপে প্রভুর পুরাতন ভক্তগণ প্রভু-দর্শনে চলিলেন। আবার যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন, এরূপ লোকও অনেক চলিলেন। যথা, বাসুদেব দত্ত, ইনি মুকুন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ও শঙ্কর, ইনি দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দামোদর পণ্ডিতেরা পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই পরম পণ্ডিত ও সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিতান্ত ভক্ত। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহারা প্রভুর নিকট চিরকাল বাস করিবেন বলিয়া চলিলেন; যাঁহারা গৃহী

তাঁহারা চারি মাসের জন্য বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া চলিলেন। তাঁহারা এই চারি মাসের জন্য বাড়ীর সংস্থান রাখিয়া, আর পঞ্চ বিংশতি দিনের পথে যাওয়া আসার ও নীলাচলবাসের চারি মাসের সম্বল সংগ্রহ করিয়া শুভযাত্রা করিলেন।

হরিদাস মুসলমান, এই নিমিত্ত প্রভুর সহিত নীলাচলে গমন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ নীলাচলে মুসলমান যাইবার অধিকার ছিল না। এখন শুনিলেন যে, মহারাজ প্রতাপ রুদ্র প্রভুর ভক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রভুর সহিত বাস করিবেন সংকল্প করিয়া, ভক্তগণের সঙ্গে নীলাচলে চলিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত কি লইয়া যাইবেন তাহার বিচার করিতে লাগিলেন। প্রভুর এমন প্রিয় দ্রব্য চাই, যাহা এক মাসে নষ্ট হইবে না। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মহা আনন্দে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দত্ত দ্রব্য সকল শ্রীবাসের হস্তে ন্যস্ত হইল। আর শচী তাঁহার নিমাইকে যে কথা, (সে এক কথা বই নয়) তাহা শ্রীবাসকে বলিয়া দিলেন। সে কথা এই যে, একবার যেন তিনি দেখা দিয়া যান। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারও এই এক কথা, সুতরাং প্রভুকে তাঁহার পৃথক সন্দেশ পাঠাইবার যেরূপ সুবিধা ছিল না, সেইরূপ প্রয়োজনও হইল না।

নীলাচলে রথ উপলক্ষে পূর্ব্বে গৌড়দেশ হইতে অধিক লোক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। যেহেতু পথ অতি দুর্গম, এবং হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হওয়ায়, উহা কখন কখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ শ্রীক্ষেত্রে যে রথযাত্রা, ইহা প্রভু কর্ত্তৃক খ্যাতাপন্ন হয়। তাহার পূর্ব্বে ইহার এত গৌরব ছিল না—এই প্রথম গৌড়ীয়গণ নীলাচলে রথ অধিকার করিতে চলিলেন।

প্রভুর ভক্ত প্রায় দুই শত চলিলেন। তাঁহাদের সুবিধা এই ছিল যে, উপবাসে তাঁহারা ক্লিষ্ট হইতেন না, এক মুষ্টি চিপিটক কি চণক পাইলেই দিন কাটাইতে পারিতেন। বিশেষতঃ সমস্ত পথে দেবস্থলী। এইরূপে কোন কোন দেবস্থানে সকল অতিথিই অন্ন পাইতেন। বাড়ী হইতে চিপিটক, জলপাত্র, কম্বল, কিছু স্বর্ণ, ও এক বোঝা কড়ি মুটিয়ার ঘাড়ে দিয়া, তখনকার যাত্রিগণ গমন করিতেন। গৌর-ভক্তগণের আর একটী

নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী—খোল, মাদল, করতাল ও মন্দিরা,—অবশ্য চলিল। প্রভুর ইচ্ছায় বিনা বিপদে ভক্তগণ পুরীধামে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের কাণ্ড শ্রবণ করুন। স্নান-যাত্রার তিন দিন থাকিতে মহারাজ প্রতাপরুদ্র পুরীধামে আসিলেন। এই সমস্ত উৎসব বড় জাঁকের সহিত বরাবর হইয়া থাকে, এবার প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত আয়োজন আরও অধিক হইয়াছে। স্নান-যাত্রা পর্ব্ব সমাধা হইল, শ্রীজগন্নাথ অতি গ্রীষ্মের সময় স্নান করিলেন, নূতন বস্ত্র পরিলেন। স্নান-যাত্রার পরে পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন নাই, তিনি জীবকে দর্শন দেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিত্য নিয়মানুসারে ঠাকুর দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন, শ্রীমন্দিরের কপাট বন্ধ!

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া অতি দুঃখে কান্দিতে লাগিলেন। কেন কান্দিতেছেন, তাহা ভক্তগণ তখন বুঝিতে পারিলেন না, শুধু প্রভুর রোদন দেখিয়া সকলে সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন যে, শ্রীমুখ না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। শেষে প্রভুর নীলাচল বাস অসহনীয় হইল, তিনি জগন্নাথ-শূন্য পুরীতে থাকিতে না পারিয়া, অমনি মন্দির দ্বার হইতে আলালনাথের দিকে ছুটিলেন!

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, এ কথা তিনি জানেন, পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অগ্রে এ সংবাদ দিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারাও তাঁহার প্রাণ। এক দিক হইতে এরূপ প্রীতির সৃষ্টি হয় না। দুই বৎসর পরে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবেন। তাঁহার তনু খানি প্রেমে গড়া, তিনি যে এখন— যখন তাঁহার নিজজন বহুদিন পরে নয়ন গোচর হইতেছেন—তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আলালনাথে প্রস্থান করেন, এ তাঁহার কি ভঙ্গী? যান কেন, তাহা বিচার করিলে, আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের হাসি পাইবার কথা। শ্রীজগন্নাথের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া দুঃখ হইয়াছে, ভাল। কিন্তু জগন্নাথ ত ভিতরে আছেন, না হয় পঞ্চদশ দিন শ্রীমুখখানি নাই দেখা হইল? শাস্ত্রে বলে স্ত্রী পুরুষে যে মধুর প্রণয়, ইহার ন্যায় গাঢ় সম্বন্ধ আর নাই। পতি যদি বহির্ব্বাটীতে থাকেন, তবে অন্তঃপুরে থাকিয়া, দুই চারি দিন তাঁহাকে না দেখিয়া, কবে, কোন সতী নারী, কোথায় প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন? অতএব প্রভুর যে কৃষ্ণপ্রেম, ইহা স্ত্রী-পুরুষের প্রেম হইতেও গাঢ়। অর্থাৎ ইহা রাধার প্রেম, ইহা এ জগতে সম্ভবে না, ইহা কেবল স্বয়ং রাধা, কি স্বয়ং কৃষ্ণ দেখাইতে পারেন।

প্রভুর অদ্ভুত দর্শনভঙ্গী এখানে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ইহাতে কতক বুঝা যাইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেন পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথদর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত রূপ দুঃখে জর্জ্জরীভূত হইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূর দেশে পলায়ন করেন। প্রভুর এই অদ্ভুত দর্শনভঙ্গীর দ্বারা জানা যাইবে যে, তিনি কিরূপ প্রকাণ্ড বস্তু,—কেন তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। যদি শুধু অলৌকিক কার্য্যের দ্বারা প্রভু জীবের মন মুগ্ধ করিতেন—যেমন আম্র বীজ হইতে সদ্য সদ্য আম্র সৃষ্টি করিয়া,—তবে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা, কি যত ভাল লোক, তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া উড়াইয়া দিতেন! যেমন মুকুন্দ উপরি উক্ত আম্রসৃষ্টি লীলা দেখিয়া উহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর শক্তি অন্যরূপ! তিনি তাঁহার গুণে মোহিত করিতেন। লোকে বুঝিত, শ্রীগৌরাঙ্গে যে গুণ, উহা জীবে সম্ভবে না। অতএব প্রভু আশ্চর্য্য দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন না, গুণ দেখাইয়া বশীভূত, অর্থাৎ মন প্রাণ হরণ করিতেন।

প্রভু প্রত্যূষে অতি ব্যগ্র হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। ভিতরে যাইবেন না, বাহির হইতে গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, উহাতে হস্ত অবলম্বন করিয়া, দর্শন করিতেছেন। দর্শন মাত্র প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল হইল। মনে ভাবুন, সাধারণ লোকে শ্রীজগন্নাথের মুখে সুখকর কিছু দেখিতে পাইবেন না, বরং হাস্য-উদ্দীপক অনেক দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকে যদি কোন ঠাকুরের মূর্ত্তিতে কিছু খুঁত দেখে, তবে মনে কষ্ট পায়। কিন্তু প্রভু, শ্রীজগন্নাথের সাধারণের সেই হাস্য-উদ্দীপক মুখ দর্শন মাত্র আনন্দে বিহ্বল হইলেন। প্রভু নিমিষহারা হইয়া বদন দেখিতে লাগিলেন। অনতি-বিলম্বে নয়ন-তারা ফুটিয়া জল আসিল, জল আসিয়া ধারার সৃষ্টি হইল। প্রকৃতই সে ধারার বিরাম নাই। এই ধারা অঙ্গ বহিয়া বক্ষ পর্য্যন্ত আসিল, সেখান হইতে প্রস্তরে পড়িল। এইরূপে প্রস্তরের উপর নয়ন জল জমিতে লাগিল, তাহার পরে একটী স্রোতের সৃষ্টি হইল। সেই স্রোত যাইয়া নিকটে একটি গর্ত্ত ছিল, তাহা পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রভুর

অগ্রে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে, বহু লোক আছেন, কিন্তু প্রভুর নয়ন-ভৃঙ্গ নিমিষহারা হইয়া জগন্নাথের মুখ-পদ্মের উপর অর্পিত আছে।

মাঝে মাঝে ভোগ লাগিতেছে, তখন কবাট বন্ধ হইতেছে। প্রভু দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিষন্ন মনে সেখানে বসিয়া পড়িতেছেন। বসিয়া, নখ দ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি আঁকিয়া তাহাই দর্শন করিতেছেন। নয়ন জলে সেই নখাঙ্কিত মূর্ত্তি ধুইয়া যাইতেছে, প্রভু আবার আঁকিতেছেন। এমন সময় কবাট খোলা হইল। প্রভু আবার আনন্দে দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দুই প্রহর গেল। প্রভু এই দুই প্রহর কি দেখিলেন,—না, জগন্নাথের মুখখানি, সে কিরূপ, তাহা আপনারা জানেন। প্রভুর বদন দেখ, দেখিবে যে আনন্দে উহা ঝলমল করিতেছে, যেন কেহ বিদ্যুৎ বাটিয়া তাঁহার বদনে মাখাইয়াছে। প্রভুর নয়নে পলক নাই, ধারার বিরাম নাই, বাহ্য জ্ঞান নাই। মাঝে মাঝে শ্রীঅঙ্গ পুলকে আবৃত হইতেছে, আর অন্যান্য নানাবিধ ভাব দ্বারা শোভিত হইতেছে। প্রভু এইরূপ প্রত্যহ গমন করেন। কৃপাময় পাঠক! প্রভু, জগন্নাথের এই আপাত-দৃষ্টি-কুৎসিত মুখ প্রত্যহ দেখিতে যান, আর প্রত্যহ দুই প্রহর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দর্শন করেন। হে পাঠক! আপনি কি ইহা পারেন? কিন্তু প্রভু আমার অষ্টাদশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ এইরূপ করিয়াছিলেন! তবু তাঁহার দর্শন লালসা মিটে নাই।

প্রভুর দর্শন সুখ কত, তাহা পরিমাণ করিবার যন্ত্র আমাদের নাই। তবে তাঁহার মুখের দুই একটী কথায় উহা কতক বুঝা যাইবে। মধ্যাহ্নকাল হইয়াছে, প্রভুকে বাড়ী আনিতে হইবে, কিন্তু প্রভু নিমিষহারা হইয়া দর্শন করিতেছেন, তিনি আসিবেন কেন? সরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু, বাড়ী চল," "প্রভু, বেলা গেল," "প্রভু, আমাদের ক্ষুধা হইয়াছে।" কিন্তু যেমন গো-বৎস মাতৃস্তন মুখে করিয়া দুগ্ধ পান করিবার সময়, উহা ছাড়িতে চায় না, প্রভু সেইরূপ দর্শন সুখ ফেলিয়া আসিবেন না। বড় পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেছেন, "সরূপ, আর একটু দর্শন করি," "সরূপ আজ ভাল করিয়া দর্শন করিতে পারি নাই," "সরূপ, আমি ত এই মাত্র আসিলাম, আমাকে আর একটু দেখিতে দাও," "সরূপ, আমি যাব না, আমি স্নান আহার কিছুই করিতে চাই না, তুমি চলিয়া যাও," "সরূপ তোমাকে মিনতি করি," "সরূপ, আমার প্রাণ বাহির হইবে, আমাকে আর একটু থাকিতে দাও।" এইরূপ নানা ছলে প্রভু আসিবেন না। দুই প্রহর দেখিয়াছেন, প্রত্যহ

দেখিতেছেন, তবু প্রভুকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলে সর্ব্বনাশ! প্রভু যখন দেখিলেন যে সরূপ আর ছাড়েন না, তখন দুটী হাত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিনয় করিতে লাগিলেন।

প্রভু দর্শন করিতেছেন, সরূপ কাছে দাঁড়াইয়া। প্রভু মৃদু স্বরে কি বলিতে লাগিলেন। সরূপ কাছে, বুঝিলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। ব্যাপার এই যে, তখন প্রভু দেখিতেছেন, কাহাকে, না—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নয়,—স্বয়ং তাঁহাকে, তাই কথা বলিতেছেন। আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, আর সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতেছেন। ইহা ফেলিয়া সরূপের কথায়, স্নান আহার করিতে প্রভু আসিবেন কেন?

প্রভু মৃদু স্বরে শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু! আমি তোমাকে ফেলে অন্য গৃহে যাবো না। বন্ধু! আমার ভয় কি? তোমাকে ফেলে কোথায় যাব?" যিনি এই কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, তিনি সরূপের কথায় বাসায় যাইবেন কেন? প্রভু, ত্রিভুবনের যত সৌন্দর্য্য তাহার আকর সেই শ্রীকৃষ্ণের বদন দর্শন করিতেন। তিনি পঞ্চদশ দিবস সে সুখে বঞ্চিত হইয়া কেন অধীর না হইবেন?

প্রভুর দর্শন সুখ কত, তাহার পরিমাণ ভক্তগণকে ফেলিয়া আলালনাথে প্রস্থানরূপ অদ্ভুত ঘটনা দ্বারা জানা যাইবে।

নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলালনাথে চলিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত ও ব্যথিত হইলেন, সার্ব্বভৌম স্বয়ং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রভুকে আনিতে আলালনাথে চলিলেন। অনেক যত্নে প্রভুকে সচেতন করা হইল, কিন্তু তবু সেখানে দর্শন-সুখ নাই বলিয়া প্রভু পুরীতে আসিতে চাহিলেন না।

তখন সার্ব্বভৌম নবদ্বীপবাসিগণের কথা উঠাইলেন। বলিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেছেন, তাঁহারা আসিয়া যদি দেখেন যে তুমি সেখানে নাই, তবে তদ্দণ্ডে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন। পরিশেষে প্রভু সম্পূর্ণরূপে চেতন পাইলেন, আসিতে স্বীকার করিলেন, পুরীতে আসিলেন, আসিয়া ভক্তগণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কত দিনে হেরব গোরাচান্দের মুখ।
কবে মোর মনের মিটিব সব দুখ॥
কত দিনে গোরা পঁহু করবহিঁ কোর।
কত দিনে সদয় হইব বিধি মোর॥
কত দিনে শ্রবণের হইব শুভ দিন।
চাঁদ মুখের বচন শুনিব নিশি দিন॥
বাসু ঘোষ কহে গোরা গুণ সোঙরিয়া।
ঝরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া॥

বাণীনাথ পট্টনায়ক ভবানন্দের পুত্র, রামানন্দের কনিষ্ঠ, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভবানন্দ যখন প্রথম প্রভুকে দর্শন করেন, তখনই আপনাকে, আপনার পঞ্চপুত্রকে, ও আপনার সমুদায় বিষয়-বৃত্তি প্রভুর চরণে সমর্পণ করেন; আর বলেন যে, "বাণীনাথ তোমার নিকটে থাকিবে, থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিবে।" কিন্তু প্রভুর আবার কি আজ্ঞা? বা অর্থবৃত্তির প্রয়োজন কি আছে? সুতরাং রামানন্দের অতুল ঐশ্বর্য্য, কিম্বা বাণীনাথের সেবা, প্রভুর বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছিল না। প্রভুর ভক্তগণ এখন আসিতেছেন, আসিতেছেন প্রভুর নিকট। এই দুই শত ভক্ত এক প্রকার প্রভুর অতিথি। তাঁহাদিগকে থাকিবার বাসা দিতে হইবে, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদায় যোগাইতে হইবে। বাণীনাথ সেই সমুদায় উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু আজ্ঞা করেন না। কিন্তু স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুর মন জানেন, সুতরাং প্রভুর অভিপ্রায় কি, বাণীনাথ তাহা তাঁহাদের দুই জনের দ্বারা জানিতে পারেন। ভক্তগণ আসিতেছেন, বাণীনাথ চন্দন ও ফুলের মালা প্রভৃতির ও তাঁহাদের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রভুর ভক্তগণ আসিতেছেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। সকলে প্রভু ও ভক্তে মিলন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভক্তগণ আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের আগমন সংবাদ আসিল, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পুরীবাসিগণ অনেকে ধাইলেন। এদিকে সার্ব্বভৌম দ্রুতগতিতে রাজার নিকট দৌড়িলেন, যাইয়া

বলিলেন, ভক্তগণ আগতপ্রায়, অতএব যাহাতে তাঁহারা সচ্ছন্দে ঠাকুর দর্শন করিতে পারেন, ও যাহাতে সচ্ছন্দে বাসা পান, তাহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। রাজা এই কথা শুনিয়া সহর্ষে এই সমুদায় কার্য্যের ভার লইয়া কাশী-মিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্র, এই দুই জনকে ডাকাইয়া সেইরূপ আদেশ করিলেন। তাঁহারা যে আজ্ঞা বলিয়া সেই কার্য্য করিতে চলিলেন। এদিকে মহারাজ বলিলেন যে, তিনিও প্রভু-ভক্তে মিলন দর্শন করিবেন। তখন সার্ব্বভৌমের সহিত পরামর্শ করিয়া, যে স্থান হইতে তাঁহারা প্রভুর সহিত ভক্তগণের মিলন সচ্ছন্দে দেখিতে পান, এইরূপ একটী অট্টালিকা বাছিয়া নির্ণয় করিলেন। রাজার বাসনা এই যে, সেখানে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ ও প্রভু-ভক্তে মিলন দর্শন করিবেন। রাজা বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য আমাকে প্রভুর সকল ভক্তকে চিনাইয়া দিতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তিনি তাহা পারিবেন না, কারণ তিনি সকলকে জানেন না, তবে গোপীনাথ পারিলেও পারেন, অতএব তাঁহাকে ডাকা যাউক। ইহা বলিয়া তিনি গোপীনাথকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

এদিকে ভক্তগণ ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র, এ সমস্ত দুঃখ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, প্রভুকে দর্শন করিবেন সেই আনন্দে ভাসিতেছেন। তাঁহারা উপবাসে কি অনিদ্রায় ক্লেশ বোধ করিতেছেন না। প্রতিক্ষণে প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, এই আনন্দে প্রতি পদবিক্ষেপে প্রচুর শক্তি পাইতেছেন। তাঁহারা এইরূপে, নগরের প্রান্তভাগে, নরেন্দ্র সরোবরের তীরে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া ধৈর্য্যহারা হইলেন। প্রভুর বাসা তখন অতি অল্প দূরে। নরেন্দ্রতীরে আসিয়া সকলে "প্রভু প্রভু" বলিয়া আনন্দে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন যেন খোল ও মাদল আপনি বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ আবিষ্ট চিত্তে পায়ে নূপুর পরিলেন, আর এই দুই শত ভক্তে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল গীত গান করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে আমি বলি, "এটি বিদেশ স্থান, তোমরা কখনও এস্থানে আগমন কর নাই, কাহারও সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, রাজা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত, তোমাদের ভজন পদ্ধতি নূতন। বাহিরের লোকের নিকট তোমাদের ভজন কিরূপ, না, পাগল হইয়া নৃত্য ও গান করা। যেমন সুরাভিভূত ব্যক্তির কাণ্ড দেখিলে ভদ্রলোকে হাস্য করে, তোমাদের কাণ্ড দেখিলেও সেইরূপে বহিরঙ্গ লোকে হাস্য করিতে পারে। ভদ্রলোকে,

শ্রীভগবানের ভজন ও সাধন মানে বুঝেন যে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করা, কি মন্ত্র পড়া, কি ফুল দিয়া তাঁহাকে পূজা করা। কিন্তু পায়ে নূপুর পরিয়া ও হাত তুলিয়া, নৃত্য ও চীৎকার করিয়া গীত গাইয়া ভজন করিতে থাকিলে ভব্য লোকে কিরূপে সহিবে? তোমরা সেখানে—সেই ভিন্ন ও অপরিচিত স্থানে—যে, পায় নূপুর পরিয়া, নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে গমন কর, তোমাদের সাহস কি?"

কিন্তু আমার প্রভুর গণের আবার ভয় কি? তাঁহারা প্রেমানন্দে বিহ্বল ও চঞ্চল হইয়াছেন! সুতরাং তাঁহাদের বাহ্যাপেক্ষা নাই। যাহারা সামান্য মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহাদের লজ্জা থাকে না। যাঁহারা প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন, তাহাদের লজ্জা কেন থাকিবে? তাঁহাদের গীত, বাদ্য, হুঙ্কার, বিশালগর্জ্জন ও হরিধ্বনি, এ সমুদায়ে যেন ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন, এ ধ্বনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিতেছে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীতের এই এক অদ্ভুত মহিমা। কীর্ত্তনের যখন তরঙ্গ উঠে, তখন বোধ হয় যেন উহার ঢেউ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া শ্রীগোলকের সিংহাসনে লাগিতেছে। প্রকৃত পক্ষে নীলাচল টল মল করিয়া উঠিল। অগ্রে, প্রভুর নীলাচল-ভক্তগণ নদীয়া-ভক্ত আগমন দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বাল, বৃদ্ধ, যুবা,—কি ভক্ত, কি অভক্ত,—এই কীর্ত্তন দেখিতে দৌড়িলেন। নীলাচলে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই মহারোল রাজার কর্ণে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয়া নির্ণীত ছাদের উপর উঠিলেন। নীলাচলবাসিগণ নূতন কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন কি না, যে, দুইশত মনুষ্য নৃত্য গীত বাদ্যে উন্মত্ত হইয়া আসিতেছেন। আসিতেছেন কাহারা, না—ভদ্রলোক। প্রাচীন ও যুবা একত্র হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাইতেছেন। দেখিলে হাসি পাইবার কথা। এরূপ কাণ্ড দেখিলে, ইতর লোকে হাস্য করে, ঢিল মারে, নানা উৎপাত করে। কিন্তু এখানে তাহা হইল না। ভক্তগণ পরম ধন হারাইয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে পাইতে যাইতেছেন। তাঁহাদের আনন্দের কি সীমা আছে? তাঁহাদের আনন্দে যে তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাঁহারা ভাসিয়া চলিলেন। বাষ্পীয় যান হওয়াতে তীর্থ-দর্শন সুখ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাহারা কায়িক শ্রম করিয়া, অনাহারে নানা বিপদ স্কন্ধে লইয়া, তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন, তাঁহারা, যত শ্রীমুখ-সন্নিকট হয়েন, ততই চঞ্চল হন।

তাঁহারা, শ্রীমুখ-সন্নিকট আসিয়া, কতরূপ আনন্দ প্রকাশ ও রঙ্গ করেন, তাহা, যিনি তীর্থযাত্রিগণের আগমন দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন। ভক্তগণ পঞ্চবিংশতি দিবস পথ হাঁটিয়া, প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া, আহ্লাদে পাগল হইলেন। সেই ভক্তগণের আগমন দর্শন করিয়া রাজা ও সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা হইল, এই ব্যাপারটী বর্ণনা করেন, তাই তদ্দণ্ডে তাঁহার মনের ভাবটি শ্লোকরূপে ব্যক্ত হইল। সেই শ্লোকটি পড়িলে পাঠক ব্যাপার কি কতক বুঝিতে পারিবেন। যথা সার্ব্বভৌমের শ্লোক—

আনন্দহুঙ্কারগম্ভীরঘোষো হর্ষানিলোচ্ছাসিততাণ্ডবোর্ম্মিঃ।
লাবণ্যবাহী হরিভক্তিসিন্ধুশ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃকরোতি॥

ভক্তগণ আসিতেছেন, মহারাজ প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া, সঙ্গে সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয়া দর্শন করিতেছেন। রাজা অগ্রে নৃত্য দেখিলেন, পরে তাঁহার কর্ণে সঙ্গীতের স্বর আসিল। রাজা একেবারে মোহিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত বিস্তর শুনিয়াছি। একি অদ্ভুত কাণ্ড! কথা একটীও বুঝিতেছি না, কেবল স্থর শুনিয়া মন প্রাণ এলাইয়া যাইতেছে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "স্থর শুনিয়াই এই, আর ইহার সহিত অর্থ বুঝিলে না জানি কি হয়।"

রাজা। শুধু স্থরে আমার প্রাণ অস্থির করিল। ভট্টাচার্য্য ইহা কোথা হইতে আসিল?

গোপীনাথ। মহারাজ! ইহা শ্রীভগবান, আমাদের প্রভুর সৃষ্টি। পৃথিবীতে এরূপ কীর্ত্তন ছিল না, তিনি ব্রজের নিগূঢ় রস প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এই কীর্ত্তনপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাজা বলিলেন, "এরূপ কীর্ত্তন, এরূপ নৃত্য, এরূপ প্রেমভাব, কখন দেখি নাই। আর হরিধ্বনিতে যে এত মাধুর্য্য আছে, ইহাও কখন জানিতাম না। ভট্টাচার্য্য! এই যে বৈষ্ণবগণ আসিতেছেন, এরূপ বৈষ্ণবও কখন দেখি নাই। ইহাঁদের তেজ যেন কোটী সূর্য্যের ন্যায়। বৈষ্ণবের এত তেজ হইতে পারে, ইহা কখন জানিতাম না। ইহাঁরা কি সকলেই প্রভুর গণ?"

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "এই যে বৈষ্ণবগণ দেখিতেছেন, যাঁহাদের দেখিয়া আপনি স্বভাবতঃ মোহিত হইতেছেন, ইহাঁরা সকলেই আমাদের প্রভুর গণ। ইহাঁরা আর কিছুই জানেন না। ইহাঁদের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, আমাদের

প্রভু।” রাজা ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এমন ভাগ্য কি কখন হইবে যে, তিনিও গৌরাঙ্গের গণ হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা এখন বিবেচনা করুন। এই ভক্তগণ, যিনি যেখানে বাস করিয়াছেন, সে স্থান অদ্যাপি তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। মনে ভাবুন, খড়দহ, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড ইত্যাদি, এইরূপ প্রায় সব স্থানেই সম্পন্নশালী শ্রীবিগ্রহ দেখিবেন। আবার অনুসন্ধানে ইহাও জানিবেন যে, সেই স্থানে সেই ভক্তের শক্তির প্রভৃত নানা পরিচয় রহিয়াছে। ইহাঁদেব সকলের কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, ইহাঁরা সকলেই পতিতপাবন, ও শক্তিসঞ্চারক্ষম ছিলেন। যেরূপ লোক এখন একটীও জন্মে না। ইহাঁরা সকলেই আমাদের প্রভুর সৃষ্ট, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কি প্রভূত বস্তু, তাহা অনুভূত হইবে।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, “কলিযুগে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই কেবল ধর্ম্ম। ইহা শাস্ত্রের বচন। আবার শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাইতেছি যে, এই নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

রাজা বলিলেন, “প্রভু যে স্বয়ং ভগবান, তাহা আমি মনে জানিয়াছি। শাস্ত্রেও দেখিতেছি, প্রভুর ভগবত্তার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না, যে বহুতর পণ্ডিত প্রভুকে কেন বিদ্বেষ করে?” সার্ব্বভৌম বলিলেন, “শ্রীভগবান আপনি না জানাইলে তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। যদি ভগবানের কৃপা না হয়, তবে যে যত বড় পণ্ডিত হউক না কেন, তাঁহাকে জানিতে কখনই পারিবে না। ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মবাক্য—

“তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

“আমি প্রভুকে প্রথমে জানিতে পারি নাই, তাই তাঁহাকে আগ্রে অবহেলা করি। তাহার পরে যখন তিনি কৃপা করিলেন, তখন তাঁহাকে জানিতে পারিলাম।”

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীসরূপ দামোদর ও গোবিন্দ প্রভুর আলয় হইতে সেখানে আইলেন।

তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞাক্রমে ভক্তগণকে আদর করিয়া আনিতে যাইতেছেন। সরূপ ও গোবিন্দ যাইতেছেন, অদ্বৈত ও ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন, রাজা প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন। সরূপকে দেখিয়া সকলে চুপ করিলেন। রাজা উপরে দাঁড়াইয়া অমনি ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইনি সরূপ দামোদর; প্রভুর অতি মর্ম্মিভক্ত।" সরূপ ও ভক্তগণে দেখাদেখি হইল, ও সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন সরূপ শ্রীঅদ্বৈতের গলে মালা পরাইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আদর পাইয়া বিবশীকৃত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈতকে আর এক গাছি মালা পরাইলেন, পরাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত গোবিন্দকে চিনেন না, সরূপ গোবিন্দের পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন কাহারও আর কথা কহিবার অবকাশ নাই, সকলে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত। সুতরাং সরূপ পথ দেখাঁইয়া চলিলেন, আর সকলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

রাজা ভাবিলেন, ভক্তগণ সকলে শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রণাম ও দর্শন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, তাঁহারা মন্দির ডাইনে ফেলিয়া যখন দ্রুতগতিতে অন্য পথে চলিলেন, তখন রাজা অবাক হইলেন। পঞ্চবিংশতি দিবসের পথ হাটিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া, এখন শ্রীমন্দিরকে প্রণাম না করিয়া, শ্রীমুখ যে নিকটে আছেন ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ভক্তগণ চলিলেন। ইহাতে রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! এ কিরূপ কার্য্য হইল? জগন্নাথ যদিও এখন গুপ্ত ভাবে আছেন, তবু তাঁহার মন্দির কি চক্রকে প্রণাম না করিয়া, ভক্তগণ আগেই প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন, ইহাতে ত অপরাধ হইতে পারে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রেমের তরঙ্গ, বিধির বাঁধে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের প্রাণ নিতান্ত উচাটন হইয়াছে। মনের এ অবস্থায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দির দর্শনে সুখ পাইবেন কেন? এরূপ অবস্থায় দর্শনে অপরাধও হইতে পারে। তাহাই আগে প্রভুকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, সকলে মহানন্দে শ্রীমন্দির দর্শন করিবেন।

এমন সময়, রাজা দেখিলেন যে, রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ, বহুতর

ভৃত্যের স্কন্ধে মহাপ্রসাদ বহাইয়া দ্রুতগতিতে, প্রভুর আলয়ের দিকে গমন করিতেছেন। রাজা ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, যে, এত মহাপ্রসাদ কোথা যাইতেছে? ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইহা ক্ষুধিত, পথশ্রান্ত, প্রভুর ভক্তগণের নিমিত্ত, তাহার সন্দেহ নাই। বাণীনাথ, ভবানন্দের ও রামানন্দের আজ্ঞাক্রমে, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া নিশ্চিত তিনি এই সকল মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছেন।" রাজা ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ কিরূপ পদ্ধতি? সত্যই কি মহাপ্রসাদ ভক্তগণের নিমিত্ত যাইতেছে? লোক তীর্থস্থানে আগমন করিয়া ক্ষৌর করে ও উপবাস করে। ইহাঁরা তীর্থে আগমন মাত্রেই মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিলেন?" ভট্টাচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রেমের ধর্ম্মে বিধি নাই। অবশ্য শাস্ত্রের আজ্ঞা উপবাস। কিন্তু ভক্তগণ শাস্ত্রে যে পরোক্ষ আজ্ঞা আছে তাহা পালন করিবার জন্য, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীভগবান স্বয়ং প্রসাদ ভুঞ্জা-ইতেছেন। তিনি সম্মুখে বসিবেন, হয়ত তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিবেন। এতটি শুভ পরিত্যাগ করিয়া কোন ছার শাস্ত্রের বিধি পালন করিবে? তাহার পরে, যেখানে মহাপ্রসাদ সেখানে উপবাস হইতেই পারে না। প্রভু যখন আমাকে কৃপা করেন, তখন পূর্ব্বে আমার মনের জড়তা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। আমি নিদ্রা যাইতেছি, অতি প্রত্যূষে প্রভু আগমন করিয়া আমার হস্তে মহাপ্রসাদ দিলেন, দিয়া ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখনই আমি বুঝিলাম যে, প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাস বিধির বাধ্য নহে।" রাজা যাহা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, সমুদায় তাঁহার নিকট নূতন বোধ হইতেছে।

রাজা এই সমুদায় শাস্ত্রকথা একটু ভাবিয়া, পরে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! এই যে মহাপ্রভুর তেজস্বী ভক্তগণ যাইতেছেন, আমাকে ইহাদের পরিচয় করিয়া দাও।" তখন সার্ব্বভৌম গোপীনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি ইহাঁদের অনেককেই চিনি না। তুমি মহারাজকে আমার প্রভুর ভক্তগণকে চিনাইয়া দাও, আমাকেও বটে।" রাজা তখন গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহাকে মালা দেওয়া হইল, সেই বড় তেজস্বী মহাজনটি কে?" গোপীনাথ বলিলেন, "উনি বৈষ্ণবগণের

রাজা। উহাঁর খ্যাতি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। উনি মহাপ্রভুর এক স্কন্ধ। আর এক স্কন্ধ শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি এখানে পূর্ব্ব হইতে আছেন।"

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পশ্চাৎ যিনি যাইতেছেন, তিনি শ্রীবাস। তাঁহার পার্শ্বে আচার্য্যরত্ন।" এইরূপে গোপীনাথ, বক্রেশ্বর, পুরন্দর আচার্য্য, গঙ্গাদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, হরিদাস, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ, মাধব এবং বাসু তিন ভাই, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, বিজয়, কুলীনগ্রামের সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি ভক্তগণের ক্রমে ক্রমে পরিচয় করিয়া দিলেন। রাজা যদিও প্রভুকে দর্শন করেন নাই, তবু তাঁহার প্রত্যেক লোম-কূপে প্রভু প্রবেশ করিয়াছেন। তখন তাঁহার প্রভুর কথা ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না। প্রভুর গণ তাঁহার নিজগণ। সুতরাং তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত কাহিনী তাঁহার কাছে বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

যখন ভক্তগণ রাজার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, তখন তিনি অট্টালিকা হইতে নামিলেন। নামিয়া, কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্রকে গুটি কয়েক আজ্ঞা করিলেন। ইহাঁরা দুই জন শ্রীমন্দিরের কর্ত্তা, এক প্রকার পুরী নগরের কর্ত্তাও বটে। রাজা বলিলেন, "গৌড়দেশ হইতে প্রভুর ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই বাসা করিয়া দিতে হইবে। দেখিও যেন তাঁহাদের দর্শনের কোন ক্লেশ না হয়।" প্রভু যদিও সন্ন্যাসী, তাঁহার কিছু প্রয়োজন নাই, কিন্তু এখন তাঁহার দুই শত নিজজন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি এখন এক প্রকার ভারি সংসারী হইয়াছেন। ইহাই ভাবিয়া রাজা আর একটী আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা যাইয়া সর্ব্বদা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে। তিনি শ্রীমুখে কিছু বলিবেন না, কিন্তু তাঁহার মন বুঝিয়া সমুদায় কার্য্য করিবে। তাঁহারা এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর নিকট চলিলেন। রাজা, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা গিয়া প্রভু ও ভক্ত মিলন দেখ; আমার ভাগ্যে নাই, আমি যাইতে পারিব না।" সার্ব্বভৌম ও আচার্য্য ভক্তগণের পশ্চাৎ প্রভুর বাসায় চলিলেন।

এ দিকে ভক্তগণ সরূপ ও গোবিন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীমন্দির দক্ষিণে রাখিয়া প্রভুর বাসা পথে চলিলেন। প্রভু তখন গণসহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া নদীয়াবাসী প্রিয় ভক্তগণকে আদর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। ভক্ত-

গণ ও প্রভুতে নয়নে নয়নে মিলিত হইল। তখন প্রথমে ভক্তগণ ভক্তিতে গদ গদ হইয়া, প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার কাহাকে প্রণাম করিতে নাই, কিন্তু তিনি তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। তিনিও সাষ্টাঙ্গে ভক্তগণকে প্রণাম করিলেন। নিকটে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু তখন অদ্বৈতকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দে প্রভুর বদন প্রফুল্ল হইয়াছে, পদ্ম-নয়নে জল আসিতে লাগিল, কিন্তু সময় বুঝিয়া অতি কষ্টে উহা নিবা-রণ করিলেন। প্রভু দেখিলেন, তাঁহার জন্মভূমির ও স্বদেশের যত খেলার সাথী, কি গুরুজন, শ্রীঅদ্বৈতের পশ্চাতে, তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ, সজল, ও সপ্রেম নয়নে পলক-হারা হইয়া দৃষ্টি করিতেছেন। তখন প্রভু ব্যগ্র হইয়া শ্রীবাসকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ কেহ আর প্রণাম করিবার অবকাশ পাইলেন না। প্রভু প্রত্যেক ভক্তকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে আলিঙ্গন করি-তেছেন, তাঁহার এত দিনের পথশ্রান্তি ও মনের দুঃখ দূর হইতেছে, অঙ্গ সুশীতল হইতেছে।

তাহার পরে, প্রভু অতি সমাদরে ভক্তগণকে তাঁহার আলয়ে লইয়া চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলকে বসাইলেন, আপনিও বসিলেন, সক-লের হৃদয়বেগ এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল পলক-হারা হইয়া সেই স্নিগ্ধ শশি-মুখ খানি দেখিতে লাগিলেন। মহাজনগণ এখানে একটি আশ্চর্য্য কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কাশীমিশ্রের আলয়ে স্থান অতি অল্প, সেখানে এত ভক্তের স্থান কখনই হইত না। তবে প্রভু অলৌকিক শক্তিদ্বারা সেই আলয়ে এত ভক্তের স্থান দিয়াছিলেন। সকল ভক্তগণ বসিলেন, প্রভু স্বহস্তে প্রত্যেকের গলায় মালা ও অঙ্গে চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। না করিবেন কেন? ভক্তগণ তখন শ্রীভগবানের অতিথি! শ্রীভগবান তখন অতি দীন ভাবে আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। সকলের হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কেহ কোন কথা কহিতে পারি-তেছেন না। এমন সময়, প্রভু অতি দীন ভাবে, কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হইয়া, শ্রীঅদ্বৈতপানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের দর্শনে পূর্ণ হইলাম।" শ্রীঅদ্বৈত সেই ভাবে বিভোর হইয়া উত্তর

করিলেন, "শ্রীভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, অতএব তিনি চিরদিনই পূর্ণ। তত্রাচ ভক্ত সঙ্গে তাঁহার উল্লাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।"

তাহার পর প্রভু বাসুদেবের প্রতি চাহিলেন। ইনি মুকুন্দের দাদা, এই প্রথম প্রভুর কাছে আসিয়াছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু, বাসুদেব যে কি বস্তু, তাহা জানেন। এই যে ভক্তগণ বসিয়া আছেন, কিন্তু প্রভুর সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় নাই। তথাপি ইহাতে প্রভুর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র বাধা হইতেছে না। অন্তর্যামী প্রভু এই সব নূতন ভক্তগণের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, ও কে কি প্রকৃতির লোক জানিয়া, তাহার সহিত সেইরূপ আলাপ করিতেছেন। যথা, চন্দ্রোদয় নাটকে—

"যারে যারে পূর্ব্বে নাহি দেখে গৌরহরি।
আপনে সম্ভাষে প্রভু তার নাম ধরি॥
এই মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্দ্রবদনে।
নাম ধরি জিজ্ঞাসেন যাঁরে নাহি চিনে॥"

এইরূপে মুকুন্দের দাদা বাসুদেবকে প্রভু পূর্ব্বে দেখেন নাই, কিন্তু তবু তাঁহার সহিত চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া, তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিতেছেন, "বাসুদেব! মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে আমার নিকটে আছেন, কিন্তু তবুও তুমি মুকুন্দ অপেক্ষা আমার নয়নে অধিক সুখকর হইতেছ।" তখন সর্ব্ব-জীবে দয়াল বাসুদেব, অতি দীন ভাবে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে, গদ গদ হইয়া, প্রভুকে বলিলেন, "তোমার চরণ প্রাপ্তিকে বলে পুনর্জ্জন্ম। মুকুন্দ শ্রীপাদপদ্ম পূর্ব্বে পাইয়াছেন, আমি অদ্য পাইলাম। অতএব মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ, আমি তাহার কনিষ্ঠ। বিশেষতঃ মুকুন্দ তোমার কৃপা পাত্র, সুতরাং সেই কারণে তিনি আমার ও সকলের পূজ্য।"

প্রভু আবার বাসুদেবকে বলিতেছেন, "দক্ষিণ হইতে আমি দুই খানি পুস্তক আনিয়াছি, কৃষ্ণ-কর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা, উহা লেখাইয়া লইও।" এই দুই খানি পুস্তক প্রভু দক্ষিণ হইতে আনয়ন করেন, উহা এখন গৌড় মণ্ডলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থখানি লীলাশুক অর্থাৎ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সৃষ্টি, এই গ্রন্থ খানি প্রেমোন্মাদ অবস্থায় লেখা। ইহা, যিনি গৌর-লীলার মধু পান করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্য

কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থ খানি জগতে গুপ্ত অবস্থায় ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার শক্তিতে উহা জীবনপ্রাপ্ত হইল। প্রভু তাহার পরে শ্রীবাসের দিকে চাহিয়া, করুণস্বরে বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি তোমাদের চারি ভাইয়ের নিকট চিরদিনের নিমিত্ত বিক্রীত আছি।" এই যে প্রভু শ্রীবাসকে গৌরব করিয়া বলিলেন, ইহার একটি আখরও অলীক নহে। প্রভু যত লীলা নিজবাটীতে করেন, তাহা অপেক্ষা অধিক লীলা শ্রীবাসের বাড়ী করিয়াছিলেন। শ্রীবাস প্রভুর এই উক্তিতে ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এরূপ আজ্ঞা কখন করিবেন না। আমরা চারি ভাই আপনার চরণে বিক্রীত।" শ্রীবাসের এ কথাও ঠিক, কারণ এ জগতে কে না শুনিয়াছে, "শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাচে গোরা রায়।"

প্রভু ইহার পরে শিবানন্দের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। বলিতেছেন, "আমার উপর তোমার চির দিন বড় টান, আমি বেশ জানি।" এ কথা প্রভু শিবানন্দকে বলিতে পারেন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সেন মহাশয় পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বহু তপস্যা করিয়া কালকে গৌর করিয়াছিলাম, আবার তুই সেই গৌরকে কাল করিলি?" প্রভুর ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আগমন করিতেন, তখন শিবানন্দ সকলের পাথেয় দিতেন; তাহা নয়, তাহাদের কোন মতে কষ্ট না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাও করিতেন। এ কথা বলিলেই হইত' যে, আমি প্রভুকে দর্শন করিতে যাইব, অমনি শিবানন্দ তাহার পাথেয় ভার গ্রহণ করিতেন। অতএব প্রভু যে বলিলেন, "শিবানন্দ, আমার প্রতি তোমার বড় টান," তাহা অন্যায় বলেন নাই। প্রভু এই কথা বলিলে শিবানন্দ প্রেমে গদ গদ হইয়া, গলায় বসন দিয়া, এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে চরণে পড়িলেন। যথা, শ্রীশিবানন্দ সেনের শ্লোক—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত শ্চিরায় মে কূলমিবাসী লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

শঙ্কর দামোদরের কনিষ্ঠ ভাই। ইহাঁরা সর্ব্ব সমেত পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই প্রভুর অতি মর্ম্মিভক্ত। দামোদর প্রভুর সঙ্গে বরাবরই আছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শঙ্কর এখন আইলেন। শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু সরূপের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "দামোদরের প্রতি আমার

যেরূপ স্নেহ আছে, তেমনি তাহাকে ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু শঙ্করের উপর আমার—" ইহাই বলিয়া যেন কি বলিবেন, তাই দামোদর পানে চাহিয়া, তাঁহার ভয়ে বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। দামোদর বলিলেন, "প্রভু, চুপ করিলেন কেন? আপনার শ্রীমুখে আমার কনিষ্ঠ শঙ্করের গুণানুবাদ, আমার ত কখন ক্লেশের কারণ হইতে পারে না, বরং বড় সুখের বিষয় হইবে।" প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, শঙ্করের উপর আমার যে প্রীতি, তাহাতে ভক্তির গন্ধ নাই, সে বিশুদ্ধ প্রীতি। তাই বলি, শঙ্করকে আমার এখানে থাকিতে দাও।" দামোদর বলিলেন, "আমরা সকল ভ্রাতাই আপনার নিকট চির-বিক্রীত। তবে শঙ্কর অদ্য আমার বড় ভাই হইলেন।" প্রভু তখন সরূপকে আবার বলিলেন, "শঙ্করকে আমি তোমার হস্তে দিলাম।" আবার গোবিন্দকে বলিলেন, "গোবিন্দ, শঙ্করকে যত্ন করিয়া পালন করিও। যেন কোন দুঃখ না পায়।"

প্রভু ইতি উতি চাহিতেছেন, যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন। পরে বলিলেন, "মুরারি! মুরারি কোথায়? এখন মুরারির কাহিনী শুনুন। মুরারি ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন, আর উঠিতে পারেন নাই। সেখানে পড়িয়া গিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, "হে ভক্তগণ! আমি পামর ও দুঃখী, আমার আর যাইতে সাহস হইতেছে না। এত দূর যে আসিয়াছি, ইহা কেবল আপনাদের কৃপায়।" প্রভু যখন মুরারিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তের মধ্যে কয়েক জন তাঁহাকে আনিতে বাহির হইলেন। তাঁহারা মুরারির অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র উঠ, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।" তখন মুরারি কষ্টে শ্রষ্টে উঠিয়া দুই গুচ্ছ তৃণ মুখে করিয়া, আর দুই গুচ্ছ তৃণ হাতে লইয়া, দীন হইতে দীন হইয়া, প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু মুরারিকে দর্শন করিয়া, সহর্ষে গাত্রোত্থান করিলেন, ও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিন্তু মুরারি করজোড়ে অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি অতি মলিন, আপনার স্পর্শযোগ্য নহি।" প্রভু অবশ্য সে কথা শুনিলেন না। বল দ্বারা মুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অতি নিকটে বসাইলেন। বসাইয়া, হস্ত দ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মুরারি!

দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্য আমি সহিতে পারি না। * যথা, চৈতন্যচরিত কাব্যে—

প্রভুশ্চ তৎ কাকুবাদং রোদনঞ্চ মহত্তরং।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা ক্ষণমপি ন সেহে বিকলোঽভবৎ॥

পানিহাটিতে রাঘবের স্থানে যে মহোৎসব অদ্যাপি হইয়া থাকে, সেই রাঘবের প্রতি চাহিয়া প্রভু বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র, তুমি অতি ভাগ্যবান।" রাঘব এই কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

এইরূপে প্রভু প্রত্যেক জনকে মধুর সম্ভাষণ করিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, "হরিদাস! হরিদাস কোথায়?" তখন আবার জন কয়েক হরিদাসকে আনিতে ছুটিলেন। দেখেন, হরিদাস মুরারির ন্যায় প্রভুকে প্রণাম করিতে গিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর উঠিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া গোপীগণ অতি কাতর হইয়া তাঁহাকে খুজিতেছিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন কোন বৃক্ষের শাখা স্বভাবত মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। গোপীগণ তখন ভগবৎ বিরহে বিভোর। তাঁহারা যাহা দেখিতেছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য ভাবিতেছেন। এই বৃক্ষের শাখাগুলি দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন যে, "ইহারা নিতান্তই প্রণাম করিতেছিল। প্রণাম আর কাহাকে করিবে, অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকে।" আবার তর্ক করিতেছেন, "যদি তাই হইল, তবে মস্তক উঠাইতেছে না কেন? শ্রীকৃষ্ণ ত এখন চলিয়া গিয়াছেন?" তাহাতে গোপীগণ আপনা আপনই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, "এই বৃক্ষ-শাখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল, কিন্তু আশীর্ব্বাদ পায় নাই, তাহাই মস্তক উঠায় নাই, আশীর্ব্বাদের আশয়ে ঐরূপ পড়িয়া আছে।" গোপীগণ উন্মাদ অবস্থায় যাহা বলিয়াছিলেন, মুরারি ও হরিদাস তাহাই সফল করিলেন।

মুরারি প্রভুর বাড়ির নিকট পড়িয়াছিলেন, হরিদাসের ততদূর আসিতে

* গোবিন্দের কড়চা অনুসারে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, মুরারি নীলাচলে পূর্ব্বে আগমন করেন। কিন্তু নানা কারণে বোধ হয় তখন তিনি আসেন নাই।

সাহস হয় নাই। প্রভুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অমনি রাজপথে পড়িয়া থাকিলেন। তাঁহার মন্দিরের নিকট আসিতে সাহস হয় নাই।

এতদূর আসিয়াছেন প্রভুর সাহসে। কিন্তু মন্দিরের নিকটে আসিয়া ভাবিলেন যে, তিনি এত অপবিত্র, যে পবিত্র স্থানে যাইবার উপযুক্ত নন। তাই প্রভুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অমনি পড়িয়া থাকিলেন। শ্রীপ্রভুর ভক্তের মধ্যে এক একজন এক এক ভাবের আদর্শ ছিলেন। হরিদাস দৈন্যের আদর্শ।

তখন হরিদাসকে লইতে কয়েক জন ভক্ত আবার আসিলেন। কিন্তু হরিদাস যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, প্রভু তাঁহার নিজ কার্য্যে যে ঔদার্য্য দেখান, তাহা তিনি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অতি নীচের শ্রীমন্দিরের নিকটে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। তাই—

হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃত টোটার মধ্যে কিছু স্থান পাঙ।
তাহা পড়ি রহি কাল এ কাল গোঞাঙ॥—(চরিতামৃত)

প্রভুকে এই সংবাদ বলা হইল। প্রভু শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, দৈন্য দেখিলে প্রভু চিরকালই আনন্দিত হইয়া থাকেন, তাই নিজ মুখে শ্লোক বলিয়াছেন, যে, যে তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে, সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উপযুক্ত হয়।

এমন সময়ে কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা আসিলেন। আসিয়া, প্রভুকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবগণের সৌন্দর্য্য ও প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার পর করজোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞাক্রমে সকল বৈষ্ণবের বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছি, আজ্ঞা দিউন, তাঁহাদিগকে লইয়া যাই, যাইয়া বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিই।" এ বাসা নির্ণয়, প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে, বাণীনাথ পূর্ব্বে করিতেছিলেন। কিন্তু এখন মহারাজ স্বয়ং এই ভার লওয়াতে, অবশ্য তাঁহার এই কার্য্য আর করিতে হয় নাই। প্রভু বলিলেন, "গোপীনাথ, তুমি সকলকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাও।" তাহার পরে ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা যাও, যাইয়া সমুদ্রে স্নান কর। পরে চূড়া দর্শন করিয়া এখানে আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিবা।"

ভক্তগণ গমন করিলে, প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন, "আমার বাসার নিকট পুষ্পোদ্যানে একখানি ঘর আছে, ও খানি আমাকে ভিক্ষা দাও।" কাশীমিশ্র বলিলেন, "ঘর কি ছার বস্তু, আমরা আপনার; যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন।"

প্রভু তখন নিশ্চিন্ত হইয়া হরিদাসকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। বাসা হইতে বহু দূর গমন করিয়া তাঁহাকে পাইলেন। দেখিলেন, হরিদাস রাজ-পথে বসিয়া নাম-কীর্ত্তন করিতেছেন। হরিদাস উঠিয়া চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। পরে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন বুঝিতে পারিয়া, করজোড়ে পশ্চাৎ হাঁটিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু আমাকে ছুইবেন না, আমি অস্পৃশ্য পামর, আপনার স্পর্শযোগ্য নহি।" প্রভু তখন গদ গদ ভাবে বলিতেছেন, "আমি পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা করি।" যথা—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্রধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ জ্ঞানী হইতে তুমি পরম পাবন॥—(চরিতামৃত)

হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক নাম জপ করিতেন। সেই কথা লক্ষ্য করিয়া প্রভু শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপু স্তপতে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচু র্নাম গৃণন্তি যে তে॥" *

প্রভু তখন হরিদাসকে হৃদয়ে করিলেন। করিয়া, প্রভু ও ভক্ত আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে, তাঁহাকে আপনি লইয়া, ক্রমে তাঁহার বাসার নিকটে ফুলের বাগানে নূতন ঘরে—(যাহা একটু পূর্ব্বে কাশীমিশ্রের নিকটে চাহিয়া লইয়াছিলেন)—উপস্থিত হইলেন।

---

* যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান সে শ্বপচ [চণ্ডাল] হইলেও কেবল সেই জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাঁহারাই যোগ করেন, তাঁহারাই তীর্থ-স্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করেন।

বলিলেন, "এই তোমার ঘর, এখানে বাস কর, করিয়া নাম-কীর্ত্তন করিও। আমি প্রত্যহ তোমার সহিত আসিয়া মিলিব। আর তোমার নিমিত্ত প্রত্যহ মহাপ্রসাদ এখানে আসিবে। মন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিও। হরিদাস যে মন্দিরে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, প্রভু তাঁহার ইচ্ছার পোষকতা করিলেন। প্রকৃত কথা, হরিদাস মুসলমান, মন্দিরে অন্য ভক্তের ন্যায় গমন করিলে বহিরঙ্গ লোকের বিরক্তি হইতে পারিত। প্রভু কখন বল করিয়া কোন মত চালাইতেন না। হরিদাস বাসায় আসিলে, নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি, যাঁহারা নীলাচলে ছিলেন, আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

প্রভুর বাসায় বহু প্রকারের বহুতর প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তগণ সকলে আপন আপন বাসা পাইয়া, তাঁহাদের যাহার যে সম্পত্তি সেখানে রাখিয়া সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। পরে চূড়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু আনন্দে একবারে বিহ্বল হইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার নদীয়ার সমুদায় খেলার সাথী উপস্থিত, তাঁহার বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ। আপনি পাতা পাতিতেছেন, আপনি সকলকে ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। সকলে উপবেশন করিলে, কাহারও হস্তে আপনি জল দিতে উদ্যোগী হইলেন, পরিশেষে আপনি পরিবেশন করিতে চলিলেন। প্রভু চিরকালই বড় মহাশয় লোক, বিশেষতঃ অতিথি খাওয়াইতে খুব মজবুৎ। সে সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ জ্ঞান থাকে না, কল্য কি খাইবেন তাহাও মনে থাকে না। তাই পাতে পাতে একবারে দুই তিন জনের ভাত দিতে লাগিলেন।

প্রভু এই পরিবেশনে আমোদ করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভু উহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার আনন্দে পাতে পাতে নানাবিধ সামগ্রী রাখিতেছেন। এমন সময় স্বরূপ বলিলেন, "প্রভু, দেখিতেছেন না, আপনি না বসিলে কেহ ভোজন করিবেন না। আপনি ভোজন করুন, আমরা পরিবেশন করিব। আপনার সঙ্গী যত সন্ন্যাসী সমুদায়কে গোপীনাথ আচার্য্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনিও প্রসাদান্ন আনিয়াছেন।" তাঁহারা আপনার আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অপেক্ষা করিতেছেন। প্রভু করেন কি, ভোজনে বসিলেন। পরিবেশন তখন

সরূপ, জগদানন্দ, ও দামোদর পণ্ডিত, এই তিন জনে করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাপ্রভু স্বয়ং গোবিন্দের হাতে মহাপ্রসাদ দিয়া হরিদাসের নিমিত্ত পাঠাইলেন। পাঠাইয়া, আপনি শ্রীনিত্যানন্দকে দক্ষিণে করিয়া ভোজনে বসিলেন। মহাপ্রসাদ কখন অপবিত্র সামগ্রী হইতে পারে না, প্রভু অগ্রে সার্ব্বভৌমকে এই শিক্ষা দেন। এবং এই যে মহাপ্রসাদ আনিয়াছেন, ইনি বাণীনাথ, রামানন্দের ভাই, কায়স্থ। আবার আনাইয়াছেন সেবকগণের দ্বারা বহাইয়া। এখন যে নীলাচল পুরীর বাহির হইলে কেহ কেহ মহাপ্রসাদকে উচ্ছিষ্ট বলিয়া অপবিত্র ভাবেন, সে কথা প্রভুর সম্মত নয়। যাহা শ্রীভগবানের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে, উহা পরম পবিত্র বস্তু।

মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া কিরূপে ভোজন করিতেন, তাহার কতক নিদর্শন, এখন বৈষ্ণবগণ যে মহোৎসব করেন, তাহাতে জানা যায়। এই ভোজন-ভজন পরে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ফল কথা, যিনি প্রকৃত মহাপ্রভুর গণ, তিনি সকল কার্য্যই ভক্তি-রসে ডুবাইয়া লয়েন। প্রভু ভক্তগণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে আপনি সকলের অঙ্গে চন্দন দিলেন। সকলের গলায় ফুলের মালা পরাইলেন। তখন ভক্তগণ যাহার যে বাসা সেখানে গমন করিয়া শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ভক্তগণ খোল করতাল মাদল মৃদঙ্গ লইয়া প্রভুর বাসায় আগমন করিলেন। রামানন্দ বৈষ্ণবগণের অপরিচিত বলিয়া পূর্ব্বে আসেন নাই, এখন প্রভুর ন'দেবাসী নিজ-জন দর্শন করিতে আগমন করিলেন। রামানন্দ কায়স্থ, ধনী লোক, পরম বিষয়ীর ন্যায় আকার, তাঁহার সহিত প্রভুর গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। প্রভু তখন সকলকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরে সকলে ধূপ আরতি দর্শন করিলেন। ভক্তগণ অবশ্য খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া গিয়াছেন। প্রভু ভক্তগণ লইয়া তখন চারিটি সম্প্রদায় প্রস্তুত করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুটি খোল, চারিটি করতাল, এক জন মূল-গায়ক দিলেন। এক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইলেন নিত্যানন্দ, এক সম্প্রদায়ের অদ্বৈত, এক সম্প্রদায়ের শ্রীবাস, আর এক সম্প্রদায়ের বক্রেশ্বর। এমন সময় তুলসী পড়িছা আসিয়া সকলকে শ্রীজগন্নাথের

আজ্ঞাস্বরূপ চন্দন মালা দিলেন। তখন প্রভু চারি সম্প্রদায় মন্দিরের চারিদিকে ভাগ করিয়া দিলেন, দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

মন্দিরের চারিদিকে চারি সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, প্রভু খঞ্জনাকৃতি ধরিয়া চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। খানিক এ সম্প্রদায়ে, খানিক ও সম্প্রদায়ে, বা আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া,—যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাসের রজনীতে করিয়াছিলেন,—একবারে চারি সম্প্রদায়েই নাচিতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা, তিনি কি করিলেন তাহা তিনিই জানেন। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রভু নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তাঁহাদের সম্প্রদায়ে আছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন, এই আনন্দে ভক্তগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মনে করুন, এই দুই বৎসর প্রভুর বিরহ সহ্য করিয়া অদ্য আবার তাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছেন। আবার প্রভু আর এক উপায়ে ভক্তগণকে কীর্ত্তন-শক্তি দান করিতেছেন। প্রভু যাহাকে নিকটে পাইতেছেন তাহাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই আলিঙ্গন দ্বারা প্রকারান্তরে জানাইতেছেন যে, তুমি বেশ কীর্ত্তন করিতেছ, তোমাকে বলিহারি যাই, তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে। প্রভুর আলিঙ্গনে ভক্ত ইহাই বুঝিয়া আরও বিহ্বল হইতেছেন। শ্রীনাম মঙ্গল কীর্ত্তনে নীলাচল টলমল করিয়া উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই মুহূর্ত্তে নীলাচল অধিকার করিয়া লইলেন।

শ্রীকীর্ত্তন মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তমের লোকে উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে ধাইলেন। এই কীর্ত্তন দেখিবার বস্তু বটে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী নহেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তখন সেখানকার প্রায় সকলেরই এই অটল বিশ্বাস। তিনি তখন তাঁহার পার্ষদগণ লইয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে কাহার না সাধ হয়? প্রভুকে কেহ কদাচিৎ দর্শন পান। যদি তাঁহাকে কেহ দেখিতে পান, তবে দেখেন তিনি ভাবে বিভোর ও ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। এই প্রভু অদ্য নৃত্য করিবেন, ইহা দেখিতে কাহার না লালসা হয়? তাই পুরুষগণ চলিলেন, নারীগণ চলিলেন, বালকগণ চলিলেন, এমন কি স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র, জ্ঞানহারা হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় কীর্ত্তন দর্শন ও শ্রবণ করিতে অট্টালিকা আরোহণ করিলেন। রাজা চলিলেন, কাজেই পাত্র মিত্র, ভৃত্য, এইরূপে তাঁহার স্বজন সঙ্গে

চলিলেন। মন্দিরের সেবকগণ তখন মন্দির হইতে দীপ আনিয়া কীর্ত্তন-স্থান আলোকময় করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন সুলভ করিয়া দিলেন।

সকলে চাহিয়া দেখেন যে, প্রভু তিলার্দ্ধের মধ্যে প্রেম-তরঙ্গে যেন সমস্ত সংসার ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন। দেখেন, প্রভু সোণার পুত্তলির ন্যায় প্রেমে বিবশীকৃত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সেই চতুর্হস্ত পরিমিত সুবলিত দেহ, গলিত বিমল হেমোজ্জ্বল তেজ দ্বারা মণ্ডিত, নানা ভাবে তরঙ্গায়মান হইতেছে। প্রভুর নৃত্য অনেক ভক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভুর এই নৃত্য দর্শনে জীবমাত্রেই চঞ্চল হইতেন, ইহা দর্শনে বহুতর লোক সংসারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। নৃত্য দেখিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সেই সন্ন্যাসিগণের রাজা, তাঁহার কুল শীল হারাইয়া প্রভুর চরণ তলে আসিয়াছিলেন। পুরীবাসিগণ ও রাজা সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন। আবার তাঁহারা দেখিতেছেন যে, প্রভুর নয়ন দিয়া পিচ্‌কারীর ন্যায় জল নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকের লোক সমূহকে স্নাত করাইতেছে। প্রভু এইরূপে মন্দির ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং সকলে তাঁহার নৃত্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কীর্ত্তনে মন নাই। প্রভু পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া, তাঁহাকে ও ভক্তগণকে দুঃখ দেন, এই ভয়ে তিনি বাহু পসারিয়া, তাঁহার পাছে পাছে বেড়াইতেছেন। যখন তাঁহার শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে গমন করেন, তখন শচীমাতা শ্রীনিতাইয়ের হাত দুখানি ধরিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া চলিল, সে বালক, তাহার আর কেহ নাই, তিনি যেন তাহাকে ছোট ভাই ভাবিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বিশেষতঃ নিমাই যখন মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়ে, তিনি যেন তাহাকে ধরেন, মাটিতে পড়িতে না দেন।" নিতাই সে ধর্ম্ম যত দূর সাধ্য পালন করিয়াছিলেন। নিতাই প্রভুকে পড় পড় দেখিলে দুই বাহু পসারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। নিতাইয়ের কাণ্ডই আনন্দময়। কখন প্রভুকে পড়-পড় দেখিয়া, আনন্দে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া "সামাল সামাল" বলিতেছেন। কখন বা সামাল সামাল বলিতে বলিতে আপনি পড়িয়া যাইতেছেন। যথা পদ—"নিতাই, আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই।"

মহারাজ প্রতাপ রুদ্র প্রভুর সহিত মিলিবার জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার নৃত্য ও কীর্ত্তন দেখিয়া ও শুনিয়া, আরও সংজ্ঞা-হারা হইলেন।

সংকীর্ত্তন দেখি রাজার হইল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥

তখন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস, ও শ্রীবক্রেশ্বর, এই চারি জনকে প্রভু নাচিতে আজ্ঞা দিলেন। চারি সম্প্রদায়ে চারি জন নাচিতে লাগিলেন। এইরূপ খানিক নৃত্যের পর যখন সকলে ক্লান্ত হইলেন, তখন কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। তখন পুষ্পাঞ্জলী দেখিয়া ভক্তগণ সহিত প্রভু আপন বাসায় আসিলেন। সকলে আসিয়া দেখেন যে তুলসী পড়িছা মহারাজের আজ্ঞা ক্রমে প্রভুর আলয়ে ভারে ভারে প্রসাদ রাখিয়া দিয়াছেন। তখন ভোজনানন্দের পরে সকলে নিজ নিজ বাসায় শয়ন করিতে গমন করিলেন।

এইরূপে যে প্রত্যহ প্রভুর আলয়ে ভোজন হইতেছে তাহা নহে। ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহারা প্রভু যাহা ভাল বাসেন তাই গৌড় হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। প্রভু ও ভক্তগণ একত্র এইরূপে প্রতিদিন মহোৎসব করিতে লাগিলেন। ক্রমে রথযাত্রার দিন সন্নিকট হইল। তখন প্রভু তুলসী পড়িছা, কাশিমিশ্র ও সার্ব্বভৌম, এই তিন জনকে ডাকাইলেন। ডাকাইয়া বলিলেন যে, রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীমন্দির পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত করিতে হইবে। অতএব তাঁহারা মন্দির মার্জ্জন-রূপ সেবাটি তাঁহাকে দিউন। ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া বলিলেন যে, এ রূপ নীচ সেবা প্রভুর পক্ষে শোভা পায় না। তবে নিতান্তই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা কাজেই আজ্ঞা পালন করিবেন। তাঁহারা বলিলেন, বহুতর ঘট ও সম্মার্জ্জনী প্রয়োজন হইবে, উহা মন্দিরে রাখা হইবে।

প্রভু পরদিন প্রভাতে তাঁহার পার্ষদগণ লইয়া মহানন্দে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এই হরি-মন্দির মার্জ্জন-রূপ লীলা প্রভু পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপে একবার করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রভু নবদ্বীপের ও নীলাচলের তিন চারি শত ভক্ত সমভিব্যাহারে মন্দিরে চলিলেন। তখন ভক্তিতে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্তকে প্রভু শ্রীহস্তে চন্দন মাখাইলেন ও মালা পরাইলেন, আর ভক্তগণ শ্রীকর-স্পর্শে ভক্তিধন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া।
ভক্ত সবে পরাইল অতি প্রীত হইয়া॥
ঈশ্বর প্রসাদ মাল্য দিলেন গলায়।
আনন্দে বিহ্বল সবে চৈতন্য কৃপায়॥
করেতে শোধনী ভক্তগণ চারি দিকে।
মত্ত গজ-গতি প্রভু চলিলেন আগে॥ -(চন্দ্রোদয় নাটক)

ভক্তগণ দেখিলেন, তুলসী পড়িছা একশত সম্মার্জ্জনী ও বহুতর ঘট রাখিয়া দিয়াছেন। তখন কটি-বন্ধন করিয়া একেবারে তাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য আমাদের প্রভু সকলের আগে। এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে প্রভু ব্রজের অতি নিগূঢ় রস জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আবার মন্দির মার্জ্জন সেবার ন্যায় অতি স্থূল সাধন প্রণালী কেন ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে গেলেন? ফল কথা, যাহাতে ভক্তির উদ্রেক করে, সেই কার্য্যই প্রভুর সম্মত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের এই সেবা ছিল যে, যখন শ্রীজগন্নাথের রথ, মন্দির ত্যাগ করিয়া সুন্দরাচল গমন করিতেন, তখন তিনি সুবর্ণ মার্জ্জনী লইয়া অগ্রে পথ পরিষ্কার ও চন্দন জল ছিটা দিয়া উহা পবিত্র করিতেন। এই সেবা দেখিয়া প্রভুর প্রতাপরুদ্রের উপর কৃপা হইল। মনে ভাবুন, শ্রীমন্দির শ্রীভগবানের বাসস্থান, তাঁহার মার্জ্জন করিতেছি যাহার মনে এই ভাব জাজ্জ্বল্যমান রূপে খেলিতে থাকে, তাহার আনন্দের সীমা কি? ভক্তি কার্য্যে ছোট বড় নাই, মোটা সূক্ষ্ম নাই।

ফল কথা, যখন ভক্তগণ মন্দির পরিষ্কার আরম্ভ করিলেন তখন সকলে ভক্তিতে বিগলিত হইলেন। সকলে মুহুর্মুহু হরিধ্বনির সহিত দিক নিনাদিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর উৎসাহ অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি অধিক কার্য্য করিতেছেন। যিনি ভাল করিয়া কার্য্য করিতেছেন, প্রভু তাঁহাকে সাধুবাদ করিতেছেন। আর সাধুবাদ পাইবার নিমিত্ত সকলে প্রাণের সহিত পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্তু তবু কেহ প্রভুর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। মাঝে মাঝে কীর্ত্তন হইতেছে, মাঝে মাঝে একটু নৃত্যও হইতেছে। মনে করুন, ইহার মধ্যে কোন ভক্তের একটু বেগ বাড়িয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া একটু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অমনি ভক্তগণ সমুদায় কার্য্য ফেলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কাজেই

কার্য্য তত শীঘ্র শীঘ্র হইয়া উঠিতেছে না। ভক্তগণ সম্মার্জ্জনীর দারা উপর ও তল এইরূপে পরিষ্কার করিয়া, শেষে সকলে হস্ত দ্বারা আবর্জ্জনা কুড়াইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, যিনি যত কুড়াইবেন সব এক স্থানে করিয়া রাখা হউক, পরে বিচার করিয়া দেখা যাইবে কাহার কত কুড়ান হইয়াছে। যাহার অধিক হইবে তিনি পুরস্কার, ও যাহার কম হইবে তিনি দণ্ড পাইবেন।

শ্রীঅদ্বৈত উপবাসে, বয়সে, পথশ্রমে ও নানাবিধ কারণে দুর্ব্বল,—অধিক কুড়াইতে পারেন নাই। বিচারে প্রভুর কঙ্করের কাঁড়ি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ও শ্রীঅদ্বৈতের সর্ব্বাপেক্ষা কম হইল। তখন প্রভু হাসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে যে কথা স্থির হয়, তাহাতে তুমি দণ্ডার্হ। শ্রীঅদ্বৈতের উত্তর নাই। তখন সরূপ শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি গোয়ালা, পেট ভরিয়া দুধ ও ননী খাও, তোমার সহিত শ্রীঅদ্বৈত তাপস ব্রাহ্মণ পারিবেন কেন?" সরূপ যেরূপ, প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহা সাব্যস্ত করিয়া, কথা কহিলেন, প্রভু সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতকে মহাদেব স্থির করিয়া বলিতেছেন, "সরূপ, তাহা নয়, তাহা নয়। যিনি ব্রহ্মাণ্ড সংহার করেন, শ্রীভগবান তাঁহার জয় কখন দেন না। সরূপ, ধর্ম্মের বল বড় জানিবা।" সরূপ বলিলেন, "গোয়ালা বুঝি বড় সাধু পুরুষ? পুতনা দিলে স্তন্য দুগ্ধ, আর সেই হতভাগিনী সেই অপরাধে মারা গেল।" প্রভু বলিলেন, "সরূপ, কথা কাটাকাটি করায় কি ফল? শ্রীজগন্নাথ দেব এখানে স্বয়ং সাক্ষী। যদি শ্রীঅদ্বৈত সংহারী ও আমি নিরপরাধী না হইব, তবে শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে পরাজয় ও আমাকে জয় দিবেন কেন? আমার কঙ্করের কাঁড়ি বড় হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি যে শ্রীজগন্নাথ আমার পক্ষে সাক্ষী দিতেছেন।" শ্রীঅদ্বৈতের তখন কথা ফুটিল, বলিলেন, "যে ব্যক্তি সুজন হয়, সে আপনাকে আপনি সাক্ষী মানে না। তোমার সাক্ষী জগন্নাথ, আর তুমি জগন্নাথের সাক্ষী, ইহাতেই প্রমাণ তোমরা কিরূপ সুজন।" সুতরাং নৃত্য, গীত ও কায়িক পরিশ্রমের সহিত হাস্য কৌতুকও হইতেছে।

মন্দির পরিষ্কৃত হইলে, তখন জল আনিবার আজ্ঞা হইল।

শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লইয়া যায় আর শত জন॥

ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাহা লোকে আনি দিল॥
জল ভরি ঘর ধোয়ে করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি করে ঘট সমর্পণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই করে সেই কহে কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ-নাম হইল তাহা সঙ্কেত সর্ব্ব কাম॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলা করেন প্রেমে শত জনের কাম॥—(চরিতামৃত)

এইরূপে সমস্ত মন্দির ধৌত করা হইল। চন্দ্রোদয় নাটক বলেন—

এবং গৃহ মার্জ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল।
আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর॥

অর্থাৎ প্রভুর অন্তর যেরূপ পবিত্র ও শীতল, মন্দির সেইরূপ পরিষ্কার ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া শীতল ও পবিত্র করিলেন।

ভক্তগণ মন্দিরে জল ঢালিতেছেন, সেই উপলক্ষ করিয়া কেহ বা প্রভুর শ্রীপদ ধোয়াইতেছেন, আবার সেই জল পান করিতেছেন। প্রভু আমার সরল চিত্ত, ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিতেছেন না। এমন সময় এক সরলবুদ্ধি বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ এক ঘট জল প্রভুর সাক্ষাতে তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দিলেন, দিয়া সেই পবিত্রীকৃত জল লইয়া অঞ্জলি করিয়া পান করিতে লাগিলেন। প্রভু এক দৃষ্টে ব্রাহ্মণের কার্য্য দর্শন করিলেন। করিয়া, ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, "সরূপ, দেখ আমার দুর্গতি দেখ। এই শ্রীজগন্নাথের মন্দির, ইহার মধ্যস্থানে, এই ব্রাহ্মণ আমার পদ ধৌত করিল, তাহার পরে সেই অপবিত্র জল লইয়া আপনি পান করিল। এখন বল আমার কি গতি হইবে? ও ব্রাহ্মণ নির্ব্বোধ, ভাল মন্দ বুঝে না, কিন্তু আমার শ্রীজগন্নাথের নিকট অপরাধ কিসে মোচন হইবে? ভক্তগণ, শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীপ্রভুতে কিছুমাত্র বিভেদ নাই, ইহা মনে ঠিক জানেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই ব্রাহ্মণের উপর রাগ হইল না, বরং বড়ই ভক্তি হইল। কিন্তু প্রভু ক্রোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভু ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে কাজেই প্রভুর কথায় তাঁহাদের সহানুভূতি করিতে হইল। তাই সরূপ সেই

ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিলেন, ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দণ্ড পাইয়া মহা খুসী। ভক্তগণ তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকে বাহির করিয়া দিলে ভক্তগণের পরামর্শানুসারে সেই ব্রাহ্মণ আবার অভ্যন্তরে আসিল। আসিয়া, প্রভুর চরণে পড়িল। বলিল, "প্রভু, আমি মূর্খ, আমি ভালমন্দ কি বুঝি? আমাকে ক্ষমা করুন।" প্রভু হাসিলেন, আর কিছু বলিলেন না। মন্দির ধৌত হইলে ভক্তগণ আপন আপন বসন দ্বারা জল মুছিয়া লইলেন। তখন সকলে একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। একটু বিশ্রাম করিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা, চন্দ্রোদয়ে—

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি, আনন্দেতে গৌরহরি,
স্বরূপাদি ভক্তগণ লৈয়া।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন আনন্দিত ত্রিভুবন,
ধ্বনি উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া॥
স্বরূপের উচ্চ গীতে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, ইত্যাদি।

তাহার পর প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

মহা উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিলে ভক্তগণ ভয় পাইতেন, উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর আছাড় দেখিলে ভক্তগণের হৃদয় শুখাইয়া যাইত। সরূপ বেগতিক দেখিয়া কীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইলেন। কাজেই প্রভু ক্রমে নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সকলে একটু শান্ত হইলে, ভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রভু সরোবরে ঝম্প দিলেন। প্রভু সেখানে কৃষ্ণের বাল্যলীলা-ভাবে বিভাবিত হইয়া জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। মহানন্দে সকলে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের কাহারও বাহ্য জ্ঞান নাই। জলে পড়িয়া কি বৃদ্ধ, কি যুবা, নিতান্ত বালকের ন্যায় খেলা আরম্ভ করিলেন। তখন কাহার বড় ছোট জ্ঞান রহিল না, যিনি অতি বিজ্ঞ, তিনিও শিশুর ন্যায় ডুব দিয়া, যাঁহাকে সম্মুখে পান তাঁহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দের জল-যুদ্ধ বাধাইয়া রঙ্গ দেখিতেন। এ তাঁহার নিয়মিত কাজ। আবার ভক্তগণও প্রভু ও গদাধরে জলযুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া তাহার শোধ লইতেন। ছেলে বেলার "কয়া কয়া" খেলায়

প্রভু বড় আমোদ পাইতেন। সেই রহস্য আস্বাদন করিতেন। প্রভু চিরদিন শিশুর ন্যায় ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে জীবকে শিশুর ন্যায় চঞ্চল করে।

হে কৃপাময় পাঠক! বনে গমন করিয়া উপবাস করিয়া যোগদ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ, আর এই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন খেলা, এই দুই তুলনা কর।

জলক্রীড়া করিয়া, নৃসিংহদেবকে প্রণাম করিয়া, সকলে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মহারাজের আজ্ঞা ক্রমে, কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা, পাঁচ শত লোকের উপযোগী অতি উপাদেয় প্রসাদ লইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ভক্তগণের যেমন ক্ষুধা, প্রসাদও সেইরূপ, গুণ ও পরিমাণে, তাহার উপযোগী। সুতরাং ভক্তগণ "আকণ্ঠ পূরিয়া" ভোজন করিতে বসিলেন। বন-ভোজন শ্রীপ্রভুর বড় ভাল লাগে। সুতরাং বন-ভোজন পাইলে আর ছাড়িতেন না। এই তিন চারি শত ভক্ত ভোজন করিতে বসিলেন। মধ্যস্থানে প্রভু বসিলেন, দক্ষিণে সার্ব্বভৌম, তাহার পরে পুরী ও ভারতী, তাহার পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। ইহাদের ঝগড়া করিতে সুবিধা হইবে, এই নিমিত্ত দুই জন বরাবর এক স্থানে বসিতেন। ভক্তগণও সেই নিমিত্ত যোগাড় করিয়া তাঁহাদিগকে পাশাপাশি বসাইয়া দিতেন। এই দিন সার্ব্বভৌমের সমন্বয় হইবে। তিনি বড় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বিধির দাস। অদ্য "ছত্রিশ বর্ণ" একত্র হইয়া মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সেই শূদ্রপৃষ্ট অন্ন, শূদ্রের হস্তে, ছত্রিশ বর্ণের সহিত ভোজন করিবেন, তাই সার্ব্বভৌমকে প্রভু আপনি ধরিয়া নিজের নিকটে বসাইয়াছেন।

তখন প্রভু "হরিদাস" "হরিদাস" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বিবেচনা করুন, হরিদাস মুসলমান, তিনি যদি সেই মহা মহা কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক পংক্তিতে উপবেশন করেন, তবে হিন্দুর হিন্দুত্বের শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তগণের তখন মনের এই ভাব যে, কৃষ্ণ জগতের পিতা, আর সকলেই তাঁহার সন্তান, সুতরাং হরিদাস তখন ভোজনে বসিলে, সে যে কোন অন্যায় কার্য্য হইবে, ইহা কেহ মনেও অনুভব করিতে পারিতেন না। কিন্তু হরিদাস দীন হইতে দীন। তিনি করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে বধ করিবেন না। আমি এ সমাজে বসিবার উপযুক্ত নহি, আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করুন।" প্রভু আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। পরিবেশক সাত জন নিযুক্ত হইলেন। যথা,

সরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর। ইহার মধ্যে বাণীনাথ কায়স্থ।

যখন সেই উপবনে ভোজনে বসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের পুলিন ভোজন সকলের মনে একেবারে স্ফূর্ত্তি হইল। প্রভু এই ভাবে এত বিভোর হইলেন যে, তাঁহার নয়ন-জলে ভোজনকার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। প্রভু দেখিলেন যে, তিনি ভোজন না করিলে কেহই ভোজন করেন না, তাই কষ্টে শ্রষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পূর্ব্বে নাচিয়া গাইয়া ভজনের কথা বলিয়াছি। যদি নাচিয়া গাইয়া ভজন হয়, তবে জলক্রীড়ায় কি বন-ভোজনে, ভজন কেন না হইবে? গীতা বলেন, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করিবে। এই মহাবাক্য আর একটি কথার উত্তর। সেটি বৌদ্ধগণের নিকট হিন্দুগণ শিখিয়াছিলেন। কথাটি এই যে, জীবের কর্ম্মের বোঝা বহিবে কে? কর্ম্ম করিলে জীবের তাহার ফল গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই তাহার নরক, স্বর্গ ও পুনর্জ্জন্ম, ভোগ করিতে হইবে। এ কথার উত্তর এই যে, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া করিলে, তিনিই সে সকল বোঝা বহিবেন। প্রভু এই অবতারে আপনি আচরিয়া তাঁহার জীবকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবান জীবের সুহৃদ, কাজেই তাঁহার ভজনে কেবল আনন্দ ব্যতীত কোন দুঃখ হইতে পারে না। এমন কি, যে কার্য্যে প্রকৃত দুঃখ আছে সে তাঁহার ভজনই নয়। তবে কোন কোন ভজনে আপাততঃ দুঃখ বোধ হইতে পারে। কিন্তু সে দুঃখ প্রথমে,—প্রকৃত ভজনের চরম কেবল আনন্দ। মনে ভাবুন, শুদ্ধ নাম-জপ আপাততঃ দুঃখকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যিনি এরূপ ভাবেন, তিনি আপনি নাম জপিয়া দেখিবেন যে, আমাদের সেই সুহৃদের নাম "জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি।"

অতএব হরিমন্দির মার্জ্জন যদিও নীচ কার্য্য, কিন্তু উহাও ভজন। আবার জল-ক্রীড়া ও বন-ভোজন, উহাও ভজন। তবে কি না, কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। তাহা করিলে সমুদায় কার্য্যেই ভজন হয়। আর সে কার্য্যের ফল স্বরূপ বোঝা বহিতে হয় না। যাঁহারা ভোজনে বসিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। যাঁহারা স্বাস্থ্য-বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ভোজনের

সময় সুখকর আলাপনে ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও পরিপাকের সহায়তা করে। তাই, যখন পাঁচ জনে বসিয়া ভোজন করেন, তখন কেহ বা পরের কুৎসা করেন, কেহ বাজে গল্প করেন। তাহার কারণ এই যে, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ভোজনের যে সুখ তাহা অবগত নহেন।

সকলে ভোজনে বসিলেন, আর হরিধ্বনি হইয়া উঠিল। যখন প্রথম গ্রাস বদনে দিতেছেন, তখন ভাবিতেছেন যে, শ্রীভগবান ইহার আস্বাদ করিয়াছেন, ও তাঁহার অধরামৃতের দ্বারা ইহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এই ভাবে বিভোর হইয়া অন্ন মুখে দিতেছেন, আর প্রকৃতই, কেন জানি না, প্রত্যেক গ্রাস ভক্তগণের জিহ্বায় অনির্ব্বচনীয় উপাদেয় আস্বাদ দিতেছে।

ভক্তগণ কৃষ্ণের সুখকে আপনার সুখ মনে করেন। গ্রাস মুখে দিয়া অতি সুস্বাদু বোধ হওয়ায় সুখ পাইতেছেন, কিন্তু ইহা ব্যতীত আর একটী অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতেছেন। ভক্ত মহাপ্রসাদ মুখে দিয়া উহা আস্বাদ করিয়া সুখ পাইতেছেন। আবার সেই সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ ইহা আস্বাদ করিয়া সুখানুভব করিয়াছেন, ভাবিয়া আরও আনন্দ পাই-তেছেন। এইরূপ মনের ভাব হওয়াতে কোন ভক্ত সময়োপযোগী একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। সেই সঙ্গে সকলে সেই শ্লোকটীর সুধা আস্বাদ করিলেন। সেই শ্লোকটীতে অন্য একটি ভাবের উদয় হওয়াতে, আর এক জন ভক্ত আর একটী শ্লোক পড়িলেন। উহা শুনিয়া ভক্তগণ পুলকিত হইয়া গগন ভেদিয়া হরি হরি বলিয়া উঠিলেন।

এই গেল মহোৎসবের মহাপ্রসাদ ভোজনের সুখ। এই গেল ভোজনে ভজন। ইহার মধ্যে কেহ বা হাস্য কৌতুক করিতেছেন, আর, সকলে আনন্দে টলমল করিতেছেন বলিয়া, উহা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "এত দিনে আমার জাতিটী গেল।" সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, হইল কি?" অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভুর কি? উনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর অন্নে দোষ নাই। কিন্তু আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমি অবধূতের (নিত্যানন্দকে দেখাইয়া) সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া সমাজ ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলাম। আমার যে কি উপায় হইবে বলিতে পারি না।" নিত্যানন্দ উত্তরে বলিলেন. "তুমি

ব্রাহ্মণ, আমি কি ব্রাহ্মণ নই? তোমার পরম ভাগ্য যে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ তোমাকে লইয়া ভোজন করিতেছে।” অদ্বৈত বলিলেন, “তুমি ত আপনাকে ব্রাহ্মণ বল, তাহা শুনিয়া থাকি, কিন্তু তোমার উৎপত্তির ঠিকানা, কৈ আমরা ত কেহই জানি না। তা না হয় তুমি ব্রাহ্মণ হইলে, কিন্তু কুড়ি বৎসর পশ্চিমে ছিলে, বল দেখি তুমি কোথাকার না অন্ন খাইয়াছ?” নিত্যানন্দ বলিলেন, “ঠাকুর, তুমি অতি মহাজন ব্যক্তি, দ্বৈত মান না, নাম লইয়াছ অদ্বৈত। অর্থাৎ শ্রীভগবান আর তুমি এক, মনে ইহা ভাব। আমরা শ্রীভগবানের দাস, তুমি কর্ত্তব্যে নাস্তিক, আমাদের এখানে তুমি কেন?” শান্তিপুর কি নবদ্বীপে হইলে এই কোন্দল ক্রমে বাড়িয়া চলিত, কিন্তু নীলাচলে পুরীবাসী বহুতর ভিন্ন লোক থাকেন, সেখানে কাজেই অল্পে অল্পে কোন্দল থামিয়া গেল।

পরিবেশকগণ প্রভুকে উত্তম প্রসাদ দিতে আসিলেই প্রভু অমনি বলেন, “উহা আমাকে দিও না, ভক্তগণকে দাও, আমাকে সামান্য ব্যঞ্জন ব্যতীত আর কিছুই দিও না।” কাজেই ভয়ে কেহ প্রভুকে ভাল দ্রব্য দিতে পারেন না। কিন্তু প্রভু জব্দ জগদানন্দের কাছে। জগদানন্দের প্রেমের নিকট প্রভু পরাস্ত। জগদানন্দ হস্তে উত্তম দ্রব্য লইয়া পংক্তির মধ্যপথ দিয়া দ্রুত গতিতে গমন করিতেছেন। অমনি হঠাৎ যেন না জানিয়া, কি অন্যমনস্ক হইয়া, প্রভুর পাতে উহা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু প্রভু উহা গ্রহণ করিলেন না। পাতের এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিলেন। এমন সময় দেখেন কি, জগদানন্দ আবার আসিতেছেন, আসিয়া প্রভুর একটু দূরে দাঁড়াইয়া, আড় চোখে দেখিতেছেন যে, তাঁহার দত্ত দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন কি না। ইহা দেখিয়া প্রভুর ভয়ে মুখ শুখাইয়া গেল। প্রভু বেশ জানেন যে, যদি তিনি উহা গ্রহণ না করেন, তবে জগদানন্দ মুখে কিছু বলিবেন না বটে, তবে ঘরে কপাট দিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। তাই জগদানন্দের ভয়ে সেই উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখানেই জগদানন্দের হাত হইতে যে প্রভুর অব্যাহতি হইল, তাহা নহে। এই যে পাঁচ শত লোকের প্রসাদ আসিয়াছে, জগদানন্দ ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে উত্তম সামগ্রী, উহা প্রভুর নিমিত্ত অগ্রে বাছিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু যদি তাঁহার দত্ত একটী দ্রব্য ভোজন করিলেন

তবে জগদানন্দ আর একটী উত্তম দ্রব্য আনিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন, আর উহা আনিয়া ঐরূপে, না বলিয়া না কহিয়া, হঠাৎ প্রভুর পাতে দিলেন।

জগদানন্দের এই ভাব দেখিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতেছেন, আর প্রভুর নিকট যাঁহারা যাঁহারা বসিয়াছিলেন, সকলেই হাসিতেছেন। কিন্তু জগদানন্দ তাহা জানিতেছেন না। এ দিকে প্রভুর আর এক শত্রু জুটিয়া গেলেন। তিনি কে না সরূপ দামোদর, প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত, প্রভুর শেষকালের প্রতি মুহূর্ত্তের সুখ ও দুঃখের সাথি। তিনিও প্রভুর নিমিত্ত বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল সামগ্রী রাখিয়াছেন, প্রভুকে উহা ভুঞ্জাইবেন, কিন্তু প্রভু ভাল সামগ্রী লইবেন না। তিনি জগদানন্দের পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া অন্য উপায়ের সাহায্য লইলেন। হাতে উত্তম সামগ্রী লইয়া প্রভুর আগে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, অভয় দেন তো বলি?" শ্রীজগন্নাথ এই অমৃত কেলি সেবা করিয়াছেন। আপনি একবার পরীক্ষা করুন, করিয়া দেখুন, তিনি কিরূপ আস্বাদ করিয়াছেন। প্রভু সরূপের মুখ পানে চাহিলেন, দেখিলেন, উহা গ্রহণ না করিলে তিনি মনে বড় বেদনা পাইবেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "দাও, কিন্তু আর না।" কিন্তু সরূপ আবার একটী দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত। জগদানন্দ ও সরূপের এইরূপে প্রভুকে খাওয়াইবার যত্ন দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অতি মুগ্ধ হইতেছেন।

সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আসিয়া প্রভুর ও ভট্টাচার্য্যের অগ্রে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, এ ব্যাপার কি? তুমি এখানে কেন? তুমি বেদাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এ কি অকাজ করিতেছ?" আবার বলিতেছেন, "কি ছিলে কি হয়েছ, একবার বিচার কর, এ আনন্দের কি উপমা আছে? তখন সার্ব্বভৌম গদ্ গদ্ হইয়া গোপীনাথকে বলিতেছেন, (যথা চরিতামৃতে)—

সার্ব্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥

কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সখ্য সুধা-সমুদ্র তরঙ্গ ॥

এই কথা শুনিয়া প্রভু কি করিতেছেন শ্রবণ করুন। তিনি অতি গম্ভীর হইয়া সরল ভাবে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তাহা নয়, পূর্ব্বে তোমার সাধনা ছিল; সেই বলে তোমার বদনে কৃষ্ণ-নাম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমরাও তোমার পবিত্র সঙ্গে নামে রতি শিখিয়াছি।" প্রভুর এই উত্তর শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে লাগিলেন। প্রভু স্বয়ং সার্ব্বভৌমকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই দিন তাঁহার একরূপ সমন্বয়। প্রভু প্রকৃতই পরিবেশকগণ দ্বারা বারম্বার উত্তম প্রসাদ আনাইয়া সার্ব্বভৌমকে অতি স্নেহের সহিত খাওয়াইতে লাগিলেন। কোন্ ভক্ত কি ভাল বাসেন, তাহা আন্তর্য্যামী প্রভু অবগত আছেন। আপনি মহাপ্রভু এই রূপে প্রত্যেক ভক্তকে পরিবেশকগণ দ্বারা ভাল ভাল দ্রব্য দেওয়াইতে লাগিলেন।

তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেন যেন কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া। (চরিতামৃত)

মহাপ্রভু বলিতেছেন, খাও; খাইতে বলিতেছেন কি না মহাপ্রসাদ; দ্রব্য কি না অতি উপাদেয় বস্তু, সুতরাং—

"আকণ্ঠ পূরিয়া বৈষ্ণব করিলু ভোজন।"

তাহার পর স্বর্গমর্ত্তভেদী হরিধ্বনি করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রভু আপনি ভক্তগণকে চন্দন ও মালা বণ্টন করিয়া দিলেন। তাহার পর ভক্তগণ নিজ নিজ বাসায় আরাম করিতে চলিলেন। সকলের ভোজন হইলে সাত জন পরিবেশক ভোজন করিলেন। গোবিন্দ হরিদাসকে প্রসাদ দিয়া আপনি ভোজন করিলেন।

তাহার পর দিবস শ্রীজগন্নাথের নেত্রোৎসব। পঞ্চদশ দিবস অদর্শনের পর, সেই দিবস তিনি জগজ্জনের নেত্র-গোচর হইবেন। শাস্ত্রের কথা এই যে, শ্রীজগন্নাথদেব স্নান করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত যাপন করেন। তাহার পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া রথে চড়িয়া সুন্দরাচল গমন করেন। সেখানে উপবনে সপ্তদিবস শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া আবার নীলাচল প্রত্যাগমন করেন।

নেত্রোৎসব দিনে শ্রীজগন্নাথ নয়ন-গোচর হইলে, প্রভু ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দে দর্শনে গমন করিলেন। প্রভু কিরূপ করিয়া দর্শন করেন, তাহার বর্ণনা যৎকিঞ্চিৎ স্থানান্তরে করিয়াছি। প্রভু যখন দর্শনে গমন করিলেন, তখন পুরী ও ভারতী গোসাঞী অগ্রে চলিলেন। স্বরূপ এক পার্শ্বে, আর এক পার্শ্বে নিত্যানন্দ, পশ্চাৎ ভক্তগণ ও গোবিন্দ। সর্ব্বাগ্রে কাশীশ্বর, ইনি মহাশক্তিধর বলিয়া ভিড়ের মধ্যস্থলে মহাপ্রভুর পথ করিবার নিমিত্ত বরাবর প্রভুর অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। পঞ্চদশ দিবস পরে শ্রীজগন্নাথ দেবকে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে কিরূপ বিহ্বল হইলেন, তাহা আমি কি বর্ণনা করিব।

তবে প্রভু দর্শন করিতে করিতে কি বলিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর নরহরি, যিনি প্রভুর নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, একটি গীতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই গীতটি দিলেই প্রভুর মনের ভাব কতক প্রকাশ পাইবে। যথা, গীত—

হেরি গোরা নীলাচল নাথ। নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইল গোপী ভাবে। কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে॥
"আমি তোমায় না দেখিলে মরি। পালটি না চাহ তুমি ফিরি?"
ছল ছল অরুণ নয়ন। বিরস আজ সরস বদন॥
বিভোরিত গোরা ভাব হেরি। কহে কিছু দাস নরহরি॥

প্রভু, শ্রীজগন্নাথকে দেখিতেছেন যেন শ্যামসুন্দর। প্রভু যে শ্রীবিগ্রহ দেখিতেছেন তাঁহার সে জ্ঞান নাই, তাঁহার বোধ হইতেছে স্বয়ং শ্যামসুন্দর তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিঠুরতা দেখিয়া প্রভুর রাগ হইয়াছে। কিন্তু প্রভুর চন্দ্রাবলীর ন্যায় প্রগল্‌ভ স্বভাব নহে, রাধার ন্যায় ধীরা স্বভাব। এই পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন ছিলেন, সেই নিমিত্ত প্রভু তাঁহার উপর বড় রাগ করিয়াছেন, কিন্তু যদিও ক্রোধ করিয়াছেন, তবু মুখে কটুবাক্য আসিতেছে না। তাই বলিতেছেন যে, "হে বন্ধু! এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি তোমাকে না দেখিলে মরি, অথচ তুমি আমাকে পালটি চাহ না।" এই যে প্রভু, শ্রীজগন্নাথের মুখে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, হে পাঠক, এই চিত্রটি হৃদয়ে অঙ্কিত কর। প্রভু তখন রাধা ভাবে বিভোর। যে ভাব গুলি মুখে ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কেবল স্ত্রী লোকের

নয়, কথাগুলি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের, যে স্বরে বলিতেছেন, তাহাও স্ত্রীলোকের ন্যায়। আপনারা কেহ বলিতে পারেন যে, কোন যুগে, কোন অবতারে, কেহ কখনও শ্রীভগবানকে এরূপ বলিয়াছেন, যে, "বন্ধু! তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না, কিন্তু আমি তোমার লাগি মরি?" এই রূপ যিনি বলিতে পারেন তিনি হয় শ্রীভগবান, না হয় শ্রীভগবান যে পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত, তাঁহার প্রকৃতি অংশ। মনে ভাবুন, একজন তাপস সহস্র বৎসর বনে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার মস্তকে পিঁপড়ার বাসা হইয়াছে। তিনি কষ্ট করিতেছেন, কেন না, তাঁহার ভাল হইবে। তিনি হয় উদ্ধার হইবেন, না হয় মহাশক্তিসম্পন্ন হইবেন। আর একজন জপ তপ উপবাস কিছু জানেন না, এমন কি সংসারে বাস করেন; কিন্তু তিনি শ্রীভগবৎ-প্রেমে পাগল হয়েছেন; এমন কি, তাঁহাকে না দেখিলে প্রাণে মরেন। তিনি মানভরে অভিভূত হইয়া শ্রীভগবানকে তিরস্কার করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "হে নিঠুর, তোমার শরীরে দয়া মায়া নাই, আমি তোমা বিনে তিলার্দ্ধ বাঁচি না, অথচ তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না!" ইহার একজন মুনি, আর একজন গোপী। শ্রীভগবান কাহার কথা অগ্রে শুনিবেন? গোপীর না মুনির? তিনি কাহার বশ হইবেন? গোপীর না মুনির? যদি শ্রীভগবানের কিঞ্চিন্মাত্র দয়া মায়া থাকে, তবে অবশ্য তিনি সেই ব্যক্তির বশীভূত হইবেন, যে কিছু চাহে না, কেবল তাঁহার নিমিত্ত পাগল। এই শেষোক্ত বস্তু জীব হইলেও শ্রীভগবান তাহার নিকট বাধ্য। অতএব যদি তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ভগবান বলিয়া মানিতে না পার, তবু তাঁহাকে ভজনা করিতে তুমি আপত্তি করিতে পার না। যাঁহার শ্রীভগবানের সহিত এরূপ সম্বন্ধ, যে, তিনি তাঁহাকে নিঠুর নির্ম্মোহ বলিয়া গালি দিবার অধিকার ধরেন, তিনি অবশ্য তোমাকে উদ্ধার করিতে শক্তি ধরেন।

এইরূপে প্রভু—

মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন।
স্বেদ, কম্প, ঘর্ম্ম অঙ্গে বহে অনুক্ষণ॥

তখন ভক্তগণ প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে বাসায় আনিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

—•◇•—

নীলাচলে জগন্নাথ রায়। গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সভে দিয়া। জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্ত্তন করয়ে গৌর রায়॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগণ ভেদিল সেই ধ্বনি। অন্য আর কিছুই না শুনি॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়। মুকুন্দ সরূপ রাম রায়॥
যার গানে অধিক সন্তোষ। গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি। গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস। ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥
এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে। কত দূর করিল গমনে॥
এ সভার পদরেণু আশ। করি কহে বৈষ্ণবের দাস॥

পর দিবস রথযাত্রা। প্রভু সেই আনন্দে একেবারেই রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না। রজনী থাকিতে আপনি উঠিলেন ও ভক্তগণকে উঠাইলেন। তাহার পর সকলে শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি ক্রিয়া সমাপ্তি করিয়া পাণ্ডু বিজয় দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সকলে দেখেন রথের মহাসজ্জা হইয়াছে। অন্যান্য বারে রথের যে সজ্জা হইত, এবারে প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত, রাজার আজ্ঞায় আরও অধিক সজ্জা দেওয়া হইয়াছে। বোধ হইতেছে রথ যেন স্বুবর্ণ মণ্ডিত। নানা বর্ণের বস্ত্রের দ্বারা উহা পরিশোভিত। নানা বর্ণের কত পতাকা উড়িতেছে। কত ঘণ্টা বাজিতেছে। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা কলরবের সহিত বাদ্য ধ্বনি হইতেছে। শ্রীজগন্নাথকে রথারোহণ করাইবার নিমিত্ত মহাবলিষ্ঠ সেবকগণ, প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। কেহ শ্রীপদ, কেহ কটি, এইরূপে শ্রীবিগ্রহ

ধরিয়া, বাদ্যের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, শ্রীবিগ্রহ উঠাইতেছেন। মহাপ্রভু "মণিমা" "মণিমা" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেছেন। এই আনন্দ কলরব মধ্যে শ্রীজগন্নাথকে রথের উপর বসান হইল। রথের পথ সূক্ষ্ম ও শ্বেতবালুকা মণ্ডিত। পথের উত্তরে প্রায় উভয় পার্শ্বে ফুলের বাগান। রথ মধ্যস্থান দিয়া চলিল, দর্শকগণ রথের দুই পার্শ্বে সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন।

কোন মহান্ ব্যক্তি অশ্ব-শকটে গমনাগমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ কখন কখন সেই অশ্বকে অব্যাহতি দিয়া, আপনারাই উহা টানিয়া লইয়া যাইয়া থাকেন। এই মহান্ ব্যক্তির অশ্ব ছিল, তাহার শকট চালাইবার কাহার সাহায্য প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাঁহার অনুগত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, অশ্ব খুলিয়া দিতে আপত্তি করিলেন না। তাহারা যদিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাঁহার শকট টানিতে লাগিল, তবু তিনি তাহাদিগকে উপরোক্ত কারণানুসারে বাধা দিলেন না। সেইরূপ শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভক্তগণের ইচ্ছা তাঁহাকে রথে উঠাইয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন। এমত অবস্থায় শ্রীজগন্নাথের ন্যায় মহান্ বস্তু কি আপত্তি করিতে পারেন? শ্রীভগবানের নিজস্ব কি কি খেলা আছে তাহা জানি না, কিন্তু যদি মনুষ্যের সহিত তাঁহার খেলা করিতে হয়, তবে তাঁহার মনুষ্যের ন্যায় হইতে হইবে, নতুবা খেলা হইবে না। তিনি যদি কেবল তেজ হইয়া ওৎ প্রোৎ ভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, তবে আর মনুষ্য তাঁহার সহিত খেলা খেলিতে পারে না। তাই মনুষ্যে যে শ্রীভগবানকে রথের উপর বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়, ইহাতে যেমন ভক্ত মুগ্ধ হয়েন, সেইরূপ শ্রীভগবান, তাঁহার জীবের তাঁহার প্রতি প্রীতি দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রথ চলিবার পূর্ব্বে সেই ধীশক্তিসম্পন্ন রাজাধিরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র হস্তে সুবর্ণের মার্জ্জনী ও চন্দন-জল লইয়া, পথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, আর উহাতে চন্দন-জলের ছিটে দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রাজার এইরূপ তুচ্ছ সেবা দেখিলেন, দেখিবা মাত্র তাঁহার প্রতি মনে কৃপার্ত্ত হইলেন। প্রভুর বলে বলীয়ান গৌড়ীয়গণ, উৎকলবাসিগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া, রথের রজ্জু ধরিলেন, ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। বাদ্যের শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে। আনন্দে

উন্মত্ত লইয়া রথের সঙ্গে সকলে চলিলেন। তখন মহাপ্রভু নিজগণকে একত্র করিলেন, করিয়া সকলকে মাল্য চন্দন দান করিয়া শক্তিসম্পন্ন করিলেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে লইয়া প্রথমে চারিটি কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান অবশ্য সরূপ দামোদর, আর পঞ্চজন তাঁহার দোহার। যথা, দামোদর, রাঘব, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ ও নারায়ণ। এই ছয় জন গীত গাইবেন, আর দুই জন মৃদঙ্গ বাজাইবেন। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সর্ব্ব সমেত নয় জন করিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীবাস, তাঁহার দোহার ছোট হরিদাস, গঙ্গাদাস, শুভানন্দ, শ্রীমান পণ্ডিত, ও শ্রীরাম পণ্ডিত। ইহাতেও দুই মৃদঙ্গ। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে নৃত্যকারী স্বয়ং নিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মুকুন্দ। ইহার দোহার মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্ত, মুরারি, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন ও গোপীনাথ। এই সম্প্রদায়ে গোপীনাথ ব্যতীত সকলেই বৈদ্য। ইহার নৃত্যকারী বড় হরিদাস।

চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান গোবিন্দ ঘোষ। ইনি বাসু ঘোষের দাদা। তাঁহার দোহার বাসু ও মাধব দুই ভাই, অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস, ও অন্য রাঘব। ইহার নৃত্যকারী বক্রেশ্বর। ইহা ব্যতীত আর তিন সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন। যথা কুলীনগ্রামের, শ্রীখণ্ডের ও শান্তিপুরের। কুলীনগ্রামের প্রধান রামানন্দ বসু, শান্তিপুরের প্রধান অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠ তনয়, আর শ্রীখণ্ডের প্রধান নরহরি সরকার ঠাকুর। অতএব সর্ব্ব সমেত সাত সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে নিযুক্ত হইলেন। ইহার চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রে চলিলেন, দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে, আর এক সম্প্রদায় পশ্চাতে। এই রূপে চৌদ্দ মাদল বাজিয়া উঠিল। বেয়াল্লিশ জন গীত গাইতে লাগিলেন ও সাত জনে সাত ঠাই নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

কীর্ত্তন আরম্ভেই লোক সমুদায় আনন্দে পাগল হইয়া উঠিলেন। আর অন্যান্য বাদ্য আপনি আপনি স্থগিত হইয়া গেল। রথাগ্রে কীর্ত্তন পদ্ধতির এই প্রথমে সৃষ্টি হইল। প্রভু এই সাত সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তাঁহাকে এই সকল সম্প্রদায়েই জীবন দিতে হইবে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার থাকিতে হইবে, প্রভুকে না দেখিলে কেহই নাচিতে কি গাহিতে পারে না। অথচ সর্ব্বাগ্রের সম্প্রদায় পশ্চাতের সম্প্রদায় হইতে বহুদূর

ব্যবধানে। এই সাত স্থানে প্রভু একেবারে কিরূপে থাকেন? অথচ তাঁহার না থাকিলেও নয়।

সাত ঠাঁই বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে॰ হস্ত তুলি॥ (চরিতামৃত)

ফল কথা, এই সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণ দেখিতেছেন যে প্রভু তাঁহাদের মধ্যেই আছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভাবিতেছেন যে তাঁহাদের প্রতি প্রভুর বড় টান, তাই অন্য সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়ে প্রভু আছেন। প্রভু কি সত্যই একবারে সাত ঠাঁই বিরাজ করিতেছিলেন? যথা চরিতামৃতে—

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঁঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঁঞি নাহি যায় আমার মায়ায়॥

এই যে রথ খানি চলিতেছে, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্রের। তিনি সেখানকার সকলের কর্ত্তা, কিন্তু লক্ষ লোকের মধ্যে কাহারও তাঁহার প্রতি লক্ষ নাই। সকলেরই নয়ন প্রভুর দিকে। ইহাতে রাজার ঈর্ষা নাই, তিনি নিজেও আত্মহারা হইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এই প্রথমতঃ স্পষ্টরূপে তিনি প্রভুকে দর্শন করিলেন। আগে যখন প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, সে হয় দূর হইতে, আর না হয় কতক অন্ধকারের মধ্যে। প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার ভক্তি দেখিয়া রাজা প্রেমে অচেতনবৎ হইলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার নীচ সেবা দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছেন। এখন প্রভু রাজাকে তাহার পুরস্কার দিতেছেন। রাজা দেখিতেছেন, যেন শ্রীজগন্নাথ রথ স্থগিত করিয়া প্রভুর কীর্ত্তন শুনিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জ্ঞান হইল যে রথের উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি আর প্রভু এক বস্তু! তিনি রথে জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না, দেখিলেন প্রভু বসিয়া আছেন।

প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হইল প্রেমময়॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি, প্রসন্ন প্রভুর মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥

রাজা ক্রমেই বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইতেছেন, ক্রমেই প্রভু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন। প্রভু এইরূপে খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় সম্প্রদায় সম্প্রদায় বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা তাঁহার অনুভবনীয় শক্তির দ্বারা সকল সম্প্রদায়ে এক সময়ে বিলাস করিতেছেন। কখন বা প্রভু আপনি কোন দলে মিশিয়া গীত গাইতেছেন। কখন ভাবে মুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু সময় বুঝিয়া আপনাকে প্রভু এ পর্য্যন্ত দিব্য সচেতন রাখিয়াছেন ও সম্বরণ করিতেছেন।

এইরূপ খানিক নৃত্যের পরে প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিবেন ইচ্ছা করিলেন। তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন। একত্র করিয়া তাহার মধ্যে নয় জন প্রধান গায়ক বাছিয়া লইলেন। সে নয় জন শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, রাঘব ও গোবিন্দানন্দ। এই নয় জনের প্রধান অবশ্য সরূপ হইলেন। এই নয় জনের গীত আরম্ভ হইলে প্রভু নৃত্যের উদ্যোগ করিলেন।

প্রভু কিরূপে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তাহা স্বয়ং মুরারি গুপ্ত চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু প্রথমে শ্রীজগন্নাথকে দণ্ডবৎ করিলেন, করিয়া যোড় হস্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। যথা চরিতামৃত—

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

প্রভু ভঙ্গস্বরে এক একটী শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর আপনাকে সম্বরণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণেক চুপ করিতেছেন। উপরের শ্লোক পড়িয়া একে একে উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দঃ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবর পরিষৎ স্বৈ র্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদ কমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ॥

প্রভু যখন তাহার পদ্মনেত্র শ্রীজগন্নাথের মুখ-পদ্মে অর্পণ করিলেন, তখন বোধ হইল প্রভুর সমুদায় প্রাণ তাঁহার নয়নে আসিয়াছে। প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখ পানে নিমিষহারা হইয়া চাহিয়া, স্তব করিতে আরম্ভ করিবা মাত্র, তাঁহার আয়ত নেত্র দিয়া জলের ধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু গদাধরের পাদ-পদ্ম দর্শনের সময়ে যে লীলা করেন, এখন তাহাই করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ অপরূপ দেখিতেছেন, কি না, নয়ন বারি ধারার ন্যায় হইয়া বদন বহিয়া হৃদয়ে আসিতেছে। সেই ধারা আসিয়া ত্রিধারা হইয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে। প্রভুর এই অমানুষিক নয়ন ধারা কবিকর্ণপূর তাঁহার কাব্যে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্লবয়তা পক্ষ্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ
শ্রীমদ্গণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ।
প্রাপ্যোরঃ পদবীং ত্রিধা প্রসরতা ভূমৌত্রুটন্মৌক্তিক-
শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃপ্রভো রশ্রুণা॥

ইহার অর্থ এই—

"যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্রপদ্ম অভিষিক্ত করিতেছে, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার সুশোভিত গণ্ডস্থলে সুদীর্ঘ ধারে বহমান হইতেছে, তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষস্থল পাইয়া তথা হইতে তিন ধারায় ভূতলে পতিত হইতেছে, প্রভুর সেই নেত্রপতিত জল ছিন্ন সূত্র-হারের ন্যায় সর্ব্বদা জগন্মণ্ডলে হর্ষ বিধান করুন।"

গ্রন্থকার এখানে কর্ণপূরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "তথাস্তু!" এই যে ধারা, ইহা সমুদায় নয়ন যুড়িয়া আসিতেছে। প্রভুর স্তব পড়া সমাপ্ত হইলে, একবার হুঙ্কার করিলেন, করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু পাক দিয়া নৃত্য করিবার কালে, পূর্ব্বে যে নয়ন জল মৃত্তিকায় পড়িতেছিল, ইহা এখন চতুর্দ্দিকের লোককে স্নান করাইতে লাগিল। প্রভু কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল।

নৃত্য করি মহাপ্রভুর পড়ে পদতল।
সসাগর মহী শৈল করে টলমল॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ শুখাইয়া গেল। কারণ উদ্দণ্ড নৃত্যের সময় প্রভু আছাড় খাইলে বোধ হইত যে, তাঁহার সমুদায় অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত ও স্বরূপ তাঁহার পশ্চাতে বাহু পসারিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহারা তিন জনে প্রভুকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। প্রভু তবু মধ্যে মধ্যে আলগোছ হইয়া এমন আছাড় খাইতেছেন যে, ভক্ত-গণ ত্রাসে হাহাকার করিয়া নয়ন মুদিতেছেন। প্রভু আছাড় খাইলেই অমনি ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিতেছেন, ধরিয়া তুলিতেছেন। দেখিতেছেন, প্রভু বাঁচিয়া আছেন কি না, কি অস্থি সমুদায় ভঙ্গ হইয়াছে কি না। কখন ধরিতে ধরিতে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। কখন ঘোর অচেতনে উঠিলেন না। তখন সকলে বসিয়া প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেখিলেন যে নিশ্বাস বহিতেছে কি না! যদি দেখেন নিশ্বাস আছে, তবে কতক নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাকে বায়ু বীজন প্রভৃতি দ্বারা সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদি দেখেন নিশ্বাস বন্দ হইয়া গিয়াছে, বুক দুর দুর করিতেছে না, তখন আতঙ্কে সকলে মহা ব্যস্ত হইলেন। ভক্তগণের সর্ব্বদা ভয় যে, কবে তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া হঠাৎ পলাইয়া যাইবেন। তখন প্রভুর অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হওয়ার কথা। প্রভু পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া সেই তপ্ত বালুকার উপর পড়িয়া আছেন। উদরস্পন্দন, নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই। উত্তান নয়ন, মুখ বাহিয়া ফেন পড়িতেছে। তবে ইহার মধ্যে সুখকর দৃষ্টি এই টুকু থাকিত যে, প্রভুর মুখের শ্রী ও শ্রীঅঙ্গের তেজ তখন যেন আরও বৃদ্ধি পাইত। প্রভু আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন, চেতন কি জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই, তখন ভক্তগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া যাঁহার যেরূপ উদয় হইতে লাগিল, তিনি সেইরূপ সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ প্রভুর মস্তক উঠাইয়া জানুর উপরে রাখিলেন। নিত্যানন্দ বায়ু বীজন, অদ্বৈত গগন ভেদ করিয়া হুঙ্কার, ও হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ বা মল দ্বারা মুখে জল আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ

লোকে সকলে চুপ করিলেন। যাঁহারা পশ্চাতে আছেন, তাঁহারা অগ্রের লোক সমূহকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, প্রভু কি চেতন পাইয়াছেন? এই দুর্ভাবনার মধ্যে প্রভু হুঙ্কার করিয়া আবার উঠিলেন, উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর অমনি লক্ষ লোকে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর। যখন গোপীগণকে আপনি কাণ্ডারি হইয়া পার করিতেছিলেন, তখন মাঝ যমুনায় আসিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিলেন! এইরূপে গোপীগণকে ভয় দিয়া আমোদ দেখিতে লাগিলেন। গোপীগণ ভয় পাইয়া ক্রমে কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিলেন। ভয় পাইলেই লোকে, যিনি আশ্রয়, তাঁহার নিকটে যাইয়া থাকে। এইরূপে প্রভু কি, আছাড় খাইয়া পড়িয়া, দু দণ্ড পর্য্যন্ত অচেতন, এমন কি মৃত অবস্থায় থাকিয়া, ভক্তগণকে ভয় দিয়া আমোদ দেখিতেন? একটী ঘটনা এখানে স্মরণ হওয়ায়, এ কথা বলিতেছি। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, রথ আসিতেছে। কিন্তু প্রভু পশ্চাতে না হটিয়া, ঐ রথের সম্মুখে হঠাৎ ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, রথ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর আসিবার উপক্রম হইল। প্রভুর সংজ্ঞা নাই, তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়া। রথ প্রায় তাঁহার বক্ষের উপরে, তাহাতে তাঁহার কি? অমনি একজন ভক্ত ভয় পাইয়া—

তৈ রেতৈঃ করপল্লবৈ র্নিজ র্নিজ ক্রোড়েষু কৃত্বা ক্রিয়,
দূরে স্বৈরমুপার্পিতো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥

(চৈতন্যচরিত কাব্য)

অর্থাৎ কোন ভক্ত ভয় পাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া রথের অগ্র হইতে এক পার্শ্বে আনিলেন। প্রভু যেরূপ অচেতন সেইরূপই রহিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ ও রাজা ভয় পাইলেন। বিশেষতঃ উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু যে কখন্ কোথা যাইতেছেন, তাহার ঠিকানা করা যাইতেছে না। আবার লক্ষ লক্ষ লোকে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত সম্মুখে ঝুঁকিতেছে। এমন কি, ভক্তগণকে ঠেলিয়া প্রভুর গায়ে পর্য্যন্ত পড়িতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতাপরুদ্র সেই লোক সমূহের মধ্যে দাঁড়াইয়া, কিন্তু তাঁহাকে তখন কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। তখন সকলে যুক্তি করিয়া মণ্ডলী বাঁধিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম

মণ্ডলে :শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীসরূপ প্রভৃতি। প্রভু মধ্যস্থানে। দ্বিতীয় মণ্ডলে প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভূত বলশালী ও নিতান্ত নিজজন, যথা কাশীশ্বর, গোবিন্দ, শ্রীবাস ইত্যাদি। আর তৃতীয় মণ্ডলে স্বয়ং মহারাজা। তিনি তাঁহার পাত্র মিত্র ও যোদ্ধাগণ লইয়া বাহিরে এক মণ্ডলী করিয়া লোক নিবারণ ও প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রাজার অগ্রে শ্রীবাস, দ্বিতীয় মণ্ডলীতে। রাজা ভাল করিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইতেছেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভুর কি কাণ্ড, রাজা প্রজা সব মিশিয়া গিয়াছে! রাজা যে সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহা অতি অল্প লোকে লক্ষ্য করিতেছেন। রাজার দক্ষিণ দিকে তাঁহার প্রধান অমাত্য হরিচন্দন। তাঁহার স্কন্ধে হস্ত অবলম্বন করিয়া রাজা এক দৃষ্টে প্রভুকে দর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শ্রীবাস একটু স্থূলকায় বলিয়া, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা একবার বামে একবার দক্ষিণে মস্তক লইতেছেন। রাজার এই দশা দেখিয়া হরিচন্দনের অসহ্য হইতেছে। শেষে অমাত্যবর থাকিতে না পারিয়া, শ্রীবাসকে হস্ত দ্বারা এক পার্শ্বে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত ঠেলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস ভাবে বিভোর, তাঁহার পশ্চাতে যে রাজা ও রাজার মন্ত্রী, আর মন্ত্রী যে তাঁহাকে রাজার প্রভু-দৃশ্য সুলভ করিবার নিমিত্ত এক পার্শ্বে যাইবার জন্য হস্ত দ্বারা ঠেলিতেছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও তিনি জানেন না। হরিচন্দন বারংবার ঐরূপে ঠেলিতে লাগিলেন, শ্রীবাস বিরক্ত হইয়া, পশ্চাতে ফিরিয়া, কে ঠেলিতেছে তাহা লক্ষ না করিয়া, হরিচন্দনের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন!

হরিচন্দন রাজনীতি লইয়া থাকেন, তিনি রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও চিনেন না, রাজনীতি ব্যতীত আর কিছুই বুঝেন না। সম্মুখের এক দরিদ্র বিদেশী ব্রাহ্মণের চপেটাঘাত দ্বারা অত লোকের মধ্যে অপমানিত হইয়া, তিনি স্বভাবতঃ ক্রুদ্ধ হইলেন, হইয়া শ্রীবাসকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাজা তখন পূর্ব্বরাগরসে বিভাবিত। তাঁহার নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ও তাঁহার সম্বন্ধীয় যে কেহ, কি যে কোন বস্তু, মধু বলিয়া বোধ হইতেছে। হরিচন্দনের ক্রোধ দেখিয়া, রাজা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি? দেখিতেছ না উনি প্রভুর গণ! উঁহার শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়াছ, তুমি অতি ভাগ্যবান, আমি পাইলে আপনাকে অতি ভাগ্য-

বান ভাবিতাম।” হরিচন্দন কাজেই নিরস্ত হইলেন, এবং যাঁহারা রাজার চরিত্র দেখিলেন ও বুঝিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। শ্রীবাস একটুকু লজ্জা পাইলেন।

প্রভুর নৃত্য কেহ দেখেন নাই। সকলে শুনিয়াছেন, শ্রীশচীর উদরে শ্রীনবদ্বীপনগরে শ্রীনন্দের নন্দন জন্মগ্রহণ করিয়া, এখন সন্ন্যাসীরূপে শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে অতি ভাগ্যবানে দূর হইতে দর্শন পাইয়া থাকেন। তিনি অদ্য সর্ব্ব-নয়ন-গোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে লোক বিমোহিত হয়, তাঁহার নৃত্য দর্শনে পাষাণ দ্রবীভূত হয়। তাঁহার প্রেম তরঙ্গের নৃত্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত অনুভব করিতে পারিবেন যে, গৌরাঙ্গের নৃত্যে ভুবনমোহিত কেন করিত। সেই নবীন গৌর-তনু, অদ্য দিবাভাগে, সর্ব্ব সমক্ষে, নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্যই অতি কঠিন জীবের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহার সঙ্গে আরো নানা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছেন। যথা চরিতামৃতে—

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল॥
মাংস-ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলোকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
এক এক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোক জানে দন্তসব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাহে রক্তোদ্গম।
জয় জয় জজ গগ গদ্ গদ্ বচন॥
জল যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রু জল।
আস্ পাস্ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্প সম॥

এই সমস্ত অদ্ভুত দর্শনে যাঁহারা দ্রবীভূত না হয়েন, অলৌকিক দর্শনেই যেন তাঁহারাও মুগ্ধ হইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রভু, বায়ু ভরে কদলী পত্রের ন্যায় কম্পিত দুই শ্রীকর যুড়িয়া, শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন, কিন্তু বড় কাঁপিতেছেন বলিয়া স্থির হইয়া প্রণাম করিতে পারিতে-

ছেন না। যুগ্ম বৃদ্ধাঙ্গুলী বারংবার কপালে লাগিতেছে। আবার প্রভু কথন কথন মহামল্লের ন্যায় দৃঢ়রূপে বাম পদ অগ্রে স্থাপিত করিয়া শ্রীজগন্নাথ পানে চাহিয়া তাল ঠুকিতেছেন। ইহাতে তুমুল শব্দ হইতেছে, ও প্রভুর বামবাহু রক্তবর্ণ হইতেছে। প্রভুর মনের ভাব অনুভব করুন। তখন তাঁহার ভক্ত-ভাব। শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন যে, "আর আমার ভয় কি, আমি তোমার বলে বলীয়ান্।" আর ত্রিতাপকে অর্থাৎ ভয়ের যত কিছু, তাল ঠুকিয়া আরোপ-টংকারে তুচ্ছ করিতেছেন। মনে ভাবুন, অতি বলশালী কোন লোক জানু পাতিয়া একটী প্রকাণ্ড শৃঙ্গী মেষকে তাল ঠুকিয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, "আয় দেখি, তোর কত শক্তি!" প্রভুও সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া এই ভাবে তাল ঠুকিতেছেন। কখন মুখে জয় জগন্নাথ বলিতে যাইতেছেন। কিন্তু একে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় অবাধ্য হইয়াছে, আরও মহাকম্পে দন্তে দন্তে আঘাত হইতেছে, সুতরাং জয় বলিতে জজ বলিতেছেন, জগন্নাথ বলিতে জগ গগ করিতেছেন। তখন ভাবোল্লাসে ভক্তি দ্বারা অভিভূত হইতেছেন। যখন মৃত্তিকায় পড়িয়া প্রভুর শ্বাস রহিত হইতেছে, তখন সকলে ক্রন্দন করিতেছেন। যখন প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তখন সেই অসংখ্য লোকের হৃদয় নাচিতেছে। প্রকৃত কথা, তখন সেই লক্ষ লক্ষ লোকে প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া কি একটা হইয়া গিয়াছেন। কি রাজা, কি প্রজা, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলে আত্মহারা হইয়া, যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি সেইরূপে বিভাবিত হইতেছেন। ফল কথা, প্রভু এই লক্ষ চিত্তকে বশীভূত করিয়া সম্পূর্ণরূপে করায়ত্তে আনিয়াছেন।

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য ভক্তের নিমিত্ত, মধুর নৃত্য প্রেমিকের নিমিত্ত। প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী, তাঁহারা সে নৃত্য দেখিয়া দুঃখ ও ভয় পাইতেছেন। প্রভু মুহুর্মুহু পড়িতেছেন, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত ও সরূপ, ইহাদের মধ্যে যিনি দেখিতেছেন তিনিই ধরিতেছেন, ও ভক্তগণে সন্তর্পণ করিতেছেন।

প্রভু নৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকটে আসিলেন, আসিয়া ঐ রূপে পড়িয়া গেলেন। তখন রাজা স্বভাবতঃ হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া উঠাইতে গেলেন। এখন প্রভুকে স্পর্শ করে, এরূপ

সাহস সরূপ ও নিতাই ব্যতীত আর কাহারও হইত না। শ্রীঅদ্বৈত পর্য্যন্তও প্রভুকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। রাজা যে প্রভুকে ধরিতে গেলেন, এ যে তিনি রাজা সেই স্পর্দ্ধার বলে তাহা নয়, ইহা কেবল অভ্যাসবশত। তাঁহার পদের নিমিত্ত চিরদিন তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি; কোন কার্য্য করিতে কাহারও অনুমতি লওয়ার শিক্ষা তিনি কখন পান নাই। প্রভুকে প্রগাঢ় ভাল বাসেন, সেই প্রভু তাঁহার সম্মুখে অতি নির্ঘাত আছাড় খাইলেন, তিনি কাজেই যাইয়া প্রভুকে ধরিলেন।

কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্য-শূন্য কার্য্য একেবারে ছিল না। সামান্য জীবের ন্যায় তাঁহার কার্য্যের ভুল হইত না। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও কোন অকাজ করিতেন না। প্রভু ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার হঠাৎ চেতন পাইবার কথা নয়। কিন্তু রাজা যাই প্রভুকে স্পর্শ করিলেন, অমনি তিনি চেতন পাইলেন! পাইয়া বলিলেন, "ছি! একি হইল? আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল?" ইহাই বলিয়া, রাজার হস্ত হইতে যেন অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অন্যত্র গমন করিলেন, করিয়া আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রাজা এইরূপে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে ও তাঁহার পাত্র মিত্র সৈন্য সামন্তের মাঝে, তাঁহার নিজ স্থানে, নিরপরাধে প্রভু কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন। রাজার যদি কিঞ্চিৎমাত্রও অভিমান থাকিত, তবে তিনি ক্রোধ করিয়া প্রভুকে সেই স্থানেই উপেক্ষা করিতেন। তাঁহার প্রভুকে যে ভক্তি যদি তাহার মধ্যে মলিনতা থাকিত, তবে তিনি এত অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। শুনিতে পাই, যাহাকে শ্রীভগবান কৃপা করিবেন, তাহাকে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এক দিন শ্রীমতী রাধিকাও এইরূপে প্রথমে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা তখন শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাই প্রভুকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করিলেন না। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান, এ বিশ্বাস তখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, একটু পূর্ব্বে তিনি স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রভুর রূপে গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার যত খানি প্রাণ, সমুদায় তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছেন। কাজেই প্রভু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, ক্রুদ্ধ না হইয়া, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লইয়া, শ্রীমতী যেরূপে উপেক্ষিত হইয়া সখীদিগের শরণাগত হইয়াছিলেন, সেই

রূপে, তিনি কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "হে সুহৃদ্গণ! আমার ভাগ্যে কি প্রভুর কৃপা হইবে না? আর আমার বাঁচিয়া কি ফল?"

তখন সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তোমার প্রতি প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপা। তাহা না হইলে, তিনি যে স্বয়ং জগন্নাথ, ইহা একটু পূর্ব্বে এই লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে অন্যকে গোপন করিয়া তোমাকে জানাইতেন না। পূর্ণ কৃপা ব্যতীত ইহা হয় না। তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, তিনি বিধি উপেক্ষা করিলে জীবে উহা মানিবে না। সন্ন্যাসীর রাজস্পর্শন ত দূরের কথা, দর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ। এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তুমি তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, তিনি সেখানে তোমাকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য। কিন্তু তুমি তাই বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িও না। তুমি উপেক্ষিত হইয়াছ বলিয়া প্রভুর কথা উপেক্ষা না করিয়া, আবার তাঁহার চরণে স্মরণ লও, লইয়া জগজ্জনকে দেখাও যে, যদিও তুমি রাজা, কিন্তু তবু তুমি ভক্ত, প্রভুর কৃপা পাইবার নিতান্ত উপযুক্ত। এইরূপে তুমি, তোমাতে প্রভুর কৃপা করিতে যে বাধা আছে, তাহা অন্তর্হিত কর। তবে প্রভু তোমার নিকট ঋণী হইবেন।

রাজা সখাগণের এই অপরূপ সান্ত্বনা বাক্যে, এবং একটু পূর্ব্বে প্রভু অন্তরীক্ষে যে তাঁহার গোচর হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া, কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন, হইয়া আবার প্রভুর নৃত্যে মনঃসংযোগ করিলেন। প্রভু রাজার হাত ছাড়াইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার আর উদ্দণ্ড নৃত্য নয়, ব্রজ-গোপীর নৃত্য। ফল কথা, প্রভুর মনের ভাব তখন অন্য রূপ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ভক্ত-ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, এখন গোপী-ভাবে অভিভূত হইলেন, হইয়া কি কি করিলেন তাহা একে একে বলিতেছি। প্রথমে এই ভাব পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য বলিতেছি। প্রভুর তখন মনের ভাব হইল যে, তিনি শ্রীমতী রাধা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ওখানে তাঁহার সহিত মিলিতে আসিয়াছেন। আসিয়া প্রথমে দেখেন যে, তাঁহার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সেখানে পরম ঐশ্বর্য্যশালী, হাতী ঘোঁড়া সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। দেখেন, তাঁহার বন্ধু রাজবেশ ধরিয়া হাতে দণ্ড লইয়াছেন। ইহাতে আপনার বন্ধুর ভিন্ন বেশ, ভিন্ন সঙ্গ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাই নিবেদন করিবেন, বলি-

বেন কি না যে, "হে আমার বন্ধু! তুমি এ বহিরঙ্গ লোক সমূহের মাঝে কেন? চল, বাড়ী চল, শ্রীবৃন্দাবনে তুমি আমি দুই জনে থাকিব।"

কিন্তু এ সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে অবগত করান? যেহেতু তিনি অতি দূরে রথের উপরে! নিরুপায় হইয়া সেখানে বসিলেন, বসিয়া নখ-দ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গ আকৃতি লিখিলেন। সেই তাঁহার কৃষ্ণ হইলেন। এখন সেই মূর্ত্তির নীচে নখ-দ্বারা মনের ভাব লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু লিখিবেন কি, লিখিবার পূর্ব্বেই নয়ন-জলে তাঁহার সেই ত্রিভঙ্গাকৃতি ধুইয়া যাইতেছে। কাজেই আবার চিত্র আঁকিতেছেন, আঁকিয়া আবার লিখিতেছেন। প্রভুর এই কার্য্য দেখিয়া সরূপ ব্যথিত হইতেছেন, যেহেতু প্রভুর নখে আঘাত লাগিতেছে। তাই প্রভু যখন লিখিতে যাইতেছেন, সরূপ, ব্যগ্র হইয়া, (তিনি প্রভুর পাশে অগ্রেই বসিয়া গিয়াছেন,) নিজ হস্ত পাতিয়া দিতেছেন, যে প্রভু মৃত্তিকায় নখ-দ্বারা আঁচড় দিতে না পারেন। প্রভু বেগতিক দেখিয়া হাত সরাইয়া অন্য স্থানে চিত্র লিখিতে যাইতেছেন, সরূপও ঐরূপ হাত সরাইয়া প্রভুর নখের নীচে হাত রাখিতেছেন। কিন্তু সরূপের অধিকক্ষণ আর পরিশ্রম করিতে হইল না, যেহেতু ইতি-মধ্যে প্রভুর মনে ভাব প্রবেশ করিল যে, শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়িয়া তাঁহা-দের সহিত বৃন্দাবনে চলিয়াছেন। প্রভুর মনের ভাব হইল যে, তিনি রাধা, সখীগণ সহিত এখন সেই বন্ধুকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। প্রভু এই ভাবে বিভোর হইয়া আহ্লাদে একেবারে গলিয়া পড়িলেন, কাজেই তাঁহার নৃত্য আপনাপনি মধুর হইল। এদিকে সরূপ অমনি বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর সে পরিবর্ত্তন কি, তাহাও বুঝিলেন।

স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায় বাক্য মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর নিজ ইন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥ (চরিতামৃত)

প্রভুর ভাব বুঝিয়া সরূপ অমনি এই পদ ধরিলেন। যথা—

সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।
যার লাগি মদন দহনে দহি গেনু॥

প্রভুও তখন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সে নৃত্য দেখিলে জীব মাত্রের

নয়নে আনন্দ-জল আইসে। প্রভু তখন রাধা-ভাবে সজল ও সলজ্জ নয়নে জগন্নাথ পানে চাহিত লাগিলেন। তাহার পরে যেন জগন্নাথের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। লোকে কথা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু প্রভু যে কি করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। প্রভু তখন যে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে আছেন, ইহা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি রথের শ্রীকৃষ্ণকে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। আবার এই লক্ষ লক্ষ লোকেও স্তম্ভিত হইয়া প্রভুর কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। প্রভুর মন জগন্নাথে নিবিষ্ট, আবার এই লোক সমূহের মন প্রভুতে নিবিষ্ট। প্রভুর প্রত্যেক ভঙ্গী সকলে আবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন।

প্রভু মুখ উঠাইয়া রথে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় যেন তাঁহার সহিত নয়নে নয়নে মিলিত হইল। অমনি লজ্জা পাইয়া মুখ হেট করিতেছেন। আবার যেন অনিবার্য্য আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চলিতেছেন।

কখন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়া অমনি লজ্জা পাইয়া, ক্রোধ করিয়া, অল্প হাসিতে হাসিতে, ও করতালি দিতে দিতে, পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে, আসিতেছেন। কখন হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া, রথের শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। আবার কখন ছল ছল আঁখিতে গদ্ গদ্ হইয়া যেন আপনার মনের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন। প্রভুর তখনকার মনের ব্যথা কি, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, “বন্ধু! তুমি এ কোথায় আসিয়াছিলে? এখানে লোকের কলরব, আমি স্বাস্থ্য পাইতেছি না। আমরা গোপী, আমাদের ও সব দেখিয়া ভয় করে। বন্ধু! বৃন্দাবনে চল, সেখানে পক্ষী গান করিতেছে, বৃক্ষ সুশীতল ছায়া দিতেছে, যমুনা পিপাসা শান্তি করিতেছে। হে আমার প্রাণের প্রাণ! আমি তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ বাঁচি না। চল, সেখানে তোমার নিজজনের কাছে চল, সকলে সুখে ক্রীড়া করিব।

প্রভু তখন আপনাকে রাধা বলিয়া ভাবিতেছেন, কাজেই সরূপকে ভাবিতেছেন ললিতা। এমন কি, নিকটে যে যে মর্ম্মী-ভক্ত আছেন, সকলকেই তাঁহার আপনার সখী বলিয়া বোধ হইতেছে। মনের ভাব এই যে, তাঁহার সুখের সুখী সখীগণের সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু দূরে রথের উপরে আছেন। প্রভুর মনের ভাব যে, কৃষ্ণ এত দূরে যে, তাঁহার সহিত

কথাবার্ত্তার সম্ভাবনা নাই। মনে ইচ্ছা হইতেছে যে, তাঁহার প্রিয়তমের গলায় মালতীর মালা দিবেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দূরে। তাহার পরে মালতীর মালা বা কোথায় পাইবেন? তখন হস্তে যে জপের মালা ছিল, উহা তাঁহার মনে সহজেই মালতীর মালা রূপে পরিণত হইল। এখন মালতীর মালা পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণও সম্মুখে, কিন্তু তাঁহার গলায় মালা দিবেন কি রূপে? তাই মনে মনে একটু পরামর্শ করিয়া হস্ত উর্দ্ধ করিয়া আপনার অঙ্গুলীতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহা শ্রীজগন্নাথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাবৎ লোকে প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন; কারণ প্রকৃতই সেই মালা শ্রীজগন্নাথের গলায় বেষ্টন করিয়া পড়িল! এই রহস্য দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চিৎকার করিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রথে, জগন্নাথের পার্শ্বে, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আবার সেই মালা প্রভুর হাতে পঁহুছিয়া দিতে লাগিলেন।

প্রভুর, মর্ম্মিভক্তগণকে সখী বোধে তাঁহাদিগকে আবার পুরস্কার মালা দিতে ইচ্ছা হইতেছে। আবার ঐরূপ অঙ্গুলি দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মালা নিক্ষেপ করিতেছেন, আর প্রকৃতই সেই ভক্তের গলায় সেই মালা বেষ্টন করিতেছে! যথা, বক্রেশ্বর প্রভুর একটু দূরে আছেন। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুলিতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উহা নিক্ষেপ করিলেন, আর অমনি তাঁহার গলা ঐ মালা দ্বারা বেষ্টিত হইল। বোধ হয় সেই দেখাদেখি এখন দর্শকগণে রুমালে প্রণামী বাঁধিয়া রথের উপর নিক্ষেপ করেন, আর সেবাইতগণ প্রণামী লইয়া সেই রুমালে প্রসাদী মালা দিয়া উহা প্রত্যর্পণ করেন।

প্রভুর নৃত্য বর্ণন করা অসাধ্য; কারণ তিনি প্রত্যহ এক রূপ নৃত্য করিতেন না। নিমিষে নিমিষে তাঁহার নৃত্য নূতন আকার ধারণ করিত। প্রভুর আনন্দ হইয়াছে, ভাবিতেছেন সখীদেরও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে, তাই সখীদের সহিত আনন্দ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি মধুর নৃত্য করিতেছেন, এখন সম্মুখে দেখেন বক্রেশ্বর। অমনি তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। কিন্তু শুধু আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না, গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন। দেখেন পার্শ্বে স্বরূপ দামোদর, দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, স্বরূপ অমনি চরণে পড়িলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে কাঁপিতে কাঁপিতে

সরূপকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। তখন বোধ হইল যেন সরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিলেন, কারণ প্রভু সরূপকে যে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তিনি যেন লোকের অদর্শন হইলেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

দধার কটিসূত্রকং প্রভুরতীহ দামোদরঃ
স্বরূপ ইব তস্ত কিং যতিবরোঽয়মুদ্‌ঘুষ্যতে।
য এষ নটোনোৎসবে হৃদয়কায়বাগ্‌বৃত্তিভিঃ
শচীসুতকলানিধৌ প্রবিশতীব সান্দ্রোৎসুকঃ॥

এই দেখিলেন দুই জনে এক হইয়া গেলেন, আবার একটু পরে পৃথক্‌কৃত হইলেন। তখন দুই জনে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখন দুই জনে হস্ত উত্তোলন করিয়া, কর ধরাধরি, মুখোমুখি হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন ঐরূপ মুখোমুখি হইয়া উভয়ে উভয়ের বাহু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গ সরূপের মুখে নয়ন-পদ্ম অর্পণ করিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা দুই জনে মুখ ঘুরাইয়া, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে মিলিত হইয়া, নৃত্য করিতেছেন। কখন বা উভয়ে পলক হারাইয়া নয়নে নয়নে মিলিত হইতেছেন, হইয়া নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্য দেখিয়া কি এই মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল? যথা—

হেরাহেরি ফেরাফেরি ধরাধরি বাহু।
পূর্ণিমার চাঁদে যেন গরাসিল রাহু॥

আবার সরূপ, সিংহের কটি হইতেও ক্ষীণ যে প্রভুর কটি, তাহা এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং প্রভু সরূপের কটি ধরিয়াছেন, আর সরূপ বক্র হইয়া অন্য হাতে প্রভুর জানু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

উন্মীলন্মকরন্দসুন্দরপদদ্বন্দ্বারবিন্দোল্লস-
দ্বিন্যাসঃ ক্ষিতিষু প্রকামমমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ।
আমুগ্ধৈঃ করকুট্মলৈরিতইতো হর্ষাদধোধো গুরু-
স্নেহার্দ্রেণ দৃঢ়োপগূহিতপদো নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাম্‌॥

আবার কখন বা প্রভু দক্ষিণ দিকে, সরূপের বাম দিকে, বক্রেশ্বরের হস্ত ধরিয়া দ্রুত পদে নৃত্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে, একবার জগন্নাথের দিকে চাহিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, আবার ঐরূপ নৃত্য করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিতেছেন। আবার প্রভু

কখন বক্রেশ্বর ও সরূপকে ত্যাগ করিয়া, যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে হৃদয়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছেন। আর প্রভু, যত বৃন্দাবনের নিকট যাইতেছেন, ততই আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন।

প্রভুর হৃদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝার বায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥ (চরিতামৃত)

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক সমূহ আনন্দে পাগল হইল। এখন, রাধা ও কৃষ্ণে যে প্রেম-ভাব, ইহা লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ও শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে জর্জ্জরিভূত হইয়া সরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা কি জাতীয় প্রেম, বহিরঙ্গ লোকে ইহা কিরূপে অনুভব করিবে? এই যে প্রভু মুখ-চুম্বন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকের কিছু মাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে না, বরং লোকে উহা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাই শাস্ত্রে বলেন, গোপী-প্রেমে কামগন্ধ নাই। অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কি কাম-রোগ থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হয় না। অথবা কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ বশীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ জ্ঞান লোপ পায়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষে যে মধুর প্রেম উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। এক শ্রীভগবান পুরুষ, আর সমুদায় প্রকৃতি, পরিণামে জীব মাত্র গোপ-গোপীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত, জীবের জীবের সহিত, ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত, কত গাঢ় সম্বন্ধ, কতক অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরকীয় প্রেমের কথা শুনিলে ক্লেশ পায়েন, তাঁহারা দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই।

জগন্নাথ-সেবক যত রাজ-পাত্রগণ।
যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন।
প্রভু নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণ-প্রেমে উথলিল হৃদয় সভার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভু নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥

তবু প্রভুর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে, কিন্তু মধুর নৃত্যে যে পতন

তাহাতে তত ভয় হয় না। প্রভু মূর্চ্ছা যাইতেছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার যে আনন্দ উঠিতেছে, তাহা হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। যখন আনন্দ হৃদয়ে না ধরে, তখন মূর্চ্ছা হয়। প্রভু আবার রাজার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইলেন!

রাজা পূর্ব্বে তাড়া খাইয়াছেন, তাহাতে এবার নিরস্ত হইলেন না। তবে সেবার যেমন প্রভুকে ধরিয়া উঠাইতে গিয়াছিলেন, এবার তাহা না। করিয়া পদতলে বসিলেন, বসিয়া শ্রীপদ দুখানি আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া অতি যতনে উহা সেবা করিতে লাগিলেন। যথা কবিকর্ণপূরের কাব্যে,—

আনন্দোৎসাহমূর্চ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দনিশ্বাসমন্দে
রোহদ্রোমাঞ্চপূরৈ র্বিকলিত-বপুষানন্দমন্দীকৃতেন।
স্যন্দন্নেত্রারবিন্দদ্বয় সলিল জুষারুদ্রদেবেন ভূয়ঃ
সানন্দং সেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয় সরসিরুহো রাজতে গৌরচন্দ্রঃ॥

অর্থ—শরীর স্পন্দন ও নিশ্বাস-বায়ু মন্দীভূত হওয়ায় নেত্র-পদ্ম বিগলিত জল-ধারা-যুক্ত, তথা আনন্দে জড়ীকৃত ও লোমাঞ্চ সমূহে বিকলিত অঙ্গ দ্বারা যাঁহাকে বোধ হইতেছে যেন আনন্দ উৎসাহ ও তত্তৎক্ষণেই মূর্চ্ছাগত হইতেছেন এবং প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক সানন্দে তদবস্থায় যাঁহার পাদ-পদ্ম যুগল সেবিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতেছেন।

প্রভু বলিতেছেন তিনি রাজ-সম্ভাষণ করিবেন না, রাজার সংকল্প তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র হইবেন। শ্রীভগবান ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। এবার প্রভু বিষয়ীর স্পর্শে হঠাৎ চেতনা লাভ করিলেন না, রাজার সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সচেতন হইলেন। কিন্তু তবু মহারাজের সেবা যে তাঁহার অবগতি হইয়াছে, ইহা জানিতে দিলেন না। প্রভু চেতন পাইয়াই আবার মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

প্রভু এই রাধা-ভাবে, প্রেমের হিল্লোলের মাঝে সহসা ভক্তি কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হইলেন। প্রেম ও ভক্তি, ভজন কালে, হৃদয়ে এইরূপ খেলা করিয়া থাকেন। কখন প্রেম ভজন করিতে করিতে হঠাৎ ভক্তির উদয় হয়, আবার ভক্তির সেবা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের হিল্লোলে প্রভুকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ ভক্তির উদয় হইল।

তখন শ্লোক আকারে প্রভু বলিতেছেন, "হে অরবিন্দ-লোচন! তোমার পাদপদ্মমাধুরী অতিশয় রমণীয়, অতিশয় সুগন্ধ, অতিশয় দুর্লভ," ইহা বলিয়া সেই সুশীতল শ্রীপদকমল ধরিতে গেলেন। আবার তখনি অধিরূঢ় ভাব উপস্থিত হওয়ায়, আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইল। অতএব এক সময়ে প্রভুর দেহে রাধা ও কৃষ্ণ উভয় ভাবের উদয় হইল। তাই রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ ধরিলেন। অর্থাৎ আপনার শ্রীপদ হৃদয়ের উপর রাখিয়া অতি গাঢ় প্রেমে ও ভক্তিতে চুম্বন করিতে লাগিলেন! প্রভু, আপনার পদ শ্রীকৃষ্ণের পদ এই বোধে উহা ঘন ঘন চুম্বন করিতেছেন, প্রেমে উহা বুকে ধরিতেছেন, আর নয়ন ভরিয়া এক দৃষ্টে দর্শন করিতেছেন!

প্রভুর এক সময়ে যে দেহের মধ্যে দুই ভাব, ইহা মুহুর্মুহু প্রকাশ পাইত। এই দুই ভাব কিরূপ না রাধা-কৃষ্ণ ভাব, কি উদ্ধব-কৃষ্ণ ভাব! এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু যখন নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণের নিকট বিদায় লয়েন, তখন এক সময় একবার কৃষ্ণ হইয়া রাধার নিমিত্ত, ও রাধা হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত, রোদন করিয়াছিলেন। এই রূপে প্রভু উদ্ধব ও কৃষ্ণ, এই দুই ভাবে, একেবারে বিভাবিত হইয়া, আপনার চুল দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেন। প্রভুর চুল হইল উদ্ধবের, পদ হইল শ্রীকৃষ্ণের! উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহার সেবা আপন কেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদবেষ্টন। ভক্তিতে ভক্তে প্রভুর এইরূপ সেবা করিয়া থাকেন।

এইরূপে রথ বলগণ্ডি স্থানে আসিল। দক্ষিণে উপবন, বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন। সে স্থানে আসিলেও প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ নাই। কিন্তু সেখানে একটি নিয়ম আছে, তাহাতে মহা ভিড় হইল। সে স্থানে রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র, বিদেশী, সকলেই, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, শ্রীজগন্নাথকে ভোগ দিয়া থাকেন। যাঁহার যতদূর সাধ্য, তিনি সেখানে সেইরূপ উত্তম আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোজন করাইয়া থাকেন। সেই কারণে এত গোল হইল যে, ভক্তগণ প্রভুকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া উপবনে লইয়া গেলেন। সেই উপবনে উত্তম গৃহ আছে, ভক্তগণ প্রভুকে তাহার পিণ্ডায় লইয়া বসাইলেন। প্রভু প্রেমে অচেতন। পিণ্ডায় পা মেলাইয়া ঘর হেলান দিয়া বসিয়া থাকিলেন। পরিশ্রমে প্রভুর ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

সেখানে তিনি শীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যে যেখানে পাইলেন, বৃক্ষ তলায় ঐরূপে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র সখাগণ সহিত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছেন। প্রভু পিণ্ডায় গমন করিলেন রাজার আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তখন সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের পরামর্শ ক্রমে রাজা তাঁহার জীবিতেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। প্রথমে রাজা সমুদায় রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া ধুতি চাদর পরিলেন, অবশ্য ধুতি ও চাদর অতি পরিষ্কার।

শুক্ল বস্ত্র, ধুতি ফোতা পরিয়াছে মাত্র।
প্রভুকে দেখিব বলি উল্লাসিত গাত্র॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

তাহার পরে সুন্দর বৈষ্ণব বেশের যে যে উপকরণ, সমুদায় ধারণ করিলেন। করিয়া একলা উপবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রকাণ্ড দেহধারী ও বলশালী, কিন্তু তখন প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছে। চকিত হরিণীর ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন, কিন্তু সে অভ্যাসে, প্রকৃত পক্ষে, উল্লাসে ও ভয়ে, বাহ্য জ্ঞান অল্প মাত্র আছে।

চতুর্দ্দিকে চাহে রাজা সভয় নয়নে।
প্রভুর নিকটে গেল মন্থর গমনে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

দেখেন, ভক্তগণ বসিয়া আছেন, তাঁহারা সকলে প্রভুর কৃপাপাত্র। ভক্তগণকে দেখিয়া রাজার চেতন হইল, তখন করজোড়ে সকলের নিকট সঙ্কেত দ্বারা, প্রভুকে মিলিতে অনুমতি চাহিলেন। রাজার এই দীন ভাব, এই আকিঞ্চন, এই দৃঢ়তা, দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন, অনেকের হৃদয় দ্রব হইল। কাহার বা একটুকু শঙ্কাও হইল, ভাবিলেন যে রাজার ভাগ্যে আজি না জানি কি হয়। এইরূপে রাজা ক্রমে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। প্রভু কিরূপে বসিয়া আছেন, তাহা চন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

নৃত্যাবেশ প্রভু চিতে, না পারেন সম্বরিতে, মুদিত করিয়া দু নয়ন।
শ্রীচরণ প্রসারিয়া, বসিল আনন্দ পাঞা, পাদপদ্ম চালেন সঘন॥
নিরন্তর নেত্র-জল, ধৌত করে বক্ষঃস্থল, প্রেমানন্দ যেমন সাক্ষাৎ।

প্রভু কি করিতেছেন, না মুখে সেই পূর্ব্বের রচিত একটী অর্দ্ধশ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন, আর মুদিত নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। সে শ্লোকটি এই, যথা—

অথাত আনন্দ ত্বমং পদাম্বুজম্ ইত্যাদি। (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)

গোপীনাথ নিকটে বসিয়া, প্রভুর এই শ্লোক শুনিয়া, মনে মনে অর্থ করিতেছেন। ভাবিতেছেন, প্রভু একটু পূর্ব্বে হঠাৎ ভক্তিতে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণমাধুরী দর্শন ও চুম্বন করিয়াছেন। দর্শন ও স্পর্শ করিয়া পরমহংসগণ যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, তাহা অপেক্ষা তোমার শ্রীচরণ মাধুরী অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এ কথার তাৎপর্য্য বলিতেছি। পরমহংসগণ যোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা তেজ উপাসনা করেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণমাধুরী আস্বাদ করিয়া বলিতেছেন যে, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চরণ হইতে যে আনন্দ, সে ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।" ইহাতে প্রভু প্রকারান্তরে সাকার ভজনকে নিরাকার ভজন হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।

রাজা প্রভুর নিকট আগমন করিয়া, প্রভুর ভাব দেখিয়া ও শ্লোক শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন প্রভুর শ্রীপদ স্পর্শ করিয়া কি তাঁহার অকৃপার ভাজন হইবেন? আবার ভাবিতেছেন, প্রভু যদি প্রাণে মারেন, তবে শ্রীচরণ ধরিয়াই মরিবেন। রাজার মনে ভয় যে, পাছে প্রভু ভাবেন যে, তিনি রাজা বলিয়া তাঁহার বিনা অনুমতিতে, তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। তখন রাজার শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী মনে পড়িল।

সর্ব্বে ভাগবত শ্রীমৎ পাদস্পর্শ হৃতাশুভম্।
ভেজেস্পর্শবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

ভাবিলেন, "যদি অপরাধ করি, তবে ভগবানের পাদস্পর্শে সমুদায় অশুভ ক্ষয় হইয়া যাইবে, অতএব শ্রীভগবানের শ্রীপাদস্পর্শে কখন কোন বিপদ নাই।" ইহা ভাবিয়া সংকল্প করিয়া পদতলে বসিলেন, বসিয়া হস্ত দ্বারা শ্রীচরণ সেবন করিতে লাগিলেন। প্রভু যেরূপ পদ চালাইতে ছিলেন, সেইরূপ করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না।

রামানন্দ রায় রাজাকে শিখাইয়া দিয়াছেন যে, "তুমি প্রভুর পদ সেবা করিবে। আর সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাও শুনাইবে।" রাজা কোথায় পাঠ করিবেন, কিরূপে পাঠ করিবেন, এ সমস্ত রাম রায়ের নিকট উত্তম করিয়া শিখিয়া আসিয়াছেন। রাজা পদ সেবা করিতে করিতে ধীরে ধীরে রাসের গোপী গীতার প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেন। যথা—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা ত্বয়ি ধৃতাসব স্ত্বাং বিচিন্বতে॥

গোপীগণ কহিলেন "হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে। অপর তুমি এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এই কারণে কমলাও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া এ স্থানে নিত্য বিরাজমানা। হে প্রিয়! এই প্রকারে তোমার কারণে যে ব্রজমণ্ডলে সকল ব্যক্তি আমোদান্বিত, সে স্থানে তোমার দাসী এই সকল গোপী (যাহারা তোমার নিমিত্তই কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়াছে) তোমার অন্বেষণ করিয়া কাতর হইতেছে, কৃপা করিয়া দর্শন দাও।"

প্রভুর মনের ভাব বাহিরে ব্যক্ত হইত, কারণ তাঁহার হৃদয় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল ছিল। এই শ্লোক শুনিবা মাত্র প্রভুর প্রফুল্ল বদন আরো প্রফুল্লিত হইল। রাজা ইহা দেখিয়া পরমাশ্বাসিত হইয়া ঐরূপ পদসেবা করিতে করিতে তাহার পরের শ্লোক পড়িলেন। যথা—

শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎসরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্ক দাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহকিংবধঃ॥

"হে সম্ভোগপতে! হে অভীষ্ট প্রদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী তুমি যে শরৎকালে সুজাত অথচ বিকসিত কমলগর্ভের শোভাহারী নেত্রদ্বারা আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি লোকে বধ বলিয়া গণ্য হয় না? শস্ত্র দ্বারা বধই কি বধ? চক্ষু দ্বারা বধ কি বধ নহে! উহা অবশ্যই বধ শব্দ বাচ্য। অতএব তোমার দৃষ্টি দ্বারা অপহৃত আমাদের প্রাণ প্রত্যর্পণ নিমিত্ত দর্শন দাও।"

প্রভুর আনন্দতরঙ্গ আরো বাড়িয়া উঠিল। তখন যদিও নয়ন মেলিলেন না; কিন্তু মুখে নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বল, বল, তাহার পর গোপীগণ কি বলিলেন বল।"

প্রভু এই প্রথম রাজার সহিত কথা বলিলেন। রাজার আনন্দে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। কষ্টে শ্রষ্টে রাজা পড়িলেন—

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥

"হে দেব! আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর। হে বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ! তোমার চরণকমল প্রাণীদিগকে অভয় দান করে, আমরা সংসার

ভয়ে ভীতা হইয়া তোমার ঐ চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া তোমার যে করকমল লক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা বরপ্রদ, তাহা আমাদের মস্তকে নিহিত কর।"

প্রভু এই শ্লোক শুনিবা মাত্র আনন্দে যেন জড়বৎ হইলেন। শ্রীঅঙ্গে পূর্ব্বে যে পুলক ছিল, সেই পুলকের উপর মুহুর্মুহু পুলকের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কষ্টে শ্রষ্টে ভঙ্গস্বরে বলিলেন, "তাহার পর, তাহার পর"। রাজা আবার বলিলেন—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীরযোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃস্মনো জলরুহাননং চারুদর্শয়॥

"সখে! তুমি ব্রজজনের আর্ত্তিহারী, হে বীর! তোমার মন্দহাস্য নিজজনের গর্ব্বহারী, আমরা তোমার কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে সখে! আমরা অবলা প্রথমে আমাদিগকে বদন-কমল দর্শন করাও।"

প্রভুর ইচ্ছা হইতেছে যে, যিনি শ্লোক পাঠ করিতেছেন, উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে, উঠিতে পারিতেছেন না। উঠিতে যাইতেছেন, আর এলাইয়া পড়িতেছেন। রাজা আর প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়া পড়িলেন। যথা—

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী রধরসীধুনা প্যায়য়স্ব নঃ॥

"হে পদ্ম-লোচন! তোমার মধুর বাণী সুন্দর পদাবলী সমলঙ্কৃতা এবং বুধজনের মনোজ্ঞা, এই বাণী দ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে। হে বীর! আমরা তোমার কিঙ্করী, মুগ্ধ হইয়া মারা পড়ি, অতএব অধরামৃত প্রদান করিয়া জীবিত কর।"

প্রভু এবার উঠিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; আবার এলাইয়া পড়িলেন। রাজা যখন বুঝিলেন যে, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রভু কর্ণ পাতিতেছেন, তখনি আবার পড়িলেন। যথা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

"হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, পুণ্যবানেরা তদীয় কথামৃত পান করাইয়া তাহা নিবারণ করিয়াছেন। ফলতঃ

তোমার কথামৃত প্রতপ্ত জনের জীবন স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ জনও তাহার স্তব করেন, তাহাতে কামকর্ম্ম নিরস্ত হয়, অপর তোমার নামামৃত শ্রবণ মঙ্গলপ্রদ এবং শান্তিদায়ক। পৃথ্বীতলে যে সকল ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাহা পান করেন, নিশ্চয় তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বহু বহু দান করিয়াছিলেন। হে প্রভু! যাঁহারা তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন, তাঁহারা যখন ধন্য হইলেন তখন দর্শনকারীদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে দর্শন দাও।"

প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, উঠিয়া "ভূরিদা, ভূরিদা" অর্থাৎ "তুমি আমাকে অনেক দান করিলে"* বলিয়া, রাজাকে বাহুপসারিয়া ধরিলেন। রাজারে বলিতেছেন, "কে তুমি হে পরম সুহৃৎ, অকস্মাৎ কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়া আমার তৃষিত হৃদয় শীতল করিলে? তুমি আমাকে বহু দান করিলে, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার দিবার কিছুই নাই, এস, তোমাকে আলিঙ্গন দান করি।" ইহাই বলিয়া রাজাকে হৃদয়ে করিয়া, "তব কথামৃত" শ্লোক পড়িতে পড়িতে উভয়ে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন উভয়ে উভয়ের বাহু দ্বারা পরিরম্ভিত হইয়া কিছু কাল অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই সুযোগে প্রভু হইতে শক্তি নির্গত হইয়া রাজার প্রত্যেক ধমনি দিয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া ফেলিল, তাঁহার মলিন ধমনি গুলি এইরূপে পরিষ্কৃত হইল। উহা দিয়া এখন বিদ্যুল্লতার ন্যায় আনন্দ-লহরী খেলিতে লাগিল। আর তাহার ফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। রাজা যেমন পাত্র,—তিনি যত খানি শক্তি ধরিতে পারেন, যখন তত খানি পাইলেন, তখন প্রভু চেতন পাইলেন। পাইয়া, রাজাকে ফেলিয়া আবার রথ দর্শনে দৌড়িলেন, সম্রাট যেমন তেমনি পড়িয়া থাকিলেন। যথা—

(প্রভু) আনন্দে আবেশে আছে বাহ্য নাহি জানে।
কারে আলিঙ্গিয়া ছিল তাহা নাহি মনে॥
প্রভু সঙ্গে ধাইল সকল ভক্তগণ।
রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেমে অচেতন॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

রাজা এইরূপ অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময়—

গোপীনাথ আচার্য্য গেল গজপতি স্থানে।
রাজারে উঠায়ে কহে মধুর বচনে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

গোপীনাথ রাজাকে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু ও ভক্তগণ উপবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা দূর হইতে প্রভুকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া ভক্তগণের পদতলে আসিয়া পড়িলেন। কিরূপ, না, যেরূপ নব বিবাহিতা বালিকা স্বামীর বন্ধুগণের চরণে পড়িয়া প্রণাম করিয়া থাকেন। রাজার অঙ্গ পুলকে আবৃত হইয়াছে, প্রতি অঙ্গ প্রেমে তরঙ্গায়মান হইতেছে, নয়ন দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে। সকলে রাজার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও বিনীত ভাবে ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন, আসিয়া যত্ন করিয়া প্রভুকে প্রসাদ পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একটুকু পরেই রাজার এক ভোগ প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সমস্ত উপহার দ্রব্য সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও বাণীনাথ লইয়া আসিলেন। পাঠক মহাশয়! প্রভুর ভোগের নিমিত্ত কি কি প্রসাদ আসিল, একবার কি শ্রবণ করিবেন? যদি প্রভুর উপর আপনার মমতা থাকে, তবে অবশ্য এই রাজযোগ্য প্রসাদের তালিকা দেখিলে আপনি আনন্দিত হইবেন। তাহাই ভাবিয়া, গৌরাঙ্গ ভক্তের নিমিত্ত কি কি প্রসাদ আসিয়াছিল,তাহা শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ বিবরিয়া বলিতেছেন। যথা—

ছানা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর।
বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃত মণ্ডা দোনার বড়ি আর কর্পূর কুলি।
সরামৃত সর ভাজা আর সরপুলি॥
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূর মালতী।
ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ড সার।
রিয়ড়ি কদমা তিলা খাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল ফুল পত্র যুক্ত খণ্ডের বিকার॥

দধি দুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি॥
লেবু কোলি আদি নানা প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥

এই সব দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি চিনিতে পারিলাম না। তবে একটা বুঝিলাম যে পূর্ব্বেও এখনকার ন্যায় শর্করার নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত হইত। রাজার উপহার দ্রব্যে অর্দ্ধ উপবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। উহার দর্শনে প্রভু পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কেন?

এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥ (চরিতামৃত)

প্রসাদের সঙ্গে পাঁচ সাত বোঝা বৃহৎ কেয়াপত্রের দোনা আসিল। ভক্তগণের বড় পরিশ্রম ও ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়া প্রভু সকলকে উদরপূর্ত্তি করিয়া ভুঞ্জাইবেন। সেই আনন্দে তখন-কষ্টে শ্রষ্টে সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া ভক্তগণকে ভুঞ্জাইতে ব্যস্ত হইলেন। ভক্তগণকে বসাইয়া এক এক ভক্তের সম্মুখে প্রভু আপনি দশ দশ দোনা রাখিলেন। তার পরে আপনিই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মনে ভাবুন যে, আমরা শ্রীভগবানের স্থানে গিয়াছি, আর শ্রীভগবান আমাদিগের আতিথ্য ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান আপনি পাত পাতিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান শেষে আমাদিগকে বলিলেন, "আপনারা বসুন।" শ্রীভগবান বিনয়িতার খনি। তিনি ভক্তগণকে এইরূপ সম্মান করিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তিনি সে দিবস গৃহকর্ত্তা অতিথি সেবা করিতেছেন। ভক্তগণ বসিতেছেন না, শ্রীভগবান শ্রীহস্তে ভক্তগণের হাত ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। এই কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ তাড়াতাড়ি বসিয়া গেলেন। তখন শ্রীভগবান নিজ হস্তে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। শ্রীভগবানের ভাণ্ডার অক্ষয়, আবার চরিত্র উদার, আতিথ্যের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিতে আপত্তি নাই। শ্রীহস্তে এক এক জনের পাতে দশ বার জনের আহারীয় দ্রব্য দিতেছেন। প্রসাদের সুগন্ধে নাসিকা মাতিতেছে। মনে ভাবুন, যেন স্বয়ং শ্রীমতী রাধা উহা রন্ধন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণ পাতে হাত দিতেছেন না, কারণ শ্রীভগবান

বসেন নাই, তিনি না খাইলে সকলে কিরূপে ভোজন করিবেন। শ্রীভগবান পরিবেশনে ব্যস্ত, হঠাৎ দেখিলেন ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া আছেন। যদিও শ্রীভগবান অন্তর্য্যামী, সমস্ত জগতের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তখন মনুষ্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তখন অন্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী হইয়া বেড়াইলে মনুষ্যে তাঁহার সহিত কিরূপে গোষ্ঠী করিবে? কাজেই তখন অতি নিরীহ সরল প্রকৃতি হইয়াছেন। তাই, ভক্তগণ কেন ভোজন করিতেছেন না, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনারা বসুন, সেবা করুন, বিলম্ব করিতেছেন কেন? তখন এক জন মর্ম্মিভক্ত বলিলেন, "ঠাকুর! বুঝিতেছেন না, তুমি না বসিলে ইঁহারা কিরূপে ভোজন করিবেন।" তখন ঠাকুর লজ্জা পাইয়া আপনি বসিলেন।

এই যে গোপীগণ শ্রীগোলোকে যেরূপে নবীন নাগরের সহিত খেলা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত সেই রূপ খেলা করিতেছেন। প্রভু ভোজনে বসিলেন, তখন স্বরূপ দামোদর গোপীনাথ প্রভৃতি পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবার আকণ্ঠ পূরিয়া॥ (চরিতামৃত)

যখন ভক্তগণের সেবা হইয়া গেল, তখন সহস্র লোকের আহারীয় উদ্বর্ত্ত হইল। প্রভু কাঙ্গালীদিগকে ডাকাইলেন। সহস্রেক কাঙ্গালী আইলে প্রভু গোবিন্দ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রভু বলেন "হরিবোল" আর সহস্র কাঙ্গালে হরিধ্বনি করিতে লাগিল!

হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়। (চরিতামৃত)

কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া, ও তাহাদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ ভক্তি-ধন দিয়া প্রভু ও তাঁহার নিজগণ আরাম করিতে লাগিলেন।

নারিকেল-শাসন বনের ভোগকার্য্য সমাধা হইলে, গৌড়ীয়গণ আবার রথের দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু রথ চলেন না, গৌড়ীয়গণ প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, তবু রথ চলিল না।

প্রভুর কৃপা পাইয়া রাজা আনন্দে মধ্যাহ্নক্রিয়াদি করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এমন সময় অপরাহ্নে সংবাদ পাইলেন যে, রথ চলিতেছেন না। মনে করুন রথ না চলা বড় দোষের কথা। ইহাতে এক

প্রকার বুঝা যায় যে, যাঁহার রথ, তাঁহার কিছু অপরাধ হইয়াছে। রাজা এই দুঃসংবাদ শুনিয়া পাত্র মিত্র সঙ্গে করিয়া নারিকেল-শাসন বনে, যেখানে রথ আবদ্ধ আছে, দৌড়িয়া আসিলেন। প্রথমে রাজা বড় বড় মল্ল-গণকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন। আপনি মহামল্ল, আপনিও ধরি-লেন। কিন্তু মহাচেষ্টায়ও রথ চলিলেন না। তখন রাজা আরও ব্যস্ত হইলেন। মল্লগণ অপারক হইলে, রাজা বড় বড় হাতী আনাইলেন। রথে হাতী যুড়িয়া দিয়া রথ লড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রথ চলেন না। রাজা ক্রমেই ব্যাকুল হইতেছেন। শেষে মাহুতগণ হস্তিকে প্রহার করিতে লাগিল, হস্তি চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু রথ চলেন না। পরিষ্কার পথে রথ রহিয়াছেন, ঐ রথ অনায়াসে সেই পথে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, এখন কেন রথ চলেন না? রাজা নিশ্চিৎ বুঝিতেছেন যে, তাঁহার উপর শ্রীজগন্নাথ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এই কথা, শুধু রাজা নয়, যাঁহারা এই কাণ্ড দর্শন করিতেছেন, সকলেই ভাবিতেছেন।

এই যে রথ চলিতেছেন না, রাজা যে ব্যাকুল হইয়া উহা চালাইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা প্রভু তাঁহার গণ লইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। রাজা যখন দেখিলেন যে রথ চালান তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইল তখন নিরাশ হইয়া অতি কাতরে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রভুও অমনি ভয় কি এই যে আমি আছি নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। প্রভু চলিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন। প্রভু হস্তি সমুদায়কে রথ হইতে ছাড়া-লেন। রথের যে রজ্জু উহা নিজ জনের হস্তে দিলেন। আপনি রথের পশ্চাতে গমন করিলেন, করিয়া মস্তকস্পর্শ করিয়া উহা ঠেলিতে লাগি-লেন। রথ অমনি হড় হড় করিয়া চলিল। যাঁহারা দড়ি ধরিয়া রথ টানিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন যে তাঁহাদের শক্তিতে রথ চলিতেছে না, উহা যেন নিজ শক্তিতে চলিতেছে। তখন লোকে কাজেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল ও প্রভুর জয়-ঘোষণা করিতে লাগিল।

জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥ (চরিতামৃত)

অগ্রে বড়জানা, অর্থাৎ রাজকুমার প্রভুর কৃপাপাত্র হইয়াছেন। এখন রাজা কৃপাপাত্র হইলেন। রাজার এইরূপে গৌর-ধ্যান গৌর-জপ গৌর-সাধন ভজন হইল। এমন কি, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে যে চৌষট্টি মহান্ত আছেন, প্রতাপরুদ্র তার মধ্যে এক জন। প্রতাপরুদ্রের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক না হইলে শ্রীগৌর-প্রসঙ্গ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ, অসম্পূর্ণ থাকিত। শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতির মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রী চরিতামৃতে প্রভুর অন্ত্য-লীলা লিখেন। চন্দ্রোদয় নাটক না হইলে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নীলাচলগমনের পূর্ব্বকার লীলা অনেক গুপ্ত থাকিত। এই চন্দ্রোদয় নাটক প্রতাপরুদ্র স্বয়ং লেখাইয়াছিলেন। প্রভু গোলোকধামে গমন করিলে প্রতাপরুদ্র শোকে অভিভূত হইলেন। চন্দ্রোদয় নাটক প্রণেতা শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর বলিতেছেন যে, প্রতাপরুদ্র শোকে অতি কাতর, কিন্তু তবু না আসিলে নয়, তাই রথের পথে স্বুবর্ণ মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জন করিতে ও চন্দন ছিটাইতে আসিয়াছেন। যথা—

শ্রীচৈতন্য ভগবান কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বিরহ বেদনায় রাজা আকুল পরাণ॥
সেবা অধিকার আছে না আইলে নয়।
তে কারণে যাত্রা কালে করিল বিজয়॥
স্বুবর্ণ মার্জ্জনী লইয়া পথ মাজি যায়।
প্রভু লাগি কান্দে পথ দেখিতে না পায়॥
এ মতি প্রতাপরুদ্র ধৈর্য্য যত করে।
বিরহে ভাঙ্গয়ে ধৈর্য্য রাখিতে না পারে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

রাজা ঐ সেবা করিয়া প্রভুর কৃপা-পাত্র হইয়াছেন। রাজা প্রত্যহ যখন রথ-যাত্রার পূর্ব্বে ঐ সেবা করিতেন, তখন আহ্লাদসাগরে ভাসিতেন। কারণ তিনি সেবা করিতেন, আর প্রভু দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তিনি রাজা, তাহার নীচ সেবা দেখিয়া প্রভু বড় খুসী হইতেন, রাজার এই বড় আনন্দ, প্রধান সুখ। কিন্তু আজ প্রভু কোথায়? কে তাঁহার সেবা দর্শন করিবে, কাহার দর্শনে সুখী হইয়া তিনি সেই সেবা করিবেন? রাজা সেবা করিতে

গিয়াছেন; না গেলে নয়। দেখেন, যেখানে দাঁড়াইয়া প্রভু তাঁহার সেবা দর্শন করিতেন, সে স্থান শূন্য। তখন রাজা একেবারে ধৈর্য্য-হারা হইলেন। পথ মার্জ্জন করিতে যান, চোখের জলে পারেন না। তখন সেই বীর-পুরুষ পতিহীনা নববিয়োগিনী-যুবতীরমণীর ন্যায়, প্রভু যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সেই দিকে চাহিয়া, মার্জ্জনী হৃদয়ে করিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া, রোদন করিয়া উঠিলেন।

তখন পাত্র-মিত্রগণ সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। রাজা রামানন্দ প্রভৃতি মর্ম্মিবন্ধুগণ লইয়া বিরলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কবি কর্ণপুর বলিতেছেন যে—

নির্ব্বিঘ্ন হইয়া রাজা বসিলে বিরলে।
আমারে ডাকিয়া আনিলেন হেন কালে॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা কহেন আমারে॥

রাজা কবি কর্ণপূরকে বলিলেন, "প্রভুর কৃপাপাত্র কবি! দেখ সেই জগন্নাথ আছেন, মহামহোৎসব হইতেছে, সেই বাদ্য বাজাইতেছে, আনন্দের সমুদায় সামগ্রীই রহিয়াছে, কিন্তু—

মহাপ্রভু বিনা মোর সব লাগে শূন্য।
হায় কি উপায় করি মুই হত-পুণ্য॥

হে কবিবর! আমি প্রভুর বিরহবেদনা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি প্রভুর লীলা নাটকাকারে আমাকে দেখাও, আমি তাহাই দেখিয়া জীবন ধারণ করিব।"

এই চন্দ্রোদয় নাটকের সৃষ্টি হইল। রাজা প্রভুর একটী নাম রাখিয়াছিলেন "প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা।" অতএব জয় প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতার জয়, জয় প্রতাপরুদ্রের জয়!

এদিকে প্রভুর শক্তিতে রথ মুহূর্ত্ত মধ্যে গুণ্ডিচার দ্বারে গেল। শ্রীজগন্নাথ সিংহাসনে বসিলেন। প্রভু অমনি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যা হইল, সকলে আরতি দেখিলেন। তখন সকলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ উপবনে বাস করিলেন। এই মনোরম উপবনে রামানন্দ রায় তাঁহার জগন্নাথ বল্লভ নাটক রচিয়া রাজাকে দেখাইয়া ও শুনাইয়াছিলেন। যে কয়েক দিবস রথ সুন্দরাচলে রহিলেন, সেই কয়েক দিবস প্রভু আর বাসায় গমন করিলেন না, ঐখানে থাকিলেন। প্রভুর তৈজস পত্র কিছু অধিক

ছিল, তাহা নয়। এক জোড়া খড়ম, এক খানা কাঁথা, একটা জল পাত্র ও দু চারি খানা কৌপীন। সুতরাং প্রভুর রাত্রিবাস যেখানে সেখানে করিলেই হইত। প্রভু মধ্যাহ্নের নিমিত্ত উপবনে আগমন করেন, আর অধিক রাত্রি হইলে সেখানে শয়ন করিতে আইসেন, এবং সকল সময়েই সুন্দরাচলে শ্রীজগন্নাথ দেবের সম্মুখে কি অন্যান্য উপবনে ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করেন। তখন প্রভুর মনের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভুর দেহে কখন রাধাকৃষ্ণ-ভাব একেবারে উদয় হয়। আবার কখন শ্রীকৃষ্ণ ও কখন শ্রীরাধা প্রকাশ হয়েন, কখন অতি সহজ জ্ঞান হয়, তখনও কিন্তু তাঁহার আবেশ একেবারে যায় না। এই সুন্দরাচলে প্রভু দিব্য সচেতনে আছেন, ভক্তগণের সঙ্গে হাস্য কৌতুক কি তত্ত্ব আলাপ করিতেছেন, এমন কি ভক্তগণের গার্হস্থ্য কথা লইয়াও অল্প স্বল্প চর্চ্চা করিতেছেন। তবু মনে একটি অটলবিশ্বাস রহিয়া গিয়াছে। সেটী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, আসিয়া শ্রীমতী রাধা ও তাঁহার সখীগণ লইয়া বৃন্দাবন বিহার করিতেছেন। প্রভু এই ভাবে আনন্দে বিভোর। তাঁহার আর কৃষ্ণ-বিরহ নাই, আর কৃষ্ণের লাগি ক্রন্দন নাই, দিবানিশি আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপ হইতে দুই শত ভক্ত আসিয়াছেন, নীলাচলেও শ্রীগৌরাঙ্গের বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ইচ্ছা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, ও সেই সঙ্গে ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রভুর সঙ্গে পুরী ভারতী স্বরূপ প্রভৃতি দশ কুড়ি জন সন্ন্যাসী আছেন। প্রভুর যেখানে নিমন্ত্রণ, সেখানে তাঁহাদেরও নিমন্ত্রণ। এখন সেই দলে নবদ্বীপের ও নীলাচলের ভক্তগণ মিশিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে দুই চারি শত লোকের আয়োজন করিতে হয়। রথের যে নয় দিবস জগন্নাথ সুন্দরাচলে রহিলেন, তাহা নয় জন মুখ্য ভক্ত বাটীয়া লইলেন। এক এক দিনে এক এক জন, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার লইলেন। ইহাঁরা সকলে গৌড়বাসী। ভক্তগণ চারি মাস নীলাচলে থাকিবেন, এই চারি মাস একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়া লইলেন। তাহাতেও আঁটিল না, তখন এক এক দিনে দুই তিন জন নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার পাইলেন। প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল, কোন কোন দিনে দুই তিন মহোৎসবও হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। সেই সঙ্গে ভক্ত-

গণও অবশ্য ভাসিতেছেন। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সকলে জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন, সেখানে মধুর মধুর নৃত্য গীত হইতে লাগিল। মধুর বলি কেন, যেহেতু শ্রীশ্যামসুন্দর এখন বৃন্দাবনে। গীত সমস্ত সেই ভাবের।' সেই আহ্লাদে টলিতে টলিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানের নিমিত্ত চারি শত ভক্ত চলিলেন। এই চারি শত ভক্ত একেবারে জলে ঝম্প দিলেন। প্রভুর ধ্রুব বিশ্বাস যে যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন। ভক্তগণের অনেকেরই সেই ভাব। ইহাদের মধ্যে পতিত-পাবন অদ্বৈত আচার্য্য আছেন, অতি বিজ্ঞ সার্ব্বভৌম আছেন, অতি দীন হরিদাস আছেন, অতি জ্ঞানী পরমানন্দ পুরী আছেন, অতি ভাল-মানুষ গদাধর আছেন, অতি রুক্ষ দামোদর আছেন, কিন্তু সকলেই মহাচাঞ্চল্য আরম্ভ করিলেন। তখন অদ্বৈতআচার্য্য জীবের দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, পরমানন্দ তাঁহার ধ্যান ছাড়িয়া দিলেন, আর দামোদর তাঁহার শাসন শিথিল করিলেন। সকলে ব্রজবালকের ন্যায় জল খেলা করিতে লাগিলেন। যদি একটী পাগল জলের মধ্যে সন্তরণ কি ক্রীড়া করে, তবে চারি শত লোক উহা দেখিতে দৌড়াইয়া যায়। যদি চারি শত পাগলে এইরূপ জলে গণ্ডগোল আরম্ভ করেন তবে সে কি ব্যাপার হয় অনুভব করুন। একটী ভব্য লোকে জলে এরূপ পাগলামি করিলে বহুতর লোক রহস্য দেখিতে গমন করেন। কিন্তু এই চারি শত ভব্য লোক, প্রভু স্বয়ং, সেই ভুবন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম; বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দ রায় প্রভৃতি জল-ক্রীড়া করিতেছেন, কাজেই লক্ষ লক্ষ লোকে দর্শন করিতেছেন।

পূর্ব্বে ভোজনে ভজনের কথা বলিয়াছি, এখন জলক্রীড়ায় ভজনের বিষয় অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই প্রভুর চারি শত ভক্ত, ইহারা প্রায় সকলেই গৃহী, অনেকেই ধনসম্পন্ন, সকলেই খ্যাতাপন্ন লোক। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাসের অধিক দেশ ছাড়িয়া প্রভুর সঙ্গে বাস করিতেছেন। ইহাদের স্ত্রী পুত্র বাড়ী রহিয়াছে, ইহারা তাহা-দিগকে ভুলিয়া দিবানিশি কেবল প্রেমানন্দে আছেন। প্রত্যূষে স্নান ও দর্শন, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে জলক্রীড়া, তাহার পরে পুলিন-ভোজন, সারা দিন কীর্ত্তন, তাহার পরে অপরাহ্নে বিবিধ উদ্যানে মধুর নৃত্য গীত। সন্ধ্যাকালে আবার কীর্ত্তন, আবার ভোজনে ভজন। এইরূপে চারি শত লোকে চারি মাস দিবা নিশি কেবল প্রেমানন্দে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। প্রেমের হিল্লোলে

ভক্তগণের দিবা নিশি পর্য্যন্ত প্রভেদ রহিত হইয়া গেল। কোথায় কবে কে শুনিয়াছেন যে, চারি শত লোকে এইরূপে চারি মাস অহরহ কেবল কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে মত্ত রহিয়াছেন? আবার এ ভজনে ত্যাগ নাই, যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, তবে ভজন কি লইয়া,—না, স্নান লইয়া, আহার লইয়া, নৃত্য গীত লইয়া, উদ্যান ভ্রমণ লইয়া। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে কোন জীবের প্রবৃত্তি ধ্বংসের প্রয়োজন নাই, উহা সমুদায় কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সব প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, নতুবা শ্রীভগবান উহা দিতেন না। আর সমুদায় বৃত্তির সদ্ব্যবহার শিক্ষাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই চারি শত লোকে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ঝাঁপ দিলেন। সকলের তখন শ্রীকৃষ্ণের রাখালগণের সহিত জল-ক্রীড়ার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের তখন লজ্জা নাই, গুরুজন ভয় নাই। জলে যত প্রকার রহস্য হইতে পারে তাহা হইলে, পরে জল-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধ হইল নিতাই ও অদ্বৈতে। অদ্বৈত হারিলেন, হারিয়া নিতাইকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। গদাধরের গুরু প্রেমনিধি ও সরূপে যুদ্ধ বাধিল। সমান সমান হইল। মুকুন্দ ও মুরারিতে বাধিয়া গেল, উভয়েই বৈদ্য। বৃদ্ধ শ্রীবাসের সহিত নবীন গদাধরের মহা সমর হইল। শেষে রামানন্দে ও সার্ব্বভৌমে ঘোর রণ বাধিয়া গেল। এই দুই জনার উড়িষ্যার রাজার নিচেই পদ। ইঁহাদের চাপল্য দেখিয়া উড়িষ্যা-বাসিগণ,—যাহারা তীরে দাঁড়াইয়া এই জল-কেলি দেখিতেছিল,—একেবারে অবাক হইল। প্রভু দর্শকগণের মনের ভাব বুঝিয়া গোপীনাথকে বলিতেছেন, "গোপীনাথ! ভট্টাচার্য্য ও রামরায়কে একটু শান্ত হইতে বল। উভয়ে পরম পণ্ডিত ও গম্ভীর, লোকে দেখিয়া কি বলিবে?" গোপীনাথ বলিলেন, "ঠাকুর! ভুবন বিখ্যাত সার্ব্বভৌম ঠাকুরের এই বাল-চাপল্য, ইহা তোমার কৃপার সাক্ষী। কি ছিলেন আর এখন বা কি হইয়াছেন! ইঁহারা তোমার কৃপায় ভাসিয়া যাইতেছেন।" প্রভু স্বয়ং করিলেন কি না, শ্রীঅদ্বৈতকে জলের উপরে পৃষ্ঠাবলম্বন করাইয়া শয়ন করাইয়া, আপনি তাঁহার হৃদয়ের উপর সেইরূপ পৃষ্ঠাবলম্বন করিয়া শয়ন করিলেন। এইরূপ করিয়া জলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সন্তরণের মধ্যে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি হইতেছে, আবার জলে হাত ধরাধরি করিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য হইতেছে।

স্নানের পরে সকলে উদ্যানে আসিলেন, আসিয়া ভোজনে বসিলেন। প্রত্যহ এক উদ্যানে মহোৎসব হয় তাহা নয়, নূতন নূতন স্থানে। যেহেতু সেখানে, মহারাজের কৃপায়, বহুতর উপবন পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। চারি-শত ভক্ত ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে মহোৎসব-কর্ত্তা সকলকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া সকলে বন-বিহার করিতে চলিলেন। এই উপবন কিরূপ না, ইহাতে—

নব-জাতি-কুন্দ-করবীর যূথিকা-
নব-মালিকা-ললিতমাধবীচয়ৈঃ।
বকুলৈঃ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ-
পরিতঃ সমাবৃতমমন্দবিভ্রমং॥ (চৈতন্যচরিত-কাব্য)

অভিনব জাতি, কুন্দ, করবীর, যূথিকা, নবমল্লিকা, মনোহর মাধবী সমূহ, বকুল, চম্পক, রসাল ও শিশু বৃক্ষ সমাবৃত উপবনে ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবেশ করিলেন।

বৃক্ষ বল্লি প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥ (চরিতামৃত)

উপবনে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মনে বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হইল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই বৃন্দাবনে প্রভু গিয়াছেন, তাঁহার মনের এই ভাব। তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও লতার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের গাঢ় মমতা উপস্থিত হইল।

বিলসৎ-কলকণ্ঠ-কাকলীং,
কলয়ন্ কোমল চিত্তবৃত্তিকঃ।
মধুরং মধুপোৎকরধ্বনিং,
শ্রবণেনৈব পিবন্ বিরাজতে॥ (চৈতন্যচরিত)

তাঁহারা সকলে বৃন্দাবন-বাসী, তাঁহারা কাজেই তাঁহার নিজ-জন। কোকিল কুহুরব করিতেছে, ভৃঙ্গ গুণ গুণ করিতেছে। প্রভুর ভাব যে, সকলেই বৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছেন।

প্রতি ভূরুহমূলমুল্লসন,
প্রতিবল্লি প্রতিকুঞ্জ মঞ্জসা।
প্রতি সৈকতরঞ্জিত স্থলং
বিলসন্ ভ্রাজতি তত্র তত্র সঃ॥ (চৈতন্যচরিত)

প্রভু এইরূপে প্রতিকুঞ্জ, প্রতিলতা, প্রতিবৃক্ষ, যেন তাঁহারা

তাঁহার পরিচিত, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে মুকুন্দের ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত। তিনি ও অন্যান্য ভক্তগণ সেই রসে মজিয়া গিয়াছেন। তখন বাসুদেব সেই আনন্দের তরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া মধুর গীত আরম্ভ করিলেন। মধুর গীত কাহাকে বলি, না, যাহার সমুদয় অঙ্গ, মিলন, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি শুভদ্বারা গঠিত। যথা বংশী-বদনের এই গীত, বংশী-বদন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাইত।

মধুর মধুর বংশী বাজে বনে। ধ্রু

পরমামৃত সিঞ্চিত, ভেল ত্রিভুবন, গোকুলনাথ বেণু গানে। ইত্যাদি।

গীত শ্রবণে প্রভুর অঙ্গ এলাইয়া পড়িল, তখন আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

অষ্টভাবললিতং সতু যুগপৎ-
শ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিকলয়ন্।
আননর্ত্ত রভসাদবশ তনু-
র্গায়তোঽস্য মধুরং বহুরচয়ন্॥ (চৈতন্যচরিত)

এক এক বৃক্ষতলে প্রভু একা নৃত্য করিতেছেন, বাসুদেব একা গীত গাইতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে দেখেন সম্মুখে আর একটী বৃক্ষ, সেও তাঁহার সখী, তাঁহার কৃষ্ণের প্রিয় বস্তু। প্রভু ভাবিতেছেন যে, যেন সেই বৃক্ষটী মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। তখন এ বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া সেই বৃক্ষের তলে গমন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বাসুদেবও নূতন পদ ধরিলেন। ভক্তগণও স্তব্ধ হইয়া এই লীলা দর্শন করিতেছেন। প্রত্যেক বৃক্ষ পত্রে, প্রত্যেক বৃক্ষ কুসুমে, প্রত্যেক লতায়, অবশ্য মাধুর্য্য আছে, কিন্তু সেই মাধুর্য্য আস্বাদ করিবার শক্তি সকলের নাই। আবার সেই মাধুর্য্য আস্বাদ করিবার যে শক্তি, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। প্রেম-ভক্তি ভজনে সেই মাধুর্য্য আস্বাদ শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। যখন হৃদয় ভক্তি কি প্রেমে আর্দ্র হয়, তখন এই আস্বাদ-শক্তি অতিশয় প্রবল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। তিনি কি দেখিতেছেন, তাহা তিনি জানেন, কিন্তু ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, ঠাকুরের নৃত্যে সমস্ত বন প্রফুল্ল হইয়াছে, বৃক্ষ ও লতা কুসুমিত হইয়াছে, প্রত্যেক কুঞ্জ কুসুমাবৃত হইয়াছে, ও তাহাতে ভৃঙ্গগণ বসিয়া উন্মত্ত হইয়া মধু পান করিতেছেন!

গৌর অবতারে নৃত্যকারী দুইজন, সুন্দর পুরুষ চারিজন। সুন্দর পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার নীচে শ্রীগদাধর, তাঁহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর ও রঘুনন্দন। নৃত্যকারীর মধ্যে দুই জন প্রধান। প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রীবক্রেশ্বর। অতএব নৃত্যে ও সৌন্দর্য্যে বক্রেশ্বর অদ্বিতীয়, প্রভুর ভক্ত মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এই বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিলে অতি বড় পাষণ্ড, অতি বড় পাপী, ও অতি বড় নাস্তিক, শ্রীভগবদ্ভক্তি কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হইতেন। বক্রেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম্মী-ভক্তের প্রধান এক জন। ইহাঁর মহিমা কি বলিব, ইনি নীলাচলে প্রভুর গাদি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁ হইতে নিমানন্দ সম্প্রদায় প্রচলিত হয়। ইহাঁরা নিমাইপণ্ডিত ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করেন। ইহাঁরা মাধুর্য্য উপাসক, তাই প্রভুর লীলার মধ্যে মাধুর্য্য ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই বক্রেশ্বরকে পার্শ্বে দেখিলেন, তখন তাঁহাকে নৃত্য করিতে বলিলেন। ঠাকুর স্বয়ং গীত ধরিলেন। ঠাকুর স্বয়ং গাইতে আরম্ভ করিলে, স্বরূপাদি তাঁহার দোসর হইয়া সঙ্গে গাইতে লাগিলেন।

প্রভুর সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনিয়া গায়।
দিক্‌বিদিক্ নাই প্রেমের বন্যায়॥ (চরিতামৃত)

বক্রেশ্বর নয়ন-রসায়ণ মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেছেন, প্রভু মুগ্ধ হইয়া অতি প্রেমে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আবার নৃত্য দেখিতে দেখিতে বক্রেশ্বরের প্রতি এত আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। যথা চৈতন্য-চরিত কাব্যে—

ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরং সরভস মনুচুম্বতি শ্রীযুতঃ।
ক্ষণমপি লঘু বিন্যসন্ রাজতে সুমধুরুচির পাদপদ্ম দ্বয়ং॥

শ্রীযুত গৌরচন্দ্র সহর্ষে কখন বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন, কখন বা সুমধুর পাদপদ্মদ্বয় ভূতলে শীঘ্র শীঘ্র বিন্যাস করত শোভা পাইতেছেন।

ক্ষণমপি পরিতো মুহুর্বিভ্রমং সচ পরিরভতেঽথ তং ভূয়শঃ।
লঘু লঘু মধুরং কলং গায়তি স্মিত রুচির রুচাক্ষণং দীপয়ন্॥

গৌরচন্দ্র কখন মুহুর্মুহু বিবিধ বিলাস বিস্তার করতঃ পুনঃ পুনঃ সেই বক্রেশ্বরকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং সুমধুর হাস্যরুচিতে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্দীপ্ত করিয়া লঘু লঘু সুমধুর অস্ফুট স্বরে গান গাইতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ মর্ম্মিভক্তগণের গলা ধরিয়া তাঁহাদের মুখচুম্বন করিতেন, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার ভক্তে কিরূপ প্রীতি ছিল তাহা বুঝা যাইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার এই ভক্তগণকে প্রেমে চুম্বন দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, জীবের প্রতি শ্রীভগবানের কত ভালবাসা। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া, কেবল ভক্তচূড়ামণি ভাবেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে কত প্রেম আছে। যেহেতু ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিন্দুমাত্র প্রেম পাইয়া থাকেন।

হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মীবিজয় উৎসব হইল। ইহা নীলাচলে হইয়া থাকে। সেই উৎসব দেখিতে প্রভু তথায় গমন করিলেন। উৎসব দেখিয়া আবার সুন্দরাচলে আসিলেন।

নবম দিবসে শ্রীজগন্নাথ নীলাচলে চলিলেন। আর প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া রথাগ্রে পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। রাজা পাত্র মিত্র সহ সঙ্গে চলিলেন। রথ চলিতে পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ এক খণ্ড ডোরী লইয়া কুলীনগ্রামনিবাসিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমারা এই ডোরী গ্রহণ কর। প্রতিবর্ষ তোমাদিগকে জগন্নাথের এই পট্টডোরী আনিতে হইবে। ইহার যজমান তোমরা হইলে। এই খণ্ড-ডোরী দেখিয়া দৃঢ়রূপে উহা প্রস্তুত করিবা।" কুলীন গ্রামের প্রধান সত্যরাজ খান বসু ও রামানন্দ বসু। তাঁহারা কুলীন কায়স্থ, কুলীন গ্রামে বাস করেন, মহা সম্ভ্রান্ত লোক। প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে শ্রীরামানন্দকে দ্বারকার নিকট কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। রামানন্দ পদকর্ত্তা তাহা বৈষ্ণবগণ অবগত আছেন। কুলীনগ্রামবাসিগণ এইরূপ প্রভু কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সেই অবধি বসু মহাশয়গণ জগন্নাথের পট্টডোরী যোগাইতেছেন, এই চারি শত বৎসর উহা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

প্রভু নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল।

একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তথা ভোজন করে ভক্ত সব॥

কখন ভক্তগণ প্রসাদ ক্রয় করিয়া লইয়া আইসেন, কখন বা আপনারা

জুটিয়া ঘরে অন্ন রন্ধন করেন। শ্রীঅদ্বৈত এক দিবস প্রভুকে পূজা করিবার নিমিত্ত তুলসী, পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য লইয়া আসিলেন। আসিয়া প্রভুকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীপদে তুলসী দিতে পারিলেন না, কারণ ঠাকুর উহা করিতে দিতেন না। তবে প্রভুকে পাদ্য অর্ঘ দিয়া, তাঁহার অঙ্গে চন্দন লেপিয়া, তাঁহার মস্তকে তুলসী দিয়া, তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিয়া, যোড় হস্তে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত স্তব করিতেছেন কিরূপে, না, প্রাণের সহিত। কিন্তু কৌতুকী প্রভু যেন সমুদায় কাণ্ডই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। অল্প কিছু পূজার দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিতে, প্রভু বলিলেন,"এই পর্য্যন্ত থাকুক, আমি এখন তোমাকে পূজা করিব।" ইহাই বলিয়া, যেমন মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ গালবাদ্য করিতে করিতে, শ্রীঅদ্বৈতের দিকে হাসিয়া হাসিয়া সংস্কৃতে এই মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। যথা—

"হে রাধে, হে কৃষ্ণ, হে রমে, হে বিষ্ণু, হে সীতে, হে রাম, হে শিব! তুমি যে হও নিত্য নমস্কার। তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার!"

শ্রীঅদ্বৈত নয়ন জলে "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিলেন, আর প্রভু হাসিতে হাসিতে "শিবায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ বুঝিলেন যে প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে ও শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন।

তাহার পরে শুভ জন্মাষ্টমী আইলে প্রভু গণসহ উৎসব করিলেন। এই মহোৎসবে প্রতাপরুদ্র সমস্ত ভক্তগণকে নূতন বস্ত্র দিলেন। আর এই সময় প্রভুর মস্তকে জগন্নাথের প্রসাদী এক খানি বহু মূল্য বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। প্রভু ভাবে অচেতন, কিছু জানিতে পারিলেন না। তাহার পর রাম-লীলা আইল। প্রভু ভক্তগণ লইয়া সেই লীলার আস্বাদন করিলেন, তাহার পরে দীপাবলি ও রাস-লীলা হইল। চারি মাস ফুরাইল, ভক্তগণকে প্রভু বিদায় করিয়া দিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কথা আরম্ভ করিলেন।

ভক্তগণ একত্র হইলে, তাঁহারা যাইতেছেন ভাবিয়া, প্রভু বড় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার তনু খানি প্রেম দিয়া গড়া। তাঁহার বয়ঃক্রম মোট ২৭।২৮ বৎসর। বাল্যকালের সমুদায় খেলার সঙ্গী, গুরুজন, নিজজন ও শিষ্য লইয়া এই চারি মাস খেলা খেলিয়াছেন। প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গীগণের সঙ্গসুখে তিনি এত দিন নদীয়া ও সংসারবাস সুখ অনুভব করিয়াছেন।

এখন আবার সেই সন্ন্যাসী হইতেছেন! তবু সময় বুঝিয়া প্রভু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আমার বান্ধবগণ! তোমরা গৃহী, গৃহে গমন কর। তবে কৃপা করিয়া প্রতি বৎসর রথের সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিও, আমি সেই উপলক্ষে তোমাদিগকে দেখিতে পাইব।" সকলে এই কথা শুনিয়া নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রভুকে ফেলিয়া গৃহে গমন করেন ইহা কাহারও ইচ্ছা নয়, তখন সকলে স্ত্রী পুত্র গৃহ ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু যিনি গৃহী, তাঁহাকে প্রভু সংসারত্যাগ করিয়া থাকিতে দেন না। প্রভুর আজ্ঞা, অবশ্য সকলের গৃহে যাইতে হইবে। প্রভু একটু নীরব থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে বলিতেছেন, "আচার্য্য! তুমি কৃপা করিয়া মূর্খ, স্ত্রীলোক, চণ্ডাল প্রভৃতিকে কৃষ্ণনাম দিবা।" শ্রীঅদ্বৈত কৃতার্থ হইয়া সজল-নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রাঘবকে বলিলেন, "তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি তোমার নিকট বিক্রীত। ভক্তগণ! রাঘবের কিরূপ সেবা তোমরা শ্রবণ কর। অন্যান্য দ্রব্যের কথা থাকুক, তিনি কিরূপ নারিকেল ভোগ দেন, তাহা মনে করিলে আনন্দ হয়। তাঁহার বাড়িতে কত শত নারিকেল গাছ আছে, সেখানে নারিকেলের মূল্য পাঁচ গণ্ডা। কিন্তু যদি শুনেন যে, দশ ক্রোশ দূরে মিষ্ট নারিকেল আছে, তবে চারি পণ দিয়া, তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেন।"

মনুষ্য দুই প্রকারে নত হয়। নিন্দায় ও সুখ্যাতিতে। নিন্দায় যে জীব নত হয়, সে কষ্ট পাইয়া। সুখ্যাতিতে যে নত হয়, সে সুখ পাইয়া। প্রভু যে পরিমাণে রাঘবের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, তিনি সেই পরিমাণে আপনাকে প্রভুর সুখ্যাতির অনুপযুক্ত ভাবিতে লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া রাঘবকে বিদায় আলিঙ্গন দিলেন, রাঘব চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে প্রভু শ্রীখণ্ডের প্রতিনিধিগণ পানে চাহিলেন। তাঁহাদের সকলের প্রধান মুকুন্দ। তিনি গৌড়ীয় বাদশাহের চিকিৎসক, বাড়ী শ্রীখণ্ডে। তিনি নরহরির দাদা ও রঘুনন্দনের পিতা। নরহরি আকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেই তিনি বিহ্বল হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গেরও তিনি অতি প্রিয়তম। রঘুনন্দন অতি রূপবান পুরুষ, মদনের অবতার। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণকে লাড়ু খাওয়াইয়া ছিলেন, সে ঠাকুর অদ্যাপি অর্দ্ধভুক্ত লাড়ু হস্তে করিয়া শ্রীখণ্ডে

বিরাজ করিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি ঠিক বল দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতা, না রঘুনন্দন তোমার পিতা।" মুকুন্দ বলিলেন, "রঘু আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র।" প্রভু বলিলেন, "এ কথা ঠিক। যাহার কাছে ভক্তি শিক্ষা করা যায় সেই পিতা। শিশুকালেই রঘুনন্দন ভক্তের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। তবে ভক্তগণ, মুকুন্দের কথা শ্রবণ কর। ইনি গৌড়ের মুসলমান রাজার বৈদ্য। ইনি রাজ-সেবা করেন বটে, কিন্তু ইহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম গুপ্তভাবে থাকে, কেহ জানিতে পারেন না। এক দিবস রাজা উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া শ্রীমুকুন্দের কাছে নিজ পীড়ার কথা বলিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য ময়ূর-পুচ্ছের পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে আসিল। ময়ূরপুচ্ছ দেখিবা মাত্র মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল। আর অমনই তিনি উচ্চ টুঙ্গি হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেলেন! রাজা অতি ব্যস্ত হইয়া মুকুন্দকে ধরিলেন, প্রাণ আছে দেখিয়া রাজা বড় সুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত ব্যথা পাও নাই।" মুকুন্দ চেতন পাইয়া বলিলেন, "বড় একটা নয়।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অচেতন কেন হইলে?" মুকুন্দ বলিলেন যে, তাঁহার মৃগী ব্যাধি আছে। কিন্তু রাজার তাহা বিশ্বাস হইল না, যে হেতু প্রেমে অচেতন, ও মৃগী রোগে অচেতন, এ দুইয়ের বিভিন্নতা যে-সে বুঝিতে পারে, রাজাও বুঝিলেন।"

প্রভু আবার ভক্তগণকে রঘুনন্দনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারে পুষ্করিণী। তাহার তীরে কদম্ব-বৃক্ষে, কৃষ্ণের কৃপায় রঘুনন্দন প্রত্যহ একটি কদম্ব ফুল পাইয়া থাকেন, ও তাহা দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন শ্রীকৃষ্ণপূজা করিতে থাকুন, নরহরি ভক্তগণের সঙ্গে যেরূপ আছেন সেইরূপ থাকুন, তুমি মুকুন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, আর পরিবার প্রতিপালন কর।" শ্রীখণ্ডের গোস্বামিগণ জাতিতে বৈদ্য, তবু তাঁহাদের পদ অতি বড়। নরহরির গৌর-প্রেম, খণ্ডবাসিগণের সকল সম্পত্তির কারণ। নরহরি হইতেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বরাগের পদ পাইয়াছি। নরহরির ভজনীয় বস্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি নিজ গৃহে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। নরহরি হইতে ত্রিলোচন দাসকে, ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল পাইয়াছি। তাঁহা হইতেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও নরোত্তম ঠাকুর

মহাশয়। নরহরির বড় দুঃখ এই যে, সাধারণ লোকে প্রভুকে চিনিল না। তাঁহার মনের সাধ এই যে, প্রভুর লীলা বাঙ্গালায় লেখা হয়, এবং আপামর সাধারণ সকলে উহা পড়িয়া উদ্ধার হয়। তাঁহার এই আকিঞ্চনে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুই গ্রন্থে নরহরির সাধ মিটে নাই। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী রাখিয়া গিয়াছেন—

প্রভুর লীলা লিখিবে যে,
বহু পরে জন্মিবে সে।

অতএব সে কথা অনুসারে প্রভুর লীলা পরে লেখা হইবে। আমরা কেবল সেই লীলারূপ অট্টালিকার ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া গেলাম। শ্রীনরহরি জয়যুক্ত হউন, তাঁহা হইতে সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ জানিয়াছে।

প্রভু এইরূপ এক এক ভক্তের গুণ বর্ণন করিতেছেন, আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছেন। যাঁহার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, সেই ভক্ত মনে মনে ভাবিতেছেন যে, প্রভু অদোষদর্শী, তাই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতেছেন। কিন্তু তিনি অতি মন্দ, অথচ প্রভু তাঁহাকে এত ভাল বলিয়া মনে বিশ্বাস করেন, অতএব অবশ্য তাঁহার ভাল হইতে হইবে। এই সমুদায় মনের ভাবের মধ্যে প্রভুর করুণস্বরে ও তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়া ভক্তগণ তখনি প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র, সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি। সার্ব্বভৌম প্রভুকে আশ্রয় করিয়াছেন, নদিয়ায় থাকিয়া তাহা শুনিয়া বাচস্পতিও অবশ্য তাহাই করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছেন। এখন প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রভু সেই বাচস্পতির নিকট বিদায় লইলেন।

প্রভু কুলীনগ্রামবাসিগণের নিকট বিদায় চাহিলেন। বলিতেছেন, "তোমরা প্রতি বৎসর পট্টডোরী লইয়া আসিবে। হে কুলীনগ্রামবাসিগণ! তোমাদের গ্রামের কুকুরও আমার প্রিয়। গুণরাজ খান শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক যে গ্রন্থ করিয়াছেন, উহার আরম্ভে একটী কথা আছে। 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' আমি সেই কথায় তোমাদের বংশের হস্তে বিকাইয়া আছি।" এই কথা বলিলে, রামানন্দ ও গুণরাজের ভ্রাতা সত্যরাজখান, এই দুই জনে কৃতজ্ঞতা রসে মুগ্ধ হইয়া গললগ্নী কৃতবাস হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। সেই সময় তাঁহারা প্রভুকে একটী প্রশ্ন করিলেন। সেটী এই যে, বৈষ্ণব কাহাকে বলি। প্রভু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি কৃষ্ণ-

নাম করে সেই বৈষ্ণব। সে যদি দীক্ষা না পায়, কি পুরশ্চরণ না করে, তবু সে বৈষ্ণব। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ বাঙ্গালার প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলিয়া অনেকে বলেন।

শিবানন্দ সেনের দিকে চাহিয়া প্রভু বলিতেছেন, শিবানন্দ! তুমি আমার নিজ-জন, এই সমুদায় ভক্তগণকে প্রতিবর্ষে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়া থাক। তোমাকে আর একটী ভার দিব।" ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্তের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, "বাসুদেব গৃহী, ইহাঁর সঞ্চয় প্রয়োজন, কিন্তু উনি উদার চরিত্র। যে দিবস যাহা আইসে তাহা ব্যয় করিয়া ফেলেন। তুমি ইহাঁর সংসারের ভার লইবা, লইয়া যাহাতে ইহাঁর কিছু সঞ্চয় হয় তাহা করিবা।" এই কথায় পাঠক বুঝিতেছেন যে, শিবানন্দ সেনের বাড়ী (কাঞ্চন পাড়া) ও বাসু দত্তের বাড়ী এক স্থানে। তাহার পরে প্রভু বাসু দত্তের গুণ সহস্র বদনে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

বাসু দত্তের কথা কি বলিব? তিনি একটি বস্তু! নিরীহ, লাজুক, দয়ালু, ভক্ত,—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইলে, যত গুলি গুণ উপস্থিত হয়, সমুদায় তাঁহাতে হইয়াছে। প্রভু তাঁহার গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলে, বাসুদেব অতি লজ্জা পাইতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠ যদি নিকৃষ্টের সাধুবাদ করেন, তবে নিকৃষ্টের আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। ভাবিলেন যে, শ্রীভগবান তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন, অথচ তিনি অতি মলিন। ইহাতে তাঁহার নিতান্ত অপরাধ হইতেছে। তাঁহার ইহা অপেক্ষা দণ্ডও আর নাই। শ্রীভগবান তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছেন। সে ঋণ শোধের একমাত্র উপায় আছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া অমনি প্রভুর দুটি চরণ ধরিয়া পড়িলেন। বলিতেছেন, "প্রভু দয়াময়! তুমি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সমুদায় পার। তোমার জীবগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ। তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। তুমি এক কাজ কর। জীবের যত পাপ সমুদায় আমাকে দাও, আমি উহা লইয়া নরক ভোগ করি, আর তোমার জীব সমুদায় উদ্ধার পাইয়া সুখী হউক। জীবের দুঃখ দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি আমার দুঃখ মোচন কর। আর তুমি আমাকে যে এত কৃপা করিতেছ, সে ঋণ শোধ দিবারও ইহা ব্যতীত আমি আর অন্য উপায় দেখিতেছি না।"

ত্রিজগতে এরূপ প্রার্থনা কেহ কখন করিতে পারেন নাই। যদি শ্রীভগবানের কাছে এরূপ প্রার্থনা কেহ করেন, সে মুখে। কিন্তু বাসুদেব ভক্তশিরোমণি, তিনি যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া নিবেদন করিতেছেন। তাঁহার নিকট বাসুদেব ভণ্ডামি করিতেছেন, ইহা হইতে পারে না। ভণ্ডামি করিলে সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিরক্ত ব্যতীত মুগ্ধ হইতেন না। বাসুদেবের প্রার্থনা শুনিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য যেন স্তম্ভিত হইল। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া কি করিবেন, কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাসু প্রভুর চরণ ধরিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া, তাঁহার বর প্রাপ্তির নিমিত্ত ভঙ্গী দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন!

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া একটু চুপ করিলেন। তাহার পরে বাসুদেবের মনের ভাব বুঝিয়া, আপনার হৃদয়তরঙ্গ গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পারিলেন না। যে হেতু অশ্রু কম্প প্রভৃতি সমুদায় অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাব একেবারে তাঁহার শরীরে উপস্থিত হইল। ভক্তগণও তখন সকলে সেই সঙ্গে বিস্ময়ে, আনন্দে, ও কারুণ্য-রসে পরিপ্লুত হইয়া, কেহ রোদন, কেহ হাস্য, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া ভগ্ন-স্বরে বলিতেছেন, "বাসুদেব! তুমি যে প্রার্থনা করিলে, ইহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে, কারণ তুমি স্বয়ং প্রহ্লাদ, কৃষ্ণের পূর্ণ-কৃপাপাত্র।" ইহা বলিতে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, ভক্তের প্রার্থনা অন্যথা করেন না, তাঁহার পক্ষে সমুদায় জীব উদ্ধার করাও কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু তিনি তোমাকে এ দুঃখ কেন দিবেন? অবশ্য তিনি তোমার বাঞ্ছাপূর্ণ করিবেন। তবে তুমি যে উপায়ে বলিতেছ, সেরূপে নহে। কারণ তোমার মত ভক্তকে তিনি দুঃখ দিতে পারেন না।"

জীবগণ সাধন বলে কতদূর উন্নত হইতে পারেন, তাহার সীমা স্থির করা যায় না। যখন দেখিলাম যে, যীশু তাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে, "হে ভগবন্! এই মূর্খগণকে ক্ষমা কর" তখন ভাবিলাম ইহা অপেক্ষা ঔদাস্য আর হইতে পারে না। পরে যখন দেখিলাম হরিদাস বলিতেছেন যে, "হে ভগবন্! এই যে ইহারা আমাকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করিতেছে, ইহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু তবু ইহাদের

গতি কি হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি দুঃখ পাইতেছি, অতএব তুমি ইহাদিগকে কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।" তখন দেখিলাম যে এটী আরও বড় কথা। এখন দেখিতেছি যে, বাসুদেব সরল মনে সমুদায় জীবের পাপ আপন স্কন্ধে বহন করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। এরূপ কথা কখনও শুনি নাই। এরূপ কথা শুনিব মনে কখন উদয়ও হয় নাই। ইহা অপেক্ষা বড় কথাও অনমুভবনীয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, তাহা তাঁহার ভক্তগণের মাহাত্ম্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। কথা আছে, ফল দেখিয়া বৃক্ষের বিচার হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ শক্তিসম্পন্ন, তাহা তাঁহার ভক্তগণকে দেখিয়া বিচার করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পরে শ্রীবাসকে সম্বোধন করিবেন মনে করিয়া, তাঁহার মুখ পানে চাহিলেন। অমনি প্রভুর একেবারে শ্রীনবদ্বীপ স্ফূর্ত্তি হইল। শ্রীবাস তাঁহার পিতার বন্ধু, তাঁহার প্রতিবাসী, ও তাঁহার মাতৃ-সখী মালিনীর পতি। শ্রীবাসের বাড়ী তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার বৃন্দাবন। তখন তিনি যে নিমাইপণ্ডিত, নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ী ঘর আছে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী জীবিতা, যুবতী ঘরণী বর্ত্তমান, আর এ সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এখন বৃক্ষতলায় পড়িয়া আছেন, এ সকল কথা একবারে স্মরণ হইল। তাঁহার শৈশব ক্রীড়া, তাঁহার বিদ্যাবিলাস, তাঁহার গৃহ, ফুলের বাগান, তাঁহার মাতার সেবা, তাঁহার প্রিয়ার বিয়োগ দশা, এ সমুদায় পর পর মনে আসিয়া শ্রীনিমাইয়ের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।

শ্রীনিমাই তখন সাশ্রু নয়নে শ্রীবাসের গলা ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বল বল, আমার মাতা ত বেঁচে আছেন?" প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত কেহ কিছু শুনিতেন না, কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইতেন না, প্রভুর হৃদয়েও কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত আর কোন বস্তুর স্থান ছিল না। যদি কখন জননীর নাম করিতেন, সে ভক্তির ভাবে, স্নেহ-ভাবে নয়। প্রভুর যে তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভালবাসা আছে, তাহা কেহ জানিতে পারিতেন না। প্রভু সর্ব্বদাই মায়ার অতীত থাকিতেন। যিনি সর্ব্বদাই মায়ার অতীত, তিনি ক্ষুদ্র জীবের নিকট ভক্তি কি দয়া পাইয়া থাকেন, কিন্তু স্নেহ মমতা কি ভালবাসা প্রাপ্ত হয়েন না। তাই জীবের সহিত প্রীতি স্থাপন নিমিত্ত শ্রীভগবান মায়া লইয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ যদি চিরদিন মায়াতীত হইয়া থাকিতেন, তবে তিনি লোকের চিত্ত এরূপ হরণ করিতে

পারিতেন না। তাঁহার মুখে সংসারের কথা অতি বিরল বলিয়া মধু, হইতে মধু লাগিত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন "আমার মাতা বেঁচে আছেন?" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অতি মধুর মায়ারসে মুগ্ধ হইয়া সকলে কান্দিয়া উঠিলেন। শ্রীনিমাই বলিলেন, "আমি কি বাতুলতা করিয়াছি! এমন কি কেহ করে? আমার সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন কি ছিল? কৃষ্ণপ্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ, তাহার নিমিত্ত ত সন্ন্যাসের প্রয়োজন নাই? তাই এখন বুঝিতেছি যে, যখন আমি সন্ন্যাস লইয়াছিলাম তখন আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল।"

শ্রীপ্রভুকে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া সকলের অপেক্ষা দুঃখ শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার। কিন্তু প্রভু নীলাচলে, তাঁহারা নবদ্বীপে,—সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ পাইতেছেন। তবে তাঁহাদের দুঃখ এত অধিক কি? তাঁহারা দেখিতেছেন যে তাঁহাদের নিজজন যে শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি ত্রিজগৎ পূজিত হইতেছেন, ইহাতেও তাঁহাদের দুঃখের লাঘব হইতেছে। অপর প্রভু যদি সন্ন্যাসী না হইতেন, তবে কি জীবে তাঁহার ধর্ম্ম লইতে পারিত?

নিমাই বলিতেছেন, "আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বৃদ্ধা জননীর সেবা করা, আমি তাহা না করিয়া এ কি করিতেছি! আমি কাহার হাতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিলাম? এ ঘোর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া আমি আমার অতি সরলা, অতি বৃদ্ধা, অতি স্নেহময়ী জননীর পাদপদ্ম সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। হে ভক্তগণ! আমার জননীর ঋণ আমি কি শোধ দিতে পারি? আমার প্রতি তাঁহার যে স্নেহ তাহার কি অবধি আছে? যে দিবস গৃহে শালগ্রামের ভোগের নিমিত্ত একটু আয়োজন অধিক হয়, অমনই জননী "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ক্রন্দন করিতে বসেন। ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে ডাকেন, আর বলেন, 'নিমাই! তুমি ঘরে নাই, এ সব দ্রব্য আমি কাহাকে দিই? তুমি মোচার ঘণ্ট বড় ভালবাস, এ মোচার ঘণ্ট আমার কে খাইবে?' মা শোকে এইরূপে রোদন করেন, আমি এখানে নীলাচলে অস্থির হই! আমি জননীর ক্রন্দনে স্থির হইয়া ভজন করিতে পারি না।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীভগবান ভাব হইল। বলিতেছেন, "আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মুহুর্মুহু শ্রীনবদ্বীপে গমন করি, কিন্তু তবু তাহা পারি না। তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ বর্ণনা করা অসাধ্য। যখন আমাকে

দর্শন করেন তখন আনন্দসাগরে ভাসেন, আবার আমার অদর্শনে আমার দর্শন স্বপ্ন বলিয়া বোধ করেন। কখন বা আমি যাইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতই বসিয়া ভোজন করি, তখন তিনি সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া আমাকে ভোজন করান। তাহার পর আবার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, ভাবেন যে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই বিজয়াদশমী দিবসে আমি জননীর নিকটে ভোজন করিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত! এ সমুদায় কথা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিও। দিয়া, আমার হইয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা মাগিয়া লইও। বলিও আমি তাঁহার অবোধ শিশু, যদি না বুঝিয়া তাঁহাকে ত্যাগ রূপ মহা অপরাধ করিয়া থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমি তাঁহার আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করি।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্ষণকালের নিমিত্ত আবার নিমাই হইয়া বিহ্বল ভাবে 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও অধীর হইয়া সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

পুর্ব্বে বলিয়াছি যে জন্মাষ্টমী দিবসে প্রভুর যখন মহা আবেশ তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে এক খানি বহুমূল্য প্রসাদী বস্ত্র দিয়াছিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া বস্ত্রখানি দেখিলেন। দেখিয়া উহা লইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। তখন পরমানন্দপুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরী গোঁসাই তাঁহার গুরুস্থানীয়। জীবের ভক্তিপথ-শিক্ষাদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। পুরী গোঁসাই বলিলেন, "জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, উহা বরং জননী শ্রীশচী দেবীকে পাঠাইয়া দাও।" প্রভু শ্রীবাসের গলা ধরিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে কষ্টে শ্রষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পরে সেই বহু মূল্য প্রসাদী বস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহা আনাইলেন। আনাইয়া বহুবিধ প্রসাদের সহিত ইহা শ্রীবাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "পণ্ডিত! এই সমুদায় তাঁহার পুত্র নিমাই পাঠাইয়াছে বলিয়া জননীকে অর্পণ করিবে।" প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম পর্য্যন্ত করিলেন না। সন্ন্যাসীদের ঘরণীর নাম মুখে আনিতে নাই, কিন্তু তিনি প্রিয়াজীকে ভুলিলেন না! তাঁহাকে যে ভুলেন নাই তাহার নিদর্শনও তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। প্রভু আমার এখন কাঙ্গাল, জননীর নিকট আপনার স্ত্রীর নিমিত্ত বহুমূল্য শাটী পাঠাইতেছেন, ইহা মনে করিলে কাহার না হৃদয় দ্রব হইবে?

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরাগে ভজনা করেন, তাঁহারা অবশ্য তাঁহার কক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও ভজনা করেন। তাঁহারা প্রভুর

নবদ্বীপে এই বস্ত্র প্রেরণ কার্য্যে ইহাই অনুভব করেন যে, শচীদেবীর স্বর্ণ-সূত্রগ্রথিত বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে এই বস্ত্র প্রভু তাঁহার প্রিয়ার নিমিত্ত পাঠাইয়া ছিলেন। এ কথা বলি কেন, না তাঁহার ভুবনমোহন স্বামী, তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন নাই, না হইয়া আগ্রহ করিয়া স্বর্ণ-সূত্রগ্রথিত সাটী পাঠাইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সুখী হইবেন। আবার ভক্তগণ ঐরূপ এই কার্য্যের দ্বারা ইহাও ভাবিয়া থাকেন যে, প্রভুর ইচ্ছা ক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাটী পরাইয়া তাঁহার বামে বসাইয়া ভজন করিতে হইবে।

প্রভু বিদায় কালে চেষ্টা করিয়া ধৈর্য্য ধরিলেন। তবু তাঁহার বদন মলিন রহিল। হৃদয়ে ভক্ত-বিরহ দুঃখ খেলিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল। ভক্তগণ চারি মাস নীলাচলে থাকিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গৌরাঙ্গ আদেশ পেয়ে, নিতাই বিদায় হয়ে,
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম,
কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্ত্তনরসে ভোলা।
পাণিহাটী গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি,
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া, গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া,
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গতি দেখি, হইয়া করুণ আঁখি,
প্রেমরত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী,
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম কাঁদে; না ভজি নিতাই পদে,
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥

প্রভু যে একেবারে একা রহিলেন তাহা নয়। প্রভুর সঙ্গে গৌড়বাসিগণের মধ্যে সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ, সরূপ, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, অন্য হরিদাস, রামদাস, গদাধর দাস, বাসুঘোষ (পদকর্ত্তা) প্রভৃতি রহিলেন। শ্রীগদাধর যমেশ্বর টোটায়, ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়া, গোপীনাথের সেবা আরম্ভ করিলেন। সে ঠাকুর অদ্যাপি বিরাজিত। শ্রীনিত্যানন্দ সমস্ত নীলাচলে খেলা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন শ্রীমন্দিরে যাইয়া বলরামকে ধরেন, কখন ঠাকুরের মালা কাড়িয়া লইয়া নিজে গলায় রাখেন, সেবাইতগণ সচল জগন্নাথের অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দাদাকে ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। প্রভু বা কোথায়, নিতাই বা কোথায়? কখন নিতাইচাঁদ একেবারে নিরুদ্দেশ। শ্রীনিতাইয়ের কোন নিয়ম পালন নাই, যেখানে সেখানে প্রসাদ ভোজন কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করেন।

প্রভুর ভক্তভাবে, হৃদয়ে দুইটী ব্যথা,—কৃষ্ণ-বিরহ ও জীবের দুঃখ। শ্রীভগবান এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রভু, তবু তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ ও কঠিন জীবে ভুলিয়া রহিয়াছে, প্রভুর মনে এই অতি বড় দুঃখ। জীবে নানা কারণে দুঃখ পাইতেছে, এই নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে দারুণ দুঃখ। জীবে অনর্থক দুঃখ পাইতেছে, ইহাতে প্রভুর দুঃখ আরও অধিক। জীবে শ্রীভগবৎ চরণ আশ্রয় করিলেই তাহার দুঃখ যায়, কিন্তু নির্ব্বোধ জীবে তাহা না করিয়া দুঃখ পাইতেছে। এই কথা মনে হইলেই প্রভু বড় কাতর হয়েন। প্রভু সম্মুখে যদি কোন মলিন জীব দর্শন করেন, তবে কখন কখন এরূপ ব্যাকুল হয়েন যে, ধৈর্য্যহারা হইয়া একেবারে রোদন করিয়া উঠেন। যথা প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বাসুর পদ—

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥

যাহাতে জীবে হরিনাম গ্রহণ করে, করিয়া সুখী হয়, ইহা প্রভুর মনের নিতান্ত সাধ। প্রভুকে এক দিন এক জন ভদ্রলোকে নীলাচলে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। কৌতুকী প্রভু তাহাকে বলিতেছেন যে, তিনি এক নিয়ম করিয়াছেন। সেটী এই যে, যে লক্ষেশ্বর নহে তাহার গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ লয়েন না। যে ভাল মানুষ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন তিনি ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! লক্ষ কোথা পাবো, সহস্র নাই।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "আমি তাহাকেই লক্ষেশ্বর বলি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করে।" এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি সহর্ষে বলিলেন, "প্রভু! আমি এই অবধি লক্ষ নাম জপ করিব।" প্রভুও বলিলেন, "তবে আমিও তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।" এইরূপে নীলাচলে নিয়ম হইল যে লক্ষ নাম জপ না করিলে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করা যায় না। তাই সকলেই লক্ষ নাম জপ রূপ সাধন গ্রহণ করিলেন।

এই হরিনাম বিতরণ অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার যাহার তাহার দ্বারা হয় না। এই প্রচার কার্য্যে প্রভুর প্রধান সহায় দুইজন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতকে সমাজের আচণ্ডাল সকলকে কৃষ্ণ-নাম দিবার আজ্ঞা দিয়া গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। নিতাই নিকটে আছেন। ইহা কিন্তু প্রভুর ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, শ্রীপাদ! তুমি এখানে আনন্দে নৃত্য না করিয়া, দুঃখী জীবকে নৃত্য করাও, ইহাই তোমার কর্ত্তব্য

কর্ম্ম। প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া নিভৃতে যাইয়া বসিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি গৌড়ে গমন কর, সেখানে যাইয়া জীবগণকে উদ্ধার কর।" শ্রীপাদ বলিলেন, "উহা আমা হইতে হবে না। এখানে যাহা বল করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" প্রভু সে দিবস আর কিছু বলিলেন না।

প্রভু আর এক দিবস শ্রীনিতাইকে লইয়া ঐরূপ যুক্তি করিতে বসিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাক, তবে আর জীব উদ্ধার হয় না।" নিতাই বলিলেন, "তোমার জীব তুমি উদ্ধার কর, আমি তোমার কাছে থাকিব।" প্রভুর তখন নয়নে জল পড়িতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নে বারি দেখিয়া নিতাইয়ের হৃদয় ক্লেশে আকুল হইল। বলিতেছেন, "প্রভু, কি আজ্ঞা বলুন, তাই করিব।" প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমার মনে সাধ ছিল যে আমি হরিনাম বিতরণ করিব, কিন্তু আমি পারিলাম না। নাম বিতরণ করিতে গিয়া নামের শক্তিতে হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল, তাই এখন আমাতে আমি নাই, ভাসিয়া চলিতেছি।"

এখানে প্রভুর হৃদয়ের ব্যথা বর্ণিত এই প্রাচীন পদটী দিব,—

"আমার মন যেন আজ কররে কেমন আমায় ধর নিতাই। ধ্রু
নিতাই, জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল ঢেউ প্রেম নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই॥
যে ব্যথা আমার অন্তরে, এমন ব্যথিত কেবা কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়।
আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হলো,
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই॥"

অর্থাৎ আমি যে প্রেম-ধন আহরণ করিয়া ছিলাম, তাহা সব ফুরাইয়া গেল। আমি যে প্রেম দিব বলিয়া জীবের নিকট সত্যে আবদ্ধ আছি, সে ধার শুধিতে পারিলাম না।

করুণাময় নিতাইয়ের তখন সমুদায় মনে হইল, চাপল্য চাঞ্চল্য গেল, শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, "প্রভু, আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি তাই করিব। তুমি প্রাণ, আমি দেহ। তোমার বিরহ আমার সহ্য করিতে হইবে, তাহাই হউক।" প্রভু বলিলেন, "গৌড় বড় কঠিন স্থান, যেহেতু উহা পড়ুয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। ঐরূপ

স্থানে ধীশক্তিসম্পন্ন বস্তুর প্রয়োজন। তোমা ব্যতীত সেথানে আর কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।”

এখানে একটী নিগূঢ় রহস্য বলি। প্রভু এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার ভক্ত পাঠাইয়া জীব উদ্ধার করিয়াছিলেন। যিনি যে স্থানের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই স্থানে নিযুক্ত করেন। গৌড় বড় জ্ঞানের স্থান, তাই আনন্দের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে এখানে পাঠাইলেন। ভাবিলেন, জ্ঞান আনন্দের নিকট খর্ব্ব হইবেন। যেখানে ভক্ত দ্বারা কার্য্য না হইত, সেথানে আপনি করিতেন।

প্রভু তাহার পরে শ্রীনিত্যানন্দের হস্ত ধরিলেন। বলিতেছেন, “শ্রীপাদ তুমি ব্যতীত আমার হৃদয়ের ব্যথা বলিবার স্থান নাই, তুমি ব্যতীত গৌড় দেশ উদ্ধাররূপ দুষ্কর কার্য্য সাধন করে এমন আর কেহ নাই। তুমি উদাসীন ব্রত লইয়া এখানে থাকিলে, আর জীবঃ হাহাকার করিতে লাগিল। তুমি তোমার গণ লইয়া গৌড়দেশ গমন করিয়া আচণ্ডাল উদ্ধার কর। যাহারা মুর্খ নীচ, কি যাহারা পণ্ডিত পড়ুয়া, কি দুর্ম্মতি, কি পাপী, ইহার কাহাকেও ছাড়িবা না, সকলকে উদ্ধার করিবে, যেন সকলে অনায়াসে হরিনাম করিয়া সুখী হইতে পারে।”

নিতাইয়ের সঙ্গে গদাধর দাস গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রভুতে ও নিতাইয়ে কি কথা হয় তাহা তিনি সমুদয় অবগত ছিলেন। এখন সেই গদাধরের পদ শ্রবণ করুন—

বিরলে নিতায়ে পায়ে, নিজ কাছে বসাইয়ে,
মধু ভাষে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়ে,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
প্রভু কহে, “নিত্যানন্দ, জীব সব হইল অন্ধ,
কেহত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করে লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়,
সুখে যেন হরিনাম লয়॥

কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধম গণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ॥
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম্ম আচরিয়া,
পূর্ণ কর সকলের আশ।”
চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চলে নিতাই বিদায় হয়ে,
সঙ্গে চলু গদাধর দাস॥

প্রভুর আজ্ঞা এখন বিচার করুন। নিতাইকে বলিতেছেন যে, যাহাকে সম্মুখে পাইবে তাহাকে উদ্ধার করিবে। আচ্ছা সে যদি মহাপাপী হয়? প্রভু বলিতেছেন, তাহা হউক, যে যত পাপী হউক সম্মুখে পাইলেই তাহাকে কৃপা করিবে। প্রভু বলিতেছেন, এ সমুদায় জীবকে সদয় হইয়া করিবে, ইত্যাদি। ইহাতে বুঝিতেছি, যে যত কাঙ্গাল তাহাকে তত করুণা করিতে হইবে, যে যত পাপী তাহাকে তত দয়া করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রভুর বিবেচনায় যে যত অধিক পাপী, সে ততই অধিক দয়ার পাত্র।

কোন ধর্ম্ম পুস্তকে এরূপ লেখা আছে যে, কোন অবতার তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেছেন, যে, “উহারা মহাপাপী, উহাদিগকে এ সকল কথা বলিও না। এ সব কথা শুনিলে তাহারা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্ত-দণ্ড হইতে উদ্ধার হইয়া যাইবে।” আমরা সেই ধর্ম্ম পুস্তকে ইহা পাঠ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলাম, কিন্তু প্রভুর লীলায় সেরূপ দুঃখ পাইবার কথা নাই। প্রভুর বিবেচনায় সকলের প্রতি সমান, বরং পাপীর প্রতি অধিক, দয়া করিতে হইবে।

প্রভুর আজ্ঞায় আরও বুঝিতেছি যে, যাহারা তার্কিক পড়ুয়া পণ্ডিত, তাহারা বড় হতভাগ্য। আর কি বুঝিতেছি, না, জীবের দুঃখ কেবল তাহারা ভক্তি হইতে বিমুখ বলিয়া। অতএব হরিনাম লইলেই তাহাদের দুঃখের মোচন হয়, এবং যমযন্ত্রণা, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের ভয় হইতে উদ্ধার পায়। প্রভুর আজ্ঞায় আরও কি বুঝিতেছি, না, তিনি অর্থাৎ প্রভু যাহাই হউন, আমাদের জাতীয় জীব নহেন। তাঁহার আজ্ঞা কিরূপ তাহা বুঝুন। তিনি বলিতেছেন, “নিতাই যাও, যাহাকে সম্মুখে পাও, অমনি তাহাকে উদ্ধার কর।” বাপ রে বাপ! নেপোলিয়ান বাদসাহ তাঁহার

সেনাপতিকে জগৎ জয় করিতে বলিতে পারেন, ইহাতে অমানুষিকতা কিছুই নাই। তাঁহার প্রকাণ্ড সতেজ সৈন্য আছে, সুতরাং তাঁহার সেনাপতির জগৎ জয় করার বিচিত্র কি? কিন্তু যাঁহাকে সম্মুখে পাইবা, সে পণ্ডিত কি মুর্খ, সাধু কি অসাধু যাহাই হউক, তাহাকে উদ্ধার করিবে, এরূপ আজ্ঞা মনুষ্যে করিতে পারে না। বিবেচনা করিতে গেলে, এরূপ আজ্ঞা কেবল শ্রীভগবানই করিতে পারেন। কোন এক জনের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কহিয়া দেখিবেন যে, লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত পরিবর্ত্তন করা কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তুমি যদি বড় সাধু ও তেজস্বী পুরুষ হও, তবু তোমার মতে আনিতে সম্ভবত সমস্ত জীবনে একটি লোককেও পারিবে না।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া নিতাই করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু! আমি পুতুল তুমি সুত্রধর, যেমন নাচাবে তেমনি নাচিব। আমি গৌড়ে চলিলাম, যাইয়া তোমার আজ্ঞা বলিব। জীবে হরিনাম গ্রহণ করে কি না তাহা আমি জানি না, তাহা তুমি জান।" তখন প্রভু ও নিতাই গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমারে কৃতার্থ করিলে। আমার আর এক নিবেদন এই, তুমি এখানে মুহুর্মুহু আসিও না, কারণ তুমি আসিলে অনেক সময় বিফলে যাইবে।" নিতাই এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। তখন প্রভু নিতাইয়ের সঙ্গে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি সহচর দিলেন। যথা, খানাকুল কৃষ্ণনগরের অভিরাম বা রামদাস, পাণিহাটীর গদাধর দাস, পদকর্ত্তা বাসুঘোষ প্রভৃতি। এই যে সহচর গুলি চলিলেন, ইহাঁরা সকলেই প্রায় বদ্ধ পাগল। নিতাইয়ের গণ প্রায় সকলেই পাগল। তাহার পরে যখন তাঁহাদিগকে গৌড় পাঠান, প্রভু তখন তাঁহাদিগকে এমনি শক্তিসম্পন্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, সকলেই একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। কোন্ পথে আসিতেছেন, কোথা যাইতেছেন, কিছুরই ঠিকানা নাই। কখন পশ্চিম, কখন পূর্ব্ব, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ, এইরূপ করিয়া কোন ক্রমে পরিশেষে সুরধুনী তীরে পাণিহাটী গ্রামে আসিলেন। পথে আসিতে রামদাস এক দিবস গোপাল ভাবে ত্রিভঙ্গ হইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এইরূপে সে দিবস গেল।

শ্রীনিত্যানন্দ গৌড় আসিয়া কি কাণ্ড করিলেন, তাহা বর্ণনা করা এক বৃহৎ

ব্যাপার। নিতাইয়ের পায়ে নূপুর, সুরধুনী তীর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন, বলিতেছেন কি না—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ সেই আমার প্রাণ॥

মনে ভাবুন, আনন্দের পরাকাষ্ঠা, এ বস্তুর দর্শনে লোকে আনন্দে মগ্ন হয়। নিতাইয়ের কার্য্যকলাপ বর্ণন যুক্ত আর একটী পদ শুনুন:—

অক্রোধ, পরমানন্দ, নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই, নগরে বেড়ায়॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌরহরি॥

আর একটী শ্রবণ করুন্—

হরি নাম দিয়া জগত মাতালে, আমার একলা নিতাই।
সঙ্গে গৌর থাক্‌লে কি না হতো॥

আর একটা—

ধর লও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয় আয়।
প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকূল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিল গোরাচাঁদের গায়॥

আবার—

সুরধুনী তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

নিতাইয়ের ধর্ম্মপ্রচার পদ্ধতি অতি মনোহর, আর একটু হাস্য উদ্দীপকও বটে। এক জনকে ধরিয়াছেন, বলিতেছেন, "ভাই শুন নাই? তিনি আসিয়াছেন, সেই যমের যম। আর ভয় কি চল, নাচিতে নাচিতে বৈকুণ্ঠে চল।" নিতাইয়ের পক্ষে ও সমুদায় সোজা কথা। কিন্তু যাহাকে বলিলেন, সে হয়ত কিছু মানে না, কি প্রভুকে মানে না। কিন্তু তবু নিতাইয়ের সেই সোজা কথা, সেই আকিঞ্চন, সেই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া প্রকৃতই লোকে নিতাইয়ের অনুগত হইলেন।

কাহাকে বলিতেছেন, "আমি তোমার দাস হইলাম তুমি গৌর ভজ।" কাহার নিকট দন্তে তৃণ ধরিয়া করজোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি আমাকে, কৃপা করিয়া একবার মুখে হরি বল।" যদি কেহ হরি নাম না লইল, তবে নিতাই ব্যথিত হইয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়া

বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে বেচারি করে কি, কাছে বসিয়া গোসাঞিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, পরে আপনিও কান্দিতে লাগিল। ইহাতে মন নির্ম্মল হইল, পরিশেষে তিনি হরি হরি বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কাজেই তিনি গৌরাঙ্গের হইলেন। কাহাকে বলিতেছেন, "জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছি? একেবারে দেশ সমভূম করিব; পতিত আর একটিও রাখিব না!"

নিতাই "ভজ গৌরাঙ্গ" বলিয়া নাচিতে নাচিতে পরিশেষে শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীশচীদেবী নীলাচল হইতে আগত ভক্তগণের নিকট শ্রীনিমাইয়ের সংবাদ পাইয়াছেন। নিতাই একবারে প্রভুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নিতাইকে পাইয়া শচীর পুত্র-বিরহ অনেক হ্রাস হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইলেন। শচী কাঁপিতে কাঁপিতে নিতাইয়ের আগে আসিলেন। নিতাই অমনি মাতার পদ দুখানি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচী নিতাইকে কোলে করিলেন, তখন মাতা পুত্রে গলাগলি করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, নিতাইয়ের দেহে বিশ্বরূপ বিরাজ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সুখে পতির সংবাদ শুনিতেছেন। শচী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিতাই! নিমাই কি আমার বেঁচে আছে? আমার ননীর পুতলি নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছে, মুই অভাগিনী, তবু মরি নাই।

কহ কহ অবধৌত, কেমন আছে।
ক্ষুধার সময়, জননী বলিয়া,
(তোমারে) কখন কিছু পুছে?
যে অতি কোমল, ননীর পুতুল,
আতঙ্কে মিলায় যে।
যতির নিয়মে, নানা দেশ গ্রামে,
কেমনে ভ্রময়ে সে?
এক তিল যারে, না দেখি মরিতাম,
বাড়ীর বাহির দ্বারে।
সে এখন দূরে, ছাড়িয়া আমায়,
কোথা নীলাচল পুরে॥

মুই অভাগিনী, আছি একাকিনী,
জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি করিব,
প্রেমদাস জ্ঞান হারা॥

অন্যত্র— নদীয়া নগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শচী মাতার পায়॥
তারে কোলে করি শচী কান্দয়ে করুণে।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিয়ায়।
গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তায়॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা স্থির কর মন।
কুশলে আছয়ে মাতা তোমার নন্দন॥
তোমায় দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিল।
তোর পদ যুগে কত প্রণতি করিল॥
কানুদাস কহে মাতা কহি তোর ঠাঁই।
তোমার প্রেমে বাঁধা আছে গৌরাঙ্গ গোঁসাই॥

নিতাই শচী মাতার তৃপ্ত্যর্থে নবদ্বীপে কিছুকাল রহিলেন, রহিয়া নিমাইয়ের কথা দ্বারা মাতা ও শ্রীমতীকে সান্ত্বনা করিলেন। শচী মা নিমাই কি খায়, কি করে, এ সমুদায় কাহিনী এক বার দুই বার দশবার করিয়া শুনিতেন, আর শ্রীমতী একটু আড়ালে বসিয়া সেই রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপবাসিগণের সহিত মিলন এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন।
নিত্যানন্দ করে তাঁর চরণ বন্দন॥
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিয়া নিতাই।
গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সবাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই।
একে একে সবা সনে মিলিল নিতাই॥
সকল ভকত মেলি নিতাই মেলিয়া।
গোরা গুণ গাথা বলি স্থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুই কি বলিতে জানি।
হৃদয়ে গাঁথিয়া সেই নিতাই চরণ খানি॥

পঞ্চম অধ্যায়।

—•◇•—

শত বর্ষ তপে যেই ধনে নাহি মিলে।
পবিত্র আনন্দে মিলে যেই শিখাইলে॥
সাধন কণ্টক পথে ফুল ছড়াইল।
বলাইয়ের সর্ব্বস্ব ধন তাঁর পদতল॥—বলরামদাসের অষ্টক।

নদীয়া-ভক্তগণের বিহনে শ্রীগৌরাঙ্গ কি রূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাহা এখন শ্রবণ করুন—

পাণি শঙ্খ বাজিলে উঠেন সেই ক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম নদী বহে যেন॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥
যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিকে সর্ব্ব লোক হরি হরি গায়॥ (চৈতন্য ভাগবত)

কপাট খুলিলে প্রভু তাঁহার নয়ন শ্রীজগন্নাথের বদনে অর্পণ করেন, অমনি ধারা পড়িতে থাকে। প্রভুর নয়নে পলক নাই, আঁখি রক্তবর্ণ হইয়াছে। নয়ন তারা ডুবিয়া গিয়াছে, ডুবিয়া ধারা পড়িতেছে, ধারার বিরাম নাই। কাজেই নয়ন জল মৃত্তিকায় পড়িতেছে, ও তাহাতে একটু স্রোত হইয়া সেখানে একটী গর্ত্ত ছিল তাহাতে যাইতেছে। প্রভু এইরূপ দুই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছেন, আর শত শত লোকে প্রভুকে দর্শন করিতেছে। পর পর নূতন নূতন ভাব উদয় হওয়াতে প্রভু নব নব রূপ ধারণ করিতেছেন। সে সমুদায়ই তুল্য রূপে মনোহর। প্রভুর বাহ্য জ্ঞান নাই। সরূপ কি গোবিন্দ কোন ক্রমে তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। সেখানে আসিয়া প্রভু সমুদ্র-স্নানে গমন করিলেন। স্নান করিয়া আসিয়া ঘরের পিঁড়ায়

সংখ্যা মালা জপ করিতে বসিলেন। প্রভুর মালা লইয়া নাম জপ করা এক প্রকার বিড়ম্বনা, যেহেতু তিনি দিবানিশি শ্রীবদনে হরে কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। প্রভু যখন জপ করিতেন তখন সম্মুখে ভাণ্ডে একটী তুলসী বৃক্ষ রাখিতেন। প্রভুর মালা লইয়া জপ কেবল ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত, তিনি যাহা করিবেন জীবে তাহাই করিবে, সেই নিমিত্ত তাঁহার ভজন সাধনের সর্ব্ব অঙ্গ পালন করিতে হইত। সামান্য জীবে সাধনের সকল অঙ্গ যাজন করিতে পারে না। কিন্তু প্রভুর তুলসী সেবা হইতে কৃষ্ণ বিরহে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত, ভজন সাধনের আরম্ভ হইতে শেষ—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত—সমুদায় অঙ্গ যাজন করিয়া জীবকে শিখাইতে হইত। কারণ তিনি না করিলে কেহ করিবে না। প্রভুর যে মালা জপ সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড। প্রভু মালা জপিবেন কি, মালা হাতে করিয়াই কান্দিয়া আকুল। যথা—

রোই রোই জপে কৃষ্ণ নাম মধু। ঞ্চ

মালা জপ হইলে প্রভু ভোজনে বসিলেন, ভোজনান্তে একটু শয়ন করিলেন, তখন গোবিন্দ আসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর একটু নিদ্রা আসিলে গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতেন। প্রভু প্রায় সারানিশি ভজনে কাটাইতেন, কাজেই দিনের বেলা একটু শয়ন করিতেন।

প্রভু নিদ্রা যাইতেছেন গোবিন্দ পদসেবা করিতেছেন, আর দেখিতেছেন—

বাহু পরে শির রাখি মৃত্তিকা শয়ন।
সরল নির্ম্মল মুখ মুদিত নয়ন॥
সুখ স্বপ্ন দেখে প্রভু আপন লীলায়।
নব নব ভাব মুখে হইছে উদয়॥
ধূলা ধূসরিত সুবলিত হেম দেহে।
যেই দেখে তার নেত্রে প্রেম ধারা বহে॥
ত্রিভুবন নাথ শুই ধূলার উপরে।
বলরাম দাস বসি পদ সেবা করে॥

প্রভু উঠিয়া অপরাহ্নে গদাধরের স্থানে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে চলিলেন। নীলাচলে প্রভুর চির-সঙ্গী গদাধর। মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধার প্রকাশ। যখন নিমাই নবদ্বীপে রাসলীলা করেন, তখন গদাধর শ্রীমতী রাধা হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ী যে নাটকাভিনয় হয় তাহাতেই

প্রথমে গদাধর রাধা রূপে প্রকাশ পায়েন। শ্রীনিমাই নৃত্য করিতে গদাধরের হাত ধরিয়া উঠিতেন। গদাধর প্রভুর চির সঙ্গী—নীলাচলে

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুকে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সমুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু প্রেমরসে হন উনমত্ত॥ (ভাগবত)

গদাধরের স্থানে তখন কাজেই প্রভুর গণ সমুদায় উপস্থিত হয়েন। সকলে বসিয়া প্রভুর সঙ্গে গদাধরের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। সন্ধ্যা হইলে যদি জ্যোৎস্না রজনী হয় তবে প্রভু সমুদ্রতীরে গমন করেন।

সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধুতীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতুহলে॥
চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণপবন।
বৈসেন সমুদ্র কূলে শ্রীশচীনন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে॥

যখন বাড়ি থাকেন তখন প্রায় সমস্ত নিশি সরূপ ও রায় রায় লইয়া রসাস্বাদন করেন। এই যে গম্ভীরায় রসাস্বাদন লীলা ইহা অতি নিগূঢ় ও অননুভবনীয় বিষয়। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি উহা বর্ণনা করিবেন।

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহার নিকট আসিয়া করজোড়ে একটি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে এখন প্রভু একক আছেন, তাঁহাকে একবার ভাল করিয়া আহার করাইবেন। কেবল এই নিমিত্ত এক খানি নূতন ঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন। সার্ব্বভৌম নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার বাড়ী প্রভুর এক মাস নিমন্ত্রণ লইতে হইবে। প্রভু হাসিয়া বলিলেন যে, তাহা হইবে না যেহেতু সন্ন্যাসের সে ধর্ম্ম নয়। সার্ব্বভৌম বলিলেন, তবে কুড়ি দিন। প্রভু বলিলেন, এক দিন! তখন সার্ব্বভৌম একেবারে প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু যখন তাহা স্বীকার করিলেন না, তখন সার্ব্বভৌম দশ দিনে আসিলেন। শেষে প্রভু নাচার হইয়া পাঁচ দিবসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার সহিত যে সমুদায় সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের আমি পৃথক্ নিমন্ত্রণ করিব। এক জনের বেশী

কোন দিন পারিব না কারণ একাধিক নিমন্ত্রণ করিলে সকলের সম্মান রাখিতে পারিব না। অতএব তুমি একা আসিবে, আর নিতান্ত যদি কাহাকে সঙ্গে করিয়া আন তবে স্বরূপ দামোদরকে আনিবে, তাঁহাকে আমার সম্মান করিতে হইবে না।

তুমি নিজ ইচ্ছায় আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর॥ (চরিতামৃত)

সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা যে প্রভু একা আসেন, আর যদি কাহারে আনেন তবে কেবল স্বরূপকে। প্রভুকে একা খাওয়াইবেন মনস্থ করিয়া, প্রভুর সঙ্গী সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক এক জনকে এক এক দিন করিয়া খাওয়াইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। সন্ন্যাসিগণ সঙ্গে আসিলে প্রভুকে মনের সঙ্গে খাওয়াইতে পারিবেন না। একা পাইলে কান্দিয়া কাটিয়া পায়ে ধরিয়া, প্রভুকে যথেষ্ট রূপে ভুঞ্জাইতে পারিবেন। তবে স্বরূপের আসিবার বাধা নাই। কারণ তিনি ভিন্ন লোক নহেন। প্রভুর অনুমতি পাইয়া সার্ব্বভৌম আনন্দে তাঁহার ঘরণীকে আসিয়া সংবাদ দিলেন। তখন স্ত্রী ও পুরুষে দুই জনে মহাপ্রভুকে সেবা করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৃহে সমুদায় দ্রব্য রহিয়াছে, তবে তরকারী ও শাক আহরণ করিয়া আনাইলেন। প্রভু উপযুক্ত সময়ে একক আসিলেন। সার্ব্বভৌম আপনি তাঁহার পদ ধুয়াইলেন। প্রভু দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য মহা আয়োজন করিয়াছেন। ভক্তগণের আহ্লাদ হইবে এই নিমিত্ত কবিরাজ গোস্বামী এই আয়োজনের এইরূপ তালিকা দিয়াছেন। আমিই বা ছাড়ি কেন?

দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত সুক্ত ঝোল।
মরিচের ঝাল ছেনাবড়ী বড়া ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুল বড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভ্রষ্টমাস মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়ম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥

মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট॥
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিতা দুগ্ধ-লক্‌লকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃতসিক্তপরমান্ন মৃতকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌর উৎকলে যত ভক্ষের প্রকার॥ (চরিতামৃতে)

প্রভু অয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিতেছেন, "এই দুই প্রহরের মধ্যে এত আয়োজন কিরূপে করিলে? যদি একশত চুলায় পাক করে, তবু এত পাক করিতে পারে না।" তাহার পরে অন্নের উপরে তুলসী মঞ্জরী দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে সমুদায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হইয়াছে। তখন অতি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় ভাগ্যবান যে এরূপ ভোগ শ্রীভগবানকে দিয়াছ। নিশ্চয় শ্রীভগবান ইহা আস্বাদ করিয়াছেন, নতুবা এরূপ সুগন্ধ বাহির হইবে কেন? আমিও ভাগ্যবান, এই প্রসাদের অংশ পাইব।" আসন দেখিয়া বলিতেছেন, "এই আসন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের, উহা উঠাইয়া রাখ, আমাকে অন্য স্থানে ভিন্ন পাত্রে কিছু অন্ন দাও।" ভট্টাচার্য্য উত্তরে বলিলেন, "যদি আয়োজন তোমার মন মত হইয়া থাকে, তবে তোমার ইচ্ছায় সমুদায় হইয়াছে, আমার উহাতে প্রশংসার কিছু নাই। আসন উঠাইব কেন? তুমি উহাতেই উপবেশন কর।" প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কৃষ্ণের প্রসাদ যেরূপে পাইবে। যদি তাঁহার প্রসাদ পাইতে আপত্তি না থাকে, তবে তাঁহার আসনে বসিতে আপত্তি কি? উহাও কৃষ্ণের প্রসাদ মনে কর।" ঠাকুর বলিলেন, "ঠিক, কৃষ্ণের শেষ তাঁহার দাসের প্রাপ্তি।" ইহাই বলিয়া হাসিয়া পীড়ির উপরে বসিলেন।

সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বর, কন্যা যাঠী। যাঠীকে মহাকুলীন জামাতার সহিত বিবাহ দিয়া গৃহে রাখিয়াছেন। জামাতার নাম অমোঘ। এই বস্তুটী নানা দোষে পূর্ণ ছিলেন। কুলীন-ব্রাহ্মণ প্রতাপশালী শ্বশুরালয়ে বাস করেন, তাহার পক্ষে মন্দ হওয়া বিচিত্র নহে। সার্ব্বভৌম

জামাতাটিকে মনে মনে বড় ঘৃণা করেন। কিন্তু করেন কি? অমোঘ জামাতা, পুত্র নহে। পুত্র হইলে তাহাকে ত্যাগ করিতেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে বসাইবার পূর্ব্বে সমুদায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রভু ভোজনে বসিলেন, সার্ব্বভৌমের ঘরণী অন্তর হইতে ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য হস্তে লাঠি লইয়া দ্বারে বসিলেন। কেন না, জামাতা অমোঘের ভয়ে। অমোঘ সেখানে আসিয়া পাছে প্রভুকে কোন দুর্ব্বাক্য বলে, কি কোন অন্যায় কার্য্য করে, তাই সার্ব্বভৌম দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অমোঘ সেখানে আসিতে পারিতেছেন না। দ্বারের নিকটে আসিতেছেন, আর নৈয়ায়িকপ্রবর দণ্ডীদিগের গুরু ভুবন-বিখ্যাত সার্ব্বভৌম লাঠি উঠাইতেছেন, আর অমোঘ ভয়ে দৌড়িয়া পলাইতেছেন। সম্ভবত অমোঘের গাঁজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, নতুবা এরূপ কেন করিবেন? এই যে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে মোটে ওদিকে যাইতে দিতেছেন না, ইহাতে ব্যাপার কি দেখিবার নিমিত্ত অমোঘের কৌতূহল ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই বারে বারে আসিতেছেন, আর সার্ব্বভৌমের লাঠি দেখিয়া ভয় পাইয়া দূরে যাইয়া লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সুবিধা পাইলেই আসিবেন মনের এই ভাব। অমোঘের শুভদিন উপস্থিত, কাজেই সুবিধাও উপস্থিত হইল। প্রভুকে কোন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিবার জন্য সার্ব্বভৌম দ্বার ত্যাগ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে যে পাকশালা ছিল সেখানে প্রবেশ করিলেন। অমোঘ এই সুযোগে অমনি ছুটিয়া আসিলেন। সার্ব্বভৌমও অমোঘ দ্বারের নিকটে আসিতেছে দেখিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অমোঘ ব্যাপার কি দেখিল। দেখিল যে, প্রভু বসিয়া ভোজন করিতেছেন।

এখন আমাদের প্রভু ভক্তের অনুরোধে অমানুষিক ভোজন করিতেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইবেন বলিয়া দশ বার জনের অন্ন প্রস্তুত করিয়া সমুদায় পাত্তে ঢালিয়া দিয়াছেন। অমোঘ দ্বারে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল; সার্ব্বভৌমকে দেখিয়া পলায়ন করিল। তবু যাইবার বেলা এই কথা বলিয়া দৌড় মারিল যে "বাপ্ রে বাপ! একটা সন্ন্যাসী এত ভাত খাইবে?"

এ কথা প্রভুর কাণে গেল। তিনি একটু হাস্য করিলেন। সার্ব্বভৌম লাঠি লইয়া অমোঘের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, সে পলায়ন করিল।

ভট্টাচার্য্য তখন জামাতাকে গালি ও শাপ দিতে দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জামাতার রূঢ়বাক্য সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিন্ধিয়া গিয়াছে। প্রভু একা না আসিলে তাঁহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিবেন না, এই নিমিত্ত প্রভুর সঙ্গী সন্ন্যাসিগণকে পৃথক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মনের সাধ এই যে, কান্দিয়া কাটিয়া প্রভুকে সমুদায় অন্ন খাওয়াইবেন। এই নিমিত্ত যথেষ্ট অন্ন রন্ধন করিয়াছেন। এখন কি না, তাঁহার জামাতা প্রভুকে এরূপ দুর্ব্বাক্য বলে? সার্ব্বভৌম গালি শাপ দিতে লাগিলেন, তাঁহার স্ত্রীও মনে দারুণ ব্যথা পাইয়া বক্ষে করাঘাত ও বারংবার "ষাঠী বিধবা হউক" বলিতে লাগিলেন। প্রভু দুই জনের দুঃখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সার্ব্বভৌমের প্রকৃতই সাধ পুরাইয়া ভোজন করিলেন। যদি অমোঘ এই দুর্ব্বাক্য না বলিত, তবে হয়ত প্রভু অত ভোজন করিতেন না। তাই বলি শুভক্ষণে অমোঘ প্রভুকে রূঢ়বাক্য বলিয়াছিলেন। প্রভু আচমন করিলেন, তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে তুলসী মঞ্জরী, এলাচী, লবঙ্গ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি দিলেন; শ্রীঅঙ্গে চন্দন মাখাইলেন, গলে মাল্য পরাইলেন। পরে দুটি চরণ ধরিয়া পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নিন্দা করাইতে বাড়ী আনিয়াছিলাম। আমার গৃহে আমার জামাতা তোমাকে কটু বলিল ইহা হইতে আমার মরণ শত গুণে ভাল।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "অমোঘের একটুও দোষ নাই। সে যাহা ন্যায্য তাহাই বলিয়াছে। তোমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট কর, আমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করি।" ইহাই বলিয়া অমোঘের কার্য্য হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বাসায় চলিলেন, সার্ব্বভৌম চুপে চুপে পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। প্রভু বাসায় গমন করিলে সার্ব্বভৌম আবার প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন, আবার ক্ষমা মাগিলেন। প্রভু তখন গম্ভীর হইয়া নানারূপে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইলেন, বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শান্ত হইয়া আসিলেন না। প্রভুর কৃপায় ভট্টাচার্য্য এখন বড় সুখে আছেন। শুদ্ধ তাহা নয়, এখন বুঝিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যখন নাস্তিক ছিলেন তখন বড় দুঃখী ছিলেন। পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না, স্বীকার করিতেন না। পূর্ব্বে ভাবিতেন যে, তিনি

তাঁহার নাস্তিকতারূপ জ্ঞান লইয়া বড় আনন্দে আছেন, এবং যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্তি চর্চ্চা করে তাহারা বড় দুঃখী। এখন প্রেম-সুধা আস্বাদ করিয়া ঐশ্বর্য্যের তাবত সুখের উপরে তাঁহার ঘৃণা হইয়াছে। এই অমূল্য সম্পত্তি তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে। তাঁহাকে একটু ভাল করিয়া খাওয়াইয়া তাঁহার কিছু ঋণ শোধ দিবেন। আবার এই প্রিয় বস্তুটি তাঁহার বিশ্বাসে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। সার্ব্বভৌম কোন ক্রমেই আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছেন না, প্রভুর কথাতে শান্তও হইতেছেন না। বরং প্রভু যত অমোঘের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, সার্ব্বভৌমের ততই ঠাকুরের ঔদার্য্য দেখিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতেছে। যাঠীর মাতারও সেইরূপ। নতুবা তিনি আপনার কন্যা বিধবা হউক, এ কথা বলিতেন না।

সার্ব্বভৌম গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, করিয়া স্ত্রীকে ডাকাইলেন। বলিতেছেন, "মনের কথা শুন। প্রভুর নিন্দা শুনিলে দুই প্রায়শ্চিত্ত আছে। যে নিন্দা করে তাহাকে বধ করা, নতুবা আপনি প্রাণত্যাগ করা। কিন্তু দুই কার্য্যই পাপ, অতএব উহা করিব না। তবে উহার (অর্থাৎ অমোঘের) মুখ আর দেখিব না। উহারে আমি ত্যাগ করিলাম। যাঠীকে বল যে তাহার স্বামীকে ত্যাগ করুক। সে মহাপাতকী, এরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিতে হয়। যথা, পতিস্তু পতিতং ত্যজেৎ, এই শাস্ত্রের বচন।"

হতভাগিনী যাঠী বাড়ী বসিয়া রোদন করিতে লাগিল, অমোঘ ভয়ে সে রাত্রি আর বাড়ী আসিল না। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ঘরণী সমস্ত দিবস ভোজন করিলেন না, নিশিযোগেও উপবাস করিয়া রহিলেন। তাঁহার ভগ্নিপতি গোপীনাথ কত প্রকার বুঝাইলেন, তাহাতেও শান্ত হইলেন না। অমোঘ যেখানে রাত্রিতে ছিলেন, সেখানে তাঁহার ওলাউঠা রোগ হইল। অতি প্রত্যূষে পীড়া হইল, হইবা মাত্র মৃতপ্রায় হইলেন। সেই সংবাদ ভট্টাচার্য্যের নিকটে আসিল। সার্ব্বভৌমের তখনও অন্তরের ব্যাথা যায় নাই। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, বিধি আমাকে সদয় হইয়া আমাকে আমার বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তাহার কর্ম্মফল সে ভোগ করিবে, আমি কি করিব? শ্রীভগবানের নিকটে অপরাধ করিলে তাহার ফল, সদ্য ফলিয়া থাকে।" ইহাই বলিয়া শাস্ত্র হইতে দুটি বচন পাঠ করিলেন।

যদিচ সার্ব্বভৌমের মন অবশ্য তখন কোমল হইয়াছে, কিন্তু মনে ভাবিলেন এ সমুদায় শ্রীভগবানের কার্য্য, তিনি আপনি ইহার কি করিতে পারেন, প্রভুর যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা ভাল হয় তাহাই করিবেন, ইহাই ভাবিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, নানাবিধ ভাবে বিলোড়িত হইতে লাগিলেন। তবু অমোঘের নিকটে গমন করিলেন না। ভট্টাচার্য্য অমোঘের কোন সাহায্য করিলেন না দেখিয়া, গোপীনাথ প্রভুর নিকট দৌড়িলেন। প্রভু গোপীনাথকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া সার্ব্বভৌম শান্ত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন যে, সার্ব্বভৌমের মনের দুঃখ এখনও যায় নাই, আর সেই নিমিত্ত তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে কল্য দিবানিশি উপবাস করিয়া আছেন। এখন অমোঘের ওলাউঠা হইয়াছে, হইয়া মরিতেছে, তবু ভট্টাচার্য্য তাহার তল্লাস লয়েন নাই। প্রভু বলিলেন, "সে কি! অমোঘের ওলাউঠা হইয়াছে, অমোঘ মরিতেছে, তুমি বল কি? চল চল শীঘ্র আমারে তাহার নিকট লইয়া চল।" ইহাই বলিয়া প্রভু গোপীনাথের সঙ্গে, অমোঘ যেখানে পড়িয়া মরিতেছে, সেখানে গমন করিলেন। প্রভু বিদ্যুতের গতিতে গমন করিলেন। দেখেন অমোঘের অন্তিমকাল উপস্থিত! প্রভু কি করিলেন শ্রবণ করুন—

শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থল হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহা বসাইল।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈল॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষের ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়॥
উঠহ অমোঘ তুমি লহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান॥ (চরিতামৃত)

প্রভু হুহুঙ্কার করিয়া এই কথা বলিবা মাত্র, অমোঘ, যিনি মৃতের ন্যায় পড়িয়া মরিতে ছিলেন, অমনি উঠিলেন। উঠিলেন তাহা নয়, একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমোঘের এক তিলের মধ্যে শরীরে স্বাভাবিক শক্তি উপস্থিত হইয়াছে। অমোঘ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতে

লাগিলেন। অমনি নয়নে ধারা আসিল, অঙ্গ পুলকিত হইল, আর অমোঘ তখনই দুই বাহু তুলিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু মধুর হাসিয়া অমোঘের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে বিস্মিত ও বাক্য শূন্য হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। অমোঘ একটু নৃত্য করিয়া মনে ভাবিলেন যে, তিনি বড় অপরাধী, তাঁহার নৃত্য এক প্রকার বিড়ম্বনা। তখন প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! অপরাধীকে ক্ষমা কর।" প্রভু তখনই তাহাকে প্রসাদ করিতেন, কিন্তু অমোঘ সে অবসর দিলেন না। আবার উঠিয়া বলিলেন' "এই মুখে তোমার নিন্দা করিয়াছি, এই মুখই অপরাধী," ইহা বলিয়া আপনার মুখকে দণ্ড করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ দুই হাতে দুই গালে চড়াইতে লাগিলেন। ঘোরতর চড়ের প্রতাপে মুখ ফুলিয়া উঠিল। তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া গোপীনাথ অমোঘের হাত ধরিলেন, ধরিয়া আর আপন গাল চড়াইতে দিলেন না। অমোঘ তখন প্রভুর পানে কাতর বদনে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু সজল-নয়নে অমোঘের গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, "অমোঘ! তোমার অপরাধ নাই। তুমি সার্ব্বভৌমের জামাতা, সহজে আমার অতি স্নেহের পাত্র। তুমিও তাহার পুত্র সম্বন্ধীয়, কিন্তু সার্ব্বভৌমের গৃহের দাস দাসী, এমন কি কুক্কুর পর্য্যন্ত আমার প্রিয়, তুমি স্বচ্ছন্দ হও, কৃষ্ণ নাম লও।" তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, "চল, সার্ব্বভৌমকে সান্ত্বনা করি গিয়া," ইঁহাই বলিয়া গোপীনাথের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে চলিলেন। এই সমুদায় কাণ্ড দেখিয়া ও শুনিয়া সার্ব্বভৌম আনন্দ ও বিস্ময়ে জড়বৎ হইয়া আছেন, এমন সময় প্রভু সম্মুখে উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! অমোঘ বালক, তাহার আবার দোষ কি? তাহার উপর আর রাগ করিও না, শীঘ্র যাও শ্রীমুখ দর্শন কর, স্নান কর, আহার কর, তবে আমার সন্তোষ।" সর্ব্বভৌম আবার চরণে পড়িলেন, আবার পড়িয়া বলিতেছেন, "অমোঘ যেমন তোমার চরণে অপরাধী তেমনি মরিতে ছিল, তুমি তাহাকে কেন বাঁচাইলে?" ইহাতে প্রভু ভট্টাচার্য্যকে আবার উঠাইলেন। বলিতেছেন, "অমোঘ তোমার বালক, তুমি তাহার পিতা, তাহার দোষ লইতে পার না। তাহে সে আবার পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। এখন তাহার সমুদায় অপরাধ

গিয়াছে, তুমি এখন তাহাকে প্রসাদ কর, আমার এই মিনতি।” সার্ব্বভৌম কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, “প্রভু! তুমি কৃপা দ্বারা সমুদায় জীবকে তোমার চরণে আকর্ষণ করিতেছ। আপনি এখন চলুন, আমি স্নান ও ঠাকুর দর্শন করিয়া আসি, আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব।” প্রভু বলিলেন, “গোপীনাথ! তুমি এখানে থাক, ভট্টাচার্য্য প্রসাদ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবা,” ইহা বলিয়া প্রভু স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, শুভক্ষণে অমোঘ ঠাকুরের ভোজন দর্শনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাহার এই দর্শন-ব্যাকুলতার নিমিত্ত ঠাকুরের উত্তম করিয়া ভোজন হইল, সার্ব্বভৌম আপনার ঠাকুরের চরণে কতটুকু ভক্তি আছে তাহা জীবকে দেখাইতে পারিলেন, আর অমোঘ ভবসাগর পার হইলেন।

সেই অমোঘ হইল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নিত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত॥ (চরিতামৃত)

শ্রীকবি কর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচরিত কাব্যে ১৮ সর্গে ৩৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে, জীব নানা কারণে প্রভুর অনুগত হইত। কেহ তাঁহার মধুর হাস্য দেখিয়াই চিরজীবনের কিঙ্কর হইতেন। শুনিতে পাই প্রভুর মুখের মধুর হাস্য জ্যোৎস্না হইতে মনোহর ছিল। তাঁহার বাক্য অতিশয় মধুর ছিল, তিনি প্রিয় ব্যতীত অপ্রিয় বলিতেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রেমচক্ষে তিনি সকলকেই ভাল, ভক্ত, সাধু বলিয়া জানিতেন। প্রভুর আর এক অচিন্তনীয় শক্তি এই ছিল যে, সকলেই ভাবিতেন যে, তিনি আর প্রভু এই দুই জনে যত প্রীতি এত আর কাহার সহিত নাই। শ্রীভগবানের এই এক প্রধান লক্ষণ যে তিনি বহু-বল্লভ, আর তাঁহার বহু বল্লভ।

ইহা ছাড়া, প্রভু কখন কখন কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত অলৌকিক কার্য্য করিতেন। কেহ গোপনে পুত্র কামনা করিতেন। প্রভুর সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ কি জানা শুনা নাই। প্রভু তাহাকে ডাকিলেন, তাহাকে বলিলেন, “শ্রীজগন্নাথ তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন, তোমার পুত্র হইবে।” এই সমুদায় কার্য্য প্রায়ই গোপনে হইত, প্রভু জানিতেন আর বর প্রার্থী জানিতেন। কিন্তু দুই একটা কার্য্য গোপনে হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। যেমন অমোঘকে প্রাণ দান। আবার আর এক কাহিনী শ্রবণ করুন।

পরমানন্দপুরী, প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্থানীয়, এমন কি বিশ্বরূপের এক অংশ তাঁহাতে বিরাজিত এরূপ কথাও আছে। প্রভু পুরীকে বড় মান্য করেন, আবার পুরীর যথাসর্ব্বস্ব ধন প্রভু। পুরী আপন মঠে বাস করেন, সেখানে একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। প্রভু সেখানে গিয়াছেন, যাইয়া কূপের নিকট দাঁড়াইয়াছেন। কূপের জল বড় মন্দ হইয়াছে ইহা সকলে জানেন, প্রভুও জানেন। কিন্তু মনে একটা অভিপ্রায় আছে, তাই প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কূপের জল কিরূপ হইয়াছে। পুরী বলিলেন, অতি অভাগিয়া কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দ্দমময়। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "একি অবিচার? পুরী গোঁসাইয়ের কূপে জল ভাল নয়, শ্রীজগন্নাথ কি কৃপণতা করিবার স্থান আর পাইলেন না। পুরী গোসাঞির কূপের জল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তাই বুঝি শ্রীজগন্নাথ মায়া করিয়া জল এত মন্দ করিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে কূপের ধারে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া প্রভু বলিলেন, "হে জগন্নাথ! আমাকে এই বর দাও যে, তোমার আজ্ঞায় গঙ্গাদেবী এই কূপে প্রবেশ করেন।" প্রভু আমোদ ভাবে বলিলেন, ভক্তগণও কতক সেই ভাবে লইলেন। তবু প্রভু কথা কহিলেন বলিয়া, সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে পরমানন্দপুরী দেখেন যে তাঁহার কূপ অতি পবিত্র জলে, পূর্ণ হইয়াছে।

আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাই হইল আনন্দে অচেতন॥

সবে বুঝিলেন যে, কূপে শ্রীগঙ্গাদেবী আগমন করিয়াছেন।

প্রভুর নিকট এই সংবাদ গেল, ভক্তগণ মিলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িয়া পড়িয়া কূপ প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিলেন। প্রভু আসিলেন, সকলেই সেই কূপে স্নান করিলেন।

প্রভু যে নিতান্ত একা আছেন তাহা নহে, নবদ্বীপবাসী প্রায় শত ভক্ত তবু প্রভুর সঙ্গে রহিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পুরী ও ভারতী প্রভৃতি দশজন অতি প্রধান সন্ন্যাসী প্রভুর পরিবারের মধ্যে গণ্য। এ সমস্তই প্রভু পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহার গণ বলিয়া তাঁহারা অতি সমাদরে সেখানে বাস করেন। তাঁহারা আপনারাও সকলে এক এক জন ভুবন পবিত্র করিবার শক্তি ধরেন। প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাগত হইলে উড়িষ্যা-

বাসী মাত্রে তাঁহাকে শ্রীভগবান-রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। তবু একজন প্রভুর বিপক্ষ রহিলেন। তাঁহার নাম শিখি মাহাতি, এখন তাঁহার অত্যদ্ভুত কাহিনী শুনুন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লেখা আছে যে; শ্রীগৌরাঙ্গ যে নিগূঢ় রস জীবগণকে প্রদান করেন, তাহা সম্যক্ রূপে আস্বাদন কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র করিয়াছিলেন, যথা সরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসী। আর তাঁহার ভক্তগণ অধিকার অনুসারে এই রস ভোগ করিয়াছিলেন। সাড়ে তিন জন বলার তাৎপর্য্য এই যে মাধবী দাসী স্ত্রীলোক।

শিখি মাহাতি, মুরারি মাহাতি, ও মাধবী দাসী, তিন ভ্রাতা ছিলেন। মাধবী দাসীকে ভ্রাতা বলার উদ্দেশ্য এই যে তিনি পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, ও পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। এই জন্য লোকে তাঁহাদিগকে তিন ভ্রাতা বলিত। ভ্রাতৃদ্বয়ও ভগিনীকে ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার ও শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে শিখিমাহাতি লিখনাধিকারী ছিলেন। এরূপ প্রথা বরাবরই চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীমন্দিরে এরূপ এক জন লেখক থাকিতেন। এই লেখা বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আর এই লেখা দেখিয়া উৎকলের ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপে জানা যায়।

প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আসিয়া তিনি কয়েক সপ্তাহ তথায় থাকিয়া দক্ষিণে গমন করিলেন, তখন নীলাচলবাসিগণ শুনিলেন যে, এক জন সোণার বরণ নবীন সন্ন্যাসী নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছেন।

এইরূপ অন্যান্য নানা কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া নীলাচলের প্রধান প্রধান যাবতীয় লোক প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন। কবে প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন এই ভাবিয়া সকলে পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে রহিলেন। রজনী প্রভাত হইলে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নূতন বাসায় লইয়া গেলেন।

প্রভু নূতন বাসায় উপবেশন করিলেন, আর নীলাচলের তাবৎ প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিল। প্রত্যেকে প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আর সার্ব্বভৌম পরিচয় করিয়া দিতেছেন। সেই সময়

শিখি মাহাতি ও মুরারি মাহাতি দুই ভাই প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।
যখন শিখি ও মুরারি প্রভুকে প্রণাম করিলেন, সার্ব্বভৌম তখন তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন।

এই প্রভুকে তাঁহাদের প্রথম দর্শন। সম্ভবতঃ মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া তখন প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা তিন ভ্রাতা সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন। কিন্তু প্রভুর কি ইচ্ছা বলা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভ্রাতাদিগের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে দর্শন করিবা মাত্র কেহ তদ্দণ্ডে তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিতেন, কাহার কিছু বিলম্ব লাগিত। কাহার হৃদয়ে দর্শন ফল কিছুই হইত না। মুরারি ও মাধবী দাসী প্রভুকে দর্শন মাত্রে কুল শীল হারাইলেন, কিন্তু শিখি মাহিতি যেমন তেমনি রহিলেন।

মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠ শিখিকে গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! তুমি প্রভুকে কিরূপ দেখিলে?" তাহাতে শিখি মাহাতি বলিলেন যে, "পরম সুন্দর, পরম চিত্ত আকর্ষক, ও পরম ভক্ত।" তাহাতে কনিষ্ঠ দুই জন অন্তরে ব্যথা পাইয়া বলিলেন, "তুমি বল কি? উনি যে শ্রীকৃষ্ণ! উনিই ত জগন্নাথ, তুমি কি তাহা টের পাও নাই?" ইহাতে শিখি একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসী আমাদের ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে জগন্নাথ বলিলে আমরা ঠাকুরের নিকট অপরাধী হইব। জীবে ঈশ্বর জ্ঞান মহাপাপ।"

ইহাতে কনিষ্ঠ দুই ভাই মর্ম্মাহত হইয়া জ্যেষ্ঠের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এরূপ দুর্ম্মতি কেন হইল? শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং আসিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না?"

শিখি মাহাতি বড় বুদ্ধিমান, ও পণ্ডিত লেখক। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "হে দুর্ব্বলচেতা ভ্রাতৃগণ! সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ বলিতেছিস? তোদের গতি কি হইবে? এ কি বিড়ম্বনা, আমি কি জগন্নাথের নিকট কিছু অপরাধী হইয়াছি?" ইহাই বলিয়া শিখি রোদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইয়া গেল। মাধবী ও মুরারি দিবানিশি গৌরাঙ্গ ভজন করিতে লাগিলেন আর শিখিও প্রত্যহ যাইয়া জগন্নাথের নিকট কনিষ্ঠ দুই [illegible]র নিমিত্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ দুই জনে

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কিছু বলিতেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, সময় হইলে প্রভু আপনা হইতে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠকে কৃপা করিবেন। পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কোন্ রূঢ় কথা শ্রবণ করিতে হয়, এই ভয়ে দুই জন জ্যেষ্ঠের সঙ্গ একেবারে ছাড়িলেন। শিখি কনিষ্ঠদ্বয়কে অনেক তাড়না করিয়া দেখিলেন, তাহাদের গৌর-রোগ মজ্জাগত হইয়াছে, শেষে তাড়না ছাড়িলেন। এমন কি পরস্পরে মুখ দেখা দেখি বন্ধ হইল।

ইহাতে অবশ্য শিখি মাহাতির দিন দিন শ্রীগৌরাঙ্গের উপর ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল না, বরং হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, এই সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বনাশ করিলেন ও তাঁহাদের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে চাহিতেনও না, যাইতেনও না। এমন কি তিনি প্রভুর মস্ত বিরোধী হইয়া পড়িলেন।

এক দিন শিখি মাহাতি নিশি শেষে শয়ন ঘর হইতে চিৎকার করিয়া মুরারি ও মাধবী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের কাতর আহ্বান শুনিয়া মুরারি ও মাধবী উভয়ে তাঁহার গৃহে ধাবমান হইয়া দেখেন, শিখি মাহাতি বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহারা দুই জনে গৃহে প্রবেশ করিলে শিখি বাহু পশারিয়া তাঁহাদের দুই জনকে হৃদয়ে লইয়া গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এত রোদন করিতে লাগিলেন যে, কিছু প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কনিষ্ঠ দুই জনে জ্যেষ্ঠের রোদন দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা দুঃখের ক্রন্দন নয়। তখন সেই পূর্ব্বকার পরস্পরে গাঢ় প্রণয় আসিয়া সকলকে অভিভূত করিল। তিন ভ্রাতা পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া বিহ্বল হইয়া এইরূপ কিছুকাল নিশ্চেষ্ট রহিলেন। শিখি মাহাতি ক্রমে ধৈর্য্য ধরিলেন, পরে ধীরে ধীরে গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদের অনুরোধে, অদ্য আমার নিকট প্রকাশ পাইয়াছেন।" ইহাই বলিয়া আবার নীরব হইলেন। বেগ সম্বরণ করিতে শিখি মাহাতির আবার কিছু সময় গেল। তখন বলিতেছেন, "আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যে, তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ যেরূপ দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। এমন সময় তিনি ধীরে ধীরে জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইলেন। এইরূপ বারংবার জগন্নাথের অঙ্গে প্রবেশ করিতে ও উহা হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। যখন বাহির হয়েন তখনি

আমার দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করেন। তাহার পরে আমার নিকটে আসিলেন, আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ, এস, তোমাকে আলিঙ্গন করি, ইহাই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিলেন।"

শিখি এই কথা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুই অনুজের সন্তর্পণে শিখি মাহাতি চেতন পাইয়া আবার বলিতেছেন, "ভাই, এখন কিছু দেখিতে পাইতেছি না, আমি কেবল চতুর্দ্দিকে গৌরময় দেখিতেছি। ভাই, আমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ বলিয়া তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি তোমাদের অগ্রজ, ইহা ব্যতীত আমার কোন সম্পত্তি নাই। ভাই, তোমাদের হইতেই আমি গৌরাঙ্গ পাইলাম।" ইহাই বলিয়া শিখি আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন।

তখন মুরারি ও মাধবী বলিলেন, "এই প্রত্যূষে শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। চল আমরা সকলে সেখানে যাই।" ইহাই বলিয়া তিন ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট গমন করিলেন।

যাইয়া দেখেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। নয়ন হইতে শত শত প্রেম ধারা পড়িতেছে। গরুড়ের নিকট যে গর্ত্তটী আছে, উহা নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইঁহারা তিন ভ্রাতা গমন করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে মহানন্দে প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ প্রভু যেন চেতনা লাভ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদের মুখ পানে চাহিলেন, চাহিয়া শিখি মাহাতিকে দেখিলেন। প্রভু তখন শিখি মাহাতিকে অঙ্গুলি দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন। শিখি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ প্রভুর নিকটে আসিলেন। আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি-বেন এই উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় প্রভু জ্যেষ্ঠ মাহাতিকে বলিলেন, "তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ না? এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" ইহাই বলিয়া বাহু দ্বারা শিখি মাহাতিকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া দুই জনে ভূতলে অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। এইরূপ অনেকক্ষণ রহিলেন। এই অবকাশে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখির প্রত্যেক ধমনি দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেন। শিখি চেতন পাইয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, যেন শতকোটী শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন। এই শিখি পরিশেষে রাম রায় ও স্বরূপের ন্যায় রসজ্ঞ হইলেন।
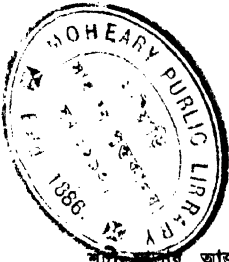
ষষ্ঠ অধ্যায়।

শচী মাতার আজ্ঞা লয়ে সকল ভকত ধেয়ে,
চলিলেন নীলাচল পুরে।
শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস, অদ্বৈত আচার্য্য পাশ,
মিলিল সকল সহচরে॥
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে, মিলিলা কৌতুক রঙ্গে,
নীলাচল পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, দেখিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে,
অনুরাগে আকুল হৃদয়॥
পথে দেবালয় গণ, করি কত দরশন,
উত্তরিল আঠার নালাতে।
সকল ভকত সাথে, কীর্ত্তন করিয়া পথে,
যায় সব গৌরাঙ্গ দেখিতে॥
কীর্ত্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল,
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি,
দেখিবারে ধায় আগে পাছে॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি, স্বরূপাদি সঙ্গে করি,
পথে আসি দিল দরশন।
মিলিল সবার সঙ্গে, প্রেম পরিপূর্ণ অঙ্গে,
প্রেম দাসের আনন্দিত মন॥

নীলাচলে প্রভু দোলযাত্রা উৎসব করিলেন, শ্রীনবদ্বীপে সেই দিনে তাঁহার জন্ম উৎসব পূজা হইল। রথের সময় হইল, নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুরাণীগণ সেবার বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারাও শ্রীনিমাই চাঁদকে দেখিতে যাইবেন। যদিও তখন পথের ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে, তবু বিংশতি দিনের দূরে স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া দুর্গম পথে যাওয়া সোজা কথা নয়। কিন্তু ঠাকুরাণীগণ নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন, তাঁহাদের পতি-গণ বৈষ্ণব, ভাল মানুষ, তাঁহাদিগকে রোধ করিতে পারিলেন না। সুতরাং স্ত্রী পুরুষে বৃহৎ এক দল নীলাচলের যাত্রী হইলেন।

যাঁহারা প্রধান তাঁহারা দিন স্থির করিবার নিমিত্ত, শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী

গমন করিলেন। দিন স্থির হইল। শচী মাতাকে প্রণাম করিয়া ও শচী-দত্ত নিমাইয়ের প্রিয় বস্তু সঙ্গে করিয়া, শ্রীহরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ চলিলেন। তাঁহার যাইতে নিষেধ ছিল, কিন্তু তিনি গৌরবিরহে সে আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। অতএব শ্রীনিতাই তাঁহার গণসহ চলিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার গৃহিণী মালিনী চলিলেন। আচার্য্যরত্ন ও তাঁহার গৃহিণী, অর্থাৎ শচীর ভগ্নী চলিলেন। শচী দেবী গমন করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধির স্বরূপ তাঁহার ভগ্নী ও মালিনী চলিলেন। খণ্ডবাসিগণ চলিলেন, কুলীনগ্রাম-বাসিগণ চলিলেন ও পট্ট ডোরী লইলেন। শিবানন্দ সেন সস্ত্রীক চলিলেন, তিনি সকলের প্রতিপালক। তিনি প্রত্যব্দ সকলকে লইয়া যাইবেন বলিয়া অগ্র হইতে পথের সন্ধান, বাসা স্থান নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন।

শিবানন্দ সেন গৌর লীলার প্রধান সহায়। শিবানন্দ সেন গৌর ব্যতীত আর কোন ঠাকুর জানেন না, শিবানন্দ সেনের পুত্র কর্ণপূর চৈতন্য-চরিত কাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখিয়া জগতে গৌর-লীলা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গোষ্ঠী হইতে যে গৌর কথা লেখা হইয়াছে, সে সমুদায় প্রায় সাক্ষাদ্দর্শন করিয়া। কবিকর্ণপূর গৌরব করিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এইরূপে তাঁহার পিতা সহস্র সহস্র লোক পথে পালন করিয়া প্রভুর সমীপে লইয়া যাইতেন। তিনি এইরূপ করিয়া পালন করিয়া লইয়া না গমন করিলে, বহুতর লোকের সেই দুর্গম ও বহু দূরের পথে প্রভুর নিকট যাওয়া হইত না। শিবানন্দ স্ত্রী পুত্র লইয়া যাইতেছেন, অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পরিবার সহিত চলিয়াছেন। এমন সময় পথে এক ঘট্টপালের হস্তে পড়িলেন। এই ঘট্টপাল পূর্ব্বে রাজার একজন মন্ত্রী ছিল। পরে এখন সেই কাটাকটীর সময় ঘাটরক্ষার ভার-প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে বহুতর লোক ও সৈন্য সামন্ত আছে, সেই সময় রাজা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় এই ঘট্টপাল বিষম অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় ভক্তগণকে পাইয়া বলিল যে, তোমাদের প্রত্যেক জনের এক এক মুদ্রা করিয়া পারের কড়ি লাগিবে। শেষে বলিল যে, তোমরা কড়ি না দিয়া পার হইয়া থাকো, অতএব এ পর্য্যন্ত যত ঘাটে এইরূপে বিনা মূল্যে পার হইয়া আসিয়াছ, এসমুদয় শোধ করিয়া দাও। ভক্তগণ বলিলেন যে তাঁহা-দের কড়ি নাই! তাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রশ্রয়ে কিছু নির্ভীকতা দেখাইলেন।

তাঁহারা ঘট্টপালকে বলিলেন যে, তিনি যদি এরূপ উৎপীড়ন করেন তবে গৌরচন্দ্র,—যিনি স্বয়ং জগন্নাথ ও তিনি, তাঁহার কর্ত্তা যে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সংত্রাতা,—তাহাকে দণ্ড দিবেন।

ঘাটপাল ক্রুদ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেনকে ধরিল, ধরিয়া কারাগারে পূরিয়া দৃঢ়রূপে নিগড়ে বন্ধন করিয়া রাখিল। এখন ভক্তগণের দশা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহাদের সঙ্গে যে স্ত্রী পুত্র আছেন, তাঁহাদের কি ভাব হইল তাহা মনে অনুভব করুন। আরো অনুভব করুন যে, শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র। শিবানন্দ সেনকে যখন এইরূপ বন্ধন করিল ও কারাগারে পূরিল, তখন অদ্বৈত প্রভৃতি হাহাকার ও রমণীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশ্য স্নানাহার হইল না। সকলে, প্রভু, প্রভু, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিন গেল, রাত্রি হইল। সকলে উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। শেষে অধিক রজনী হইল, কাহারও নিদ্রা নাই। শিবানন্দ বন্ধন দশায় থাকিয়া গৌর-নাম জপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় দুই জন প্রহরী আলো লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, "চল, তোমায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা হইয়াছে।" ইহা বলিয়া শিবানন্দের বন্ধন খুলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঘট্টপালের নিকটে লইয়া চলিল। শিবানন্দ সারা দিন ও অর্দ্ধ রজনী বন্ধন দশায় উপবাসে ও নানা চিন্তায় অভিভূত আছেন। এখন ভাবিলেন যে, তাঁহাকে বুঝি বধ কি প্রহার করিতে লইয়া যাইতেছে। শিবানন্দ সেন গৌর-ভক্ত তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ঘাটপালের নিকট নির্ভয়ে চলিলেন। দেখেন, ঘাটপাল খট্টার উপর বসিয়া আছে। শিবানন্দ তাহার নিকট আসিলে, সে তাঁহার পানে রুক্ষ ভাবে চাহিয়া বলিল, "তোমরা বলিলে তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের গণ। আরো বলিলে তিনি শ্রীভগবান। আমরা উড়িয়া, আমরা জানি শ্রীজগন্নাথই ভগবান। ভাল, তোমরা বল দেখি আমাদের জগন্নাথ বড় বা তোমাদের গৌর বড়?"

শিবানন্দ সেন ভাবিলেন যে, যদি বলেন জগন্নাথ বড়, তবে ঘাটপাল সন্তুষ্ট হইবে। আর যদি বলেন, গৌরাঙ্গ বড়, তবে আরো ক্রুদ্ধ হইবে। শিবানন্দ দেখিতেছেন, তাঁদের বড় বিপদ, সকলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া দুর্গম পথের মাঝে দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছেন, এখন কোন ক্রমে দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া আপদের হাত হইতে, উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

আবার গৌর অপেক্ষা জগন্নাথ বড়, ইহা বলিতেও মুখে আইসে না। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে অপরূপ ভাব উপস্থিত হইল। সে ভাব কিরূপ, না, যাঁহার শক্তিতে এক দিন হরিদাস,—যখন তাঁহাকে কাজি ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল যে,—

"খণ্ড খণ্ড করে দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু না বদনে আমি ছাড়ি হরি নাম॥"

সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া শিবানন্দ বলিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়!

বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে যিনি উভয় গৌর ও জগন্নাথকে ভগবান বলিয়া মানেন, সকলেই বলিতেন যে, উভয়েই সমান। কিন্তু শিবানন্দ গৌর উপাসক। তাঁহার কাছে গৌর সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তিনি যদি বলিতেন, জগন্নাথ ও গৌর উভয়েই সমান, হবে তাঁহার একটু ভয় করিয়া বলিতে হইত। তাই বলিলেন, গৌর বড়।

শিবানন্দ যখন এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস যে এ কথা বলিলে, হয় তাঁহার প্রাণ দণ্ড, না হয় অন্য কোন গুরুতর শাস্তি হইবে। কিন্তু তখন তিনি মনুষ্যভাব অতিক্রম করিয়া দেবতা হইয়াছেন। তখন গৌর-প্রেমে অভিভূত হইয়া, তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা আর সুখ নাই, ইহা ভাবিয়া বলিলেন "জগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়।" যখন তিনি এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার মুখের অপরূপ শ্রী হইল। তাঁহার তখন বদনে যে শোভা হইল তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

ঘট্টপাল এই কথা শুনিয়া এক দৃষ্টে শিবানন্দের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে যেন অভিভূত হইয়া, "আমাকে ক্ষমা কর" বলিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। তিনি সাধুগণকে দুঃখ দিয়াছেন এইরূপ মনের ভাবে ভয়ে ভয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, কোন নরসিংহ আকারধারী এক বস্তু তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন "তুই আমার ভক্তকে বন্ধন ও আমার গণকে দুঃখ দিতেছিস্। এখন তাঁদের দুঃখ মোচন কর, নতুবা তুই উপযুক্ত শাস্তি পাইবি।" ইহা দেখিয়া ঘট্টপাল ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া শিবানন্দকে ডাকিতে পাঠাইলেন। শিবানন্দ সেন আসিলে ভাবিলেন যে 'গৌরচন্দ্র কিরূপ বস্তু, অর্থাৎ যিনি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন, তিনি গৌরাঙ্গচন্দ্র কি না, তাহা একবার তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিবেন। তাই শিবানন্দকে, উপরে যাহা বলিলাম, ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শিবানন্দ যখন বলিলেন, গৌর বড়, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যে তিনি মহাপুরুষ। তখন পূর্ব্বকার স্বপ্নের সত্যতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাই তখন অতি ভয়ে ভীত হইয়া শিবানন্দসেনের চরণে পড়িলেন।

এখন এই ঘটনাটি লইয়া একটু বিচার করিতেছি। যদি স্বপ্নে ভয় পাইয়া, শুদ্ধ সেই ভয়ের নিমিত্ত ঘট্টপাল ভক্তগণকে ছাড়িয়া দিত, কি সম্মান করিত, তবে এই উপলক্ষে ভক্তের মাহাত্ম্য দেখান হইত না। ঘাটোয়াল স্বপ্নে দেখিয়া ভয় পাইল বটে, কিন্তু শিবানন্দকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের মলিনতা দূর হইল।

দুই জাতিতে যুদ্ধ হইতেছে, মধ্যে ঘাটোয়াল। সে কাহাকে বধ করিলে অনায়াসে পারে। সে প্রভু হইয়া শিবানন্দকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে, সে জগন্নাথের ভক্ত, গৌরচন্দ্রকে চিনে না। শিবানন্দ সেন এইরূপে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ঘাড়ে সহস্র ভক্ত ও তাঁহাদেরও আপনার স্ত্রী পুত্র। তখন তাঁহার পক্ষে এ কথা বলা, যে গৌরচন্দ্র বড়, ইহা সামান্য মনুষ্যে পারে না। এ কেবল শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যাঁহারা, তাঁহারা পারেন। ঘাটোয়াল শিবানন্দের সহিত মনুষ্য দিলেন, তাহারা আলো ধরিয়া, যেখানে ভক্তগণ পড়িয়া আছেন, সেখানে সেন মহাশয়কে আনিল। যথা, চন্দ্রোদয় নাটক—

দুই দীপ-ধারী প্রতি কহিল সত্বর।
যথা আছে ইহাঁর পুত্রাদি পরিবার॥
সেই স্থানে রাখ গিয়া দীপিকা ধরিয়া।
প্রণাম করিয়া সেনে দিল পাঠাইয়া॥
হেনকালে সেন আইল হাসিয়া হাসিয়া।

যে সকল বৈষ্ণব, গৃহিণী সহ চলিয়াছেন, ইহাঁরা অনেকেই সমাজের উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি। কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, কিন্তু তাঁহারা এই দুর্গম পথে বিংশতি দিবসের পথ হাঁটিয়া প্রভুকে দেখিতে চলিয়াছেন।

যে যে দ্রব্য জানেন প্রভুর বড় প্রীত।
সবেই লইলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥ (ভাগবত)

আর ভক্তগণ—পত্নী পুত্র দাস দাসী গণের সহিতে।
চলিলেন পরানন্দে প্রভুকে দেখিতে॥

যেখানে যে রাত্রি ভক্তগণ বাসকরেন, সেই স্থানে যেন বৈকুণ্ঠ পুরী হয়। কারণ, সঙ্গে খোল করতাল রহিয়াছে। হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে। অবশ্য পথ গমনে ক্ষুৎপিপাসা শ্রান্তিতে দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু সঙ্গে ঔষধ রহিয়াছে, সে শ্রীনামকীর্ত্তন। যে স্থানে রাত্রি রহিলেন, সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চতুঃপার্শ্বে লোক দেখিতে দৌড়িল। মহা সমারোহ হইল, আর কত লোক সেই তরঙ্গে পড়িয়া একবারে জন্মের মত কুলের বাহির হইতে লাগিলেন। তখন প্রভুর কৃপায় নীলাচলের পথ অনেক সুগম হইয়াছে। সকলে প্রভুর নাম শুনিয়াছেন। নিত্যানন্দের সহিত অনেকের পরিচয়ও আছে। সুতরাং প্রায় যেখানে যাইতেছেন সেখানেই সমাদর পাইতেছেন। ক্ষীরচোরা গোপীনাথের এখানে, সেবাইত-গণ বার খানি ক্ষীর আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। এইরূপে নাচিতে নাচিতে সকলে নীলাচলের নিকট আঠারনালাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখেন গোবিন্দ প্রভু-দত্ত দুই ছড়া মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণ আসিলে সেই দুই ছড়া মালা অদ্বৈত এবং নিতাইকে পরাইলেন। প্রভুর আদর ও আহ্বান নিদর্শনস্বরূপ মালা পাইয়া আনন্দে ভক্তগণ তখনি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন।

সেই দিন নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীজগন্নাথ নৌকা বিহার করিবেন, তাহার নিমিত্ত উৎসব হইতেছে। বাদ্যের উৎসবের অন্যান্য আয়োজন হইয়াছে। সহস্র সহস্র পতাকা উড়িতেছে। বহুতর লোক নৌকা বিহার দেখিতে তীরে উপস্থিত হইয়াছে। ও দিক হইতে প্রভুর নবদ্বীপ-ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। এ দিকে প্রভু বহুতর নীলাচলবাসি-ভক্ত সঙ্গে করিয়া নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে গদাধর, সরূপ, রামরায়, পুরী, ভারতী, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, অদ্বৈত প্রভুর তনয় অচ্যুত, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি অনেকেই আছেন। সংকীর্ত্তন কোলাহল শুনিয়া প্রভু নরেন্দ্রকূল ত্যাগ করিয়া ভক্তগণকে আনিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। মাঝ পথে দুই দলে দেখা দেখি হইল।

দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ॥

শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃপুনঃ হইতে লাগিল প্রণিপাত॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিল ভাল মতে॥
বৈষ্ণবগৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে রোদন॥ (ভাগবত)

শিবানন্দ সেন তাঁহার পুত্রকে কোলে করিয়া এই বিংশতি দিবসের পথ আসিয়াছেন। বালক পিতার কোলে চাপিয়া যাইতেছেন। কোথায় যাইতেছেন, না, প্রভুকে দেখিতে। যখন দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হইল, সকলে "প্রভু" "প্রভু" বলিয়া চীৎকার করিলেন, তখন বালক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, প্রভু কৈ ?" শিবানন্দ সেন কোলের পুত্রকে অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছেন। যথা—

বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দাম বাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোত বিদ্যোতি বাসাঃ,
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥
(শিবানন্দের শ্লোক।)

তখন দুই দলে মিশিয়া আনন্দে নৃত্য গীত করিতে করিতে সকলে আবার নরেন্দ্রতীরে আসিলেন।

প্রভুর এত আনন্দ হইয়াছে যে তীরে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, সরোবরে ঝম্প প্রদান করিলেন। প্রভু যদি আনন্দে জলে ঝম্প দিলেন, তবে ভক্তগণও দিলেন। ইহারা প্রেমানন্দে জলে ঝাঁপ দিলেন, সুতরাং ভব্য লোকের ন্যায় যে স্নান করিতে লাগিলেন তাহা নয়। তবে কি করিলেন শ্রবণ করুন—

সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মিলি।
পরস্পর কর ধরি হইলা মণ্ডলি॥

মনে করুন তিন চারি শত লোকে এইরূপ হাত ধরাধরি করিয়া জলের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

গৌড়দেশে জলকেলী আছে কয়া নামে।
সেই জল ক্রীড়া আরম্ভিলা প্রথমে॥
কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে।
জলবাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে॥

মনে ভাবুন তাহার পরে সকলে হাত ছাড়িয়া দিলেন, পরে মুখে "কয়া" "কয়া" বলিয়া দুই হাত দিয়া জলে আঘাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপ শত শত জনে জলবাদ্য বাজাইতেছেন, ইহাতে বহু তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে। এই তরঙ্গ আবার ক্রমে বাড়িতেছে, শেষে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিতেছে। এই খেলার মধ্যে অতি বৃদ্ধ আছেন, অতি পণ্ডিত আছেন, অতি নিরীহ ভাল মানুষ আছেন। এই সমুদায় ভাবিয়া এখন মনে করুন তাঁহাদের মনে কত আনন্দ হইয়াছে। আর এইরূপ ক্রীড়ার দ্বারা বৃন্দাবনের সম্পত্তি কিরূপ তাহাও কিছু বুঝিতে পারিবেন। যেহেতু শ্রীবৃন্দাবন যাঁহাদের গতি তাঁহাদের সকলের বাল্য ভাব হয়। তাহার পরে শ্রবণ করুন ঃ—

গোকুল শিশুর ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার॥
বাহ্য নাহি কার সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে গৌরাঙ্গদেহে সবে দেন জল॥
অদ্বৈত গৌরাঙ্গে দুঁহে জল ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিল দুঁহে মহাকুতূহলি॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥

জলক্রীড়া করিয়া সকলে প্রভুর বাসায় আসিলেন। অদ্য প্রভুর বাসায় মহোৎসব। পূর্ব্বকার বৎসরের ন্যায় সকলে একত্রে বসিয়া প্রভুকে মধ্য-স্থলে করিয়া ভোজন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন।

যে যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্ব শিশুকালে।
সকল জানেন সব বৈষ্ণব মণ্ডলে॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হইয়ে।
আনিয়াছেন যত সব প্রভুর লাগিয়ে॥

শ্রীলক্ষ্মীর অংশ যত বৈষ্ণব গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জন।
নবদ্বীপের শ্রীবৈষ্ণবী সকলেতে জানে॥

এইরূপ প্রত্যহ এক এক ভক্তের গৃহে মহোৎসব হইতে লাগিল। এবারে গৃহিণীগণ আসিয়াছেন, এমন কি প্রভুর মাসী স্বয়ং ও মালিনী দেবী আসিয়াছেন। প্রভুকে লইয়া তাঁহারা নির্জ্জনে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। প্রভু, মাসীর ওখানে নিমন্ত্রণে আর সন্ন্যাসীর নিয়ম কিছু রাখিতে পারিলেন না। মাসীকে প্রণাম করিলেন, আর তাঁহাকে পাইয়া মায়ের কথা ও ঘরকন্নার কথা সব শুনিলেন ও বলিলেন। জননীর নিকট কি কি বলিতে হইবে সমুদায় বলিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে রাস বর্ণনের মধ্যে একটি অদ্ভুত কথা আছে। সেটী এই যে শ্রীভগবান গোপীগণকে বলিতেছেন যে, "হে আমাতে লুব্ধাগণ! তোমরা কি জান না যে, আমার সাক্ষাৎকার লাভ অপেক্ষা, আমার লীলা কথাদ্বারা আমার সহিত মিলন আরও মধুর?" গোপীরা একথা মানিলেন না, কিন্তু ভাগবতের এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লইয়া একটু বিচার করিব।

মনুষ্যের প্রকৃতি বিচার করিতে গেলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রথম কথা, সুখ ভোগ অপেক্ষা সুখ ভোগের আশা ও সুখ ভোগের স্মৃতি অনেক সময় সুখকর। যে সুখ দুর্ল্লভ, তাহা সুলভ সুখ হইতে অধিক মিষ্ট। সাক্ষাদর্শনে যে সুখ, তাহা অপেক্ষা প্রিয়জনের চিন্তায় অধিক সুখ। সাক্ষাদ্দর্শনে অনেক খুঁত দেখা যায়, কিন্তু দূর দর্শনে তাহা দেখা যায় না। সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা দূরদর্শনে বস্তু মনোহর হয়। কোন ব্যক্তির চিত্র দেখিয়া বোধ হইবে, যে, সে পরমসুন্দর, কিন্তু তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিলে তাহা বোধ হইবে না। সাক্ষাদ্দর্শন নয়ন দিয়া করিতে হয় আর যে চক্ষের বাহিরে, তাহাকে মন দ্বারা দর্শন করিতে হয়। মন দ্বারা যে দর্শন, সেই প্রকৃত দর্শন। প্রিয়বস্তু সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাক সর্ব্বদা দেখিতেছ, কিন্তু কিছু মাত্র সুখ পাইতেছ না। সে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিল, তাহাকে মন দিয়া যখন দেখিতে হইল, অমনি তাহাকে অতি মধু বলিয়া বোধ হইবে।

তাই মৃত্যুতে জীবের নানা মহদুপকার করে। যেখানে মৃত্যুই জীবের ঐহিক পরিণাম' সেখানে প্রিয় বস্তুর অগ্রে মরণ হইলে ভাল, যেহেতু যে

মরে সে বাঁচিয়া যায়। তোমার বিরহে তাহাকে দুঃখ না দিয়া তাহার বিরহ তুমি ভোগ কর, করিয়া তাহাকে সুখীকর। সে ব্যক্তি পরকালে তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিবে। তুমি মরিলে সেই বিদেশ স্থানে গমন করিয়া প্রিয়জন পাইবে, তাহারা তোমার নিমিত্ত বাহু প্রসারিয়া বসিয়া আছে। যদি তোমার প্রিয়জনের বিয়োগ না হইয়া থাকে, তবে পরলোকে তোমাকে কে আদর করিয়া লইবে? যাহাদের প্রিয়জনের বিয়োগ হইয়াছে, তাহারা মরিলে, এক প্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য প্রিয়সঙ্গ পাইয়া থাকে।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গম সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

অর্থাৎ বিয়োগে হৃদয় দ্রব হয়, আর হৃদয় কোমল হইলেই উহা বৃদ্ধি পায়। বিয়োগে প্রিয়-জন নয়নের অন্তর হয়েন বলিয়া তাহাকে মন দিয়া দর্শন করিতে হয়, তখন যদি তাহার কিছু খুঁত থাকে' তাহা আর দেখা যায় না, তাহার স্মরণ তখন তাহার সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা মধুর হয়।

প্রিয়বস্তু বিদেশে আছেন, যদি সেখান হইতে কেহ সংবাদ লইয়া আইসেন যে, তিনি সেই বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তবে যিনি বিয়োগী তিনি তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া সেই দূরস্থিত নিধির কথা শুনেন। স্বামী পরদেশে, স্বামীর সংবাদ লইয়া কোন ব্যক্তি আসিল। স্ত্রী তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁর সহিত তোমার দেখা হয়? এই সমুদায় কাহিনী তাঁহার নিকট তাঁহার স্বামী সহবাসের ন্যায় অতি মধুর লাগে। যদি শুনেন তাঁহার স্বামী সর্ব্বদা তাঁহার কথা বলেন, সর্ব্বদা তাঁহার প্রেম-সুধা পান করেন, তবে তাঁহার বিয়োগ জনিত দুঃখ থাকে না। বরং সেই বিয়োগ একটি মহাসুখের কারণ হয়।

সেইরূপ মালিনী প্রভৃতি যখন বাড়ী আসিলেন, তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদের লইয়া বসিলেন। তাঁহাদের নিকট নিমাইয়ের কথা শুনিতে লাগিলেন। এই নিমাইয়ের কথা হইল, শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন ধারণের উপায়! তাঁহারা জনা জনার নিকট এই কথা শুনেন। সুতরাং সে কথা দিবানিশি শুনিয়াও ফুরায় না। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়া, মালিনী আসিলেন। শচী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সই, আমার মাথা খাও, নিমাই আমার বেঁচে আছে ত?" মালিনী আমূল বলিতে লাগিলেন। নিমাই

কিরূপে আসিলেন, পা ধুইলেন, আসনে বসিলেন, কি কি খাইলেন, পাক কিরূপ হইয়াছিল, শাক কয় প্রকার হয়েছিল, নিমাইয়ের শাকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সেইরূপই আছে, এইরূপ সমুদায় কাহিনী বলিতেছেন। যেমন মালিনী বর্ণনা করিতেছেন, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এক চিত্তে শুনিতেছেন। সুতরাং সমুদায় যেন স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এইরূপে মালিনীর নিকট এক দিবস, প্রভুর মাসীর নিকট এক দিবস, আবার প্রত্যেকের নিকট দুবার চারি বার করিয়া শুনিয়া শুনিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদের প্রিয় বস্তু বিয়োগ-জনিত দুঃখ সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা বরং তাঁহাদের বিয়োগ-দশা হইতে নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিলেন যে তাঁহাদের প্রিয় বস্তু যেমন তেমনি আছেন, তাঁহা-দের উপর তাঁহার যে মায়া উহা যেমন তেমনি আছে, তখন আর তাঁহা-দের দুঃখ কি ?

শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর ভক্তগণের সহিত এই চারি মাস বিহার সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন—

> পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রা কাল যবে আইল।
> সবা লয়ে গণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল ॥

প্রভু নৃত্য করিয়া উদ্যানের পুষ্করিণী তীরে ক্লান্ত হইয়া বসিলে, শ্রীনিতাইয়ের একজন শিষ্য, কৃষ্ণদাস নামক রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রভুকে শীঘ্র শীঘ্র ঘট ভরিয়া জল আনিয়া স্নান করাইলেন। এই সামান্য ঘটনাটি কেন এখানে বলিলাম তাহা বলিতেছি। যত অবতারের লীলা লেখা হইয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু নাই। কেবল গৌর অব-তারের ইতিহাস অতি পরিষ্কার রূপ চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রমাণ যতদূর সম্ভব উহা কেবল গৌর অব-তারে রহিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণদাস প্রভুকে স্নান করাইয়া ছিলেন তাহাও লিখিত রহিয়াছে।

প্রভু পূর্ব্বকার বৎসরের মত এবারও রথাগ্রে নৃত্য করিলেন, মন্দির মার্জ্জন করিলেন, লক্ষ্মী বিজয় উৎসব দর্শন করিলেন। কিন্তু তিনি যত লীলাই করুন, তিনি যে তাঁহার মাসীকে অগ্রে বসাইয়া তাঁহার হস্তের পাক ভোজন, আর তাঁহার সহিত সাংসারিক আলাপ করিয়াছিলেন, এই বৎসরের কাহিনীর মধ্যে ইহা যত মধু লাগিবে এত আর কিছু নয়।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে এক দিবস নিমন্ত্রণ করিলেন, যতদূর সম্ভব উদ্যোগ করিলেন। প্রভুর যত প্রিয় বস্তু সমুদায় দিয়া ভোগের সামগ্রী করিলেন। স্ত্রী পুরুষে দুইজনে যত্ন করিয়া রন্ধন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছেন, "শুন কৃষ্ণদাসের মা, প্রভু যদি একা আইসেন তবেই মঙ্গল, আর যদি সহচর সন্ন্যাসী সকলে সঙ্গে আইসেন তবে প্রভুকে কিছুই খাওয়াইতে পারিব না।" এই বলিতে বলিতে মহাঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রভু প্রসন্ন বদনে হরেকৃষ্ণ বলিতে বলিতে আসিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসিগণ ঝড়ের উৎপাতে নিমন্ত্রণে আসিতে পারিলেন না। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত মহানন্দে শ্রীভগবানকে ভুঞ্জাইলেন।

দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার।
যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার॥

ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি ধন্য। তুমি শ্রীকৃষ্ণ সেবা জান বটে।" প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, "কি আচার্য্য ঠাকুর আজ যে ইন্দ্রকে বড় ভক্তি?" অদ্বৈত বলিলেন, "সে কথায় তোমার কাজ কি?" তখন প্রভু বলিতেছেন "বুঝেছি বুঝেছি, এ ঝড়বৃষ্টি বুঝি তোমার কার্য্য? তা ইন্দ্রের ভাগ্য ভাল যে তোমার আজ্ঞা পালন করে।"

জন্মাষ্টমী আসিল, আর নীলাচলে নন্দোৎসব আরম্ভ হইল। অমনি প্রভুর গোপভাব হইল। প্রভুর হইল, কাজেই ভক্তগণেরও তাহাই হইল। ভক্তগণ কেহ বা গোপ, কেহ গোপী, কেহ নন্দ, কেহ যশোদা হইলেন। যিনি যাহা সাজিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইলেন। পদকর্ত্তা কানাই খুটিয়া,—যাঁহার মনোহর গীতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ,—তিনি সাজিলেন নন্দ, জগন্নাথ মাহাতি সাজিলেন যশোদা, তাঁহারা শুধু সাজিলেন তাহা নয়। প্রকৃতই তাঁহারা নন্দ যশোদা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ নন্দ যশোদা হইয়া বসিলেন। গোপ কে কে সাজিলেন শ্রবণ করুন। যথা প্রভু স্বয়ং, নিতাই, অদ্বৈত প্রভৃতি নবদ্বীপ ভক্ত, আর নীলাচলে প্রভুর ভক্তের মধ্যে স্বয়ং প্রতাপ রুদ্র, কাশী মিশ্র, সার্ব্বভৌম, পরীক্ষা পাত্র, তুলসী পাত্র, প্রভৃতি। অগ্রে নন্দালয় সাজান হইয়াছে, যশোদা, অর্থাৎ জগন্নাথ মাহাতি কোলে কৃষ্ণ মূর্ত্তি লইয়া বসিয়া আছেন। একদৃষ্টে নবকুমার পানে চাহিয়া আছেন, নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। প্রভু,

প্রতাপ রুদ্র প্রভৃতি সকলে মাথায় পাগ বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে লাঠি, কান্ধে দধির ভার। সকলে অবশ্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। কানাই খুটিয়ার নন্দ-ভাব হওয়াতে আহ্লাদে বাতুলের মত হইয়াছেন। মহাব্যস্ত, তাঁহার পুত্র হইয়াছে। প্রভু প্রভৃতি দধির ভার লইয়া আঙ্গিনায় আইলেন। সকলে সুখের সাগরে ভাসিতেছেন। সকলের গাত্র দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে অভিসিক্ত, আঙ্গিনা দধি দুগ্ধে কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছে।

তখন সকলে সেই কর্দ্দমময় আঙ্গিনায় লগুড় হস্তে করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মনে ভাবুন, এই নৃত্যে আছেন কে, না কবি রাম রায়, নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম, রাজমন্ত্রী পরীক্ষা, মহারাজা প্রতাপ রুদ্র, সন্ন্যাসী-প্রবর পরমানন্দ পুরী। প্রকৃত কথা, তখন সমভূম হইয়া গিয়াছে! আনন্দের বন্যাতে উচ্চকে নিচু করিয়া ফেলিয়াছে। পরে সকলে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও নিতাইচাঁদে একটু লাঠালাঠি হইল, শ্রীঅদ্বৈত দুই এক ঘা খাইয়া রাগ করিয়া নিতাইকে গালি দিতে লাগিলেন।

তবে লগুড় ল'য়ে প্রভু ফিরাতে লাগিল।
বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিল॥
এই মতে নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়॥

যদি শ্রীভগবান আপনি, জীবগণকে, প্রত্যক্ষে হউক, বা পরোক্ষে হউক, শিক্ষা না দিতেন, তবে জগতে এত বিভীষিকা আছে যে, সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভাল বলিয়া জানিতে পারিত না। শ্রীভগবান যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ইহা আমরা অবতার হইতে জানিতে পারি। আর এই অবতার দ্বারা শ্রীভগবানের লীলার সৃষ্টি হয়। কেবল এই লীলা দ্বারা জগতের জীব এ জগতে ভগবানের সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারে। এই লীলারূপ ভগবানের সঙ্গ করিয়া জীব পরিবর্দ্ধিত হয়। এই লীলা জীবের পরম ধন, যেহেতু জীবের আধ্যাত্মিক পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত লীলারূপ ভগবৎসঙ্গ যেরূপ সহজ, যেরূপ সুখকর, ও যেরূপ শক্তি সম্পন্ন উপায়, এরূপ আর কোন সাধন নয়, যাগ নয়, যজ্ঞ নয়, মন্ত্র নয়, তন্ত্র নয়, যোগ নয়, তপস্যা নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তগণ ভোজনে ভজন, নৃত্যগীতে ভজন করেন। এখন দেখুন তাঁহারা লগুড় ফিরাইয়াও ভজন করিয়া থাকেন।

এখন প্রভুর পরের কাণ্ড শ্রবণ করুন। ক্রমে প্রভুর শ্রীভগবান ভাব হইল। এখন কাজেই কানাই খুটিয়া ও জগন্নাথ মাহাতিকে পিতা-মাতা জ্ঞান হওয়াতে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদেরও তখন জ্ঞান নাই যে প্রভু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন, তাঁহারাও নন্দ ও যশোদাভাবে প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে লীলারস সুধা ভোগ করিলেন, কিন্তু নন্দ যশোদা আরও কিছু করিলেন। যথা—

কানাই খুটিয়া জগন্নাথ দুইজন।
আবেশে বিলান ঘরে ছিল যত ধন॥ (চরিতামৃত)

ইহাতে বুঝিবেন যে তাঁহাদের আবেশ বড় একটা কাল্পনিক নয়।

রাজা প্রতাপরুদ্র পূর্ব্ব হইতেই প্রভুর যত গণকে নূতন বস্ত্র পরাইবেন বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলকে নূতন বস্ত্র দিবেন। কিন্তু প্রভুকে কি দিবেন, প্রভুর ত বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তিনি সন্ন্যাসী কৌপীন-ধারী? রাজা পরম প্রেমে ভাবিলেন যে, প্রভুর যদি বস্ত্রের প্রয়োজন হয় তবে তাঁহার প্রিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিমিত্ত। অবশ্য প্রভুর জননী আছেন, কিন্তু তাঁহার চারি পাঁচ হস্ত লম্বা এক খানি মোটা কাপড় পাই-লেই চলিয়া যায়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন পূর্ণ যৌবনা, তাই ভাবিলেন যে তাঁহার উপযুক্ত বহুমূল্য একখানি শাটী দিবেন। প্রভু যখন গোপাল ভাবে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, তখন রাজা তাঁহার মস্তকে সেই শাটী বান্ধিয়া দিলেন। এইরূপ মহারাজা প্রত্যব্দ শ্রীমতীর জন্য এক এক খানি বহুমূল্য শাটী প্রণামি দিতেন। এই শাটী পণ্ডিত দামোদর লইয়া আসিতেন। রাজা যে শ্রীমতীর নিমিত্ত এই শাটী দিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু প্রভুর এরূপ বহুমূল্য বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রভু মাতাকে দিও বলিয়া উহা দামোদরের হস্তে দিয়া মাতার নিকট পাঠা-ইতেন। দামোদর প্রভুর বাড়ীতে তাঁহার জননী ও প্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভক্তগণের সহিত নীলাচল ত্যাগ করিতেন ও তাঁহাদের সহিত আসিতেন। এই আট মাস প্রভুর বাড়ীতে থাকিতেন। দামোদর এই শাটী শচীর হস্তে দিলে তিনি আর উহা কি করিবেন, অবশ্য বধূকে দিতেন। সেই বস্ত্র আইলে অবশ্য শ্রীমতীর বয়স্যাগণ দেখিতে আসিতেন। শ্রীমতীকে সে শাটী অবশ্য পরিতে হইত, শচী পরাইতেন, তিনি না পরাইয়া ছাড়িবেন কেন? হয়ত শ্রীমতী পরিতে চাহিতেন না,

কিন্তু প্রভু যখন শাটী পাঠাইয়াছেন, তখন ইহাও তিনি ও সকলে বুঝিতেন যে, শাটী পরিতে প্রভুর আজ্ঞা। সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আর শ্রীমতীর সাধ্য হইত না। ফল কথা তিনি কেন শাটী পরিবেন না? তাঁহার হয়েছে কি? তাঁহার ত সমুদায়ই আছে, স্বামী জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছেন, তবে যাইবার মধ্যে কেবল তাঁহার স্বামীর সহিত যে দৈহিক সম্বন্ধ, তাহাই গিয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দকে পাইয়া প্রভু আবার যুক্তি করিতে বসিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি জীবগণকে উদ্ধার করিবে, সে কার্য্য ফেলিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ।" নিতাই বলিলেন, "বৎসরের মধ্যে একবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব, তাহা যদি নিষেধ কর তবে আমি শুনিব না।" প্রভুর সঙ্গে এরূপ উত্তর করিতে কেবল এক নিতাই আর কতক সরূপ পারেন। প্রভুর নিতাইকে তখন সন্তোষে রাখিতে হইবে, কারণ তিনি নিতাইকে বধ করিবেন সেই সঙ্কল্প করিয়াছেন। সে বধ কিরূপ এখনি বলিতেছি। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! এখন আমার মিনতি শ্রবণ কর। তুমি তোমার সন্ন্যাস ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়া আবার গৃহস্থ হইয়া জীবকে হরিনাম বিতরণ কর।"

নিতাই এ কথা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না, পরে যখন বুঝিলেন প্রভু তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তখন তাঁহার সমুদায় আনন্দ ফুরাইয়া গেল। জীব-বন্ধু প্রভু জীবকে ভক্তি পথে আনিয়া সুখী করিবেন, এই তাঁহার অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন। নিতাই সন্ন্যাস লইয়াছেন, গদাধর ও সরূপ ঐরূপে সন্ন্যাস লইয়াছেন। লোকের ইহাতে কাজেই একটী বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, বৈষ্ণব হইতে গেলে উদাসীন হইতে হয়। স্বভাবতঃ লোকে গৃহস্থ ভক্ত হইতে উদাসীন ভক্তকে অধিক ভক্তি করে। স্বয়ং প্রভু উদাসীন, সুতরাং যিনি বৈষ্ণব তিনি যদি গৃহস্থ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার মনে বোধ হয় যে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি হীন। কুলীনগ্রামবাসী বসুগণ গৃহস্থ, তাঁহারা প্রত্যব্দ প্রভুকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য। প্রভু তাঁহাদিগকে কত প্রকার বুঝান যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে সংসার ত্যাগ প্রয়োজন নাই, কিন্তু তবু লোকে তাহা বুঝে না। লোকে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না, শুধু এই নিমিত্ত ভক্তি

ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। শ্রীঅদ্বৈতের দুই বিবাহ, তিনিও যদি বলেন যে, সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নাই, তবু তাঁর শিষ্যগণে তাহা বুঝেন না। স্বভাবতঃ এ দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপর এইরূপ ঘৃণা। প্রভু ভাবিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করিলে লোকের এই ভ্রম একবারে যাইবে, যে সংসার ত্যাগ না করিলে ভব সাগর পার হওয়া যায় না।

একটী পদ আছে,

সাধে কি আমি গৌরগুণে ঝুরে মরি। ইত্যাদি

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন,—ইহা সকল শাস্ত্রের বিবাদ নাশ করিয়াছে। বাসুদেব দত্তকে প্রভু [illegible]তেছেন, তুমি গৃহস্থ, তোমার সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। রামানন্দ রায় অধিকারী অর্থাৎ রাজার অধীন রাজা, পরম আরামে দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, দোলায় চড়িয়া ভ্রমণ করেন। শ্রীগদাধরের গুরু পুণ্ডরীক প্রেমনিধির কাহিনী আপনারা প্রথম খণ্ডে পাঠ করিয়াছেন। বাহ্যে তিনি মহাভোগী ছিলেন। রামানন্দ রায়ের মহিমার কথা কি বলিব। এই গৌর অবতারে মোটে সাড়ে তিন জন পাত্র, তাহার মধ্যে রামানন্দ রায় এক জন। শ্রীগৌর অবতারে চৌষট্টি মহান্ত, তাহার মধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র এক জন, ইনি তখন হিন্দু রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত, আপনার রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত অহরহ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। যিনি বড় শুদ্ধ বৈষ্ণব, তিনি মক্ষিকার অঙ্গে করস্পর্শ করেন না, কিন্তু প্রতাপরুদ্র প্রতি মাসে সহস্র বিপক্ষসৈন্য বধ করিয়া, সহস্র সহস্র আপন সৈন্যের রক্ত মোক্ষণ করিয়া, কিরূপে এত বড় বৈষ্ণব হইলেন যে, তিনি এক জন মহান্তের মধ্যে গণ্য হইলেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ মদনমোহনকে ভজন করেন, মদন ভস্মকারিকে নয়। সন্ন্যাসিগণের রাজা, বৈদান্তিকগণের গুরু, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, তাঁহার অদ্ভুত গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রামৃতে বলিতেছেন যে, গৌর-ভক্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংস করেন না, তবে উহাদিগকে অখণ্ড রাখেন, রাখিয়া উহাদের লইয়া খেলা করেন, কেমন ভাবে, না, যেমন সর্প-বৈদ্যগণ সর্পের বিষ-দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদের লইয়া খেলা করে। অতএব গৌর-ভক্তগণ ইন্দ্রিয়-রূপ বিষ-সর্পকে প্রাণে মারেন না, যেমন তেমনি রাখেন। তবে তাহারা ক্ষতি করিতে না পারে

এই নিমিত্ত তাহাদের বিষ দন্ত উৎপাটন করেন, করিয়া তাহাদিগকে অধীনে রাখিয়া খেলা করেন। ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন রঘুনাথ দাস, প্রভু তাঁহাকে বলিতেছেন। যথা—

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাবিষ্ট হ'য়ে।

এখন দেখুন ধর্ম্ম কি? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে জটিলতা কিছু নাই, নিরর্থক কিছু নাই, সমুদায়েরই প্রয়োজন আছে। আমরা ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতেছি যে, সকল দ্রব্যেরই সৎ ও অসৎ ব্যবহার আছে। অতএব শ্রীভগবদ্দত্ত কোন দ্রব্য ধ্বংস করিও না, অসৎ ব্যবহার করিও না, সমুদায় ঠিক রাখ, রাখিয়া উহাদের সদ্ব্যবহার কর। যদি শ্রীভগবান জ্ঞানময় ও প্রেমময় হন, তবে ইহা বই আর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

এ সব কথা বলি কেন, শ্রবণ করুন। লোকে বলে, যে বৌদ্ধধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে হিন্দুদিগকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে হিন্দুগণের বিশ্বাস, তাহাদের পরাধীনতা কেন না হইবে? উপবাস, মিতাহার, নিরামিষ আহার, মদ্যে বিতৃষ্ণা, যে ধর্ম্মের প্রধান অনুষঙ্গ, তাহাতে জীবকে নিস্তেজ কেন করিবে না? এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন যে, শুদ্ধ কেবল হিন্দুগণকে আসুরিক ভাব দিবার নিমিত্ত বীরাচার তন্ত্রের সৃষ্টি হইল! বীর কাহারা না যাহারা মদ্য মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যাহারা অসুর। এখন ইংরাজগণকে দেখিয়া বলিতে পারেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইব, লইয়া উপবাস করিয়া করিয়া কি আমরা আরও নিস্তেজ হইব? একে হিন্দু জাতি ধ্বংস প্রায়, তাহাতে যে টুকু বাকি আছে, বৈষ্ণব হইয়া তাহাও কি খোয়াইব? বৈষ্ণব হইলে কেবল ক্ষতির মধ্যে এক দেখিতেছি যে, মাংস ভক্ষণ করার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতেছি শ্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়া মৎস্য মাংস ইত্যাদি যতবার ইচ্ছা ভোজন করিতেন। তাই বলিয়া আমরা মাংস ভোজনের অনুমোদন করিতে পারি না। ফল কথা, যাঁহার ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে, তিনি অতি বড় তেজীয়ান না হইলে, জীব হত্যার মধ্যে থাকিতে বড় কষ্টকর হইবে। মাংস ভক্ষণ শারীরিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, যাঁহার ভক্তি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়া আপনি আপনি পশু হত্যার প্রতি বিরক্তি জন্মিবে।

স্থূল কথা, শ্রীভগবান মনুষ্যকে যত গুলি বৃত্তি দিয়াছেন, সমুদায়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি উৎকর্ষিত হইলে এই

বৃত্তি গুলির মধ্যে কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না, সমুদায় বৃত্তি গুলি তাঁহাদের নিয়মিত কার্য্যের অতিরিক্ত করিতে অশক্ত হয়। প্রভু বলিতেছেন, "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।" ভক্তির উৎকর্ষ করিলে আপনা-আপনি বিষয় হইতে মন অন্তর্হিত হয়। মনে রাখিবেন যে, তৃণ হইতে নীচ হইতে হইবে বলিয়া, নিস্তেজ কাপুরুষ হইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিতে হইবে বলিয়া, শরীর দুর্ব্বল করিতে হইবে না। এক আশ্চর্য্য দেখিবেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের যত ভজন সমুদায় শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের তেজ বৃদ্ধি কারক। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া ভোজন করেন। নৃত্য গীত তাঁহাদের ভজন, তাঁহাদের শরীর কেন ভাল থাকিবে না? এমন কি বৈষ্ণব শাস্ত্রে এরূপ কথাও আছে যে, যাঁহার উদরে বায়ুর সৃষ্টি হয়, তাঁহার প্রেম ভক্তি চর্চ্চা করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রেম ভক্তি ভজনের নিমিত্ত উত্তম জীর্ণ শক্তি অর্থাৎ উত্তম স্বাস্থ্য প্রয়োজন। সংসার ধর্ম্ম আচরং করাই ধর্ম্ম, ইহার বিপরীত কাজই অধর্ম্ম। তবে কোন প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তেজীয়ান লোকে সংসার হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে চাহেন। যাঁহাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কি যাঁহারা বীর পুরুষ, অসুর দমন করিবেন সংকল্প রহিয়াছে, এরূপ সমুদায় লোকে, তাঁহাদের কার্য্য উদ্ধারের সুবিধা হইবে বলিয়া, সংসারে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। প্রভু সেইরূপ মহা উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিতাইকে মহাপ্রভু বলিতেছেন "তুমি মুনি ধর্ম্ম লইয়া থাকিলে কাজেই জীব যে অন্ধ তাহাই থাকিল। তুমি গৌড় দেশে যাও, আপনি সংসার কর, করিয়া জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা দেখাও।"

প্রভুর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। গুরু-কুল রক্ষা দুই প্রকারে হইতে পারে। গুরু-বংশ দ্বারা, ও গুরু-শিষ্য দ্বারা। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের গাদি তাঁহারা আপনাদিগের শিষ্যগণের মধ্যে বাছিয়া এক জন উদাসীনকে দিয়া থাকেন। আবার যে আচার্য্য গৃহী তাঁহার ঔরসপুত্র তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হয়েন। প্রভুর বিবেচনায় গুরুকুল রাখিতে শিষ্য অপেক্ষা ঔরস পুত্র ভাল। আমরাও দেখিতেছি যে যেখানে শিষ্য দ্বারা গুরুকুল রক্ষিত হইয়াছে, সেখানে পরিশেষে পরম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া সংসারধর্ম্ম আচরণ করিলেন, তাই গুরুকুলের মধ্যে প্রধান এক শাখার সৃষ্টি হইল। কে জানে, শ্রীনিত্যানন্দ সংসার না করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কি দশা হইত?

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রভু যে কঠোর আজ্ঞা করিলেন তাহা একটু বর্ণনা করিতে হইবে, নতুবা সকলে বুঝিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি কৌপীন পরিধান করিয়াছেন, তাহা আবার ত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলে তিনি পতিত হয়েন। তাঁহার ছায়া মাড়াইলে অধর্ম্ম হয়। মনে ভাবুন, এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে, যে সে উদাসীন হইত, আর উহা ভাল লাগিল না দেখিয়া আবার সংসারে আসিত। অতএব এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে উদাসীনের উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকিত না। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিতাইয়ের এখন কৌপীন ছাড়িয়া পতিত হইতে হইবে। তাহার পরে বিবাহ করিতে হইবে, বিবাহ কিরূপ, না হিন্দু সমাজ সম্মত। নিতাইয়ের জাতি কি, তাহা ঠিক কেহ জানেন না। কুল কি তাহা লইয়া মহা গণ্ডগোল, নিতাইয়ের অন্ন বিচার নাই, দ্বাদশ বর্ষ হইতে দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ভারত বর্ষের নানা স্থানে তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি যদি বিবাহ করিতে চাহেন, তবে ভদ্র ব্রাহ্মণে তাঁহাকে কেন কন্যাদান করিবেন?

তাহার পর তিনি নিমাইয়ের দাদা। নিমাই নির্ম্মল পবিত্র, ঘোর তপস্যা করিতেছেন। তিনি নিমাইয়ের দাদা হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, পরিত্যক্ত উপবীত আবার গ্রহণ করিবেন, বিবাহ করিবেন, কাচ্চা বাচ্চা পালন করিবেন, করিয়া হরিনাম বিতরণ করিবেন। ইহা কিরূপে হইবে? লোকে এত অত্যাচার কিরূপে সহিবে? কিন্তু নিতাই তাঁহার ভক্তিবলে সমুদায় করিয়াছিলেন। নিতাই গৌড়দেশে আসিয়া কি তরঙ্গ উত্থিত করেন, তাঁহার আভাস একটু পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উঠাইয়া দেখাইব যে, নিতাইয়ের আগমনে গৌড়দেশে একবারে তোলপাড় উপস্থিত হইয়াছিল।

নিতাইয়ের,

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।

মুক্তিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥
হেন যে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শত জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে হই মহা কুতূহলী ॥
এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥
পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া ॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
বান্ধেন মারেন তবু অট্ট অট্ট হাসে ॥
এক দিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে ॥
গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকে কে কিনিবি গো-রস ॥ (চৈতন্যভাগবত)

অনেকে এখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আশ্রয় করিতেছেন। আমরা বলি যে, শ্রীভগবান, যে দেশে যাহা প্রয়োজন, তাহাই সেই দেশে সৃষ্টি করেন। অতএব অবতার যদি লইতে হয়, তবে অন্ততঃ বাঙ্গালিগণকে শ্রীগৌরাঙ্গকে লইতে হইবে। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সুধু বাঙ্গালি বলিয়া আমাদের পূজ্য নহেন, তাঁহার মত বস্তু ত্রিজগতে আর খুজিয়া পাইবেন না। যদি ভারতবর্ষীয়গণ এইরূপে ভক্তিবারি সিঞ্চন দ্বারা তাঁহাদিগের নির্জীব আত্মাকে সতেজ করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের রক্ষা। কোন জাতি মরিয়া থাকে, কোন জাতি মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠে। ইহার ঔষধ কোন একটী তরঙ্গ। কিন্তু যত রূপ তরঙ্গে মনুষ্য সমাজ তোল পাড় করে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তেজ-

স্কর ও নির্দ্দোষ এই ভক্তির তরঙ্গ। এই ভক্তি তরঙ্গে বৌদ্ধগণ নূতন শক্তি পাইয়া পৃথিবী অধিকার করিলেন। ইহা দ্বারা খৃষ্টিয়ানগণ ও মুসলমানগণ প্রভূত শক্তিসম্পন্ন হইলেন। ভারতবর্ষীয়গণ যদি, আবার সেইরূপ ভক্তির তরঙ্গ উঠাইতে পারেন, তবে তাঁহারাও পুনর্জীবন পাইবেন। রাজনীতি ভারত-বর্ষীয়গণের পক্ষে বলকারী দ্রব্য নয়, তাঁহাদের মহত্ব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ভারতবাসিগণ তাহাই করুন, পুনর্ব্বার জীবন পাইবেন। আর আধ্যাত্মিক জীবন পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে গৌরাঙ্গ ব্যতীত যে আর উপায় আছে, তাহা বোধ হয় না। অন্ততঃ ইহার ন্যায় সহজ ও পরিষ্কার উপায় যদি কিছু থাকে তাহা আমাদের গোচর নাই।

আপনার অন্তরে তরঙ্গ উঠিলে অন্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তরঙ্গ উত্থিত করা যায়। যদি এইরূপে সমাজে কোন কারণে তরঙ্গ উঠে, তবে সে সমাজ কিছু না কিছু উন্নতি লাভ করে। এইরূপে ধন লোভের নিমিত্ত কি যুদ্ধের নিমিত্ত কখন কখন সমাজে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, প্রায়ই এই সমুদায় তরঙ্গে কিছু না কিছু সামাজিক উন্নতি হয়। ইউরোপের যে কিছু উন্নতি, উহা প্রায় ধন লোভে হইয়াছে। বিদ্যালোভে যে তরঙ্গ উঠে ইহা কেহ কস্মিন্ কালে দেখেন নাই। ইহা কেবল বাঙ্গালিগণ নবদ্বীপে সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে যে বিদ্যার তরঙ্গ উঠে, তাহার চরম ফল হইল শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার।

কোন ক্রমে সমাজে তরঙ্গ উঠিলে উহার গতি অনুসারে উহার ফল লাভ হয়। হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিয়াছে, কিন্তু উহা অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত নিয়োজিত হইল, তাহাতে যে ফল হইবে তাহা অপেক্ষা অবশ্য পরমার্থের নিমিত্ত উহা নিয়োজিত হইলে অনেক ফল হইবে। শ্রীমহম্মদ ভক্তির সাহায্যে তরঙ্গ উঠাইলেন, পরে উহা যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইল। ইহাতে নির্জীব মুসলমানগণ একবারে জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইল। বৌদ্ধগণ এই তরঙ্গ, জীবকে দয়া ধর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারা জাপান পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে আনয়ন করিলেন। মনে ভাবুন কোথা জাপান কোথা মিথিলা, কোথা সংস্কৃত ভাষা কোথা জাপান ভাষা, কোথা বাঙ্গালি কোথা জাপানদেশীয় লোক। কিন্তু ভক্তির তরঙ্গে এই অসাধ্য অননুভবনীয় ব্যাপার সিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ বাঙ্গালিগণ জাপানে গমন করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনিয়াছিলেন।

গৌর অবতার কালে রাজা ছিলেন মুসলমান, বাড়ী গৌড়ে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। এই নবদ্বীপ শাসনের জন্য রাজার দৌহিত্র চাঁদকাজি ছিলেন। ইনি সহস্র সহস্র পাঠান সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দেশ শাসন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যে, বিনা অস্ত্র চালনায়, তাঁহাকে দমন কিরূপে করিলেন? লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তি বলে উন্মত্ত, তাই যদিচ তাঁহাদের অস্ত্র ছিল না, যদিও তাঁহারা কস্মিন্ কালে যুদ্ধ করেন নাই, তবু তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে প্রভূত শক্তি পাইয়া, সেই পাঠান সৈন্যগণকে ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দিলেন। মনে ভাবুন শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বৈষ্ণবগণের ঐ ভাব রাখিয়া দিতেন, তবে হয়ত বাঙ্গালিগণ অন্ত মুসলমানদিগের ন্যায় জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইতেন। নির্জীব হিন্দুগণ যদি এখন জীবনে কোন লক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে ধর্ম্ম লইয়া। যদি এ দেশবাসিগণ আবার ভক্তি তরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে আবার জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন।

এইরূপে নীলাচলে চারিমাস মহোৎসব হইল, প্রত্যহ আনন্দ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আনন্দ, দেহধর্ম্ম পালন করিতে যে সময় প্রয়োজন উহা ছাড়া সকল সময়েই ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতেছেন। ইতোমধ্যে এক দিবস এক ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু অচেতন হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে কি হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সকলে অনেক কষ্ট করিয়া প্রভুর জীবন শূন্য দেহ উঠাইলেন। সকলে ভাবিলেন প্রভুর হাড় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু—

> কিছু নাহি জানেন প্রভু প্রেমভক্তি রসে।
> বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
> সেই ক্ষণে কূপ হইল নবনীত ময়।
> প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥ (ভাগবত)

প্রভুকে কূপ হইতে উঠাইলে তাঁহার চেতন হইল। তখন শুনিলেন যে তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন। প্রভুর এই কার্য্যে সকলের মহা-ভয় হইল। প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে লীলা সম্বরণ করিয়া ভক্তগণকে ছাড়িয়া যাইবেন, কে জানে? তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি কাতরে প্রভুর শরণ লইলেন। শ্রীঅদ্বৈত বর মাগিলেন। বর মাগিলেন যে, তিনি অনুমতি না দিলে প্রভু লীলা সঙ্গোপন করিতে পারিবেন না। ইহাতে—

তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥ (চরিতামৃত)

সকলের মনে ভয় যে প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে কোন দিন চলিয়া যাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। তাই শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুর নিকট অঙ্গীকার করিয়া লইলেন যে তিনি, অদ্বৈত প্রভুর অনুমতি ব্যতীত, পলাইতে পারিবেন না।

প্রভু সকলের সমক্ষে নিতাইকে আবার বলিলেন—

প্রতি বর্ষ নীলাচলে আর না আসিবে।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা পালন করিবে॥

কুলীন গ্রামবাসিগণ আবার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা কিরূপে শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন। প্রভু বলিলেন যে নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা করিলে তাঁহারা শ্রীপদ পাইবেন। তাহাতে তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা যে বৈষ্ণব সেবা করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণব কিরূপে চিনিয়া লইবেন? প্রভু বলিলেন যে, যে ব্যক্তির মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম সেই ব্যক্তি বৈষ্ণব। কিন্তু কুলীন গ্রামবাসিগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। সে পরের কথা ভক্তগণের সহিত দামোদর পণ্ডিত চলিলেন, প্রভু জননীর নিকট সেই বহুমূল্য শাটী ও জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পাঠাইলেন।

যত দিবস ভক্তগণ নীলাচলে থাকেন, তত দিবস প্রভু অনেকটা সচেতনে থাকেন। ভক্তগণ বিদায় হইবার সময় প্রভুর মুখ মলিন হইয়া যায়। যাঁহার হৃদয় নবনীত হইতে কোমল, তাঁহার যে চিরদিনের বন্ধুগণকে বিদায় দিতে দুঃখ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি। সে মুখ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তগণ বিদায় হইলে কিন্তু প্রভুর দুঃখ থাকিত না। তখন প্রভুর সচেতন ভাব অনেকটা লোপ পাইত, পাওয়ায় তিনি বাহ্য জগতের সহিত বিদায় লইয়া অন্তরে লুকাইতেন। অন্তর্জগতে থাকিয়া প্রভু যাহা বর্ণনা করিতেন, তাহাকে মহাপ্রভুর প্রলাপ বলে। যদি পাষাণ বিগলিত করিতে চাহ, যদি ভক্তিরস আস্বাদ করিতে চাহ, যদি কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করিতে চাহ, তবে প্রভুর এই প্রলাপ লীলা শ্রবণ মনন দ্বারা আপনাকে জয় জর কর।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ বর্ণনা করিব, আমাদের এরূপ কি সাধ্য আছে?

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী না পারিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন। জীব মাত্রেই ঐরূপ ক্ষান্ত দিবেন। তবে যত টুকু পারি কিছু কিছু বলি। এখন কিছু বলি, অল্পে অল্পে এইরূপ আর কিছু অন্য সময়ে বলিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ ভাবে রাধার নিমিত্ত রোদন ও রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে রোদন ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধা বলিয়া প্রভু রোদন করিতেন, আর নীলাচলে রাধা ভাবে কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন।

প্রভু নীলাচলে বসিয়া আছেন, মুখ মলিন, কখন কখন অতি বেগে নয়ন ধারা পড়িতেছে। ইহার কারণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য চরিতামৃতে এইরূপে বর্ণিত আছে। প্রভু বলিতেছেন—

কাঁহা করো কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণ নাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥

কেহ কাহার বিরহে রোদন করে, ইহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু পতি বহু দিবস বিদেশে আছেন, সতী স্ত্রী গোপনে রোদন করিতেছেন, ইহা অনুভব করা যায়। ইহাও অনুভব করা যায় যে, সেই সতী স্ত্রী তাঁহার নিতান্ত কোন প্রিয়নর্ম্ম সখীর নিকট তাঁহার মনের বেদনা উঘাড়িয়া বলিতেছেন আর কান্দিতেছেন। কিন্তু প্রভুর শুধু ক্রন্দন নয়, তাহা অপেক্ষা অনেক গাঢ়তর উদ্বেগের চিহ্ন, যথা মূর্চ্ছা ও শ্বাস রোধ, বিবর্ণ ও প্রলাপ বাক্য।

প্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভাবে রাধা, জীবন্ত সামগ্রী, কোন কল্পনার বস্তু নহে। প্রভুর দেহে শ্রীমতী স্বয়ং প্রকাশ পাইয়াছেন। তখন সে দেহে আর নিমাই কি কৃষ্ণচৈতন্যের কোন ভাব নাই। তখন প্রভু একেবারে রাধা হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কি দ্বারকায়। কৃষ্ণ নাই বলিয়া প্রভু আপনাকে রাধা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন আর নানাবিধ প্রলাপ করিতেছেন। কখন কখন মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখন কৃষ্ণান্বেষণে দৌড় মারিতেছেন। যত সন্ধ্যা হইতেছে প্রভুর মনের বেগ ততই বাড়িতেছে।

এই প্রভুর মনের ভাব। ইহাতেই মুখ মলিন, ইহাতেই ঝলকে ঝলকে তরঙ্গ উঠিতেছে, আর নয়ন জল পড়িতেছে। কাছে সরূপ ও রামানন্দ

বসিয়া নানা রূপে প্রভুকে অন্যমনস্ক করিতেছেন, ও প্রভুর মন কৃষ্ণ হইতে অন্য দিকে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। নানা বাজে কথা বলিতেছেন। প্রভু উপরোধে এ কথার ও কথার উত্তর দিতেছেন। কখন বা তাঁহারা হাসিবার কথা বলিতেছেন, প্রভু উপরোধে হাসিতেছেন। কিন্তু সে হাসি দেখিলে মনে আনন্দ হয় না, প্রত্যুত হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সময় কেহ আগমন করিল। অমনি সরূপ বলিতেছেন, "প্রভু এক বার কৃপা করুন, অমুক আসিয়াছেন চরণে প্রণাম করিতেছেন।"

এইরূপে সরূপ রামরায় নানা চেষ্টায় প্রভুকে চেতন ও আনমনা রাখিতেছেন। প্রভু কাতর বদনে ইতি উতি চাহিতেছেন। প্রভু থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। যত বেলা যাইতেছে, ক্রমেই কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা বাড়িতেছে, ও ক্রমেই সরূপ রামরায়ের চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে। শেষে সন্ধ্যাও হইল আর সরূপ রামরায় পরাজয় মানিলেন। প্রভুকে আর চেতন রাখিতে পারিলেন না। প্রভু একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, অগাধ বিরহ সমুদ্রে ডুবিলেন।

গম্ভীরায় অর্থাৎ ভিতর প্রকোষ্ঠের মধ্যে অতি গুপ্ত স্থানে তখন প্রভুকে লওয়া হইল। ফলতঃ সন্ধ্যা হইলেই সরূপ রামরায় তাঁহাকে সেই গম্ভীরার ভিতরে লইয়া যান। লইয়া যান ইহার অর্থ এই যে, তখন প্রভু কোথায় কি করিতেছেন, কেন কি করিতেছেন, কিছু তাঁহার জ্ঞান থাকে না। সুতরাং তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইত।

এই ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভু আসনে আসীন, সম্মুখে স্বরূপ রামরায় বসিয়া। সম্মুখে একটী প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আপনাকে শ্রীরাধা ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ফেলিয়া মথুরায় গিয়াছেন। সরূপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "সরূপ! তুমি আমাকে প্রবোধ দেও, আর প্রবোধ না মানিলে দুঃখিত হও। কিন্তু বল দেখি এমন হতভাগিনী জগ মাঝে কে? কৃষ্ণ কাল আসিব বলিয়া গেলেন, আর কত যুগ বয়ে গেল। আমি বেঁচে আছি কেন জান? কেবল কঠিন প্রাণ বলিয়া। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এ দুঃখ না দিয়া আমাকে বধ কর," এই বলিয়া প্রভু ধূলায় পড়িলেন।

তখন দুই জনে আস্তে আস্তে ধরিয়া প্রভুকে উঠাইলেন। রামানন্দ প্রভুর মনের ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত শ্লোক পড়িলেন যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ

করিয়া কখন যান না। প্রভু এই কথা শুনিয়া সহর্ষে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন? তবে আর কি? চল আমাকে নিয়া চল।"

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, এই আনন্দে প্রভুর মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন বলিতেছেন, "সরূপ আমার কৃষ্ণের রূপ একবার বল, আমি শুনি।" এই কথা বলিয়া আপনি বলিতে লাগিলেন। তখন সুধার সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গের মনে যখন যে ভাব হইতেছে বদনে তাহা তদ্দণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। অতি সরলা বালিকা মনের ভাব গোপন করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের মনও বালিকার মনের ন্যায় সরল। যখন যে ভাবটি হইতেছে, তাহা তখনই বদনে দেখা যাইতেছে। সরূপ রামরায় যেমন প্রভুর সমুদায় কথা শুনিতেছেন, আবার ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন। ইহাতে প্রভুর মুখে নব নব রূপের উদয় হইতেছে, প্রত্যেক রূপ তুল্য মনোহর।

কখন প্রভু একেবারে বিহ্বল হইতেছেন। সরূপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ললিতে! তোরা কৃষ্ণ দর্শনে যাবি কি না আমাকে বল? আমি এই বেরোলাম!" ইহাই বলিয়া প্রভু উঠিলেন ও দ্রুত পদে গমনোদ্যত হইলেন। তখন সরূপ রামরায় তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া তাঁহাকে একটু সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অগ্রে বলিলেন, প্রভু শান্ত হউন, বসুন, কোথা যাইবেন, ধৈর্য্য ধরুন।

কিন্তু ইহাতে প্রভু কর্ণপাত করিলেন না। তখন সরূপ বলিতেছেন, চুপ কর। জটিলা বুড়ী এখনও জাগ্রত আছে। সে নিদ্রা যাউক, তবে আমরা যাবো। অমনি প্রভু ভয়ে চমকিত হইয়া বসিলেন; ও চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে প্রভুর হঠাৎ একটু চেতন হইল। তখন সরূপকে বলিতেছেন, সরূপ! তুমি ত ললিতা নও। তুমি না সরূপ? আর আমি না কৃষ্ণচৈতন্য? আমি ত রাধা নই, তবে আমি এখন প্রলাপ করিলাম?

সরূপকে প্রভু এইরূপ বলিতেন; তাহাতেই প্রভুর এই সমুদায় ভাবকে "প্রলাপ" বলিয়া উক্ত হইতেছে।

প্রভু বলিতেছেন, "সরূপ! আমি কি প্রলাপ বকিলাম? আমি যেন স্বপ্নে দেখিতেছিলাম? দেখিতেছিলাম কি—"বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিলেন না, আবার বিহ্বল হইলেন। তখন সরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া

বলিতেছেন, সরূপ! তুমি যদি আমাকে ভাল বাস, তবে আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া দিয়া আমাকে প্রাণে বাঁচাও। আমার প্রাণ যায়, তুমি একবার আমার উপকার কর। আমি চিরকাল তোমার হইব্। তুমি একবার আমাকে কৃষ্ণকে দেখাও। সরূপ এই আমার প্রাণ গেল। ইহাই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনেক যতনে প্রভু চেতন্ম পাইলেন। প্রভু নীলাচলে, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ও মর্ম্মী ভক্তগণ নবদ্বীপে, সুতরাং তাঁহার মনে দুঃখ হইবার কথা। কিন্তু ভক্তগণ নীলাচল ত্যাগ করিলেন, অমনি প্রভু কৃষ্ণ বিরহে একেবারে ডুবিলেন। প্রভুর দিবা ভাগে কিছু চেতন থাকে বটে, কিন্তু সন্ধ্যা হইলে আর কেহ তাঁহার ভাব ভঙ্গ করিতে পারেন না। প্রভু সরূপ রামানন্দকে শ্লোকবন্ধে তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা এইরূপে উঘাড়িয়া বলিতেছেন। যথা প্রভু কৃত শ্লোক—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিত দেহ গেহঃ।
গৃহীত কাপালিকধর্ম্ম কো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয় শিষ্য বৃন্দম্॥

এই শ্লোকের অর্থ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ করিতেছেন যথা—

প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় সরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক বেদধর্ম্ম,
যোগী হইয়া হইল ভিখারী॥ ধ্রু

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া সরূপকে শ্লোক বন্ধে আবার কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন, যথা—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

অর্থাৎ—হে সরূপ, কৃষ্ণ বিরহে আমার নিমেষ কাল যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার নয়ন বর্ষার মেঘের ন্যায় হইয়াছে, ও ভুবন অন্ধকার হইয়াছে।

এইরূপ প্রভু আমার, হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কোথা আমি কৃষ্ণ পাবো, কে আমাকে কৃষ্ণ দিবে, কি করিলে কৃষ্ণ পাবো, করিয়া নীলাচলে অষ্টাদশ বর্ষ কাটাইলেন।

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কান্দিতেছেন আবার সরূপ রামরায়কে বলিতেছেন, "তোমরা আমার কৃষ্ণকে নিন্দা করিও না। তিনি আমার প্রাননাথ, তিনি যাহা করেন সবই ভাল।" এখন প্রভুর শ্রীমুখের অদ্ভুত শ্লোক শ্রবণ করুন যথা—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

প্রভু বলিতেছেন, "সরূপ! আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে লম্পট বলিতেছ। তাহাই হউক। তিনি আমাকে আলিঙ্গন দিয়া আনন্দ দিয়া থাকেন, কি অদর্শন হইয়া দুঃখ দিয়াও থাকেন। কিন্তু তিনি যাহাই করুন, তবু তিনি আমার অপর নহেন আমার প্রাণনাথ।

প্রভুকে অনেক কষ্টে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভুলাইয়া রামরায় ও সরূপ শয়ন স্থানে লইয়া গেলেন। প্রভুকে শয়ন করাইয়া, প্রদীপ নির্ব্বাণ করিলেন, দ্বার বন্ধ করিলেন, করিয়া রামরায় গৃহে গমন করিলেন, আর সরূপ ও গোবিন্দ দ্বারে শয়ন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

অপরূপ রথ আগে।

নাচে গোরারায়, সভে মেলি গায়,

যত যত মহাভাগে ॥ ধ্রু ॥

ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস,

আবেশে কিছু না জানে।

জগন্নাথ মুখ, দেখি মহা সুখ,

নাচে গর গর মনে ॥

খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল,

ঘন ঘন হরিবোল।

জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি,

গগনে উঠয়ে রোল ॥

নীলাচল বাসী, আর নানা দেশী,

লোকের উথলে হিয়া।

প্রেমের পাথারে, সভেই সাঁতারে,

দুখী যদু অভাগিয়া ॥

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। প্রভুর নবদ্বীপ বিরহ উপস্থিত হইল। একবার শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন ইহা মনের মধ্যে সঙ্কল্প রহিয়াছে। সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া কাটোয়া হইতে সেই দিবস ছুটিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সে বার যাইতে দেন নাই। তাহার পরে নানা কারণে এই চারি বৎসর যাবেন যাবেন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে তাঁহার একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হইবে। সন্ন্যাসিগণের ইহা করিতে হয়। এখন ভাবিলেন যে, জননী, জন্মভূমি, গঙ্গা দর্শন করিয়া ঐ পথে বৃন্দাবন যাইবেন। এই মনস্থ করিয়া সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট মনের কথা খুলিয়া সমুদায় বলিলেন। এ কথা শুনিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। এ কথা রাজা শুনিলেন, শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। প্রভু যখন যাইবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন তখন তাঁহাকে আর কে রাখে? তাহার পরে প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে কি আর

প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ? তিনি স্বেচ্ছাময়, তাঁহার মনে কি আছে তাহা কে জানে। বৃন্দাবনের নাম করিলে প্রভু মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনি কি আর প্রাণে বাঁচিবেন ? রাজার ভরসা কেবল সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ। তিনি এই দুই জনকে বলিলেন যে, প্রভুর যাহাতে না যাওয়া হয় তাহাই যেন তাঁহারা যে প্রকারে পারেন করেন।

গদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়াছেন, তাঁহার ক্ষেত্রত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবার অধিকার নাই। প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনি সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। কিন্তু প্রভুকে না দেখিলে তিনি এক মুহূর্ত্তকালও বাঁচেন না। তিনিও সেই দলে মিলিয়া গেলেন। সকলে জুটীয়া প্রভুকে নানা কথা বলিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গদাধর প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, তিনি কেন বৃন্দাবন যাইবেন ? তিনি যেখানে থাকেন সেই না বৃন্দাবন ? প্রভু হাঁসিয়া বলিলেন যে, তিনি অবশ্য যাইবেন। একটী বার পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া, আবার সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। রামরায় ও সার্ব্বভৌম বলিলেন "প্রভু, শীতকাল আসিয়াছে, পশ্চিম দেশে বড় শীত, শীত গেলে তবে যাইবেন।" প্রভুকে তাঁহারা এইরূপ কাতর হইয়া ধরিলে তিনি শীতের কয়েক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। শীত গেল ফাল্গুন মাস আসিল, আবার প্রভু অনুমতি চাহিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, "প্রভু ! এই সম্মুখে দোল আসিতেছে, এই দোল দেখিয়া যাইবেন।" দোল হইয়া গেলে তাঁহারা বলিলেন যে, গৌড়ীয় ভক্তগণ অতি শীঘ্র রথ দর্শনার্থে নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আসুন, আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। প্রভু করেন কি, তাহাই স্বীকার করিলেন।

সার্ব্বভৌম, রাজা ও রামানন্দের এই কার্য্যে গৌরভক্তগণ মনে একটু ব্যথা পাইতে পারেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাউন কি না সে অল্প কথা। প্রকৃতই গদাধর যাহা বলিয়াছেন যে তিনি যেখানে সেই থানেই বৃন্দাবন, সে ঠিক কথা। কিন্তু প্রভু একবার দেশে যাইবেন, স্বদেশ দর্শন করিবেন, জননীকে দর্শন করিবেন। জননীর বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ, তাঁহার এক পুত্র নিমাই। চির বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াও এই উদ্যোগে একবার স্বামীর শ্রীমুখ দেখিয়া চিত্ত জুড়াইবেন। এরূপ কার্য্যে কি বাধা দিতে আছে ? এরূপ কার্য্যে বাধা দিলে কিছু স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। কেন না, "প্রভু তুমি গেলে আমরা বাঁচি না,

অতএব তোমার মাতা ও ঘরণী তোমার দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকুন," এই রাম রায়ের কথা। এ কথা কি ভাল? শচী অতি বৃদ্ধা, তিনি যে কোন দিন মরিতে পারেন। যদি তিনি ইহার মধ্যে দেহত্যাগ করেন তবেত এ জগতে আর তাঁহার নিমাইয়ের মুখ দেখা হইল না?

কিন্তু রাম রায় প্রভুর সাড়ে তিন জন পাত্রের মধ্যে এক জন। তিনি প্রভুর প্রিয় হইতে প্রিয়।

অন্যের কা কথা প্রভু বৃন্দাবন যাইতে।
দুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছে চিত্তে॥
আজি রহ কালি রহ বলে রামানন্দ।
দুই বর্ষ রাখিলেম হ'য়ে প্রতিবন্ধ॥

যাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। হয়ত রাম রায় ভাবিলেন যে, শ্রীভগবানের আবার জননী কে? হয়ত ইহাও ভাবিলেন যে, শ্রীভগবানের ঘরণী ও জননীকে সামান্য মায়ায় কেন অভিভূত করিবে? বোধ হয়, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুর ইচ্ছা না হইলে শচী কখন এ সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রভু একবারমাত্র দেশে যাইবেন, অতএব তাঁহার যত বিলম্ব করিয়া যাওয়া হয় ততই ভাল। বোধ হয় সেই জন্যই তিনি ও সার্ব্বভৌম প্রভুকে যাইতে দেন নাই। প্রভুকে লোকে স্বেচ্ছাময় বলে, কিন্তু তিনি আবার ভক্তের বশ। প্রভু তখন গমন করিলেন না, নবদ্বীপবাসিগণের অপেক্ষা করিয়া নীলাচলে রহিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে আসিয়া সুরধুনীর দুই তীর হরিনামে উন্মত্ত করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমে যত আচার সমুদায় ত্যাগ করিলেন। তিনি উত্তম পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভরণ ধরিলেন, পায়ে নূপুর পরিলেন, সুতরাং তাঁহার বৃহৎ এক দল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিকগণকে হিন্দুসমাজের সহিত মিলন করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান উদ্ধারণ দত্ত অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভেক লইয়া নিতাইয়ের পশ্চাদ্গামী হইলেন। নিতাই কত লক্ষ লোককে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু তবু তিনি সমাজ কর্ত্তৃক বড় প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। এমন কি, অনেক বৈষ্ণব পর্য্যন্ত তাঁহার বিপক্ষ হইলেন, কেহ তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ, কেহ বা প্রভুর নিকট তাঁহার কলঙ্ক রটাইতে লাগিলেন। নিতাই

সামাজিক-উৎপীড়নে জর্জ্জরীভূত হইয়া একক, কেবল দুই একটী ভৃত্য ও জন কয়েক পারিষৎ সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট অনুমতি লইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও হইয়াছে। যে প্রভু এত কঠোর সন্ন্যাস করিতেছেন তিনি কি তাঁহার সমুদায় আচার ত্যাগ রূপ কার্য্য অনুমোদন করিবেন ?

শ্রীনিত্যানন্দ এইরূপে নীলাচলে আগমন করিয়া একটী পুষ্পোদ্যানে বসিয়া দুঃখে ও ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কি ছিলেন কি হইয়াছেন এই দুঃখ, প্রভু কি বলিবেন এই ভয়। যাঁহার হাস্যময় শ্রীমুখ দেখিলে পুত্র-শোকীর দুঃখ দূর হয়, এখন তাঁহার মুখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দের আর্ত্তনাদ সামান্য কথা নয়। উহা তখনি প্রভুর গোচর হইল। প্রভু জানিলেন নিতাই আসিয়াছেন, আসিয়া তাঁহার ভয়ে ও মনের দুঃখে বসিয়া রোদন করিতেছেন। তখন ভক্তবৎসল প্রভু আর তিল মাত্র বিলম্ব করিলেন না, একাকী সেই স্থানে ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়া দেখেন নিতাই জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করিতেছেন।

নিতাইকে প্রভু ডাকিলেন না, কিছু বলিলেন না, তবে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, আর একটী শ্লোক রচনা করিয়া নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীনিত্যানন্দ যদি অতি কুকর্ম্মও করেন, তবু তাঁহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রহ্মার বন্দনীয়।"

এখানে এ কথা রাখিয়া আর একটী অদ্ভুত কথা বলিব। শ্রীগৌরাবতারের বৈষ্ণবগণ হিন্দুগণের পক্ষে যে সমুদায় অসম্ভব কথা ও কার্য্য তাহা বলিতেন ও করিতেন। গঙ্গাজল ও তুলসী লইয়া প্রভুর চরণ পূজা করিতেন। প্রভু বলিতেছেন নিত্যানন্দের চরণ ব্রহ্মার বন্দনীয়। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, গৌর-লীলা যাঁহাদের লইয়া তাঁহাদের গৌর অবতার সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র ছিল না, অর্থাৎ প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ, ও নিতাই যে বলরাম, ইহা কেহ একটু মাত্রও সন্দেহ করিতেন না।

নিতাই নয়ন মেলিলেন, দেখিলেন প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন। ইহা নিতাই সহিতে পারিলেন না, তখন দ্রুত বেগে উঠিয়া প্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন, কিন্তু অমনি আছাড় খাইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া গেলেন। চিরদিন প্রভু আছাড় খাইলে নিতাই

তাঁহাকে তুলিয়া থাকেন। এখন তাহার উল্টা হইল, প্রভু যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। এক দিন শ্রীঅদ্বৈত কাতর হইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি তোমার সমুদায় ভক্তগণকে ভক্তি দিয়াছ। তাঁহারা সেই আনন্দে ভাসিতেছেন। তুমি আমাকে খানিক রাগ, অহঙ্কার, অবিশ্বাস দিয়াছ ও তাহাতে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি।" এখন নিত্যানন্দ প্রভুকে করজোড়ে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। বলিতেছেন, "প্রভু—

[illegible] তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলে প্রেমভক্তি আচরণ॥
মুঞি ধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারি জনে যে সকলে হাস্য করে॥" (চৈতন্য ভাগবত)

শ্রীঅদ্বৈত ভগবানের চিদংশ। তাঁহার অবিশ্বাস, অহংকার, ও ক্রোধ থাকিবারই কথা। আবার নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের আনন্দাংশ, তাঁহার পক্ষে তপ ও বিধি পালন কিরূপে চলিবে? নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, আমি ছিলাম সন্ন্যাসী আমাকে গৃহী করিলে, এখন লোকে আমাকে দেখিয়া হাস্য করে।

কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে॥
মন প্রাণ সবারি ঈশ্বর প্রভু তুমি।
তুমি যে করাহ সেই রূপ করি আমি॥
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলে।
আপনিই ঘুচাইয়া এ সব করিলে॥"
প্রভু বলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধ ভক্তি বই কিছু নহে আর॥" (ভাগবত)

প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ, তোমার দেহে যে অলঙ্কার উহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে নববিধ ভক্তি তাহারই প্রকাশ বই আর কিছুই নয়। তুমি স্বর্ণবণিকগণকে যে ভক্তি দিয়াছ উহা স্বয়ং মহাদেবও বাঞ্ছা করেন। তোমার সঙ্গিগণ যাঁহারা নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহাঁরা সকলেই গোপবালক! গোপবালকের জপ তপ শোভা পাইবে কেন? শ্রীপাদ তোমার আবার বিধি কি?"

প্রভুর প্রশ্রয় বাক্য শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ পরমাশ্বাসিত হইলেন। ত্রিজগতে

তিনি আর কাহারও নহেন, কেবল তাঁহার প্রভুর। নিতাই এইরূপ আপনি গৃহস্থ হইয়া জগতের জীবকে দেখাইলেন যে, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বৈষ্ণবাচারের বিরোধী নয়। তাহার পর প্রভু নিজ বাসায় গমন করিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন। সেখান হইতে যমেশ্বর টোটা, শ্রীগদাধরের স্থানে গমন করিলেন। গদাধর ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের আগমন শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন।

নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বর সে ধরে। (ভাগবত)

এইরূপ প্রীতি হইবারই কথা, কারণ দুই জনেই গৌর ব্যতীত আর কিছু জানেন না। নিতাই, গদাধরের গোপীনাথের নিমিত্ত, এক মণ অতি শুভ্র ও সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি রঙ্গিন বস্ত্র আনিয়াছেন। গদাধর সে দিবস নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের উদ্যোগ এখন শ্রবণ করুন। গদাধর—

তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিল।
আপন টোটার শাক তুলিতে লাগিল॥

গদাধর কি মাটি কোপাইয়া শাক রোপণ করিয়াছিলেন? তাহা নহে,—

কেহ করে নাই দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিল এক পাক।
তেতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিল লোন জল॥

এই গেল নিমন্ত্রণের উদ্যোগ!

উভয়ের ইচ্ছা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সাহস হইতেছে না। তাঁহাদের মন জানিয়া প্রভু আপনি আগমন করিলেন।

"গদাধর "গদাধর" ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমেতে গদাধর বন্দে পদ দ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন "প্রভু শুন গদাধর।
আমি কি না হই এই নিমন্ত্রণ ভিতর॥
নিত্যানন্দদ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন ইথে আছে মোর ভাগ॥" (ভাগবত)

অবশ্য ভাগ আছে তাহা কে না বলিবে। অতএব তিন প্রভু একত্র বসিয়া হাস্য কৌতুকে ভোজন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নবদ্বীপ-ভক্তগণের শ্রীনীলাচলে আসিবার সময় হইল। এবার তাঁহাদের আসিতে একটু কষ্ট হইল। যেহেতু তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু-মুসলমানে আবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় লোক চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছে। ভক্তগণ কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আগমন করিলেন। সেই সঙ্গে প্রভুর বাড়ী-রক্ষাকর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত আসিলেন। ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রীতি সম্ভাষণ হইয়া গেল। প্রভু দামোদর পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। অন্য লোক হইলে জিজ্ঞাসা করিত, "মা কেমন আছেন।" কিন্তু প্রভু তাহা করিলেন না। যখন প্রভু সন্ন্যাস লয়েন তখন জননীকে বলেন যে, "মা আমার এই ভিক্ষা মনে রাখিও, সদা কৃষ্ণনাম লইও।" এখন প্রভু দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দামোদর জননীর ত শ্রীকৃষ্ণভক্তি আছে?"

এক কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীতে কোন্দল হয়, তখন সখীগণ রাধার পক্ষ লয়েন। সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যশোদার বচসা হইলে ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ না হইয়া যশোদার পক্ষ হয়েন। সেইরূপ দামোদর শচীদেবীর সেবক, তিনি শচীর পক্ষ। প্রভু যখন বলিলেন, জননীর কৃষ্ণভক্তি আছে ত, অমনি দামোদর ক্রুদ্ধ হইলেন। দামোদর অতি বড় রুক্ষ লোক, কাহাকেও ন্যায্য বলিতে ক্রটী করেন না।

পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
"কি বলিলে গোঁসাই মায়ের ভক্তি আছে।
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন লাজে॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম॥" (ভাগবত)

দামোদর ক্রোধে আরও বলিলেন, গোসাঞি "তুমি যে কৃষ্ণভক্তি পাইয়াছ তাহা সেই জগজ্জননী শচীদেবীর কৃপায়।"

প্রভুও ইহাই শুনিতে দামোদরকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রভু তখন উঠিয়া দামোদরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন—

"আজ দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত সব আমারে বলিলা॥

যত কিছু কৃষ্ণভক্তি সম্পত্তি আমার।
জননী প্রসাদে সব দ্বিধা নাহি তার॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে মধুর হাসি এরূপ চিত্ত বিমোহিত করিত যে, অনেক ভক্ত শুধু তাঁহার সেই মধুর হাসি দ্বারা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইতেন। কিন্তু প্রভুর হাসি যেরূপ মধুর বচনও সেইরূপ। শুধু গলার স্বর বলিয়া নয়, তিনি যখন যাহার সহিত কথা বলিতেন, তখন তাহার বোধ হইত যে, প্রভু তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। অন্তর্য্যামি প্রভু সমুদায় জানেন। যদিও ভাবে বিভোর তবু যদি গার্হস্থ্য কথা কহিতে লাগিলেন, তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, বহির্জগতের তিনি সমুদায় সংবাদ রাখেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট তাঁহার শারীরিক পারিবারিক ইত্যাদি সমুদায় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বুঝিল যে প্রভু তাঁহার বিষয় দিবানিশি চিন্তা করিয়া থাকেন, আর সমুদায় অবগত আছেন। সকলেই ভাবেন যে প্রভুর ন্যায় আত্মীয় তাঁহার ত্রিজগতে আর কেহ নাই। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

হেন সে তাঁহার রঙ্গ সবেই মানেন।
আমার অধিক প্রীত কারু না বাসেন॥

সকলেই ভাবেন, প্রভু তাঁহারি আর তিনি প্রভুর। এইরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ। যাঁহারা নীলাচলে আসিতে পারেন নাই, প্রভু তাঁহাদের কথা ঐরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা গৃহে বসিয়া উহা শ্রবণ করেন। করিয়া জানেন যে, প্রভু তাঁহাদিগকে এক বিন্দুও ভুলেন নাই। তাহাতে তাঁহারা প্রভুর সাক্ষাদ্দর্শনের ফল পান।

ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা আসিলে প্রভু বলিলেন, "এবার তোমরা অধিক দিন এখানে থাকিও না, রথ দর্শন করিয়াই গৃহে গমন কর, আমি বিজয়া দশমী দিবসে শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিব। যাইবার বেলা গৌড়ে যে দুই দয়াময়ী আছেন, শ্রীগঙ্গা ও জননী, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যাইব।" ভক্তগণ ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। প্রভু দেশে গমন করিবেন, শচীর নিকটে যাইবেন, ইহাতে ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে প্রভুকে একে বারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন না। ভক্তগণ রথ দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এক যুক্তি করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বরাবর প্রভুকে সন্দেহ করিয়া ভক্তগণকে দুঃখ দিয়াছেন, আপনিও দুঃখ পাইয়াছেন। তাহার প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ তিনি এখন একটি সংকল্প করিলেন। লোকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৌর-কীর্ত্তন প্রচার করিবেন মনস্থ করিলেন, ও একটি গীতও বাঁধিলেন। কিন্তু গাইবে কে? ঘরে বসিয়া গাইলে কোন ফল নাই, ঘরে বসিয়া গৌর-গুণ সকলেই গাইয়া থাকেন। প্রভুকে শুনাইয়া গাইতে হইবে, কিন্তু প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন?

এক জন ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু ক্লেশে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন, দুই দিবস অহরহ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সহজ অবস্থায় প্রভু দীনের দীন। কিসে কৃষ্ণের দাস হইবেন, কিসে কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে তাঁহাকে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, ইহা দিবানিশি নিজ জনের গলা ধরিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে এ কথা বলিতে কাহার শক্তি হইত না যে, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভগবান, কি তুমি ঈশ্বর।

তবে,যখন ভগবানরূপে প্রকাশ পাইতেন, তখন প্রভু আবার বলিতেন যে, "আমি শ্রীকৃষ্ণ, ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার আসিবার বহু কারণ আছে,-তাহার মধ্যে এক কারণ জীবকে এই অভয় প্রদান করা যে, তাহারা আমার অতি প্রিয়, ও ভক্তি দ্বারা অতি সহজে আমাকে পাইতে পারে।" প্রকাশাবস্থায় ভক্তগণ অনায়াসে চন্দন তুলসী গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত অনেক বিবেচনা করিয়া একটি পদ রচনা করিলেন। সে পদটি শ্রবণ করুন—

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥

এ পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই, প্রভু শুধু নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এখন নারায়ণ সন্ন্যাসী মাত্রকে বলা যায়। অদ্বৈত ভাবিলেন, যদি প্রভু নিতান্ত রাগ করেন, তবে বলিলেন যে, তিনি সন্ন্যাসী তাঁহাকে নারায়ণ বলিলে তিনি আপত্তি করিতে পারেন না। যেহেতু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদিগকে নমো নারায়ণায় বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণকে পদ শুনাইলেন, আর বলিলেন যে, "প্রভুর কৃপায় আমরা সর্ব্ব প্রকারে ধন্য

হইয়াছি। এসো আমরা সেই প্রভুর যশ গান করি। প্রভুকে জগতে প্রচার করিতে হইলে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন প্রকাশ্যে করিতে হইবে।” ভক্তগণ শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, কিন্তু প্রভু রাগ করিবেন এই কথা উপস্থিত করিলেন। তখন অদ্বৈত বলিলেন যে, সে ভার তাঁহার উপর। তখন প্রভুর দুই চারি শত ভক্ত যন্ত্র মিলাইয়া নব অবতারের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে তখন বাঙ্গালিগণ প্রধান ইহা অনেকে স্বীকার করেন। বাঙ্গালি এখন প্রধান কি না এ কথার প্রতি অনেক সন্দেহ আছে। তখন যে তাঁহারা প্রধান ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতের সৌভাগ্য ত্রিহুত হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ জগতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তন্ত্র-ধর্ম্ম সমুদায় ভারতবর্ষে বিস্তার করিলেন। কাশীতে বেদের প্রাধান্য রহিল বটে, কিন্তু সেই রূপ ন্যায়ের আকর স্থান নবদ্বীপ হইল। চণ্ডীদাস বাঙ্গালি, জয়দেব বাঙ্গালি, উমাপতি বাঙ্গালি, গীতার টীকাকার অর্জ্জুনমিশ্র বাঙ্গালি। সেই বাঙ্গালির মধ্যে প্রধান শ্রেণীর দুই চারি শত লোক, আমাদের ন্যায় একজন দেহধারীকে,—যাঁহার ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে, নিদ্রা আছে, ভ্রম আছে, অচৈতন্য আছে,—তাঁহাদের “জীবনে মরণে গতি” স্থির করিয়া, তাঁহার যশ গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দেহধারী বস্তুটী তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির যে পূজা তাহা লইতেছেন। কোন পরিষ্কার রজনীতে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও যে কত নক্ষত্র। ইহাদের সংখ্যা করা যায় না। ইহারা এক একটি, আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বহুতর জগতকে, আমাদের সূর্য্যের ন্যায় আলো দিয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কিরূপ বৃহৎ বস্তু তাহা আকাশের দিকে চাহিয়া কতক বুঝিতে পারিবে। সেই ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মা, তাঁহার যে স্বামী তিনি কাশীমিশ্রের আলয়ে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন! ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ শক্তিধর বুঝিবেন, আর এরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না।

এই উপরি উক্ত পদ ধরিবা মাত্র আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। তখন ভক্তগণের প্রভুর সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ ভয় ছিল তাহা উড়িয়া গেল। তখন সমস্ত ভয় দূরে ফেলিয়া দিয়া, নিষ্কপটে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীহরি, তিনি যে শচীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা এক বাক্য হইয়া সকলে গাইতে লাগিলেন।

এবারে আর লুকাচুরি কিছু নাই। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া গাইতে লাগিলেন যে, "হে হরি! তুমি গোলোক ত্যাগ করিয়া যে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এখন কৃষ্ণ-চৈতন্য নামধারী হইয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার।" ভক্তগণ গাইতে গাইতে আনন্দে পাগল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তন-ধ্বনি জগত ব্যাপিয়া উঠিল।

প্রভু বাসায় ছিলেন, এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণে গেল। তখন শীঘ্র শীঘ্র বাসা ত্যাগ করিয়া এই কীর্ত্তনানন্দে প্রবেশ করিতে আগমন করিলেন। প্রভুকে দেখিয়া আর কেহ ভয় পাইলেন না, তখন আনন্দ ভয়কে একেবারে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। প্রভু সহাস্যে আসিলেন, তখন সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গাইতে লাগিলেন, "তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার," "তুমি কৃষ্ণ, তোমার জয় হউক"। ভক্তগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেছেন ভাবিয়া, তাঁহারা কি করিতেছেন বুঝিতে প্রকৃতই প্রভুর একটু সময় গেল। কিন্তু একটু পরে প্রভু সমুদায় বুঝিলেন। তখন লজ্জায় তাঁহার চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল। প্রভু আর কিছু বলিলেন না, যে পথে আসিলেন সেই পথে বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব দেখিয়া একটু তটস্থ হইলেন, কাজেই কীর্ত্তন আপনাপনি বন্ধ হইল। তখন তাঁহারা একত্র হইয়া প্রভুর বাসায় গমন করিলেন। দলপতি শ্রীঅদ্বৈত অগ্রে, তাঁহার পশ্চাৎ শ্রীনিবাস, তাঁহার পশ্চাৎ আর সকলে। বাসার নিকটে যাইয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কি করিতেছেন। দ্বাররক্ষক গোবিন্দ বলিলেন যে, তিনি প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া বাসায় আসিয়া শয়ন করিয়া নয়ন মুদিয়া আছেন। ইহাতে ভক্তগণ আশ্বাসিত হইলেন না; বরং আরো ভীত হইলেন। তখন তাঁহারা তাঁহা-দের আগমন সংবাদ প্রভুকে দিতে শ্রীগোবিন্দকে বলিলেন। গোবিন্দ যাইয়া প্রভুকে জানাইলেন, প্রভু ভক্তগণকে আসিতে অনুমতি দিলেন। তখন ভক্তগণ নীরবে প্রভুর পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন, বসিয়া প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভুও নয়ন মুদিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিলেন।

একটু পরে প্রভু উঠিয়া বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতকে বড় খাতির করেন বলিয়া, তাঁহাকে কিছু না বলিয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আজ তোমরা একি কীর্ত্তি করিলে?" শ্রীবাস ও ভক্তগণ সকলে দেখিলেন যে, তাঁহারা যত ভয় করিয়াছিলেন, প্রভুর তত রাগ হয় নাই। তখন আশ্বাসিত

হইয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! কি অকীর্ত্তি করিলাম বলুন।" প্রভু তখন একটু উগ্র হইয়া বলিতেছেন, "কি অকীর্ত্তি তাহা বলিতে হইবে? কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রাখিয়া তোমরা একি আরম্ভ করিলে? পরিণামে তোমাদের ও আমার সর্ব্বনাশ। অগ্রে লোকের উপহাস, তাহার পরে পরকাল নাশ।" শ্রীবাস তখন অতি নিঃশঙ্ক হইয়াছেন। প্রভু তাঁহাদিগকে মারিবেন কি গালি দিবেন এ ভয় তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের ভয়, পাছে প্রভু মনের ক্লেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, কি নীলাচল ত্যাগ করেন, কি প্রাণে মরেন। কিন্তু প্রভুর সেরূপ কিছুই ভাব না দেখিয়া ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন ভয় নাই। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! আমি জীবের স্বাধীনতা স্বীকার করি না। তুমি প্রভু আমরা অধীন। তুমি যেমন বলাইলে আমরা তেমনি বলিলাম।" ইহাতে প্রভু আরো ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "করিলে তোমরা, অপরাধী হইলাম আমি?" ইহা বলিতে বলিতে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বহুতর লোকে প্রভুর বাসার দ্বারে দাঁড়াইয়া, "জয় কৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া গৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। কেহ বলে "জয় সচল জগন্নাথ," কেহ বলে "জয় সন্ন্যাসীরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ।" ইহাঁরা সমুদায় গৌড় দেশীয়, রথোপলক্ষে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। প্রভুর দর্শন-লালসায় তাঁহারা বাসায় আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। আসিয়া প্রভুর নাম-কীর্ত্তন করিয়া দ্বারে গাইতে লাগিলেন।

> হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে।
> সহস্র সহস্র জন না জানি কোথাকারে।
> জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবারে॥
> কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চট্টগ্রামবাসী।
> শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী॥
> সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
> শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার করিয়া বর্ণন॥ (ভাগবত)

তখন শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! আমরা তোমার দাস, যাহা বল তাহা আমাদের করিতে হইবে, কিন্তু এখন কি করিয়া ইহাদের মুখ বন্ধ করিবে?" প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি কৃষ্ণের কৃপা পাত্র, তোমার শক্তির অবধি নাই। তুমি নিজ শক্তির বলে এই সমুদায় আনাইয়া আমাকে নিরুত্তর করিতেছ।"

শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি ঘরে লুকাও, আর বাহিরে প্রকাশ হও, এ তোমার কি রীতি? এ সমুদায় লোক, যাহারা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করিতেছে, ইহারা তোমাকে সম্ভবতঃ কখন দেখে নাই। ইহারা এ কথা কেন বলে যে তুমি ভগবান? তুমি যাই বল, আমরা কিন্তু উহাদের শিখাইয়া দিই নাই।"

প্রভু বলিলেন, "তোমরা নিজজন, তাই তোমাদের বলি যে তোমাদের এ সমুদায় লোকদিগকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য।" শ্রীবাস সঙ্কেত দ্বারা অনেক সময় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। প্রভুর কথা শুনিয়া তিনি সেই কথার উত্তরস্বরূপ দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া যেন মুষ্টির মধ্যে কি পুরিয়া নিচে আনিলেন। প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত! তোমার সঙ্কেত আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।" শ্রীবাস বলিলেন, "এই হস্তের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত করিলাম, আর কি?" ইহা বলিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু! তোমার নির্ম্মল যশ জগৎ ব্যাপিতেছে, আমরা উহা রোধ করিতে পারি না। আমাদের রোধ করিতে ইচ্ছাও হয় না। তোমার শ্রীচরণকৃপাবলে সমুদায় জগৎ উদ্ধার হইয়া গেল। প্রভু, লোকে কি সাধে তোমাকে পূজা করে?" এই কথা বলিতে শ্রীবাসের ও সকলের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। প্রভু তখন নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গের রাঙ্গাপদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
নির্ম্মল হৃদয় হৈল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়,
তাঁরে আমি যাই বলিহারী।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, "গৌর-নাম জপ করিলে সদ্য প্রেমের উদয় হয়।" ইহা আমরাও দেখিয়াছি। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, "যদি ভক্তি-পথ অবলম্বন কর, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদ আশ্রয় কর," ইহা ঠিক। এমন কাণ্ডারী, এমন আশ্রয়, এমন আদর্শ, এমন গুরু, এমন ভজনীয়, আর জগতে মিলিবে না। ঠাকুর মহাশয় আবার বলিতেছেন যে, "গৌরলীলা হৃদয়ে প্রবেশ করিলে অন্তর নির্ম্মল করে।" ইহাও ঠিক। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেমে লোলুপ, তাঁহারা গৌরলীলা আস্বাদন করুন। মন

নির্ম্মল ও হৃদয় দ্রব করিতে এমন তেজস্কর বস্তু আর ত্রিজগতে কিছুই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম তখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াছে। দক্ষিণ দেশে যত ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। পশ্চিম দেশেও তাঁহার গৌরব তখন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সকলে শুনিয়াছেন যে, একটী মনুষ্য-দেহধারী বস্তু, যাঁহার সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের কান্তি, যাঁহার লোচন খঞ্জনের ন্যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নবদ্বীপে ও নীলাচলে পূজিত হইতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় প্রধান নগর বারাণসী; সেখানে সার্ব্বভৌমকে সকলে অতি মান্য করেন। সকলে শুনিলেন যে, সেই কৃষ্ণ বলিয়া পূজিত বস্তুটী সার্ব্বভৌমকে পাগল করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ দশ সহস্র সন্ন্যাসী লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ভাবুক সন্ন্যাসী চৈতন্য সার্ব্বভৌমের ন্যায় প্রবল পণ্ডিতকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তিনি প্রভুকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায় করিলেন। ইহা ভাবিয়া একটী নীলাচলযাত্রীর দ্বারা প্রভুর নিকট একটী শ্লোক পাঠাইলেন, সেই ব্যক্তি নীলাচল আগমন করিয়া ভক্তগণ দ্বারা উহা প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই শ্লোকটী এই—

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা মলহরা স্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা
রত্নস্তারক মোক্ষদং তনুমৃতেশম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতত্ত্বদ্ভুতধামতঃ সুরপুরো নির্ব্বাণমার্গস্থিতং
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

"যে স্থানে মাণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারক মোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্ত্তী নির্ব্বাণ পথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ সেই প্রকৃতরত্ন ত্যাগ করিয়া, পশুরা যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যাশায় অন্য দিকে ধাবিত হয়।"

প্রভু প্রকাশানন্দের নাম শুনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শ্লোক পড়িয়া সুখ পাইলেন না, তবু প্রকাশানন্দের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই যাত্রীর দ্বারা প্রভু উত্তর স্বরূপ একটী শ্লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

ধর্ম্মাম্ভোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বুভাগীরথী,
কাশীনাম্পাতিরর্দ্ধমেবভজতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ং।

এতন্মেবহি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং,
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব্বাণদং ॥

"মণিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্ম্মজল ও ভাগীরথী ভগবানের চরণবারি ও কাশী-পতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেন এবং বারাণসী নগর যাঁহার নাম নিস্তার তারক। অতএব হে সখে! সেই কৃষ্ণের নির্ব্বাণ-প্রদ চরণ কমল তাঁহাকে ভজনা কর।"

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিয়া একেবারে চটীয়া উঠিলেন। তখন প্রভু যে জগন্নাথ প্রসাদকে উপেক্ষা করিতেন না, এই কথা লইয়া গালি দিয়া আর একটি শ্লোক পাঠাইলেন, সেটি এই—

বিশ্বামিত্রপরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশিন
এতে স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নঃ সঘৃতং পয়ো দধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্দুস্তরেৎসাগরং ॥

"বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল পত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়াও মনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন, যে মানবগণ ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-যুক্ত ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারাও যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে তবে চটক পক্ষীও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে।"

এই শ্লোক দেখিয়া প্রভু বলিলেন, ইহার উত্তর প্রয়োজন করে না, তাই প্রভু আর কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িলেন না। প্রভুকে গোপন করিয়া সে শ্লোকের একটী উত্তর পাঠাইয়া দিলেন—

সিংহোবলী দ্বিরদশূকর মাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবত স্তৃণশিখাকণমাত্রভোগী
কামী ভবেদনু দিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ ॥

"বলবান সিংহ হস্তী শূকর প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিয়াও বৎসরে একবার মাত্র ক্রীড়া করে, কপোত সামান্য বস্তুর কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াও নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে, ইহার কি হেতু বল।"

যেমন কাশীতে প্রকাশানন্দ বেদে, তেমনি পূর্ব্বাঞ্চলে বেদে ও ন্যায়ে সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দের গালিপূর্ণ পত্র দেখিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিলেন যে, তিনি বারাণসী যাইয়া

প্রকাশানন্দকে নিরস্ত করিয়া ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তুমি সে কার্য্য করিও না, সে অতি কঠিন স্থান, তুমি সেখানে যাইও না, সেখানে তুমি কিছু করিতে পারিবে না।" কিন্তু সার্ব্বভৌম এক শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট খাট হইয়াছেন, প্রকাশানন্দের নিকট কেন হইবেন? বিশেষ তখন তিনি প্রেমে ঢল ঢল করিতেছেন। মনে ভাবিলেন, প্রভু অতি প্রেমে তাঁহাকে যাইতে দিতেছেন না। তিনি প্রভুকে গোপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার মনের গৌরব এই যে তিনি প্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তখন ভাবিলেন যে, ভক্তগণ যখন নীলাচলে আসিবেন, আসিয়া চারি মাস থাকিবেন, সে কয়েক মাস প্রভুকে তাঁহাদের হস্তে রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, বিদেশে থাকিতে পারিবেন। ভক্তগণ আসিতেছেন শুনিয়া তিনিও লুকাইয়া গৌড় পথে বারাণসী চলিলেন। পথে শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভক্তগণ সার্ব্বভৌমকে দেখিয়া অবাক হইলেন। হরিদাস সেবার নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে শান্তিপুর গিয়াছিলেন। তিনিও নীলাচলে আসিতেছেন। সার্ব্বভৌম শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া শেষে হরিদাসকে এই শ্লোক বলিয়া নমস্কার করিলেন, যথা—

কুল জাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ।

হরিদাস লজ্জা ও ভয় পাইয়া দৌড় মারিলেন। কিন্তু পাঠক সার্ব্বভৌম কি ছিলেন আর কি হইয়াছেন, একবার মনে করুন। এখানে চন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিব—

অদ্বৈত গোসাই সার্ব্বভৌমে জিজ্ঞাসিলে।
শ্রীপ্রভুর পদ ছাড়ি কি লাগি আইলে॥
সার্ব্বভৌম বলে মোর মনে এই লইল।
কাশীর সন্ন্যাসী সব ভক্তি না বুঝিল॥
ভাষ্য সহ বেদান্তাদি করয়ে বিচার।
কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদ্য অজ্ঞাত সবার॥
তৎ পদার্থ ত্বং পদার্থ ব্যষ্টি সমষ্টি।
ব্রহ্ম চিদানন্দ স্বরূপ করে হরে তুষ্টি॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
গৌরাঙ্গের মত না বুঝিল কোন জন॥

তাই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার করিতে কাশীতে যাইতেছেন। সার্ব্বভৌম আরও বলিলেন যে তিনি প্রভুর অনভিমতে যাইতেছেন। যত অসুর ছিল, তাহাদের কতক বলরাম নাশ করেন। যাহাদের নাশ বলরামের শক্তির বাহিরে, তাহাদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাশ করেন। প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা অসুর সার্ব্বভৌমের বধ্য নয়, ঠাকুরের নিজের বধ্য। তাই গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বারাণসী যাইতে নিষেধ করিলেন। সার্ব্বভৌম বারাণসী যাইয়া কিছু করিতে পারিলেন না। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং যখন বারাণসী গমন করেন, তখন প্রকাশানন্দকে তাঁহার চরণে আনয়ন করেন। প্রকাশানন্দের সেই উদ্ধারকাহিনী বিস্তাররূপে আমার কৃত প্রকাশানন্দের জীবনীতে লেখা আছে।

ভক্তগণ তাহার পরে বিদায় লইয়া বাড়ী চলিলেন। প্রভু বলিলেন যে, তিনি বিজয়া দশমী দিবসে গঙ্গা ও জননী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন। ভক্তগণ যাইবার বেলা কুলীনগ্রামবাসিগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভু, বৈষ্ণব কাহাকে বলে? তখন প্রভু পরিষ্কার উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন, বলিলেন যে, বৈষ্ণবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা— বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম। যাঁহাদের দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবপ্রধান বলিয়া জানিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার চরিত যত পুরব পীরিত।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মুরছিত॥
সে হেন নদীয়াপুর সে হেন সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি॥

বিজয়া দশমী আসিতেছে, রামানন্দের প্রাণ শুখাইয়া যাইতেছে। সার্ব্বভৌমের এই দশা, রাজারও এই দশা। যাঁহারা গৃহী, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, তাঁহারাও যাইতে পারিবেন না, যথা গদাধর। তিনি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়া গোপীনাথের সেবা করিতেছেন, তিনি নীলাচল ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আর সকলে যাঁহাদের যাইবার কোন বাধা নাই, প্রভুর সঙ্গে যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না, সেখানে কেন তাঁহারা গৌর-শূন্য নীলাচলে বাস করিবেন? প্রভুর সঙ্গে স্বয়ং পুরী ও ভারতী চলিলেন। সরূপ অবশ্য চলিলেন। প্রভুর আশ্রিত অন্যান্য সন্ন্যাসিগণও চলিলেন। নবদ্বীপের প্রায় শত ভক্ত, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহারাও চলিলেন।

প্রভুর নবদ্বীপের নিজ জনের মধ্যে কেবল দুঃখী গদাধর রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ"। সেই গদাধরের গৌর-শূন্য নীলাচলে একা থাকিতে হইবে। অবশ্য সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি প্রভুকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন। কিন্তু প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, গদাধর ক্ষেত্রের সন্ন্যাসী, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে নাই, প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন?

প্রভু জননী ও অন্যান্য প্রধান ভক্তের নিমিত্ত জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ

সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভু মহাব্যস্ত, একি নিজ দেশে নিজজনকে দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া, কি বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া, তাহা কে জানে? তবু এ কথার বিচার পরে করিব। প্রভুর মনে একটী খেয়াল হইয়াছে। তিনি ভক্তগণকে লইয়া বাসা হইতে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিবেন ও সেখান হইতে নৃত্য করিতে করিতে নিজ দেশাভিমুখে গমন করিবেন। তিনি নৃত্য করিবেন, আর গাইবেন—সরূপ।

প্রভাত হইল, ভক্তগণ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু মন্দিরে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। ইহা মনে স্থির আছে, স্বরূপ গাইবেন তিনি নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। কিন্তু সরূপ কোথা? সরূপকে পাওয়া গেল না। প্রভু অনেকক্ষণ বিলম্ব করিয়া সরূপকে না পাইয়া, নৃত্য করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া, বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। প্রভুর নৃত্য করা হইল না, অধিকন্তু সিংহদ্বারে সরূপকে অপেক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। ভাবিতেছেন, আসিতে পথে ত নৃত্য করা হইল না। সরূপ আসিলে সিংহদ্বার হইতে ঠাকুরের সম্মুখ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। তবু সরূপ আসিলেন না। প্রভু এইরূপ বহুক্ষণ কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু সরূপ নিরুদ্দেশ। প্রভু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সরূপ আসিলেন। প্রভুর হস্তে একখানি গীতা গ্রন্থ।

সরূপের কি নিমিত্ত আসিতে বিলম্ব হইল, জানি না। সরূপকে দেখিবা মাত্র প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সেই গীতাগ্রন্থ দ্বারা সজোরে তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন, তাহার পরে শ্রীচরণ দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন, করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সরূপ প্রভৃতি তখন ভীত হইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভু শিশুকালে জননীকে একটি ঢিল ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন। জননী তখন নিমাইকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কপট মূর্চ্ছাভাব অবলম্বন করেন। নিমাই তখন "মা" "মা" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া গলা ধরিয়াছিলেন। আর প্রভু সরূপকে প্রহার করিলেন, সরূপ ইহাতে ত্রিজগতের মধ্যে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে ভাবিলেন। সরূপের ভাগ্যকে শ্লাঘা করিয়া চৈতন্যচরিত-কাব্য-লেখক কবিকর্ণপুর এই সুন্দর শ্লোক দিতেছেন, যথা—

ভাবাভাবাভিভাব্যাভিভব ভাবে ভবো ভবং।
বিশ্বাবেবস্তাব ভাবে বভূব ভুবি বৈভবং॥

"এইরূপে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সরূপের অভাবজনিত বিয়োগে মহাপ্রভু ব্যাকুল হওয়ায়, সরূপেরই জন্ম শোভা পাইয়াছিল এবং ভূমণ্ডলে মহাগৌরব হইয়াছিল।" অর্থাৎ মহাপ্রভু যাঁহার বিরহে ব্যাকুল তাঁহারই জন্ম সকল ও তাঁহারই গৌরব।

প্রভুর গৌড়ে গমন বৃত্তান্তের আরম্ভ আমরা, নানা কারণে কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিত কাব্য হইতে লইলাম। প্রভু দেশে আসিতেছেন, এই আনন্দে কবিকর্ণপুর তাঁহার এই ১৯শ সর্গটী নানা ভক্তিযুক্ত কবিতা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। উপরে একটী দিলাম, পরে আরও দিতেছি।

শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া প্রভু প্রভৃতি সকলে আনন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিদায় মাগিলেন। তখন সেবাইতগণ, প্রভু ও ভক্তগণকে আজ্ঞামালা প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে সকলে, কেহ কীর্ত্তন কেহ নৃত্য করিতে করিতে মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। কর্ণপুরের ইহার ভঙ্গিমা বর্ণন শ্রবণ করুন—

কী র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুৎ সু ক ম নো ল য়াঃ।
× × × × × × × × × × × × × × ×
ন র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুৎ সু ক ম নো ল য়াঃ।

"এখন সকলে সেইরূপ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের বাহির হইলেন, ও ঐরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে দেশাভিমুখে চলিলেন।"

স্নানযাত্রার সময় পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন থাকেন, মন্দিরের কপাট খোলা হয় না। সেই নিমিত্ত জগন্নাথবিরহে প্রভু প্রতি বৎসর মৃত-প্রায় হয়েন। সেই প্রভু এখন কিরূপে শ্রীজগন্নাথকে ত্যাগ করিয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন? কথা এই, যতগুলি ভাব, তৎসমুদায় প্রভুর দাসীর স্বরূপ ছিলেন। যখন কৃষ্ণ-বিরহ-ভাব প্রভুর শরীরে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি সজীব হইয়া আসিতেন। প্রভু আপনি যজিয়া জীবকে কোন্ ভাব, কিরূপ তাহা দেখাইতেছেন। এই তাঁহার অবতারের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যখন জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া, প্রভু অনাহারে পড়িয়া থাকিতেন, তখন কৃষ্ণ-বিরহ জীবন্তরূপে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেন এই মাত্র। এখন প্রভু আপন হৃৎপদ্মাসনে শ্রীজগন্নাথের স্থানে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিলেন। কাজেই শ্রীজগন্নাথকে ভুলিলেন, আর "বৃন্দাবন" "বৃন্দাবন" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন।

প্রভু যখন নীলাচল ত্যাগ করিতে চলিলেন, তখন সেই নগরে হাহাকার

পড়িয়া গেল, নীলাচলবাসিগণ প্রভুর সঙ্গ লইলেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ, কি বালক, সকলে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। এই রোদনের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্র, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণকে প্রভু তাঁহার সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন। কাশীমিশ্র আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। কিন্তু গদাধর সে আজ্ঞা পালন করিলেন না। অন্যান্য সকলকে প্রভু অতি মধুর ও কাতর স্বরে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ শুনিলেন না। তাঁহারা সকলেই প্রভুর পশ্চাদগামী হইলেন। তাঁহাদের সকলের ভাব এই যে, প্রভু যেখানে গমন করেন, গৃহ ও নিজ জন সমুদায় ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান নাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ জীবের চিত্ত-আকর্ষক। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে জীবে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

প্রভু এই পশ্চাদগামী লোক সমূহের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কখন পথ ছাড়িয়া বিপথে গমন করিতে লাগিলেন, কখন দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিলেন, কখন বা লুকাইতে লাগিলেন। অর্থাৎ প্রভু পথাপথ জ্ঞান না করিয়া একেবারে দৌড় মারিলেন। যেমন মধুলুব্ধ ভ্রমর, বায়ুতে কম্পিত পুষ্পে বসিতে পারে না, নীলাচলবাসিগণও সেইরূপ চেষ্টা করিয়া প্রভুকে ধরিতে পারিতেছেন না। এই ভক্তগণের অবস্থা বর্ণন করিয়া চৈতন্য চরিত কাব্যলেখক এই একাক্ষর শ্লোক দিয়াছেন—

লললীলো ললল্লীলো লোলো লোলো ললল্ললঃ।
লীলালালো হলিলীলালীঃ লীলালী লোললাং ললুঃ॥

"অনন্তর নীলাচল লীলাকে বিদূরিত করত ব্রজগমনরূপ লীলাই যাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হওত সমস্ত ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে চঞ্চলমনাঃ হইলেন। তথা অনুগামী ভক্তগণও যাহাতে সেই চঞ্চলমনাঃ গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায় তাদৃশ ভ্রমরগণের লীলা সমূহের ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন।"

এই সমস্ত লোক প্রভুকে না দেখিয়া, কেহ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে, কেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় বাবু লোক, হাঁটিতে পারেন না, প্রভুকে ছাড়িতেও পারেন না। তিনি দোলায় চাপিয়াছেন,

কোথা চলিয়াছেন, কতদূর প্রভুর সঙ্গে যাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। প্রভু হাঁটিয়া যাইতেছেন, তিনি দোলায়, ইহা হইতে পারে না। অথচ হাঁটিতেও পারেন না, আবার না গেলেও নয়। তাই দোলায় চড়িয়া প্রভুর অনেক পশ্চাৎ আসিতেছেন। প্রভু রামানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন, রুক্ষ ভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু রামানন্দ গ্রহগ্রস্তের ন্যায় প্রভুর কোন কথা যেন শুনিতে পাইলেন না। দোলায় চড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। প্রভু গদাধরকে আবার নিষেধ করিলেন। গদাধর এই কথা শুনিয়া প্রভুকে ত্যাগ করিয়া অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন, যাইতে ছাড়িলেন না। পরে সকলে ভবানীপুরে উপস্থিত হইলেন; দেখেন,—সেখানে বাণীনাথ দ্রুতগামী দূত দ্বারা বহুবিধ সদ্যোমহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছেন। প্রভু সদলে সেখানে উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রসাদও আইল। এই মহাপ্রসাদ যে অল্প নহে, কর্ণপুর তাহা এইরূপে রঙ্গ করিয়া একাক্ষর শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

নানানা নুনি নানেনে নানা নূনননূ নন্নু।
নানা নূনে নাননান্নানে নো নানা নন্নুন্নু॥

"তৎপরে কোন এক মহাত্মা বিবিধ প্রকারের মহাপ্রসাদ অত্যল্প দেখিয়াও "ইহা অত্যল্প বা প্রচুর নহে" এ কথা কেহই বলেন নাই অর্থাৎ অল্পতর প্রভুর প্রসাদকেও বহুরূপে জানিয়াছিলেন।"

প্রভু একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলেন। প্রভু আনন্দে টলমল করিতেছেন। ভক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত। কবি কর্ণপুর প্রভুর এই গমন বর্ণনা করিতেছেন। কবিবর সেই রসে মুগ্ধ হইয়াছেন, কাজেই নানা ভঙ্গীর কবিতা প্রস্তুত করিতেছেন।

প্রভু চুপ করিয়া যাইতেছেন, ভাবিতেছেন বৃন্দাবনে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবেন। নবদ্বীপ তাঁহার জন্ম ও ভালবাসার স্থান, তাঁহার অতিপ্রিয় সেই নবদ্বীপকে ও নিজজনকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভুকে এ সমুদায় কথা জোর করিয়া মনে করিয়া না দিলে তাঁহার মনে হইত না। প্রভু প্রায় অহোরহ রাধা ভাবে বিভাবিত, এখন সেই ভাবে বৃন্দাবন যাইতেছেন। সেই ভাবে মুগ্ধ হইয়া চলিয়াছেন, বহির্জগতের সহিত তাঁহার অল্প সম্বন্ধ। দেখেন, পথের ধারে একটী বৃক্ষ, উহা দেখিয়া এক দৌড়ে যাইয়া লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার একটী শাখা ধরিলেন, ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন।

ইহার মানে কি? সেই ধীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, মহামহোপাধ্যায়, বৃক্ষতল-বাসী সন্ন্যাসী, সেই ভক্ত-শিরোমণি, সেই জগৎ-পূজ্য প্রতাপরুদ্রের সংত্রাতা, বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তাহার কারণ কি? প্রভু অতি সুস্থকায়, বলবান, তখন যুবা পুরুষ ছিলেন, তাই কি সেই তেজে এইরূপ বাল-চাপল্য দেখাইলেন? তাহা নয়। কৃষ্ণ-প্রেমে এইরূপ চঞ্চল করে। কৃষ্ণ-প্রেমে আনন্দের উদয়, আনন্দে জীবগণকে ব্রজবালকের ন্যায় সবল ও চঞ্চল করে। প্রভু তাই কি লম্ফ দিয়া বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন? তাহাও নয়, ইহার অর্থ বলিতেছি। প্রভুর মনের ভাব কি তাহা তাঁহার নিজের কথায় পরে ব্যক্ত হইল। শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যকার বলেন—

অথ বীক্ষ্য দ্রুমং শ্রেষ্ঠং ধাবন্নারাদবারিতঃ।
স্কন্ধমুৎপ্লুত্য ধৃত্বা চ লম্বমানঃ শ্রিয়ং দধে॥

"অনন্তর একটী বৃক্ষকে দেখিয়া নির্ব্বাধে ধাবমান হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের স্কন্ধদেশ (মূল শাখা) ধারণ করিয়া লম্বমান হইলেন, এবং তাহাতে বিশেষ শোভাও পাইতে লাগিলেন।"

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যাইতেছেন। এমন সময় সেই সুন্দর বৃক্ষটি দেখিয়া প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হইল। প্রভু দেখিতেছেন কি না, শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষের উপর বসিয়া। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন হাসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। তখন প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া দৌড়িলেন। দৌড়িয়া সেই বৃক্ষের শাখা ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করিতে গেলেন। কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। উঠিতে না পারিয়া সেই ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। এ দিকে, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যেন রাধা-রূপ প্রভুর সঙ্গে আমোদ ভাবে সেই বৃক্ষ তখনি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রভু তখন সে বৃক্ষ শাখা ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকায় নামিয়া, সেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বৃক্ষের দৌড়িলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, কৃষ্ণ অন্য বৃক্ষে গিয়াছেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। যে বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, তাহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন

কৃষ্ণ তখন অন্য বৃক্ষে গিয়াছেন। তাহাতে সেই বৃক্ষটিতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রতি অতি প্রেমের উদয় হওয়ায়, তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই গাঢ় আলিঙ্গনে ক্ষুদ্র বৃক্ষ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কখন বৃক্ষের কন্টক প্রভুর অঙ্গে আঘাত দিতেছে। কখন এই কারণে বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছেন, কখন শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত শাখা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। কখন কোন বৃক্ষকে শ্লাঘা মনে করিয়া তাহার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন। কখন কোন বৃক্ষকে চুপে চুপে কি বলিতেছেন, কি বলিতেছেন তাহা তিনিই জানেন।

হইয়াছে এই যে, প্রভু তখন জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, স্থতরাং প্রভু যে বৃক্ষের স্থানে চাহিতেছেন, সেইখানেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। এক বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ নয়ন অন্য দিকে অর্পিত হওয়ায় সেখানেও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। দেখিতে পাইয়া ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরা দিবেন না বলিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তখন সেই কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় বৃক্ষের দিকে ছুটিতেছেন।

প্রভু এইরূপে শত শত ভক্তের সমক্ষে এই রঙ্গ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই, দেখেন প্রভুর বাহৃদৃষ্টি নাই, একেবারে দেবচক্ষু হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে ব্রণের ন্যায় পুলকে আবৃত করিয়াছে। প্রভু কখন বা স্ত্রীলোকের ন্যায় করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। কৃষ্ণ-দর্শন লালসায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। তবে প্রভু বৃক্ষে আরোহণ করিতে যাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরং মৃত্তিকায় পড়িবার সম্ভব হই-তেছে। ইহা দেখিয়া পরমানন্দপুরী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ তাঁহাকে নীচে হইতে জড়াইয়া ধরিতেছেন, যেন মাটিতে পড়িয়া না যান, কি আঘাত না পান। যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

অধঃ কণ্টক সঙ্কীর্ণে নিপতিষ্যন্তমঞ্জসা।
ভিয়া পুরিপ্রভৃতয়ো জগৃহুর্ব্বরবাহুভিঃ॥

"কণ্টক সমাকীর্ণ অধঃ প্রদেশে প্রভু পতিত হইবেন, এমন সময় পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি ভক্তগণ সভয়ে শীঘ্র স্বীয় বিশাল বাহুদ্বারা ধারণ করিলেন।"

প্রভু কি করিতেছেন তাহার বর্ণনা চৈতন্যচরিত কাব্যের ১১শ সর্গের ৪৪ ও ৪৬ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা, প্রভু প্রেমানন্দ জলে ভাসিতেছেন, বন মধ্যে বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভু এইরূপে বিহ্বল হইয়া এরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন যে, বৃক্ষ চূর্ণ হইবার সম্ভব হইতেছে। প্রভু খঞ্জনের ন্যায় ফিরিতেছেন। প্রভু কেন এরূপ করিতেছেন, তাহা তিনি পরে যাহা বলেন তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ একবার শ্রীকৃষ্ণকে দুই-স্থানে দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে কোন স্থানে, মনে এই বিচার করিতে লাগিলেন। প্রভু অন্বেষণে ক্ষান্ত দিয়া এই কথা মনে বিচার করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি অন্য স্থানে পড়িল। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন কৌতুহলী হইয়া চারি দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখেন কি যে চারিদিকে কৃষ্ণ! তখন উর্দ্ধে চাহিলেন, দেখেন আকাশে কৃষ্ণ, পথে চাহিলেন দেখেন সেখানে কৃষ্ণ, বৃক্ষে কৃষ্ণ, লতায় কৃষ্ণ, কুসুমে কৃষ্ণ, পশ্চাতে কৃষ্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণ, সম্মুখে কৃষ্ণ। প্রভু তখন এই জগতে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার একটু বাহ্য হইল, এবং বিস্মিত হইয়া ভক্তগণ পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখ। তিনি প্রত্যেক বৃক্ষে ও নানা স্থানে বিচরণ করিতেছেন।" আগে বলিলেন, "প্রত্যেক বৃক্ষে," পরে "নানা স্থানে" বলিতেছেন। "তাহা নয়, শ্রীকৃষ্ণকে সকল দিকে যে দেখিতেছি, তিনি যে জগৎময়?" যথা, চৈতন্যচরিত কাব্যে—

উচৈঃহথ পশ্য পশ্যায়ং কৃষ্ণচন্দ্রোঽভিতোঽভিতঃ।
প্রতিদ্রুমং বিলসতি জগত্যেতন্ময়ীক্ষ্যতে॥

"অনন্তর গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া কহিলেন যে, দেখ দেখ, এই কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্ততঃ প্রত্যেক বৃক্ষে বিলাস করিতেছেন, আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতেছি।"

তখনি ভক্তগণ বুঝিলেন, সমুদায় বুঝিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, কেন প্রভু প্রথমে দৌড় মারিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষের শাখা ধরিয়া উহাতে উঠিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেন চঞ্চল গতিতে এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষে যাইতেছিলেন, কেন প্রতি বৃক্ষকে আলিঙ্গন ও কোন কোন বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছিলেন। প্রভু এ পর্য্যন্ত এক মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখিতে পাইলেন তখন মনে একটু সন্দেহের উদয় হইল। মনে উদয় হইল, এই যে আমি কৃষ্ণ দেখিতেছি একি সত্য না ভ্রম? মনে এই সন্দেহের উদয় হওয়াতে অমনি অল্প একটু বাহ্য হইল, ও ভক্তগণের কথা মনে পড়িল। তখন ভক্তগণের নিকট সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ ব্যাপার কি বল দেখি, আমি কি সচেতন আছি না অচেতন? কেন আমি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছি?

ভক্তগণ এ পর্য্যন্ত প্রভুর মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া শুধু প্রভুর কোন দুঃখ কি বিপদ না হয় তাহারি চেষ্টা দেখিতেছিলেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিলেন যে, তিনি বৃক্ষে ও চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ দেখিতে পাইতেছেন। তখন তাঁহার সমুদয় কার্য্যের হেতু বুঝিতে পারিলেন, পারিয়া তাঁহারাও সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহাদেরও এই বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা যেন দেখিতে পাইলেন যে, পক্ষিগণ সুখে গান করিতেছে, বৃক্ষ লতা কুসুমিত হইয়াছে ও সেই কুসুম হইতে মধু ঝরিতেছে। প্রকৃতই তখন পালে পালে ময়ূর আসিয়া সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। আবার তাহাদের মধ্য হইতে যখন কোন কোন ময়ূর নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন ভক্তগণ প্রেমে বিহ্বল হইলেন। একে শরৎ কাল, তাহাতে এই সমুদায় কাণ্ড, সুতরাং কবিকর্ণপুর ছাড়িবেন কেন? এখন সেস্থানের অবস্থা বর্ণিত অদ্ভুত রঙ্গিম কবিতা সকল শ্রবণ করুন। যথা—

লীলা লোলানিললনা ললন্নলিন লালনৈঃ।
নলাল ললনা লীনাং লীলাং লাসনিলো ললন্॥ ৪১॥

"তৎকালে পবন দেবও পদ সঞ্চালন দ্বারা বিলাসনলিনী অলি মালাতে অভিলাষ করত স্ত্রী বিলাস ইচ্ছা করিয়াই যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছেন।"

এই শ্লোক দ্ব্যক্ষর। তাহার পর শ্রবণ করুন—

কা কে নে ব ব নে কে কা,
লা ব কে ন ন কে ব লা।

শু দ্ধা সা র র সা দ্ধা শু,
স্তু তি রা স্থ স্থ রা তি স্তু॥

"কানন মধ্যে কাকের ন্যায় লাবক নামক পক্ষিগণের ধ্বনির সহিত ময়ূরের উচ্চ ধ্বনি হইল। এবং প্রকৃত পক্ষেই ময়ূর ধ্বনি বিশুদ্ধ বর্ষা ঋতুর সম্বন্ধ বশতঃ উৎকৃষ্ট হইয়া যেন মদমত্ত ব্যক্তিকেও অতিক্রম করত উচ্চ স্তব পাঠের ন্যায়ও শোভা পাইতে লাগিল।"

এই উপরের শ্লোক বাম হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ হইতে বামে সমান। তাহার পর আর একটি শ্লোক শ্রবণ করুন—

সা র সা স র সা সা রং
র সা নূ ত ন নূ ত না।
না ত নূ ন ত নূ সা র
রং সা সা র স সা র সা॥

"যে শরৎ রসা অর্থাৎ পৃথিবীর সরসা উৎকৃষ্ট বস্তু স্বরূপ এবং যে অসার অর্থাৎ বর্ষণ বিহীন হইয়াও রস অর্থাৎ জল দ্বারা সম্যক প্রকারে উৎকৃষ্ট নূতন হইয়াছিল এবং যে বহুতর সারস অর্থাৎ তন্নামক জলচর পক্ষী বিশিষ্টা হইয়া না তনু ও ন তনু কি শরীরী ও কি অশরীরী সকলেরই সার তেজঃ বা বল দান করত সেই প্রিসিসদ্ধা শরৎ শোভা পাইয়াছিল। (শরীরী বৃক্ষ লতাদি অশরীরী সময় দিক প্রভৃতি') শরৎকালে বৃক্ষ লতার সবিশেষ বিকাশ হয়, এবং শীত ঋতুর অংশ থাকার সময়ও উত্তম এবং দিক্ সকল প্রসন্ন হয়।"

প্রভু ক্রমে শান্ত হইলেন, আবার পথে চলিলেন। প্রভুর নিমিত্ত মুহুর্মুহু জগন্নাথের প্রসাদ, পানা, পিঠা প্রভৃতি দ্রুতগামী দূত দ্বারা বাণীনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেছে। এরূপ সুন্দর বন্দবস্ত যে প্রভু যেখানে বিশ্রাম করিবেন সেখানে দেখেন প্রচুর পরিমাণে সদ্য, ও অতি উত্তম মহাপ্রসাদ প্রস্তুত রহিয়াছে। শুধু তাহা নয়, রামানন্দ রায় প্রয়োজন বুঝিয়া নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রভু সেই নূতন গৃহে রজনী বাস করিতেছেন।

প্রভু ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া চলিলেন। রজনীতে এইরূপে রামানন্দ-নির্ম্মিত একটি গৃহে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সমস্ত রজনী রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিয়াছেন। প্রভু ও পরমানন্দ পুরী সর্ব্বাগ্রে, প্রভু নাম জপিতে জপিতে চলিয়াছেন। রামানন্দ দোলায় সর্ব্ব পশ্চাতে, যেখানে প্রভু

বিশ্রাম' করিতেছেন, দোলা হইতে নামিয়া সেখানে যাইয়া প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিতেছেন। প্রভু যাইতে যাইতে নদী তীরে রামানন্দ-নির্ম্মিত অতিসুন্দর বাসস্থান দর্শন করিলেন। দেখিয়া বড় মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রভু মনের আনন্দে শ্যামগুণ গীত গাইতে লাগিলেন। ইচ্ছা সেখানে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে রসাস্বাদন করেন। তাই পরমানন্দ পুরীকে উপলক্ষ করিয়া সকলকে বলিলেন যে, আমি এখানে একটু বিশ্রাম করিব, আপনারা অগ্রবর্ত্তী হউন। কটকে গোপীনাথের মন্দিরে আমাকে পাইবেন। ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চলিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ অগ্রবর্ত্তী হইলে প্রভু একা রাম রায়কে লইয়া সেই নূতন গৃহে কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিতে লাগিলেন। তখন যে কি সুধা উঠিল তাহা কে বলিতে পারে? শ্রীভগবান এরূপ বস্তু যে তাঁর নামে সুধা ক্ষরণ হয়। তাঁহার সম্বন্ধিনী কথায় কত মধু আছে তাহা কে বর্ণিতে পারে? প্রভুর রামানন্দ রায় ও সরূপ দামোদরের সহিত বসিয়া এই কৃষ্ণ-কথা, ইহার আভাস পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রভু তখন শ্রীমতী রাধা হইয়া তাঁহার যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উহার সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম যে গতি, তাহা মন উঘাড়িয়া বলিতেন। সেই তাঁহার মুখচন্দ্রের সুধা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ও তাহাই জীবগণে এখন আস্বাদ করিয়া থাকেন।

শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রভৃতি অগ্রে কটকে গমন করিয়া সংবাদ দিলেন যে, প্রভু বৃন্দাবন যাইবেন। রাজা তখনি ব্যাকুল হইয়া রামরায় ও সার্ব্বভৌমকে মিনতি করিয়া বলিতেন যে, প্রভুকে যেন না যাইতে দেওয়া হয়। রামরায় ও সার্ব্বভৌম নানা উপায়ে দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুকে যাইতে দেন নাই, শেষে যাইতে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েন। রাজা এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে, প্রভু গমন করিলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? এখানে শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান আছেন ইহা সত্য, কিন্তু তবু প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলে আমার ভুবন অন্ধকার হইবে। যথা, রাজার সার্ব্বভৌমের প্রতি উক্তি (চন্দ্রোদয় নাটক)—

যদ্যপি জগদধীশো নীলশৈলস্য নাথঃ
প্রকটপরমতেজা ভাতি সিংহাসনস্থঃ।
তদপি চ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবে,
চলতি পুনরুদীচীং হন্ত শূন্যা ত্রিলোকী॥

ইহার অর্থ—

রাজা কহে ভট্টাচার্য্য কি কহিব আর।
যদ্যপিও জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার॥
প্রকট পরম তেজা নীলশৈলনাথ।
সিংহাসনে বসিয়াছে বলভদ্র সাথ॥
তথাপি চৈতন্যচন্দ্র পুরি ছাড়ি গেলা।
এ তিন ভুবন মোর শূন্য যে হইলা॥

সার্ব্বভৌম ও রামরায় রাজাকে বলিলেন যে, শ্রীভগবান স্বেচ্ছাময়, তাঁহাকে রোধ করা যায় না, তাঁহার সঙ্গে অতি হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি ভক্ত-বৎসল, এই দুই বৎসর ভক্ত অনুরোধে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন নাই, এখন চলিলেন, আর তাঁহাকে রাখিতে পারা গেল না।

প্রভু বিজয়া দশমী দিনে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। তাহার পূর্ব্বেই রাজা নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটকে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন পরমানন্দ পুরী প্রভৃতির নিকট শুনিলেন যে, প্রভু আগতপ্রায়।

প্রভু যখন বিরলে কৃষ্ণ-কথা বলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী রামরায় ও সরূপ। এখন শুধু রামরায়কে লইয়া বসিলেন। রামরায় প্রভুর ভাবি বিরহে ব্যাকুল। রামরায় প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভু আড্ডায় আড্ডায় বলিতেছেন, রামরায় বাড়ী যাও। রামরায় এ কথা শুনিলেই কান্দিয়া আকুল হয়েন; বলেন, প্রভু আর খানিক যাইব। আর এক আড্ডায় যাইয়া প্রভু রামরায়কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলেন। আবার রামরায় কান্দিয়া বলেন, আর খানিক যাইব। এইরূপ করিয়া রামরায় প্রভুর সঙ্গে এতদূর আসিয়াছেন।

ভক্তগণ কটকে আসিয়া একবারে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কোন একজন ব্রাহ্মণ পুরী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এমন সময় গৌরচন্দ্রের উদয় হইল। প্রভু আইলে স্বপ্নেশ্বর নামক কোন বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুর সঙ্গে আর যে শতাবধি ভক্ত, সে সমুদয় রামরায় কটকে তাঁহার নিজ বাটীতে আহ্বান করিলেন। রসিক চূড়ামণি রামরায়ের বাড়ীর নিকট অবশ্য অপরূপ উদ্যান আছে। সেখানে ভক্তগণকে লইয়া গেলেন। সেই উপবন মধ্যে এক অতি

মনোরম ও প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় ভক্তগণ বিশ্রাম, কেহবা রন্ধনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভিক্ষা করিয়া ক্রমে সেখানে পরমানন্দ পুরী ও স্বয়ং গৌরচন্দ্র আইলেন। প্রভু সেই বকুলের মূলে উপবেশন করিয়া সহাস্য বদনে শোভা পাইতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে ভোজন করাইয়া রামরায় রাজার ওখানে ছুটিলেন। রাজা প্রভুর আগমন পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। এবারে রাজা দীনবেশে, একমাত্র ধূতী পরিয়া আইলেন না। রামানন্দের পরমর্শানুসারে রাজবেশ পরিলেন, ও হস্তি ঘোড়া সৈন্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, প্রকাণ্ড সজ্জায় প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়া উপবনের নিকট যাইয়া সকলে স্থির হইলেন। যদিও সৈন্যগণ কোলাহল করিতেছে না, কিন্তু হস্তি ও ঘোড়া সমূহ চিৎকার করিয়া রাজার আগমন প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা হস্তির উপর ছিলেন, মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তখন মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রামানন্দের বাহু ধরিয়া মন্থর গতিতে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সে কিরূপ, না, যেমন শ্রীমতী রাধা, ললিতার কর ও অন্যান্য সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্যাম দরশনে বৃন্দাবনে যাইতেন। রাজা প্রভুর শ্রীচরণ অধিকার করিবার জন্য চতুরঙ্গ দল কর্ত্তৃক কিরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন, উহা চরিত কাব্য লেখক কর্ণপুর মহাসুখে ১৯শ সর্গ ৮৮ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজা উপবনে প্রবেশ করিয়া বকুল বৃক্ষমূলে প্রভুকে দর্শন করিলেন। প্রতাপরুদ্র মুখ উঠাইয়া প্রভুর সহাস্য আহ্বান সূচক চন্দ্রবদন দেখিলেন, অমনি তাঁহার নয়ন দিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। রাজা নিমিষহারা হইয়া প্রভুর বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। রূপ দেখিয়া তাঁহার সাধ মিটিল না। রাজার আনন্দ জলে নয়ন তারা ডুবিয়া যাওয়ায়, তাঁহার পথ দেখিবার শক্তি গেল। কাজেই হাঁটিতে পদস্খলন হইতে লাগিল। তখন রামানন্দের অঙ্গে হেলন দিয়া, মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে, অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিন্তু বড় অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। সেই রাজবেশ লইয়া সেই রাজ-মুকুট সহিত প্রভুর চরণতলে ধুলায় পড়িয়া গেলেন।

প্রভু তখন প্রেমার্দ্র হইয়া রাজাকে উঠাইলেন, উঠাইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে

ধরিয়া আপাদ মস্তক আলিঙ্গন করিলেন। রাজা আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, আর ভক্তগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, সৈন্যগণ, যাঁহারা সেখানে ছিলেন, সকলে আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে প্রভু রাজার সহিত অতি প্রেম সহকারে বাক্য আলাপন করিলেন। রাজার মনে প্রতীতি হইল যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের, আর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার। প্রভু সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা শ্রীমুখে শুনিয়া, রাজা নিতান্ত শান্ত হইলেন। রামানন্দ তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ বচন বলিলেন। রাজা প্রভুর নিকট বিদায় হইলেন, রাজ-কর্ম্মচারিগণ সৈন্যগণ সকলে প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন, কেহ নিকটে যাইয়া কেহ দূরে দাঁড়াইয়া।

রাজা বাহিরে আসিয়া, কিরূপে প্রভুর গমন সুলভ হয় তাহার উপায় চিন্তিয়া, আপনার দুই প্রধান মন্ত্রী, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন, (হরিচন্দন যিনি শ্রীবাসের হস্তে চপেটাঘাত প্রসাদ পাইয়াছিলেন) এই দুই জনকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা প্রভুর সঙ্গে গমন কর। এইরূপে রামানন্দ, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন রাজার তিন জন মহাপাত্র প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। রাজা আরো আজ্ঞা করিলেন যে, যেখানে প্রভু বাস করিবেন সেখানে তাঁহার ও ভক্তগণের থাকিবার নিমিত্ত, পাঁচ সাত খানা নূতন গৃহ প্রস্তত, আর নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হউক। প্রভুর সঙ্গে বহুতর ভক্ত, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ, হরিদাস, জগদানন্দ, মুকুন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর, গোপীনাথ, নন্দাই, প্রভৃতি সকল লোক চলিয়াছেন। রাজা আবার পথে যত প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ বাস করেন, তাঁহাদের নিকট আজ্ঞা-পত্র পাঠাইলেন যে, প্রভু যাইতেছেন, যাহাতে তাঁহার কোন অভাব না হয় এইরূপ মনোযোগী হইয়া থাকেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর সঙ্গে আছেন, তিনি একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, মহারাজ তোমার এ সমুদয় অতি প্রীতির কার্য্য একটুকু হাস্যকর। তুমি যাঁহার বিপদাশঙ্কা করিয়া উহা নিবারণার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছ, তাঁহার নাম স্মরণ করিলে বিঘ্ননাশ হয়, অতএব তিনি তাঁহার নিজের রক্ষা অবশ্য করিতে পারিবেন।

রাজা ইহা শুনিয়া আরো আর্দ্র হইলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, প্রভু যেখানে স্নান করেন, যেন সেখানে

একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করা হয়। সে অতি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে আমি প্রত্যহ স্নান করিব। আর যদি প্রভুর চরণে আমার মতি থাকে, তবে সেখানে মরিব। রাজা আরো আজ্ঞা করিলেন যে, ঘাটে প্রভুর পারের নিমিত্ত যেন এক খানা নৌকা থাকে। রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন, সুতরাং রাজার বড় ভরসা যে প্রভুর কোন কষ্ট হইবে না।

বিজয়া দশমী দিবস প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটক আসিয়াছেন, কাজেই জ্যোৎস্না-রজনী। এ দিকে শরৎকাল। প্রভু রাত্রে চলিবেন এ ইচ্ছা করিলেন। সন্ধ্যাকালে চিত্রোৎপলা নদীতে স্নান করিলেন। সেখানে প্রভু পার হইবেন। রাজ-পরিবারগণ প্রভুকে দর্শন করিবেন মনে নিতান্ত বাঞ্ছা। রাজা তাঁহাদের দর্শন সুলভ নিমিত্ত, হস্তীর উপর তাঁবু খাটাইয়া, সেই ঘাটে সারি সারি হাতী রাখিলেন। প্রভু গজেন্দ্রগমনে আসিতেছেন, সন্ধ্যা হয় হয় সময়, সুতরাং রাজ-পরিবারগণ তাম্বুতে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে দর্শন করিতে পারিলেন। প্রভুকে দর্শন মাত্র তাঁহাদের প্রেমের উদয় হইল—

প্রভুর দর্শনে সভে হইল প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে অশ্রু নেত্রে বরিষয়॥
এমত কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ প্রেমা হয় যার দূর দরশনে॥ (চরিতামৃত)

শ্রীগদাধর, যিনি পণ্ডিত গোঁসাই বলিয়া পরিচিত, প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। প্রভু নানা মতে নিবারণ করিতেছেন, গদাধর শুনেন না। প্রভু বলেন, "গদাধর! ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়াছ, তুমি নীলাচল ত্যাগ করিলে পতিত হইবে।" গদাধর বলেন, "প্রভু! তোমার শ্রীচরণে যদি আমার মতি থাকে, তবে আমার কোন বিপদ নাই। প্রভু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "গদাধর এ নিতান্ত স্বার্থপরতা। নিয়ম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তুমি, দোষী হইব আমি, একি তোমার ভাল কাজ? তুমি কি শুন নাই যে শ্রীভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কোন কু-কাজ করিলে তিনি উহা কখন মার্জ্জনা করেন না? তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা সেবা-ভঙ্গ রূপ মহা পাপ করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কেন উহা হইতে অব্যাহতি দিবেন?"

গদাধরের একমাত্র উত্তর ক্রন্দন। প্রভু যদি এখন বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার কথা ফুটিল।

গদাধর বলিলেন, যে দোষ হয় আমার। তোমাকে আমি দোষ হইতে

অব্যাহতি দিলাম। আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি না, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। আমি তোমার জন্য যাইতেছি না। আমি শচী জননীকে দেখিতে যাইতেছি।

গদাধরের কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু! আমি তোমার সঙ্গে যাইব, ইহাতে নরকে যাই তাহাও স্বীকার। হে কৃপাময় পাঠক! এই ঘটনা দ্বারা আপনি কতক বুঝিবেন যে ভগবৎ-প্রেম কেন পরকীয়া প্রেমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু হারিলেন, আর এ পর্য্যন্ত হারিয়া চলিয়া আসিতেছেন। এখন কটকের নদী পার হইবার সময় গদাধরকে ডাকাইলেন, ডাকাইয়া হাত দু'খানি ধরিলেন, তাহার পরে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া, ছল ছল আঁখিতে বলিতে লাগিলেন, "গদাধর! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না, আমি দুঃখ পাই। তুমি কি অকাজ করিতেছ, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। আমার সঙ্গসুখের লোভে প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িতেছ, গদাধর এ কাজ ভাল নয়। শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া যাও, আমি সত্বর ফিরিয়া আসিব। তুমি চিরদিন আপনার সুখ অনুসন্ধান না করিয়া আমার সুখ খুজিয়া থাক। তুমি যদি আমার সঙ্গে গমন কর, আমি দুঃখ পাইব। যদি ফিরে যাও সুখী হইব। আমাকে সুখ দেওয়া তোমার জীবনের প্রধান সুখ। অতএব তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর। আর যদি কথা কও আমার মাথা খাও।"

গদাধর তখন মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিলেন, চাহিয়া নিমিষহারা হইয়া মুখ খানি একটুকু দেখিলেন। যেন জন্মের মত সেই মুখ খানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতেছেন। পরে তাঁহার নয়ন-তারা স্থির হইয়া উর্দ্ধে উঠিল। একটু কাঁপিলেন, আর অমনি ধপাৎ করিয়া সেই বালুকার উপর পড়িয়া গেলেন। গদাধর যেমন পড়িলেন, অমনি সার্ব্বভৌম তাঁহাকে যতদূর পারিলেন ধরিলেন।

যেমন বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, সেইরূপ প্রভুর অন্তরের তীক্ষ্ণ দুঃখের রেখা হৃদয়ের বাহিরে চলিয়া গেল। উহার কিঞ্চিৎ আভা বদনে প্রকাশ হইবা মাত্র লুকাইয়া গেল। প্রভু সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আপনি গদাধরকে সুস্থ করিয়া উহাকে এখান হইতে নীলাচলে লইয়া যাউন।" প্রভু এইরূপে একটী বাটুলে দুইটি জীব বধ করিলেন। সার্ব্বভৌম, এমন কি প্রথমে প্রায় সমগ্র নীলাচলবাসী, প্রভুর সঙ্গে আসিতেছিলেন। প্রভু সকলকে নানা উপায়ে নিবৃত্ত করিয়া পথে রাখিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা

প্রধান,—বৈশ্য তাহার মধ্যে সার্ব্বভৌম একজন,—তাঁহাদিগকে পারেন নাই। প্রভুর ইচ্ছা যে সার্ব্বভৌমকে কটকের এদিকে আসিতে দিবেন না। তাই ছল ছল আঁখিতে, একবার মাত্র মূর্চ্ছিত গদাধরের পানে চাহিয়া, সার্ব্বভৌমকে উপরি উক্ত আজ্ঞা করিয়া, তূর্ণ নৌকায় উঠিলেন, আর উহা তখনি ছাড়িয়া দিতে নাবিককে আজ্ঞা করিলেন।

সার্ব্বভৌম প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে মূর্চ্ছিত গদাধর কোলে, ওদিকে প্রভু ছাড়িয়া চলিলেন! যখন প্রভু দক্ষিণে গমন করেন, তখন সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিয়াছিলেন, "শতপুত্র-শোক সহিতে পারি, তবু তোমার বিরহ সহিতে পারি না।" সার্ব্বভৌম প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর গদাধরের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। বলিতে-ছেন, "গদাধর! উঠ, মহাপুরুষের কার্য্যই এইরূপ, তাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ কুসুম হইতে কোমল, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে উহা বজ্র হইতেও কঠিন হইয়া থাকে। শ্রীভগবান তোমার বিরহে দুঃখ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। যাহাতে তোমার ধর্ম্মনষ্ট না হয় ইহাই ভাবিয়া সে দুঃখ স্বেচ্ছায় নিজস্কন্ধে লইলেন।" এদিকে নৌকা দ্রুতগতিতে এ পারে আসিল, প্রভু অমনি নামিলেন, আর পাছে না ফিরিয়া দ্রুতগতিতে চলি-লেন। এমন সময় গদাধর উঠিলেন। তখন তিনি আর সার্ব্বভৌম সজল নয়নে প্রভুর গমন দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকাল, প্রভু অতি শীঘ্র অদর্শন হইলেন। তখন দুইজন দুইজনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া, ধীরে ধীরে নীরবে রোদন করিতে করিতে, নীলাচলে ফিরিয়া চলিলেন।

প্রভু চতুর্দ্বারে রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় রজনী যাপন করিলেন। প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য লোক, তাঁহারা যিনি যেখানে পাইলেন সেখানে থাকিলেন। প্রভাত হইল, প্রভু তখন স্নান করিলেন। সদ্যঃপ্রসাদ সম্মুখে উপস্থিত, বহু প্রকারের। প্রভু তখন সেবা করিলেন, করিয়া আবার ভক্তগণ সমভিব্যাহারে চলিলেন। একে যাহারা প্রভুর নাম শুনিয়াছেন, তাহারাই তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক। (শ্রীভগবান সন্ন্যাসিরূপে জগতে বিচরণ করিতেছেন, যে সন্ন্যাসী এরূপ পূজিত তাঁহাকে দেখিতে কাহার না সাধ হয়? সুতরাং যিনি শুনিতেছেন যে, সেই সন্ন্যাসী গৌড়-পথে চলিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন।) তাহার উপর আরো রাজার পত্র। যেখানে যেখানে নূতন ঘর প্রস্তুত হইতেছে,—আর ঘর প্রস্তুত, সহস্র লোক

দ্বারা সদ্যাই হইতেছে,—সেখানে সেখানে লোকের ভিড় হইতেছে, সকলে যাহার সেরূপ সাধ্য ভেটের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। প্রভু অদ্য কি কল্য, কবে সেখানে আসিবেন ঠিক নাই। সকলে এই রূপ দুই এক দিনই প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রভু যে পথ দিয়া যাইবেন সে পথের দু'ধারে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এই লোক ভিড়ের কথা আমি পরে বলিব। এই-রূপে কি পথে কি আরামের স্থানে, সকল স্থানেই সর্ব্বদা কেবল লক্ষ-বদন-উত্থিত হরিধ্বনির কোলাহল হইতেছে।

প্রভু যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। যাজপুরে বহু দেবমন্দির ও সে অতি পবিত্র স্থান। সেখানে বহুতর ভদ্রলোকের বাস। প্রধান লোক সকল "কই প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়," বলিয়া একেবারে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রভুর তিনটি ভাব ছিল, সহজ ভাব, আবেশ ভাব, ও শ্রীভগ-বদ্ ভাব। মধ্যে মধ্যে সহজ ভাব ও মধ্যে মধ্যে ভগবদ্ ভাব হইত, কিন্তু আবেশ ভাব প্রায় সর্ব্বদা থাকিয়া যাইত। প্রভুর বদনের দিকে চাহিলেই জানা যাইত যে, তিনি আপনাতে আপনি নাই। যেন তাঁহার চিত্ত কে চুরি করিয়া লইয়াছে। প্রভু চক্ষু মেলিয়া এদিকে ও দিকে চাহিতেছেন, কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে বাহ্য জগত তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। এই যে প্রভু আভ্যন্তরিক জগতে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু তবু তিনি কি ভাবিতেছেন, কি দেখিতেছেন, তাহা প্রায় তাঁহার কার্য্য দ্বারা জানা যাইত। অন্ততঃ স্বরূপ প্রভৃতি মর্ম্মিভক্তগণ উহা জানিতে পাইতেন। প্রভুর এই আবেশ ভাব আবার তিন রূপ। উদ্ধবের ভাব, গোপীর ভাব, ও রাধার ভাব। যখন উদ্ধবের ভাব, তখন প্রভু দীন হইতেও দীন; কিসে তাঁহার কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবেন, এই নিমিত্ত কান্দিয়া ব্যাকুল। যখন গোপীভাব, তখন বাহিরের জগত কিছু দেখিতেছেন না, কি অতি অল্প দেখিতেছেন। নানাবিধ কৃষ্ণ-লীলা দেখিতেছেন। আর যখন রাধা ভাব, তখন একেবারে অচেতন; একে-বারে ঠিক রাধা, রাধার সহিত আর কিঞ্চিৎ মাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রভুর যখন যে ভাব, তাহার সঙ্গিভক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত হয়েন।

যখন প্রভুর ভগবদ্ ভাব, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাকে শ্রীভগবান না ভাবিয়া থাকিতে পারে। যাহার যত বড় অবিশ্বাস হউক না কেন প্রভুকে তখন ভগবান না ভাবিয়া থাকিতে পারিবেন না। সুখের মধ্যে

ভক্তগণ ঐশ্বর্য্য ভগবদ্ ভাবের কথা মুহুর্মুহু ভুলিয়া যাইতেন, তাহা না ভুলিলে তাঁহারা অধিকক্ষণ প্রভুর সঙ্গ করিতে পারিতেন না। ভগবান জানিয়া, জীব অধিকক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না। যে দিবস মহাপ্রকাশ হয়, সে দিবস প্রভু সপ্ত প্রহর ভগবানরূপে প্রকাশ পায়েন, তাহাতে ভক্তগণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আবার মানুষ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদের স্মরণ আছে।

শ্রীভগবানের সহজ ভাব সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। সহজ ভাব মানেই ঐশ্বর্য্য-শূন্য ভাব। যেখানে যতখানি ঐশ্বর্য্য, সেখানে ততখানি মাধুর্য্যের অভাব। শ্রীনিমাইয়ের যখন সহজ ভাব, তখন অতি সুন্দর, ভুবনমোহন, যুবা পুরুষ। অতি লাজুক, অতি দীন, অতি স্নেহশীল, অতি সরল, অতি অনুগত। আরো এই সমুদায় গুণের মধ্যে অতি বুদ্ধিমান, অতি পণ্ডিত, অতি রসিক, অতি চঞ্চল। অন্তরে যে আনন্দ, তাহার অবধি নাই। বদন সেই নিমিত্ত ঝলমল করিতেছে। উহাতে নয়ন পড়িলে আপনা আপনি আনন্দ জল আইসে। নিমাই তখন সর্ব্বদা হাস্য-কৌতুক করিতেছেন, এমন কি নিমাই তখন ব্রজের কৃষ্ণ।

যখন যাজপুরের আচার্য্যগণ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কই, প্রভু কোথায়? কই, কৃষ্ণচৈতন্য কোথা?" তখন প্রভুর সম্পূর্ণ সহজ ভাব। আই রসিকশেখর প্রভু করিলেন কি শ্রবণ করুন। তিনি উঠিয়া, অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত সেই সমুদয় আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "এই যে প্রভু, ইহাঁকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া পরমানন্দ পুরীকে ধরিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। পুরী গোঁসাই নিতান্ত ভাল মানুষ, প্রভুর এই কার্য্য দেখিয়া কি করেন, দিশেহারা হইয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "না না আমি না, আমি প্রভু না।" নিমাইয়ের বদন অতি গম্ভীর। তিনি আবার আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "আপনারা উহাঁর কথা শুনিবেন না। উনিই প্রভু, প্রকলে উহাঁকে প্রণাম করুন। এই দেখুন আমি করিতেছি, ইহা বলিয়া প্রভু প্রকৃতই পুরীকে প্রণাম করিলেন।" পুরী ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমি না, আমি না উনি। শুন নাই কৃষ্ণচৈতন্য সুবর্ণের ন্যায় পুরুষ। ঐ দেখ সত্য কি না। উনি আমাকে লোক শিক্ষার নিমিত্ত প্রণাম করেন।"

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে ভক্তগণ অবাক। পরে তাঁহারি গম্ভীর মুখ ও পুরীর দিশাহারা ভাব দেখিয়া সকলে মহা কলরব করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয় তিন দিবস পূর্ব্বে প্রভু প্রতি বৃক্ষে, প্রতি গুল্মে, প্রতি লতায়, শ্রীকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার অদ্য আর এক মনোহর ভাব দেখুন। প্রভু ও পুরী দুই জনে দুইজনকে প্রভু বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন।

এখানে প্রভু মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহারা যাইতে চাহেন না, কিন্তু প্রভু ছাড়িলেন না। তখন অমাত্যের মধ্যে এক রামরায় সঙ্গে চলিলেন। প্রভু আর রামরায় এই দুইজনে চলিয়াছেন, ইহার মানে এই যে, প্রভু কেবল রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় সমুদায় সময় যাপন করিতেন। আর সকলে বরাবর সঙ্গে যাইবেন, কিন্তু রাম রায়ের সহিত ছাড়া ছাড়ি হইবে। রেমুণাতে সকলে আসিলেন। রাম রায়ের সীমা এই পর্য্যন্ত, সেখান হইতে তাঁহার ফিরিয়া যাইতে হইবে। প্রভু ও রাম রায় হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রভু রাম রায়ের নিকট বিদায় লইবেন, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। রামরায় প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন।

সেই শত শত দাস দাসী সেবিত-অঙ্গ এখন ধূলায় পড়িয়া রহিল। প্রভুর দৃঢ় মন, কিন্তু রামানন্দের নিকট উহা পরাজিত হইল। তাঁহার নয়নে জল আসিল। তখন বসিলেন, বসিয়া, রায়কে কোলে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু রায়কে ফেলিয়া চলিলেন, তিনি মৃত্যুবৎ পড়িয়া রহিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় রায় প্রাণে মরিলেন না, কিন্তু মর মর হইয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। তখন দোলায় করিয়া, তাঁহার রক্ষক ও সেবকগণ তাঁহাকে কটকে আনি-লেন। রামানন্দ তখনি সেই পথে রাজ দর্শনে গমন করিলেন।

রাজা রায়কে দেখিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, "রামরায়, আমার প্রভু কোথায় গেলেন। কাহার হাতে আমাদের সেই পরম ধন, জীব-নের জীবনকে ন্যস্ত করিয়া আসিলে?" রামানন্দ কান্দিতে ছিলেন। বলিতে-ছেন। "মহারাজ, জানেন আমি প্রভুকে কেন ফেলিয়া আসিলাম? কেবল আপনার ভয়ে। আমি, আপনার সেবক, আপনার অন্নে এ দেহ পালিত। তাই যখন প্রভু আমাকে বিদায় দিলেন, তখন ভাবিলাম যে আমি কি করি। সেই

করুণার সিন্ধু আমার গৌরচন্দ্র ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? আবার ভয় হইল যে, তোমার বিনা আজ্ঞায় কিরূপে যাইব? তখন প্রভুর পায়ে মনে মনে এই প্রার্থনা করিলাম যে, এখনি আমার মরণ হউক। কিন্তু মহারাজ! তাহা হইল না। এই দেখুন বাঁচিয়া আছি।” কথা এই, রামরায় আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছেন। বিষয়ী রাজার ভয়ে হৃদয়ের রাজা শ্রীগৌরচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, রামরায়ের মনের এই বিষম অনুতাপ।

নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতে তিনটি পথ। প্রভুর কি ইচ্ছা বুঝি না, সেই সময় এমন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে যে, এই তিন পথই বন্ধ। এই নিমিত্ত প্রভু ভক্তগণকে এবার শীঘ্র শীঘ্র গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। প্রভু কিরূপে গৌড়ে আসিবেন, যে হেতু পথ বন্ধ, ইহা সকলের ভয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং সে কথা মুখেও আনেন নাই। এখন সকলে উড়িষ্যার রাজ্যের সীমানায় আসিলেন। ও পারে মুসলমান ঘাট রক্ষক, অতি প্রবল ও ভয়ানক।

উড়িষ্যার অধীনে সেখানকার অধিকারী প্রভুর চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, “প্রভু, এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি ওপারের মুসলমান অধিকারীর সহিত সন্ধি করি, করিয়া আপনাকে ওপারে পাঠাইব।” প্রভু সে কথা শুনুন না শুনুন তাহার কোন উত্তরে হাঁ কি না বলিলেন না। প্রভু আসিলে সেখানে লক্ষ লোক সমবেত হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজেই গগনভেদী হরিধ্বনি উঠিল। ওপারে যবন অধিকারী এই কলরব শুনিল, শুনিয়া ভাবিল যে বিপক্ষদের বহুতর নূতন সৈন্য আসিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত একজন গুপ্তচর পাঠাইয়া দিল। এই গুপ্তচর মুসললান, হিন্দুর বেশ করিয়া আসিল।

সে বেচারি আসিয়াছে কি করিতে, আর কি তরঙ্গে পড়িয়া গেল! সে আসিয়া দেখে যে, যেদিকে চায় সেদিকে নৃত্য ও হরিধ্বনি। এইরূপে সে সর্ব্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্ব স্থানে হরিধ্বনি, সর্ব্বস্থানে ভক্তির তরঙ্গ! স্বভাবত সে ব্যক্তি অভিভূত হইল। তখন সেও হরিধ্বনি আরম্ভ করিল। সেই তরঙ্গে অনেক্ষণ হাবু ডুবু খাইয়া শেষে ভাসিতে ভাসিতে স্বয়ং প্রভুর নিকট উপস্থিত। সে বেচারির তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, সে বাহু তুলে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার যাহা একটু বাঁকি ছিল, প্রভুর দর্শনে তাহা গেল। এই অবস্থায় সে মুসলমান অধিকারীর

নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাঁহার প্রভুর নিকট যাইয়া কি বলিবে? তাহার হাস্য, রোদন, নৃত্য, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি ভাবে সে এত মুগ্ধ যে প্রথমে কিছু বলিতেই পারিল না। তৎপরে তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষ, লাবণ্য দেখিয়া মুসলমান অধিকারী বিস্মিত হইলেন। এখন প্রভুকে যিনি যাহাই ভাবুন, তাঁহার এই অনম্নুভবনীয় শক্তি ছিল। কখন তাঁহাকে দর্শনে, কখন স্পর্শে, কখন তাঁহার মুখের বাক্য শুনিয়া জীবে অভিভূত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিত, কি তাহার নৃত্য করিতে অনিচ্ছা, কিন্তু তবু সে আপনাকে নিবারণ করিতে পারিত না। প্রভুর লীলায় এরূপ শতশত ঘটনা বর্ণিত আছে। এরূপ করিয়া বর্ণিত আছে যে, তাহা পড়িয়া সহজেই বিশ্বাস হয় যে, সে সমুদয় ঘটনা সত্য। ভক্ত-গণ, যাঁহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা এতবার এতরূপে দর্শন করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন আশ্চর্য্য আছে তাহা বর্ণনাকালে ভুলিয়া গিয়া-ছেন। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, শুধু দর্শনে ও স্পর্শনে প্রভু এই শক্তি সঞ্চার করিতেন তাহা নহে, উহা লোক দ্বারা প্রেরণ করিতেও পরিতেন। যখন শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামকে, শ্রীঅদ্বৈতকে ডাকিতে পাঠান, তখন তাঁহার সঙ্গে ঐরূপ শক্তি পাঠাইয়া ছিলেন। শ্রীরাম অদ্বৈতকে প্রভুর সন্দেশ বলি-লেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইলেন। সেইরূপ প্রভু এই মুসলমান দ্বারা মুসলমান অধিকারীর নিমিত্ত শক্তি পাঠাইলেন। মুসলমান দূতের নৃত্য দেখিয়া, তাহার মুখে কৃষ্ণ-নাম শুনিয়া, অধিকারী একবারে বিহ্বল হই-লেন। দূত বলিতে লাগিলেন যে, যাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি সেই "তিনি," যিনি হিন্দু মুসলমান সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, রূপ অমানুষিক, তাঁহার নূতন যৌবন, তাঁহার প্রকাণ্ড দেহ। তাঁহার পদ্মচক্ষু দিব্য তাহাতে অনবরত প্রেমধারা পড়িতেছে, তাঁহাকে দর্শন করিলে যে আনন্দ, তাহা শত সহস্র বাদসাহী হইতে শ্রেষ্ঠ। ভাটমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ শুনিয়া যেরূপ রাধা উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন, অধিকারী সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। এখন কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুরাণী, তাঁহার সেবা ছাড়িবেন কেন? তিনি তাহাকে সদ্বুদ্ধি দিলেন। মুসলমান অধিকারী উড়িয়া অধিকারীর নিকট চর পাঠাইলেন। চরগণ আসিল, আসিয়া উড়িয়া অধিকারীর নিকট

বলিল যে, তাঁহাদের অধিকারী মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, যদি অনুমতি পান তবে আসিয়া দর্শন করিয়া যান। উড়িয় অধিকারী মহা চিন্তিত হইয়াছিলেন, ভক্তগণও কতক বটে, কিরূপে প্রভুকে গৌড়ে পাঠাইবেন। তাহার উপায় না পাইয়া সকলে বসিয়া ভাবিতেছেন। প্রভুর কোন অনুসন্ধান নাই। তিনি গৌড়ে যাইতেছেন পথে আটকা পড়িয়াছেন। এই সমুদয় সংবাদ যে তিনি কিছু রাখেন, তাহার চিহ্নও তাঁহার কথায়, কার্য্যে, কি মুখে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি যে চলিতেছেন, আর এখন মাঝপথে, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি দুই চারি দিন সেখানে কেবল প্রেমানন্দে বাহ্য হারাইয়া, দিবা নিশি বিহ্বল রহিয়াছেন! এখন মুসলমান অধিকারীর চর আগমন করিলে, উড়িয়া অধিকারী ও ভক্তগণ একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাদের আবার মনে উদয় হইল যে, প্রভু যে বস্তু, তিনি উহা অপেক্ষাও সহস্র গুণে অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। চরের কথায় উড়িয়া অধিকারী বলিলেন যে, এ অতি উত্তম কথা। প্রভুতে সকলেরই অধিকার আছে। তিনি পাঁচ সাত জন সঙ্গী লইয়া নিরস্ত্র হইয়া আসিতে পারেন। তাঁহাকে সম্মানের ত্রুটী হইবে না। তাই মুসলমান অধিকারী যখন আসিলেন, তখন উড়িয়া অধিকারী বাহু পসারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন। মুসলমান প্রভুকে দর্শন করিবা মাত্র অমনি বিবশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। উড়িয়া অধিকারী, অভ্যাগত মুসলমানকে উঠাইয়া প্রভুর সমীপে লইয়া গেলেন। মুসলমান অধিকারীর মুখে তখন প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনাম লাগিয়া গিয়াছে। তিনি প্রভুকে জোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রভু! আমি হিংসা করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, আমাকে তুমি অঙ্গীকার কর, করিয়া উদ্ধার কর।" উড়িষ্যার অধিকারীও জোড়হস্তে বলিতেছেন, "প্রভু! যাঁহার নাম স্মরণ মাত্র ভববন্ধন ঘুচিয়া যায়, তাঁহার দর্শনে হিংস্রক মুসলমান পবিত্র হইবে তাহার বিচিত্র কি?" কিন্তু প্রভু, কে তাঁহাকে প্রণাম করিল, ইহার কিছুই লক্ষ্য না করায়—

প্রভুর পার্ষদগণ প্রভু প্রতি কন।
ইহা প্রতি কর প্রভু কৃপাবলোকন॥
ভক্ত বাক্য অনুরোধে প্রভু তার প্রতি।
কৃপা দৃষ্টিপাত কৈল গোলোকের পতি॥

প্রভু-কৃপাদৃষ্টি পেয়ে সুকৃতি সে জন।
প্রেমে মত্ত হৈল যেন গ্রহগ্রস্ত জন॥
পুলকে ব্যাপিল সেই যবনশরীর।
গদ্‌গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রুনীর॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, ওহে অধিকারি, প্রভু গণসহ গৌড়ে যাইবেন, তুমি তাঁহার সহায়তা কর। অধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কত দূর যাইবেন? গোপীনাথ বলিলেন, পাণিহাটী পর্য্যন্ত। ইহাতে মুসলমান অধিকারী কৃতার্থম্মন্য হইলেন। বলিতেছেন—

চৈতন্য দেবের আমি সাহায্য করিব।
মনুষ্য জনম আইজ সফল হইব॥

তখন— এক নৌকা নবীন অত্যন্ত সুগঠন।
তার মধ্যে দিব্য ঘর বসিতে আসন॥ (চন্দ্রোদয়)

সেই নৌকা আনিয়া প্রভু ও তাঁহার নিজ জনকে উঠাইলেন। অধিকারীর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিবার একটুও ইচ্ছা নাই, তাই ছল উঠাইলেন যে, পথে জল-দস্যুভয় অতএব তিনিও যাইবেন। এইরূপে দশ নৌকা সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রভুর নৌকার অগ্রবর্ত্তী হইয়া আগে পাছে চলিলেন। উড়িয়া অধিকারী বিদায় হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। এদিকে হরিধ্বনির সহিত প্রভুর নৌকা গৌড়দেশে ছুটিল। মুসলমান অধিকারী প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট নদ পার করাইলেন। শেষ পিছল-দহ পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখান হইতে জনালয়, সেখান হইতে আর ভয় নাই। তখন প্রভু মুসলমান অধিকারীকে ডাকাইলেন। তিনি আসিলে—

জগন্নাথ প্রসাদ মোদক মনোহরা নাম।
আপনার হস্তে করি গৌর ভগবান॥

তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। ইহাতে মুসলমান অধিকারী—

উচ্চৈঃস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকারিয়া।
মহাভাগবত হৈল প্রভু কৃপা পাইয়া॥
ছাড়িয়া না যায় প্রভু কান্দিতে লাগিলা। (চন্দ্রোদয়)

এইরূপ তিনি শুধু প্রভুর গণ হইলেন তাহা নয়, পরম ভাগবত জগতমান্য বৈষ্ণব হইলেন।

নবম অধ্যায়।

শ্যামচাঁদ নেচে নেচে নেচে যায় ॥ ঞ ॥
ব্রজ জুড়াল, দুঃখ গেল .
ব্রজ জনার প্রাণ এল।
তামসী রজনী গেল, শ্যামচাঁদের উদয় হলো
উঠিল প্রেমেরি হিল্লোল।
ফুল ফুটিল, জুটিল পিক শুক অলি কুল ॥

নৌকা চলিয়াছে, যাহারা নাবিক তাহারাও প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে! তাহারাও নৌকা বাহিতেছে ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-নাম বলিতেছে। নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইল। প্রভুর এক অদ্ভুত শক্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা কি, না, লোক আকর্ষণ করা। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা গো গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেন। পানিহাটীতে যেই নৌকা লাগিল, অমনি সকলে দেখেন যে উঠিয়া যাইবার পথ নাই, একেবারে লোকারণ্য হইয়াছে! প্রভু নৌকাপথে আসিয়াছেন। অবশ্য রাঘব—যাহাব বাড়ীতে প্রভু উঠিলেন,—জানিতেন যে, প্রভু বিজয়া দিবসে নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখে যাইবেন। প্রভু নৌকাপথে আসিতেছেন, এত দ্রুত আসিতেছেন যে, হাঁটিয়া নৌকার সহিত যাওয়া যায় না। প্রভু কোথাও নামেন নাই, কারণ গ্রন্থে দেখিতেছি যে পিচ্ছল দহ হইতে এক দিনে পানিহাটি আসিলেন। কিন্তু যে ঘাটে নৌকা লাগিল, অমনি "অকস্মাৎ কোথা হইতে লোকময় হইল।"

বিবেচনা করুন, প্রভুকে সকলের প্রয়োজন, পরিমিত দেহধারী প্রভু বাড়ী বাড়ী যাইতে পারেন না। প্রভু জীবগণের সহিত মিশিতে আসিয়াছেন, তাই একস্থানে বসিয়া তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। প্রভু যে অবধি নিলাচল ত্যাগ করিয়াছেন, সেই অবধি লোকারণ্য। তবে নদী যেমন ক্রমে পরিসর হয় সেইরূপ এই লোক-স্রোত ক্রমে বাড়িতেছে। পানিহাটিতে কিরূপ লোকারণ্য হইল তাহা চন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে।

যথা।— গঙ্গাতীর সীমা প্রভু যেই মাত্র গেল।
অকস্মাৎ কোথা হইতে লোকময় হইল॥
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি।
এই কথা শুনি মনে বুঝিবে বিচারি।
ধরণীতে ধূলি রাশি যতেক আছিল।
হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল॥

এইরূপ পাণিহাটি হইতে প্রভুর গতির সঙ্গে ক্রমে লোক বাড়িয়া চলিল। সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভু আবার চলিলেন। প্রভু নৌকায় চলিয়াছেন, লোকের আকিঞ্চনে বাহিরে আসিয়া বসিয়া আছেন।

সুমধুর কণ্ঠ স্বরে, প্রসন্ন বদনে হেরে,
কৃষ্ণ বলি গৌর ভগবান।
নৌকা পরে বসি যায়, অনিমিখ নেত্রে চায়,
দুকূলে যতেক ভাগ্যবান॥
প্রভু চলে গঙ্গাজলে, লোক সব দুই কূলে,
উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বনি।
বাল বৃদ্ধ নর নারী, সবে বলে হরি হরি,
ব্যাপিলেক আকাশ অবনী॥

পাঠক মহাশয়, মনে অনুভব করুন যে প্রভু নৌকায় বসিয়া যাইতেছেন, কখন বা লোকের তৃপ্তির নিমিত্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবদনে হরি বলিতেছেন। দুই ধারে লোকের অন্ত নাই, নিরপেক্ষ প্রভু তাই মাঝ গঙ্গা দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তবু শ্রীভগবানের কি কৃপা লোকের নিষ্ঠা এরূপ যে যদিও প্রভুর নৌকা পরিসর গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া গমন করিতেছে, তবু তাঁহারা তাঁহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছেন। ইহা প্রভুর শক্তির নিমিত্ত নহে, লোকের ভক্তির নিমিত্ত। প্রভুর শ্রীবদন দর্শন নিমিত্ত লোকের এরূপ গাঢ় বাসনা হইয়াছে যে, চক্ষুর দীপ্তি স্বভাবত অতি তীক্ষ্ণ হইয়াছে। সকলে প্রভুর আপাদ মস্তক অতি পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইতেছেন। কাজেই উভয় কূলের লোকে ভাবিতেছেন যে, কৃপাময় প্রভুর তাঁহাদের প্রতি বড় কৃপা, তাই তাঁহাদের কূল দিয়া যাইতেছেন। সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। যাঁহারা অগ্রে পথ রোধ করিয়া দাড়াইয়া আছেন, তাঁহারা অগ্র হইতে চলিয়াছেন। প্রভু মাঝে মাঝে উঠিয়া বাহু তুলিয়া হরিধ্বনি করিতেছেন, আর

দুই কূল হইতে লোকে তাহা শুনিতে পাইতেছেন। কিরূপে, না যেরূপে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন। প্রভুর মুখে হরিধ্বনি শুনিয়া অমনি লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেছেন।

এই মতে প্রভু কুমারহট্টে উঠিলেন। প্রভু সেখানে নামিয়া সেই ভূমিকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানকার এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইলেন, লইয়া বহির্ব্বাসে ইহাই বলিতে বলিতে বান্ধিতে লাগিলেন, "এ কুমার-হট্ট পবিত্র স্থান, এখানকার কুকুর শৃগাল আমার নমস্ত, যেহেতু ইহা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান, এই মৃত্তিকা আমার প্রাণ হইতে প্রিয়।"

প্রভুকে তখন সকলে সান্ত্বনা করিয়া লইয়া গেলেন। কোথায়? কাহার বাড়ী? যাঁহার বাড়ীতে প্রভু আট নয় মাস নৃত্য করিয়াছিলেন। যাঁহার বাড়ী তাঁহার নিজের বাড়ীর ন্যায় তাঁহার লীলার স্থান। অর্থাৎ প্রভুকে, শ্রীবাস আদর করিয়া তাঁহার কুমারহট্টের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। শ্রীবাসের এমন কি তখনকার বহুতর লোকের, নবদ্বীপে এক বাড়ী, আর বাহিরে আর এক বাড়ী ছিল। প্রভুর শুভাগমনে শ্রীবাসের বাড়ী,—তাঁহার স্ত্রী মালিনী, তাঁহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীকান্ত ও শ্রীনিধি ও তাঁহাদের পত্নী, শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের মাতা, নারায়ণী, তখন নয় বৎসরের,—ইহাদের মধ্যে কিরূপ হুলু স্থূল পড়িয়া গেল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। শ্রীবাসের বাড়ীতে সকলে আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন; যথা—

সেইত পরাণ নাথ হে।
আমি পেলাম, আমি পেলাম, হারা ধনে॥

এই গণ্ডগোলের মধ্যে জগদানন্দ প্রভুকে কি অন্য কাহাকে না বলিয়া চুপে চুপে কাঞ্চন পাড়ায় শ্রীশিবানন্দ সেনের বাড়ী চলিয়া গেলেন; কুমার-হট্ট কাঁচড়া পাড়ার অতি নিকটে। শ্রীজগদানন্দ উদাসীন, যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন এই শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে। ইনি সত্যভামার প্রকাশ প্রভুর সহিত ইহাঁর কিরূপ প্রীতি ছিল, না, যেমন শ্রীকৃষ্ণে ও সত্যভামায়। প্রভুর সহিত সর্ব্বদা কলহ করিতেন, কলহ আর কোন বিষয় লইয়া নয়, তিনি প্রভুকে ভাল খাওয়াইবেন, আরামে শুয়াইবেন। কিন্তু প্রভু তাহা শুনিতে পারিতেন না। জগদানন্দ তখন রাগ করিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। প্রভু যাইয়া তাঁহাকে সাধিয়া খাওয়াইতেন।

এখন একটী কাহিনী বলিব। প্রভু পূর্ব্বে যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন রামরায় ও সার্ব্বভৌমের অনুরোধে উহা হইতে নিরস্ত হয়েন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সংকল্পের সময় শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেখানে ছিলেন। কথা এই, ভক্তগণ কার্ত্তিক মাসে চলিয়া আসিলে, শ্রীকান্ত আর কিছু দিন নীলাচলে ছিলেন। শ্রীকান্ত যখন গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন প্রভু তাঁহাকে বলেন যে, তিনি গৌড়ে যাইবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, আর যাইয়া জগদানন্দের হস্তে ভিক্ষা করিবেন। শ্রীকান্ত এই কথা শুনিয়া মনে বুঝিলেন যে, প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আসিবেন, যেহেতু জগদানন্দ সেই বাড়ীতে থাকেন। ইহা বুঝিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই সংবাদ মামা শিবানন্দকে বলিবার নিমিত্ত গৌড়ে ছুটিলেন। গৌড়ে আসিয়া এই শুভ সংবাদ দিলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাস।

শিবানন্দ আনন্দে একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সেইদিন হইতে প্রভুর সেবার বস্তু আহরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু বাস্তুশাক ভাল বাসেন, কিন্তু শীত কালে উহা হয় না। প্রভু গর্ভথোড় ভাল বাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। তবু শিবানন্দ নানা স্থানে শাক রোপণ করিয়া উহাতে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কোথায় গর্ভ-থোড় পাওয়া যাইবে উহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর তাঁহার চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বলিতেছেন যে, শ্রীকান্ত আসিয়া তাঁহার পিতাকে সংবাদ বলিলে,—

সেই দিন হইতে শিবানন্দ ভাগ্যধর।
ভিক্ষার সামগ্রী লাগি হইলা তৎপর॥

এদিকে প্রভু আসিবেন আসিবেন মনে করিতেছেন। রামানন্দ রায় নানা ছলে নানা উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতেছেন, আসিতে পারিলেন না। তখন অবশ্য শিবানন্দ বড় কাতর হইলেন। প্রভুর নিমিত্ত সংগৃহীত দ্রব্য কাহাকে ভুঞ্জাইবেন? নীলাচলে বাস্তু শাক গর্ভ-থোড় পাঠাইতে পারেন না। তখন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক তিনি আশ্বাসিত হইলেন। ইনি বড় তেজস্কর ভক্ত। কথিত আছে ইহাঁর উপাস্য দেবতা শ্রীনৃসিংহ ঠাকুর ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ রূপে কথা কহিতেন। এদিকে গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। তাঁহার নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ। ব্রহ্মচারী শিবানন্দকে

আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তিনি গৌরাঙ্গকে প্রেম ডোরে বান্ধিয়া তাঁহাকে তাঁহার (সেন মহাশয়ের) বাড়ীতে আনিয়া, সেন-দত্ত সমুদায় সামগ্রী খাওয়াইবেন। ইহা বলিয়া ব্রহ্মচারী কঠোর ধ্যানে বসিলেন। সারা দিন সারা রাত্রি এইরূপে গেল, তাহার পরদিবস' ভোগ দিলেন। খানিক কান্দিলেন, হাসিলেন, নৃত্য করিলেন, আর বলিলেন গৌরাঙ্গ আসিয়া সমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে শিবানন্দ দেখিতে পাইলেন না। প্রভু যে আসিয়া সেবা করিয়াছেন, তাহার কিছু প্রমাণ ছিল না। ভোগের সামগ্রী যেমন তেমনি রহিল। শিবানন্দ সেন দেহধারী ভগবানকে পূজা করেন, তাঁহার ওরূপ মনে মনে ভোগে তৃপ্তি হইবে কেন? ব্রহ্মচারী যে প্রকৃতই গৌরাঙ্গ প্রভুকে আনিয়া ছিলেন, আর তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু সেই বার ভক্তগণ নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিয়া ইহার তথ্য পাইলেন। প্রভুর সম্মুখে সকলে বসিয়া, শিবানন্দ সেনও আছেন। এমন সময় প্রভু হঠাৎ বলিলেন, "এই বার পৌষ মাসে আমি কাঁচনা পাড়ায় শিবানন্দের আলয়ে নৃসিংহানন্দের হাতে অপরূপ বাস্তু শাক খাইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া শিবানন্দ সেনের মনের সন্দেহ গেল। প্রভু যে তাঁহার বাড়ী গমন করিয়া ভোজন করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস হইল।

শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সত্যভামা, প্রভুর সেইরূপ জগদানন্দ, অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে জগদানন্দের এত প্রীতি। জগদানন্দ চিরদিন শিবানন্দ কর্তৃক তাঁহার বাড়ীতে প্রতিপালিত। তিনি ভাবিলেন এই উদ্যোগে প্রভুকে সেন মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার যে ঋণ, তাহার কিছু শোধ করিবেন। তাই প্রভু কুমারহট্টে আসিলে, জগদানন্দ গোপনে গোপনে শিবানন্দের বাড়ী গমন করিলেন। শিবানন্দকে বলিলেন, "তুমি নৌকা লইয়া প্রভুকে নিবেদন কর যে তোমার বাড়ী তিনি পদার্পণ করেন, আর আমি এদিকে বাড়ী সুসজ্জীভূত করি।" শিবানন্দ তাই প্রভুকে আনিতে চলিলেন। কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের নিকট মস্তক রাখিয়া শিবানন্দ কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার এই দীন ভক্তের চির দিনের মনের সাধ এই বার পূর্ণ কর।" প্রভু তখনি বুঝিলেন, শিবানন্দ

কি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন, "শিবানন্দ, তোমার যাহা অভিরুচি।" প্রভুর অনুমতি পাইয়া, শিবানন্দ দ্রুতপদে দূত দ্বারা এই সংবাদ জগদানন্দের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু এই লীলাটী শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর স্বয়ং বর্ণনা করেন।

যথা—(চন্দ্রোদয় নাটক)

শিবানন্দ সুখী হইল, ঘাটে নৌকা আনাইল,
শেষ রাত্রে প্রভু যাত্রা কৈল।
অকস্মাৎ লোক সব, করি হরি হরি রব,
চতুর্দ্দিকে ধাইতে লাগিল॥
কেহ বা চড়ে প্রাচীরে, কেহ বৃক্ষডালে চড়ে,
কেহ নাচে কেহ গায় পথে।
পৃথ্বী হইল লোকময়, উচ্চ হরিধ্বনি হয়,
মহাপ্রভু চলিলা নৌকাতে॥

মনে ভাবুন প্রভু লোকের ভয়ে শেষ রাত্রিতে লুকাইয়া যাইতেছিলেন। আবার শুনুন,—

মহাপ্রভু কুতূহলে, কাঞ্চন পাড়াতে চলে,
শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায়।
গঙ্গার দুকূল ভরি, সবে বলে হরি হরি,
গঙ্গায় উজান নৌকা যায়॥

কাঁচনা পাড়ায় নৌকা লাগিল, শিবানন্দের ঘাটে প্রভু উঠিলেন। দেখেন যে পথ সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রথমে পথের দুই ধারে কদলীবৃক্ষ, প্রদীপ, কুম্ভ, ফুলের মালা, আম্রের পল্লব, ঘাট হইতে সেনের বাটী পর্য্যন্ত বস্ত্র-সুমণ্ডিত। প্রভু সেই পথে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ভক্তগণ, দুই ধারে অসংখ্য লোক। পথের সুরচনা দেখিয়া প্রভু হাসিয়া, শিবানন্দের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এ সমুদায় জগায়ের কাজ, না?" তাহা হউক "জগাই" আমার (গ্রন্থকারের) মনের মত মানুষ। প্রভু সুখে পথের সজ্জা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন।

কতদূর গিয়া আগে, দুই পথ দুই দিকে,
সমান মণ্ডিত সুরচন।

(চন্দ্রোদয় নাটক।)

প্রভু দুই দিকে দুই পথ দেখিয়া, কোন পথে যাইবেন ভাবিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন। তখন মুকুন্দের দাদা বাসুদেবদত্ত চরণ তলে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "এই পথে অধমের বাড়ী যাইতে হয়। আগে শিবানন্দ সেনের বাড়ী গমন করুন, পরে কৃপা করিয়া এ অধমের বাড়ী যাইবেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আগে চলিলেন।

প্রভু বাহির বাটী মন্দিরের নিকট দাঁড়াইলেন। গ্রামের যত রমণীগণ অভ্যন্তরে আসিয়াছেন, তাঁহারা গগন ভেদিয়া হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ঝাঁঝর-ধ্বনি আরম্ভ করিলেন। শিবানন্দ সেন উত্তম আসনে ঠাকুরকে বসাইলেন। জগদানন্দ ঝারিতে জল আনিয়া আপনি প্রভুর পদধৌত আরম্ভ করি-লেন। প্রভুর সেই চরণামৃত লইয়া জগদানন্দ সমস্ত বাড়ী ছিটাইতে লাগি-লেন। প্রভু এইরূপে কিয়ৎক্ষণ শিবানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। বাসুদেব যদিও গৃহী, তবু প্রভুর বড় প্রিয়। তিনি জগতের জীবের সমুদায় পাপ লইবেন এই বর প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। প্রভু বাসুদেবের বাড়ী এইরূপ কিছুকাল বসিয়া শেষে যাইয়া আবার নৌকায় উঠিলেন। ইহাতে শিবানন্দ বাসুদেবে, সগোষ্ঠিতে "উচ্চৈঃ-স্বরে কান্দেন নৌকার পানে চাঞা।"

প্রভু যে পথে হাটিয়া শিবানন্দের ও বাসুদেবের বাটী গনন করিয়াছিলেন,

সে স্থানের ধূলি নিতে, লোক যায় শতে শতে,

গর্ত্তময় হয় ক্রমে ক্রমে।

প্রভু আবার নৌকায় চড়িলেন। প্রভু বড় ব্যস্ত, কিন্তু লোকের আকি-ঞ্চনে যাইতে পারিতেছেন না। প্রভু চলিয়াছেন, দুই ধারে অসংখ্য লোক হরি হরি বলিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন।

প্রভুর চরণ জল লইবার তরে।
সহস্র সহস্র লোক জলে আসি পড়ে॥
আকণ্ঠ হইল জল তবু ব্যগ্র হইয়া।
পাদোদক লাগি লোক চলিল ভাসিয়া॥
লোকের ব্যস্ততা দেখি করুণা জন্মিল।
প্রভু ইচ্ছায় পাদোদক সর্ব্বলোকে পাইল॥

কিন্তু তবু লোক ফিরিতেছে না, ক্রমেই লোকের জনতা বাড়িয়া যাই-তেছে। কোন ক্রমে প্রভু শান্তিপুরে আসিয়া পঁহুছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথ পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাইবেন অনুমতি মাগিলেন, আর শীঘ্র যাইবেন বলিয়া শান্তিপুরে থাকিতে পারিলেন না, নদীয়া অভিমুখে চলিলেন।

প্রভুর ইচ্ছা ছিল কয়েকদিন একটু নির্জ্জনে বাস করিয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে বিদায় লইবেন। কিন্তু দিবানিশি তাঁহার লোকারণ্য মাঝে বাস করিতে হইতেছে; যত অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, ক্রমেই লোক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা যে, ক্রমেই জনপূর্ণ স্থানে আসিতেছেন শুধু সে নিমিত্ত নহে। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারা নাচিতেছেন, গাইতেছেন, অর্থাৎ সুখে ভাসিতেছেন। ভক্তি হইতে উত্থিত এই অভিনব অতি সুস্বাদু স্ফূর্ত্তিকর আনন্দ পাইয়া, অনেকে আর গৃহে যাইতেছেন না, সুতরাং প্রভুর সহিত লক্ষাধিক লোক রহিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের অবশ্য দেহধর্ম্মের প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তির শক্তিতে তাঁহারা দেহধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন যে, এইরূপ কেহ কেহ ভক্তি-সুখে উন্মত্ত হইয়া এক মাস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়াও ক্লিষ্ট হইতেন না। প্রভু কিছু কাল নির্জ্জনে আরাম করিবেন, এই আশায় নবদ্বীপের এক অংশ বিদ্যা-নগর, সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির বাড়ীতে বাস করিবেন, মনে সংকল্প করিলেন। লোকের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অতি গোপনে, গভীর রজনীতে নৌকা আরোহণ করিলেন, করিয়া অতি প্রত্যূষে আঁধার থাকিতে বিদ্যানগর বাচস্পতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন নিদ্রিত। মৃদুস্বরে তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি নয়ন মুছিতে মুছিতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, দ্বারে স্বয়ং নবদ্বীপচন্দ্র উদয় হইয়াছেন, তখন আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, আমরা তোমার অতিথি, দিন কয়েক তোমার আলয়ে বাস করিয়া গঙ্গাস্নান করিব। আমাদিগকে প্রকাশ করিবা না, আমরা নিতান্ত গোপনে থাকিব ইচ্ছা করিয়াছি। বাচস্পতি বলিলেন, আমার বাড়ী কি ছার, আমার গোষ্ঠি সমেত আপনাকে মন প্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিয়াছি। তবে আপনাকে গোপন যতদূর সাধ্য তাহা করিব।

প্রভুর উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যানগর পর্য্যন্ত আগমন লীলা প্রধানতঃ কবিকর্ণপুরের চন্দ্রোদয় হইতে গৃহীত হইয়াছে। পরের লীলার নিমিত্ত আমরা শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় লইলাম।

এখন শ্রীনবদ্বীপের এক অংশে প্রভু লুকাইয়া থাকিবেন ইহা সম্ভব নয়। প্রভু আসিবা মাত্র একথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, যে নিমাইচাঁদ বাচস্পতির বাড়ীতে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহার বাড়ীতে আসিলে তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া প্রথমে লোকে বুঝিল যে কি একটা কাণ্ড হইয়াছে। কাজেই লোকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, আর কাজেই প্রভু ধরা পড়িলেন। লোকে জানিল প্রভু আসিয়া লুকাইয়া আছেন। ইহাতে ভক্ত অভক্ত, নিমাইয়ের শত্রু মিত্র, সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ছুটিলেন। প্রভুর মহিমা তখন সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর অনুগত ভক্ত ছিলেন ও বিদ্বেষী অভক্ত ছিলেন। যাহারা বিদ্বেষী তাহারা সুখবিলাসী নিমাইকে হঠাৎ নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শেষে সমাজের মধ্যে এরূপ অবস্থা হইল যে, প্রভুর যে অতি বড় শত্রু সেও বলিতে লাগিল যে, নিমাইয়ের ন্যায় ভক্ত জগতে কস্মিন্ কালেও হয় নাই। ভক্তির নিমিত্ত মাধবেন্দ্র ভারত পূজ্য ছিলেন। প্রভুর যশে পুরী গোসাঞির মহিমা মলিন হইয়া গেল। যাহারা প্রভুর অতি বড় বিপক্ষ তাহারাও তাঁহাকে শুক বা প্রহ্লাদের সহিত তুলনা করিতে লাগিল। প্রভুকে যাঁহারা পূর্ব্বে নিন্দা করিতেন, তাঁহাদের এখন প্রভুর কঠোর তপস্যা দেখিয়া কিরূপ ভাব হইয়াছে, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একটী গীতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়।
এইবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমা, গুণ কহিয়াছি কত।
এবার নাগালি পেলে হব অনুগত॥
দেশে দশে যত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তার লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিত পাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্দাবন দাস॥

প্রভু বাচস্পতির বাড়ী আসিয়াছেন, একথা মুখে মুখে সমস্ত নবদ্বীপ প্রচার হইয়া পড়িল। মনে ভাবুন শ্রীনবদ্বীপ নগরীতে অন্ততঃ দশ বিশ লক্ষ লোকের বাস, দশ বিশ লক্ষ লোকেই প্রভুকে দেখিবেন ইচ্ছা করিলেন। শুধু তাহা নহে, নবদ্বীপ যেরূপ জনাকীর্ণ নগর উহার নিকটের গ্রাম সমুদায়ই এক একটি প্রধান নগরের মধ্যে গণ্য, সে সমুদায় স্থানের লোকও আসিতে প্রস্তুত হইলেন।

বাধার মধ্যে এই যে অন্য নগর হইতে বিদ্যানগর আসিতে পার হইতে হয়। প্রথমে এক দুই করিয়া বাচস্পতির গৃহে লোক আসিতে লাগিল। বাচস্পতির বাড়ী শীঘ্র লোকে পূরিয়া গেল। শেষে সমুদায় বিদ্যানগর লোকে পরিপূর্ণ হইল। এ পারের এই দশা; ও পারে অসংখ্য লোক পার হইতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া। আবার অসংখ্য লোক নানাদিক্ হইতে আসিতেছে। ওপারে লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এপারের লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে। এপারে ওপারে এইরূপে মুহুর্মুহু উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। প্রভু যে গোপনে থাকিবেন সে কথা আর কাহারও মনে নাই। প্রভু নিতান্ত বালকের ন্যায় ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। লোক বাচস্পতির বাড়ী ক্রমে সমস্ত নগর অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। লোকের পদাঘাতে গ্রামটি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

বাচস্পতির গৌরবের সীমা নাই, সকলেই তাঁহাকে ডাকিতেছে। বলিতেছে, "বাচস্পতি ঠাকুর! একবার প্রভুকে দাও।" বাচস্পতি প্রভুকে দেখাইবেন কি, তিনি এক ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়া গঙ্গাতীরে ছুটিলেন। তিনি শুনিলেন সহস্র সহস্র লোক নৌকা না পাইয়া অধৈর্য্য হইয়া গঙ্গায় ঝম্প দিয়াছে, দিয়া এপারে আসিতেছে, আর সেই নিমিত্ত লোক ডুবিয়া মরিতেছে। বাচস্পতি এই কথা শুনিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, করিয়া অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। দেখিলেন ওপারে অসংখ্য লোক, দেখিলেন আরো অসংখ্য লোক আসিতেছে, আর দেখিলেন গঙ্গা যুড়িয়া লোকে সাঁতার দিয়া এপারে আসিতেছে। কেহ সাঁতার দিতেছে, কেহ কলসী লইয়াছে, কেহ কলার গাছ। গঙ্গায় কেবল মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে।

লোক পার করিবার নিমিত্ত বহুতর নৌকা আপনা আপনি জুটিয়া গিয়াছে। পারের কড়ি পাঁচ গণ্ডা অর্থাৎ সিকি পয়সা ছিল। এক রাত্রে

এক টাকা (তঙ্কা) হইল। লোক নৌকায় উঠিতে নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। কখন নৌকায় এত লোক উঠিতেছে যে উহা কখন কূলে কখন মাঝখানে ডুবিয়া যাইতেছে, কিন্তু তবু প্রভুর কৃপায় লোক মরিতেছে না। যখন নৌকা ডুবিতেছে, তখন সেই নৌকার লোকে হরিধ্বনি করিতেছে। যাহারা সেই নৌকায় নাই, তাহারা তাই দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেছে। লোকের উৎসাহে কাহার প্রাণে ভয় নাই, লোকে দেখিতেছে যে শত শত নৌকা ডুবিতেছে তাহা দেখিয়াও কেহ সাবধান হইতেছে না। আবার ঐরূপ নৌকায় বহুতর লোক উঠিতেছে, ও আবার ডুবাইতেছে, কি কখন উহা ভাঙ্গিতেছে। ভরা নৌকা সহিত জলে ডুবিয়া যাওয়া সেও এক আমোদের কাজ হইল! সমুদায় গঙ্গায় মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে, আর ওপারে লক্ষ লোক পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বাচস্পতি ভাবিলেন যে প্রভুকে দেখিতে সমুদায় লোক তাঁহার বাটীতে আসিতেছে, ইহাদিগকে তাঁহার পারের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। তাই আপনি যত্ন করিয়া বহু লোক দ্বারা বহু নৌকা আনাইতে লাগিলেন। দুই চারি ক্রোশের মধ্যে সেখানে যত নৌকা আছে সব ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রভুকে বাচস্পতি গোপনে রাখিবেন ভার লইয়া ছিলেন। এখন প্রভুকে গোপন করার আশা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে লোকের দর্শন সুলভ হয় তাহাই করিতে লাগিলেন। বাচস্পতির নিজের দেহধর্ম্মের চেষ্টা নাই, গ্রামের লোকেরও সেইরূপ। গ্রামের মধ্যে হরিধ্বনির হুঙ্কার হইতেছে, নৃত্য হইতেছে, বাচস্পতির গৃহ দ্বার আর থাকে না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই।

পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন জঙ্গল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে॥
মনুষ্য হইল পরিপূর্ণ সর্ব্ব গ্রাম।
নগর প্রান্তরেও নাহি কিছু স্থান॥
সহস্র লোক এক এক বৃক্ষের উপরে।
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে॥ (ভাগবত)

প্রভু ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। বাহিরের লোকে দর্শন দাও বলিয়া হুঙ্কার করিতেছে। লোকে জানিতেছে যে প্রভু সম্মুখের ঘরে লুকাইয়া আছেন, জানিতেছে তাহাদের আর্ত্তনাদ তিনি শুনিতেছেন, জানিতেছে তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, জানিতেছে তিনি দয়াময়। এই কয়টী জ্ঞানের

দ্বারা (প্রথম তিনি সম্মুখে লুকাইয়া, দ্বিতীয়তঃ তিনি আর্ত্তনাদ শুনিলে দয়াদ্র হইবেন) চালিত, ভক্তগণ প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রভুর প্রতিজ্ঞা যে তিনি লুকাইয়া থাকিবেন, তাহার শক্তি হ্রাস হইল, কাজেই তিনি লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কথা এই, শ্রীভগবান লুকাইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ও দয়াদ্র জানিয়া যদি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ডাকা যায়, তবে তিনি লুকাইয়া থাকিতে পারেন না। এই তাঁহার প্রকৃতি, কি এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা, কি এই তাঁহার নিয়ম। তুমি যদি শ্রীভগবানকে নিকটে জানিয়া, তাঁহাকে দয়ার্দ্র জানিয়া, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ডাকিতে থাক, তবে তিনি তোমাকে দর্শন দিতে বাধ্য ; কি রূপ ? না যেরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ তিনি গোপনে থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও এই সমস্ত লোকদিগকে পরিশেষে দর্শন দিয়াছিলেন।

প্রভু দেখিলেন বিদ্যানগর উজাড় হইবার উপক্রম! আর দেখিলেন যে, বাচস্পতির গৃহ দ্বার বাগান আর কিছু থাকে না। তখন কোথায় লুকাইবেন এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ওপার কুলিয়া, সেখানে মাধব দাস বৈরাগীর বাড়ী থাকিবেন, পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত করিলেন। করিয়া, স্বগণে সকলকে ফাঁকি দিয়া, কুলিয়ায় মাধব দাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই যে প্রভু গেলেন, ইহা কেহ জানিতে পারিলেন না বাচস্পতিও না। তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাকে লুকাইয়া প্রভুর চলিয়া যাইতে কঠিন হইল না। বাচস্পতি, প্রভু গিয়াছেন এই দুঃখে, ও লোকের ভয়ে, আপনি তখন গৃহের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলেন। কিন্তু তাহাও অধিকক্ষণ পারিলেন না। দর্শন দাও দর্শন দাও বলিয়া যে লোকের হুঙ্কার, তাহার শব্দ তখন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাচস্পতি অগত্যা বাহিরে আসিলেন, আসিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনারা শান্ত হউন। প্রভু আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" এ কথা লোকে বিশ্বাস করিল না, তাহারা বলিল' প্রভু এইমাত্র এখানে দর্শন দিয়াছিলেন, অতএব এখানেই আছেন।"

বাচস্পতি বলিলেন যে, তাহা সত্য, কিন্তু তাহার পরেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

লোকে ভাবিল বাচস্পতি ফাঁকি দিতেছেন, তাহাই ভাবিয়া পরামর্শ করিল যে প্রভু হরিধ্বনিতে তুষ্ট, অতএব মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিলে তিনি

অবশ্য বাহিরে আসিবেন। ইহাই ভাবিয়া লোকে সব কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া এক সুরে হরি হরিবোল, হরি হরিবোল বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। লক্ষাধিক লোক এই রূপে পলকে পলকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া হুলুস্থূল, এমন কি শ্রীভগবানকে পর্য্যন্ত অস্থির করিলেন। কিন্তু প্রভু তখন কুলিয়া গিয়াছেন।

বাচস্পতি যদিও বারংবার বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু তাঁহার বাড়ীতে নাই, লোকে তবু উহা প্রত্যয় করিল না। তাহারা ভাবিল যে বাচস্পতি প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। লোকে হতাশ্বাস হইয়াছে, তাহাদের ক্রোধের বস্তু এক জন প্রয়োজন হইয়াছে। প্রভুর উপর রাগ করিবার অধিকার নাই। তাই বাচস্পতিকে সকলে গালি পাড়িতে লাগিল। লক্ষাধিক লোকে তাঁহার বাড়ী ঘিরিয়া। তাহারা গালি পাড়িলে তিনি কি করিতে পারেন? লোকে বলিতে লাগিল, বাচস্পতি ঠাকুর! প্রভুকে ঘরে পাইয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমরা যদি ভবসাগর পার হইতে পারি, তোমার তাহাতে ক্ষতি কি? লোকে বলিতেছে, (চৈতন্য-ভাগবত)—

আমরা তরিলে বা উহার কোন দুঃখ।
আপনিই মাত্র তরি এই কোন সুখ॥
কেহ বলে সুজনের এই ধর্ম্ম হয়॥
সবারে উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥

বাচস্পতি মহা বিপদে পড়িলেন, পড়িয়া কান্দিয়া তখন প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন, প্রভু! অদ্যকার বিপদ হইতে অধমকে উদ্ধার কর। ইহা বলিতে বলিতে, একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কর্ণে বলিল যে, প্রভু কুলিয়া মাধব দাসের বাড়ী গিয়াছেন। তখন বাচস্পতি আনন্দিত হইয়া বাহিরে আসিয়া সকল লোককে বলিলেন যে, প্রভু কুলিয়া গমন করিয়াছেন, চল তোমাদের আমি সেখানে লইয়া যাইব। এই কথা শুনিয়া সকলে তাঁহার কথা প্রত্যয় করিয়া, তাঁহার সঙ্গে চলিল।

সকলে সেখানে আসিয়া দেখেন ইহার মধ্যেই সেখানে লোকারণ্য হইয়াছে। যে লোকারণ্য সঙ্গে লইয়া বাচস্পতি আসিতেছেন, তাঁহাদের যাইবার আর পথ নাই! শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিতেছেন যে, প্রভুর কুলিয়ায় জীবের আকর্ষণ এত প্রকাণ্ড ব্যাপার যে উহা একবারে বর্ণনার অসাধ্য।

বোধ হইল যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক কুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীতে কখন এত লোক নাই, ইহা মনে ভাবিয়া অনেকে অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তেত্রিশকোটি দেবগণ মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিরাছেন। বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন যে, প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান তাহার আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন করে না, এই লোক সংখ্যা দেখিলেই বুঝা যাইবে। বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন, এত লোক ইচ্ছা মাত্র একত্র করা কি মনুষ্যে পারে? কে এ সমুদায় লোককে সংবাদ দিল, কেন এত লোকে সুখ দুঃখ, রোগ ক্রীড়া, বিষয় ধর্ম্ম, আহার নিদ্রা, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল? বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মন্তব্য এই যে, যিনি এইরূপে সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

ইহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন এইরূপে লক্ষাধিক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৌড়ের এপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন পাতসাহ ওপারে লোকের কলরব শুনিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত অট্টালিকায় উঠিলেন। সেখান হইতে লোকসমুদ্র ও তাহাদের জীবন্ত ভাব নৃত্য গীত ও হরিধ্বনি, ও নানা আনন্দসূচক কলরব দেখিয়া শুনিয়া ভয় পাইলেন। ভাবিলেন বা কেহ বুঝি তাঁহার রাজধানি আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। কেশব লাল বসু, খান উপাধি, তাঁহার মন্ত্রী। পাতসাহ ভয় পাইয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন। কেশবলাল বলিলেন, একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বই নয়। পাতসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই লক্ষ কোটি লোক তাঁহার সঙ্গে কেন? কেশব বলিলেন, ভবসাগর পার হইবার জন্য। পাতসাহ বলিলেন, এই সন্ন্যাসী আমা অপেক্ষা শক্তিধর সন্দেহ নাই, এত লোক সংগ্রহ করি আমার এ সঙ্গতি নাই, আর যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা স্বার্থপর হইয়া তাহাদের প্রভুর সেবা করিবে। যিনি বেনা বেতনে, এই লক্ষাধিক লোকের উপর এরূপ আধিপত্য করিতে পারেন, তিনি সামান্য জীব নহেন। তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান। অতএব পাতসাহাও বৃন্দাবন দাসের মীমাংসার অনুমোদন করিলেন।

এই যে লক্ষ কোটি লোক আসিতেছে ইহারা প্রায় কেহ ফিরিয়া যাইতেছে না। ইহারা কি করিতেছে, অগ্রে ইহা শ্রবণ করুন। তাহার পরে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও পাতসাহ যে তত্ত্ব কথা বলেন, তাহা বিচার করিব। এই সমস্ত কাণ্ড বৃন্দাবন দাস স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি শ্রীবাসের

ভ্রাতৃ-কন্যা-সুত-শ্রীনদীয়ায় তাঁহার বাড়ী, সুতরাং তাঁহার এই সমুদায় এক প্রকার চক্ষে দেখা বলা যাইতে পারে। শতশত সাধু লোকে, যাঁহারা এই ভিড়ে ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া তিনি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন! যথা—

বাচস্পতি গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল॥
কুলিয়া আকর্ষণ না যায় বর্ণন।
কেবল বর্ণিতে পারে সহস্র বদন॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়॥

মাধব দাস প্রভুকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছেন, কিন্তু এই পরম ধন প্রাপ্তির সঙ্গে যে বিপদ আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। বন্যা আসিতেছে, প্রথম লোকে অগ্রাহ্য করে। ধান্য ক্ষেত্রে এক অঙ্গুলি জল আসিয়াছে বই নয়, তাহাতে ভয় কি? অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে দেখে যে হাঁটু পরিমাণ জল হইল। শেষে ধান্য রক্ষা ত পাছের কথা, নিজের বাড়ী রক্ষা, প্রাণরক্ষা বিপদ হইয়া পড়ে। জন কয়েক সঙ্গী লইয়া প্রভু আসিলেন। মাধব দাস কৃত কৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিলেন। মাধব দাস ভাবিতেছেন, প্রভু আসিয়াছেন এ সংবাদ তাহার বন্ধু বান্ধবের নিকট পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এক দণ্ডের মধ্যে সহস্র লোক দুই দণ্ডের মধ্যে লক্ষ লোক হইল। যখন সন্ধ্যা হইল তখন মাধব দাস প্রভুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। প্রভুর প্রাণের ভয় কেন বলিতেছি। যে ঘরে প্রভুর বাস, সে ঘর আর রক্ষা করিতে পারেন না। পশ্চাৎ হইতে লোকে এরূপ অগ্রবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে যে, প্রভুর বাসগৃহের নিকট যাঁহারা, তাঁহারা গৃহের উপর পড়িতেছেন, প্রভু যে গৃহে রহিয়াছেন উহা রক্ষা করিতে পারেন না, দেখিয়া মাধব দাস সন্ধ্যার সময় সহস্র লোক লইয়া বাঁশ কাটাইতে লাগিলেন। এই বাঁশ কাটাইয়া প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত অতি দৃঢ় করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। প্রাতে সকলে দেখে, দুর্গ চুরমার হইয়া গিয়াছে।

সহস্র সহস্র নৌকা শুনিয়া আইল।
তথাপি মনুষ্যে পার করিতে নারিল॥
কেহ বলে জন প্রতি কাহনেক দিব।
মোরে পার করি দেহ প্রভুকে দেখিব॥
বড় বড় ধনী লোক যত ছিল তায়।
জন প্রতি তঙ্কা দিয়া পার হৈয়া যায়॥
কেহ কলাগাছ বান্ধি গঙ্গা পার হয়।
কেহ ঘট ধরি যায় না করয়ে ভয়॥
আজ সে খেলার সঙ্গী পড়ুয়া সকল।
দেখিতে আইলা সঙ্গে আনন্দে বিহ্বল॥
ন্যায়শাস্ত্রঅধ্যাপক নবদ্বীপে যত।
লোক দ্বারে শুনিছিলা চৈতন্যমহত্ত্ব॥
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়-টীকাকার।
তার মত লৈয়া তারা করে ব্যবহার॥
হেন সার্ব্বভৌম প্রভু বৈষ্ণব করিলা।
ষড়ভুজ ঈশ্বরমূর্ত্তি তারে দেখাইলা॥
পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী গর্ব্ব খণ্ডি নদীয়ায়।
নবদ্বীপ-মর্য্যাদা রাখিলা গৌররায়॥
হেন প্রভু আইলেন কুলিয়া নগরে।
সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে॥
কুলিয়া নগরে সংঘট্টের অন্ত নাই।
বাল বৃদ্ধ নর নারী হৈলা এক ঠাঁই॥
নিশায় মাধব দাস বহু লোক লঞা।
বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধি যাঞা॥
প্রাতঃকালে বাঁশ-গড় সব চূর্ণ হয়।
লোক ঘটা নিবারিতে কার শক্তি নয়॥

যাহারা আসিতেছে তাহারা আর যাইতেছে না, তাহাদের আহার নিদ্রা নাই। তাহারা কি করিতেছে? নৃত্য গীত করিতেছে, কখন কান্দিতেছে, কখন হাসিতেছে। ফল কথা, সকলে আনন্দে ভাসিতেছে, তাহাদের নৃত্য দেখিলে বোধহয় যে সকলে পরমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছে। এরূপ

শতকোটি জীব, এক বস্তুর এরূপ আশ্রয় লইতে কখন কোন কালে শুনা যায় নাই। মনে ভাবুন, এই যে সমুদয় লোক আসিতেছে, ইহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আছেন। কোন সাধুর পশ্চাৎ কখন কখন বহু সংখ্যক লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু সে স্বার্থের নিমিত্ত, কেহ ঔষধ লইতে, কেহ পুত্র কামনা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ বা সাধুর কৃপায় বড়লোক হইবেন, লৌহকে সোণা করিতে শিখিবেন, সেই নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছেন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে এই যে শত কোটী লোক ফিরিতেছেন, ইহা কি নিমিত্ত? ইহাতে স্বার্থসাধন লেশ নাই। শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবমাত্রের হৃদয়ে আছে, কখন জাগ্রত ভাবে, কখন সুষুপ্ত ভাবে থাকে। যখন শ্রীভগবদ্ভক্তি আছে, তখন শ্রীভগবান আছেন। কারণ স্বভাব কখন নিষ্ফল কিছু করেন না। স্বভাব যখন ভগবদ্ভক্তি রূপ ভাব দিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাহার তৃপ্তির বস্তু দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে সেই ভগবদ্ভক্তিটুকু জাগ্রত হইয়াছে। যেমন লোকের পিপাসা হইলে, যেখানে জল পায় সেখানে দৌড়ায়, সেইরূপ লোকের হৃদয়ে ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায়, উহা নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট দৌড়িয়া আসিতেছে।

হৃদয়ে এই ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় কুজ্ঝটিকারূপ অজ্ঞানতা ও নাস্তিকতা নষ্ট হইয়াছে, ও জ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। কেহ বলেন জ্ঞান হইতে ভক্তি, কেহ বলেন ভক্তি হইতে জ্ঞান। এ অনর্থক বিচারে আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে অন্ততঃ ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহার পরে মনে গুটি কয়েক অতি জাজ্জ্বল্যমান সিদ্ধান্ত আসিয়াছে। সে জ্ঞান এই যে, এ জীবন পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর ন্যায়, এই আছে এই নাই। আমি বৃথা কতকগুলি সামান্য বস্তুর লোভে মুগ্ধ হইয়া পরম ধন ভুলিয়া আছি। সেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় করা না জীবের পরম ধর্ম্ম? তাহা আমি কই করিলাম? তাহা না করিয়া আমি কি করিতেছি? হে শ্রীভগবান! এ অধমকে কি মনে আছে? এ অধম তোমাকেত ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি তাই বলিয়া কি আমাকে ভুলিয়া যাইবে? ছি! আমি এ কি করিতেছি, আমি আপনার দোষ তোমার ঘাড়ে দিতেছি? সমুদায় দোষ না

আমার? তোমা হইতে উৎপত্তি তোমার কাছে যাইব, আমি এখন তোমাকে ভুলিয়া নানা অফল বিষয়ে মত্ত হইয়া নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এই সমুদায় মনের ভাব হওয়ায় ভক্তি-মুগ্ধ ব্যক্তি ভাবিতেছেন যে, তাঁহার ন্যায় নির্ব্বোধ ও অপরাধী জীব জগতে নাই। তিনি আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছেন,—আর করিবেন না। তাঁহার দিন প্রায় গিয়াছে, তাঁহার আর সময় মাত্র নাই। তাই সেই লোককলরবের মাঝে হয় চিৎকার করিয়া, কি মনে মনে বলিতেছেন যে, "হে প্রভু! আমি অপরাধী আমার দিন গিয়াছে। এখন তুমি কৃপাময় দীনজনের বন্ধু আমাকে কৃপা কর।" মনে ভাবুন যে, একজন অকূল পাথারে পড়িয়া একবার ডুবিতেছে একবার ভাসিতেছে, চারিদিকে চাহিয়া দেখে কূল কিনারা নাই, তাহার সাঁতার দিবার শক্তিও নাই। তখন সেই ব্যক্তি ঘোর বিপদে সেই ভবকাণ্ডারীকে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে, হে দয়াল-কাণ্ডারি! আমি ডুবিয়া মরিলাম, আমাকে চরণ-তরী দিয়া আশ্রয় দাও। আবার বলিতেছে "হে দয়াল-কাণ্ডারি! আমার নৌকা পাইলেও উঠিবার শক্তি নাই, তুমি আমাকে চুলে ধরিয়া তোমার নৌকায় উঠাইয়া প্রাণ দান কর।" এইরূপে ঘোর বিপদে পড়িয়া ডাকিতে ডাকিতে যেন কর্ণে শুনিতে পাইল যে' শ্রীভগবান অভয় দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই, এই যে আমি আসিতেছি।" তখন আশার সঞ্চার হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইল।

নিরাশ হইয়া লোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে বটে, কিন্তু এ নিরাশ ভাব বহুক্ষণ থাকিতেছে না। দৈন্য ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই তাহার পরে আনন্দ আপনা আপনি উদয় হইতেছে। তখন আপনার দুর্ম্মতির কথা ভুলিয়া শ্রীভগবানের কৃপার কথা ভাবিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে সকলের শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে হইতেছে। শ্রীভগবান আমাদের পিতা মাতা, কি বন্ধু, আমরা তাঁহার নিজজন। তিনি আমাদের দুর্ম্মতি দেখিয়া দুঃখিত হইয়া, তাঁহার বংশী পীতাম্বর দূরে ফেলিয়া দিয়া, ডোর কৌপীন পরিয়া, আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। ভগবান এরূপ দীন অবস্থায় কেন আসি-য়াছেন? তাহার কারণ এই যে, এবার তাঁহার সুখের অবতার নয়, দুঃখের অব-তার। এবার তাঁহার চুড়া বংশী শোভা পাইবে কেন? তাই কৌপীন পরিয়া-ছেন, তাই করোয়া লইয়াছেন, তাই বংশী বদন ছাড়িয়া হরিধ্বনি অবলম্বন করিয়াছেন। সেই হাস্য কৌতুক ক্রীড়া ছাড়িয়া দিয়া রোদন সম্বল করিয়াছেন।

এই অবস্থায় সেই "তিনি" আসিয়া অভয় দিতেছেন। বলিতেছেন কি না, ভয় কি? এই যে আমি? যম তোমাদের কি করিবে? যম ত আমারি ভৃত্য? তোমরা অপরাধ করিয়াছ? তাহাতে ব্যস্ত কি? আমি তাহার সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। মুখে কৃষ্ণ বল, আর সমুদায় অপরাধ নষ্ট হইয়া যাইবে। দেখ, তোমরা দুর্ব্বল, সাধন ভজন করিতে পারিবা না। তাই আমি তোমাদের সুবিধার নিমিত্ত হরিনাম লইয়া আসিয়াছি। ইহা মুখে বল, আর জগতে বিলাও, সমস্ত অপরাধ মোচন হইয়া অন্তিমে আমাকে পাইবে।

যাঁহারা শ্রীভগবানের দয়ার সাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদিগকে গোলোকধামে লইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন, আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে সন্ন্যাসীর রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাতে তাঁহাদের ভয় গিয়াছে, আশা আসিয়াছে। ইহাতে দুঃখ গিয়াছে, আনন্দ আসিয়াছে। তাই লোকের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে, না, যে ভাবে প্রভু স্বয়ং রথের সময় জগন্নাথের অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া তাল ঠুকিয়াছিলেন। লোকে মনে ভাবিতেছেন, আর ভয় কি? এক জন আহ্লাদে গলিয়া পড়িয়া আর এক জনকে বলিতেছেন, "বড়ই আনন্দ!" সহস্র সহস্র সম্প্রদায় হইয়াছে, আর সেইরূপে লক্ষ লোকে দুই বাহু তুলিয়া "আর ভয় নাই" "পেয়েছি" "তাঁরে পেয়েছি" এই ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন।

পাঠক মহাশয়, আপনি একবার গৌরলীলার আমূল চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিবেন যে, এইগৌরলীলার কাণ্ডটি যে দৈবাৎ হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। একটু স্থির হইয়া বিচার করিলে বুঝিবেন, এই লীলাখেলাটি শ্রীভগবান স্বয়ং পাতাইয়াছেন। আপনা আপনি এরূপ হয় নাই। এ দেশে ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীভুক্ত, যথা বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী। প্রভু স্বয়ং বৈদিক, নিতাই রাঢ়ী এবং অদ্বৈত বারেন্দ্র। হে পাঠক! এইরূপ আপনি আগা গোড়া দেখিবেন যে, এই লীলাটি সেই সর্ব্বশক্তিমান পাতাইয়া আপনি ইহা চালাইয়াছেন।

যদি এই গৌরলীলা মনে বিচার করিয়া আপনি বুঝিতে পারেন যে, এই খেলাটি শ্রীভগবান অন্তরালে থাকিয়া পাতাইয়া আপনি দেখিয়াছেন, তবে ইহা বুঝিবেন যে, এই খেলা দ্বারা শ্রীভগবান জীবকে এই শিক্ষা দিয়া-

ছেন, কি না (১) শ্রীভগবান আছেন, (২) পরকালও আছে (৩) শ্রীভগবানের প্রিয় জীব ও জীবের প্রিয় শ্রীভগবান।

এখন শ্রীভগবান আছেন ইহা সৃষ্টি প্রক্রিয়া দ্বারা অনুভব করা যায়। এই সংসার দেখিলে আপনা আপনি মনে উদয় হয় যে, একজন সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা আছেন। কিন্তু তিনি কিরূপ প্রকৃতির বস্তু ইহা গোপন রাখিয়া শ্রীরসিকশেখর জীবকে বড় ধান্ধায় ফেলিয়াছেন। তিনি দয়াময় তাহার সন্দেহ নাই। কারণ মাতৃহৃদয়ে দুগ্ধ দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিচারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি নিষ্ঠুর, নতুবা সর্পকে বিষ কেন দিলেন? আবার রশিকশেখর মনুষ্যকে আর এক ধান্ধায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা মরিলে কি থাকিবে? যদি থাকে, তবে কিরূপে? আর এক ধান্ধা এই যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধান্ধায় পড়িয়া জীব নিরাশ সাগরে ভাসিতেছিল। মহম্মদকে মুসলমানগণ "রসুল" বলেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে জীবের নিমিত্ত সংবাদ আনিয়াছেন। সেইরূপ যিশু "সুসমাচার" আনিয়াছেন, ইহা খৃষ্টিয়ানগণ বলেন। ঠিক সেইরূপ, কুলিয়ার অনন্ত কোটী লোক, শ্রীগৌরাঙ্গ সুধু সুসমাচার আনিয়াছেন, তাহা নয়, তাহাদের নিমিত্ত আরো কিছু আনিয়াছেন বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

মহম্মদ মুসলমানগণের নিমিত্ত সংবাদ আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন, জীবগণ মরিয়াও বাঁচিবে, ও যাহারা শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করে, তাহারা সুখে ও যাহারা অপালন করে তাহারা দুঃখে থাকিবে। মহম্মদ যে সংবাদ আনিয়াছেন ইহা কাল্পনিক নহে। ইহা বিশ্বাস করিয়া, যে সমস্ত জীব নিরাশ সাগরে ভাসিতেছিল, তাহারা কূল পাইল, পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল।

জীব মাত্রে অকূল পাথারে ভাসিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের এরূপ মায়া যে, তাহারা তাহাদের নিজের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। যাহার শ্বাস রোগ আছে, তাহার ক্রমে ক্রমে বোধ হইবে যে তাহার পীড়াজনিত বিশেষ কষ্ট নাই। কিন্তু তাহার শ্বাস আরাম হইলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে এ যাবৎ বড় দুঃখে কাল কাটাইতেছিল। সেইরূপ মনুষ্য হাসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহার কোন দুঃখ নাই। তাহার যে, যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা তাহার বোধও নাই। যে কোন জীবের যে কোন মুহূর্ত্তে দারিদ্র্য, অপমান, পীড়া, ও শোক হইতে পারে। কিন্তু

লোকে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, যেন তাহার কোন দুঃখ কি চিন্তার বিষয় নাই, এই রূপে জগতে বিচরণ করিতেছে। তবু তাহার অন্তরের অতি গুহ্য স্থানে হা হুতাশরূপ দুঃখের লহরী সর্ব্বদা অনেক সময় তাহার অজ্ঞাতসারে চলিতেছে। এই অবস্থায় যদি তাহার বিশ্বাস হয় যে, সে মরিবে না, মরিলেও বাঁচিবে, ও তাহার অতি শক্তিসম্পন্ন একজন পরম সুহৃদ আছেন, যিনি তাহার সমুদায় দুঃখ মোচন, ও সমুদায় আশা পূরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত, তখন তাহার পূর্ব্বকার উপায়হীন অবস্থা সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহাতে, সে ব্যক্তি অকূলে ছিল এখন কূল পাইয়াছে, এই আনন্দে উন্মত্ত হয়।

সেইরূপ যিশুখ্রীষ্ট "সুসমাচার" আনিলেন, তাঁহার গণ ঐরূপ আহ্লাদে মাতোয়ারা হইল। এই সমস্ত লোক "রসুল" অর্থাৎ শ্রীভগবানের দূতের নিকট সুসমাচার পাইয়া উহা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত জয় পতাকা উঠাইয়া, দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিল। তাহারা ভক্তিতে গদগদ বলিয়া, অন্য জীবগণকে মুগ্ধ করিতে শক্তি পাইল। তাহাদের আনন্দ ও বিশ্বাস দেখিয়া, যে সমস্ত জীবগণ অকূলে ভাসিতে ছিলেন, পালে পালে আসিয়া তাঁহাদের আশ্রয় লইতে লাগিলেন।

মনুষ্য হৃদয়ে ভগবৎ কৃপার সহিত গুটি কয়েক শত্রু প্রবেশ করে, যথা দম্ভ ও অহঙ্কার। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী। তিনি পরম পুরুষের স্কন্ধে চড়িতে গিয়াছিলেন। অতএব সামান্য জীবের কথা কি? মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান কৃপা পাইয়া ভাবিলেন যে, তাহারা শ্রীভগবানের প্রিয় পুত্র, নতুবা তিনি তাহাদের নিকট সুসমাচার কেন পাঠাইবেন? তাহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়াছেন, অতএব তাহাদের কথা যাহারা না শুনে তাহারা শ্রীভগবানের বিদ্রোহী। অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে পাপ ত নাই, বরং শ্রীভগবানকে তুষ্ট করা হইবে। তাহারা ইহা ভাবিলেন না যে, সকলেই তাঁহার সন্তান, আর তিনি অতি মহাশয়।

যে আনন্দে মুসলমানগণ দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত জগত ওলট পালট করেন, কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের সেই জাতীয় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে। তবে আনন্দে মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন, বৈষ্ণবগণ জীব মাত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ "রসুল" পাইয়াছেন, ইনিও গোলোক হইতে সুসমাচার আনিয়াছেন। সে সুসমাচার

এই যে, শ্রীভগবান আছেন, তোমরাও চিরদিন থাকিবে, আর তিনি মনুষ্যের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নরলীলা ও নরের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে সুসমাচার আনিলেন, তাহাও লোকে বিশ্বাস করিল। অধিকন্তু তিনি আসিয়া শ্রীভগবানের প্রকৃতি বড় মধুর বলিয়া পরিচয় দিলেন। মহম্মদ ঈশ্বরের যে রূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে লোকে ইহাই বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান ভয়ঙ্কর হইয়া সিংহাসনে বসিয়া জীবগণের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপ শ্রীভগবানের পরিচয় দিলেন, তাহাতে বুঝা গেল যে শ্রীভগবান অতি সুন্দর নবীন পুরুষ, রসিক চূড়ামণি, বংশীধারী ও নৃত্যকারী শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণকে অধিকন্তু বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রীভগবান অতি প্রেমময়। যথা পদ—

"জানি জানি তার মন জানি।
প্রেমে গড়া তনু খানি।
আর, চিরদিন সে ভালবাসে কাঙ্গালিনী॥"

কাজেই মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন। বৈষ্ণবগণ জীবকে আলিঙ্গন করিলেন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আবার দেখুন যিশু সুসমাচার আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে জানা গেল যে, তিনি এবার কাহাকে প্রেরণ করেন নাই, স্বয়ং আসিয়াছেন। সুতরাং কুলিয়াবাসিগণের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহারা অকূলে ভাসিতেছিলেন, এখন কূল পাইলেন। লোকের আনন্দের কারণ একটি উদাহরণ দ্বারা বলিব। একজন নিগড়ে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার আশার লেশ মাত্র নাই; এইরূপ তিনি রজনী আসিলে কখন দিন হইবে ভাবেন, আবার দিন আসিলে কখন রজনী আসিবে ভাবেন। যখন তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে, তাঁহার বন্ধন কিছু নয়, তাঁহার পিতা যিনি তিনি রাজরাজেশ্বর, তাঁহাকে বিশেষ কোনকার্য্য উপলক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যুবরাজ, তাঁহার পিতার সমস্ত ধনের অধিকারী। সেই রাজপুত্রের অবস্থা একবার মনে অনুভব করুন, তাহা হইলে কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের আনন্দের কতক পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। পাঠকের মধ্যে অনেকে হয়ত বুঝিবেন না যে, জীবগণ কেন অকূলে ভাসিতেছে? যাঁহার উপস্থিত কোন বলবৎ দুঃখ নাই তিনি ভাবিতে পারেন যে, "কই, আমি ত বেশ সুখে আছি।" হয়ত তিনি বড় জ্ঞানী, মনে ভাবেন তিনি শান্ত, বড় বেশ আছেন। কিন্তু

তিনি বেশ আছেন এই জ্ঞানই তাঁহার পতনের মূল। যেই তাঁহার জ্ঞান হইবে তিনি বেশ নাই, অমনি তাঁহার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

তিনি যে, বেশ নাই তাহার প্রমাণ দিতেছি। আমি কেন দিব, তিনি নিজেই তাঁহার রোগ, শোক, ও অন্যান্য তাপের সময় জানিবেন যে তিনি বেশ নাই। যে ব্যক্তির ঘোর বিয়োগ হইয়াছে, কি হঠাৎ দারিদ্র্য চাপিয়াছে, কি কারাগারে ভয় উপস্থিত হইয়াছে তিনি সেই সময় বুঝিতে পারিবেন, তিনি বেশ নাই। তিনি যদি একটু ভাবিয়া দেখেন যে, তাঁহার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, এই আছেন মুহূর্ত্ত পরে তিনি যাহা আছেন তাহার কিছুই না থাকিতে পারেন, তখন তিনি বুঝিবেন যে, তিনি বেশ নাই, বরং দিবা নিশি অকূল পাথারে ভাসিতেছেন।

"আমি বেশ আছি" আমি শান্ত অতএব অন্যাপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছি" ইহা মনে গৌরব করিও না। ইহা তোমার গৌরবের কথা নয়। যখন তুমি জানিবে যে, তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত, আর সেই দুঃখ ভাবিয়া তোমার নয়নে জল আসিবে, তখনি জানিবে তোমার জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়াছে। কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ ভাবিতেছেন কি না—

সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
গোলোকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥"

কাজেই উন্মত্ত হইয়া এই অসংখ্য লোক নৃত্য করিতেছেন।

এদিকে বাচস্পতি আসিয়া লোকের ভিড়ে আর প্রভুর নিকট যাইতে পারেন না। কিন্তু অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহার আগমন ও দুঃখ জানিলেন। জানিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন বাচ-স্পতি আসিয়া শ্লোকবন্ধে (এই শ্লোকগুলি তল্লাস করিয়া পাই নাই) প্রভুকে এই স্তুতি করিলেন, যথা প্রথম শ্লোকের বৃন্দাবন দাসের ব্যাখ্যা—

সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব কূপে॥
সেই গৌরসুন্দর কৃপা সমুদ্রের প্রায়।

বাচস্পতি বলিলেন, প্রভু! তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়, কুলিয়ায় আসিবে ইচ্ছা হইল আসিলে, কিন্তু তোমার দাস এই ব্রাহ্মণ মারা যায়। আমি তোমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি, এই ভাবিয়া লোকে আমার ঘর দ্বার ভাঙ্গি-তেছে। আপনি একবার বাহির হউন।

প্রভু হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। ফল কথা, প্রভু, অবশ্য বাহির হইবেন,

তবে কখন বাহির হওয়া কর্ত্তব্য তাহা তিনি আমাপেক্ষা ভাল জানেন। এই কথা হইতে হইতে পণ্ডিত দেবানন্দ আসিলেন। ইঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইনি সর্ব্ব প্রকারে বিশেষতঃ ভাগবতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। অতি সচ্চরিত্র ও মহাজ্ঞানী, ভক্তি মানিতেন না, সুতরাং প্রভুর আশ্রয় লয়েন নাই। ভাগ্য-বশে বক্রেশ্বর তাঁহার আলয়ে কিছু দিন রহিয়াছিলেন। বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিয়া দেবানন্দের ভক্তির উদয় হয়। এখন কুলিয়া আসিয়া, শ্রীবাসের নিকট পূর্ব্বের অপরাধ মনে করিয়া, ভয়ে দূরে দূরে আছেন।

অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহাকেও নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন কি মধুর আলাপ হইল, মনে করিলে শরীর আনন্দে টল মল করিয়া উঠে। প্রভু বলিলেন, "দেবানন্দ! তোমার সমুদায় অপরাধ ভঞ্জন হইল।" অমনি দেবানন্দ চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! আপনার বরে আমার সুখ হইল না। আপনি বর দিউন যে, যে কেহ অপরাধী হইয়া এই কুলিয়া আসিয়া আপনার নিকট অপরাধ ভঞ্জনের প্রার্থনা করিবে, আপনি তাহারই অপরাধ ভঞ্জন করিবেন।" প্রভু বলিলেন তথাস্তু। এই কুলিয়ায় এইরূপে অপরাধ ভঞ্জন পাটের সৃষ্টি হইল। সেখানে সেই অবধি লোকে অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত যাইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা সহজেই দয়াময়, তাঁহারা চিরদিনই জীবের দুঃখে ব্যথিত।

বাহিরে কোটি কোটি লোকে কলরব করিতেছে। সহস্র সহস্র সম্প্রদায় হইয়াছে, তাহারা নৃত্যগীত করিতেছে। লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে। চকিতের মধ্যে কত শত সহস্র দোকান বসিয়া গিয়াছে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দোকানে নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করা হইতেছে, কিছু প্রভুর জন্য, কিছু বিতরণের জন্য। কেহ মিষ্টান্ন কিনিয়া হরিধ্বনি করিয়া ছড়াইয়া দিতেছেন, আর লোকে হুড়াহুড়ি করিয়া উহা কুড়াইতেছে। কেহ বসিয়া কাঙ্গালী খাওয়াইতেছেন। কেহ কম্বল ও বস্ত্র কিনিয়া বিতরণ করিতেছেন। কেহ আপন মনে নৃত্য করিতেছেন। কেহ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। কেহ কেবল প্রণাম কি কোলাকুলি করিয়া, কেহ পদধূলি লুটিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ বসিয়া কেবল সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিতেছেন।

কুলিয়ায় প্রভাস যজ্ঞ আরম্ভ হইল!

এখানে গুরুজন, বয়স্য, শিষ্য, কুটুম্ব, প্রতিবেশী, নিজজন ও ভক্ত

সকলের সহিত প্রভু মিলিত হইলেন। প্রভু প্রায় জন্মাবধিই শ্রীনবদ্বীপে বিখ্যাত। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় ছিল না। সুতরাং শিশু বেলায় যে তাঁহাকে দেখিত, তাহারই মনে এই প্রশ্ন উদয় হইত যে, এটী নরশিশু না দেবশিশু? নিমাই যত বড় হইতে লাগিলেন, ততই লোকের নিকট পরিচিত ও সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কি শত্রু কি মিত্র সকলেরই মনের এই ভাব যে, এই যে বস্তুটী, ইনি কে একজন হইবেন। এমন কি একটি প্রবাদ ছিল যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন। ইহা উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেন যে, সেই ব্রাহ্মণটী এই জগন্নাথের পুত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত যদি কাহার কোন কথা হইত তাহা লইয়া আলোচনা হইত। সে কথাটী সে গোষ্ঠিতে রহিয়া যাইত। এরূপ কথার মধ্যে অনেক গুলি অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে। এমন অনেক সময় হইয়াছে যে, গ্রন্থকারের কাহার সহিত কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উঠিল। অমনি সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল যে, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, ইহাঁর আমাদের গোষ্ঠীর প্রতি বড় করুণা ছিল। কারণ ইনি আমাদের বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, কি গোষ্ঠীর কোন এক জনকে এই কথা বলিয়াছিলেন। নিমাই যখন পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সহধ্যায়িগণ সকলেই বুঝিলেন যে, তাঁহার সহিত কাহার কোন রকম পাল্লাপাল্লি চলিবে না। তখনকার সময় ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান দীধিতি গ্রন্থকার রঘুনাথ। রঘুনাথের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর বাল্যকালের প্রীতি ও বচসা সম্বন্ধে আমি প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণন কালে আভাস দিয়াছি। এই সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে একটি কথা চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহা আমরা পণ্ডিত শ্রীল মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। যথা শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীরঘুনাথের তর্ক চলিতেছে। সে কখন, না যখন প্রভু কিছুকাল ন্যায় পাঠ করিতেছিলেন। সামান্য লক্ষণা সম্বন্ধে রঘুনাথের মুখে অন্যায় তর্ক শুনিয়া প্রভু বিদ্রূপ করিয়া রঘুনাথকে এই শ্লোক বলিলেন :—

বক্ষোজপানকৃৎ কাল সংশয়ো জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্য লক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥

বলা বাহুল্য যে এই তর্কে রঘুনাথের অন্যায়। এইরূপে প্রভু তাঁহার জন্মাবধি নবদ্বীপবাসিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। যদিচ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার দ্বেষ করিত, কিন্তু তবু যে তিনি শ্রীনবদ্বীপের

কি ভারতবর্ষের কি কলিকালের গৌরব স্বরূপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। তাহার পর প্রভু সন্ন্যাস লইয়া গমন করিলে তাঁহার প্রতি বিপক্ষদিগের আর দ্বেষ রহিল না। এমন কি, এরূপও ঘটনা হইয়াছিল যে, প্রভু সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহাকে যিনি যত খানি দ্বেষ করিতেন, তিনি ততখানি কান্দিয়াছিলেন। কাজেই প্রভু যখন কুলিয়ায় গমন করিলেন, তখন শ্রীনবদ্বীপে আর কেহই রহিলেন না, সকলেই প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। এখানে প্রভু সপ্ত দিবস রহিলেন, থাকিয়া সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। এই সপ্ত দিবানিশি প্রভুর সহিত এই কোটী লোকে কেবল নৃত্য করিয়া যাপন করিলেন। প্রভু এই সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন। সকলেই বোধ করিলেন যে প্রভু তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিলেন, বিশেষ কৃপা দেখাইলেন।

শ্রীনবদ্বীপ প্রায় শূন্য, সকলে এপারে, ওপারে সারি দিয়া লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা এপারে কোটী লোকের নৃত্য দেখিতেছেন, কলরব শুনিতেছেন। সুতরাং মধ্যস্থানে একটি নদী থাকায় তাঁহাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতেছে না। এপারে লোকের যেরূপ আনন্দ, ওপারেও স্ত্রীলোকের সেইরূপ আনন্দ। অবশ্য এই স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভুর বড় ঘনিষ্ঠ দুইজন আছেন। যথা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। সেখানে গঙ্গা যেরূপ পরিসর তাহাতে ওপারের লোকে এপারের লোকে সমুদায় কাণ্ড সচ্ছন্দে দেখিতে পারেন। এমন কি, একটু ঠাউরিয়া দেখিলে এপারের লোককে অপর পারের লোক চিনিতে পারেন। অন্যের সঙ্গে প্রভুর একটু বিশেষ ছিল। লক্ষ লোকের মাঝে দাড়াইলেও সকলের মস্তকের এক বিঘাত প্রমাণ উপরে প্রভুর মস্তক দেখা যাইত। জীবের দর্শনসুলভের নিমিত্ত প্রভু এইরূপ দেহ ধারণ করেন যে প্রকৃতই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, মহাপুরুষের যে সাড়ে চারি হস্ত দীর্ঘে, তাহাই ছিল। সুতরাং লক্ষ লোকের মাঝে প্রভু দাঁড়াইয়া থাকিলে, তবু দূর হইতে তাঁহাকে বেশ দেখা যাইত। শ্রীশচী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ওপার হইতে প্রভুকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। প্রভু এই কুলিয়ায় নিজজনের নিকট জনমের মত বিদায় লইলেন।

দশম অধ্যায়।

আসিবে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, নদীয়া নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া, সচকিত হৈয়া, করব মঙ্গল কাজ॥
জলঘট ভরি, আমশাখা ধরি, রাখি সারি সারি করি।
কদলি আনিয়া, রোপণ করিয়া, ফুলমালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া, নদীয়া নাগরী, আওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি, জয় জয় বাণী, উঠিবে সকলের ঘরে॥
শুনিয়া জননী, ধাইবে অমনি, করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে, ধুই কলেবরে, তুরিতে লইবে ঘরে॥
যতেক ভকত, দেখি হরষিত, হইবে প্রেম আনন্দ।
যদুনাথ যাঞা, পড়িল লোটাঞা, লইবে চরণারবিন্দ॥

প্রবাসে প্রিয় বহুদিন অদর্শনে আছেন, তিনি গৃহে আসিতেছেন এরূপ জানিলে প্রিয়ার যে আনন্দ, তাহাকে ভাবোল্লাস বলে। ভাবোল্লাসে প্রিয়ার মনে যে সমুদায় ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তাহার বর্ণন শ্রীবিদ্যা-পতির দুইটি পদ পাওয়া যায়। একটি শ্রবণ করুন, যথা—

আমার আঙ্গিনায় আওব যব রসিয়া। ধ্রু।

অর্থাৎ প্রিয়া আপনার সখীকে বলিতেছেন "সখি! আমার প্রিয় যখন আমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাড়াইবেন, তখন আমি কি করিব বল দেখি?" সখী বলিলেন, "তুমি বল, আমি কি কবিব?" তখন প্রিয়া বলিতেছেন, "শুনিবে কি করিব?

আমার আঙ্গিনায় আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হসিয়া॥

অর্থাৎ হে সখি, প্রিয় আঙ্গিনায় দাঁড়াইলে, আমি মুখ ফিরাইয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ মাত্র করিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া যাইব।"

হে পাঠক মহাশয়, তুমি প্রবাসী হও, আর তোমার প্রণয়িনীকে বিরহিণী প্রিয়া কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে উপরি উক্ত প্রিয়-প্রিয়ার প্রীতি খেলা কত মধুর। কিন্তু তবু ইহাতে একটু তিক্ত রস থাকিবে, যেহেতু এখানে প্রিয় ও প্রিয়া উভয়ে মলিন বস্তু। এই যে মধুর হইতে মধুর প্রীতির

খেলাটি, ইহা এখন শ্রীভগবানে অর্পণ কর। শ্রীভগবান, তিনি এমন সুন্দর, এরূপ মধুর, তিনি তোমার এত প্রিয়, তাঁহার তুমি এত প্রিয়, তোমার না উচিত যে যত ভাল দ্রব্য সমুদায় তাঁহাকে অর্পণ করা? অতএব এই যে উপরি উক্ত মধু হইতে মধু প্রীতি খেলারূপ রস, ইহা দ্বারা শ্রীভগবানকে পূজা কর। তাহা হইলে উহা পবিত্রীকৃত হইবে, উহার আস্বাদ অনন্তগুণে বাড়িবে। আর তুমিও সেই মধু হইতে মধু রসের প্রসাদ পাইবে। এই হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৈষ্ণবের চরম ভজন।

এই রসটি কিরূপে শ্রীভগবানকে অর্পণ করা যায় বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায়। শ্রীমতীর মনে হঠাৎ উদয় হইল যে তিনি আসিতেছেন। তাই বলিতেছেন, ললিতে! শুনিতেছি বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেছেন। বন্ধু আসিলে আমি প্রথমে কি করিব শুনিবে? যথা বিদ্যাপতির দ্বিতীয় পদ—

যব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে বাজাওব জয় তুর॥

অর্থাৎ ললিতে, বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে আমি জয় তুরি দ্বারা ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইব যে আমার বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। পূর্ব্ব লিখিত ভাবোল্লাসটী এখন সম্পূর্ণরূপে দিব।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পালটি চলব হাম হসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরব। যাওব হাম যতন বহু করব॥
রভস মাগব পিয়া যবহি। মুখ বিহসি নহি বোলব তবহি॥
কাচুয়া ধরব যব হঠিয়া। করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহুঁ সুপুরুখ ভঁওরা। চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামরা॥
তৈখনে হরব মঝু চেতনে। বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥

বৈষ্ণবগণ এইরূপ গোপী অনুগত হইয়া রস দ্বারা শ্রীভগবানকে পূজন কি পোষণ করিয়া থাকেন। ইহাকে বলে ব্রজের নিগূঢ় রসাস্বাদন। তাই এই শ্লোক—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন॥

এখন শ্রীকৃষ্ণ বা কোথা, শ্রীমতী রাধা বা কোথা? জীবের ভাগ্যক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের অনেক নিকটে। অতএব হে পাঠক মহাশয়! আসুন এই যে ভাবোল্লাস রস, ইহা দ্বারা আমরা শ্রীভগবান গৌরচন্দ্রকে সেবা করি। তিনি এখন নদীয়া আসিয়াছেন, তিনি ঘরের ধন ঘরে আসিয়াছেন, শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নগোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-

চন্দ্রকে অবহেলা করিও না। যদি তুমি তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিতে না পার, তবু তোমাকে বলিতে হইবে যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ আনিয়া জীবগণকে আশ্বস্ত, আর তাহাদিগকে গোলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সন্ন্যাস রূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দেখ মহাম্মদের নিমিত্ত মুসলমানগণ, যীশুর নিমিত্ত খ্রীষ্টিয়ানগণ কি না করিতেছেন? শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের কোন অংশে ন্যূন নহেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রজের নিগূঢ় রস পূর্ব্বে জীবে "অনর্পিত" ছিল। অতএব হে পাঠক মহাশয়, যদি আপনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবু তিনি অবতারের শিরোমণি, এ কথা বলিতেই হইবে। সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ এখন আমাদের নদীয়া আসিয়াছেন, আসুন সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সেবা করি। শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর স্থাপিত করিয়া মহাজন কৃত ভাবোল্লাসের কয়েকটি পদ পাইয়াছি। কিন্তু একটীও পূর্ণ কি ভাল অবস্থায় পাইলাম না। অতএব মহাজনগণের দ্রব্য লইয়া আমি যোজনা করিয়া এই নিম্নের ভাবোল্লাসের মালাটী প্রস্তুত করিলাম।

দশমী দিবস প্রভু দেশাভিমুখে শুভাগমন করিবেন তাহা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া জানেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দিন গণিতেছেন। তাঁহার বল্লভ যে সন্ন্যাসী তাহা মধ্যে মধ্যে অবশ্য তিনি ভুলিয়া যান। তাঁহার মনের স্বাভাবিক এই ভাব যে পতি প্রবাসে গিয়াছেন, এখন গৃহে আসিতেছেন সেই ভাবের কথা সখীর সহিত বলেন। মনের যত সুখ দুঃখ তাঁহাকে উঘারিয়া বলিয়া আপনার মনকে শান্ত করেন। তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে বলিতেছেন, সখি!

কি লাগি বল না, আনন্দ ধরে না,
অঙ্গ কাঁপে থরে থর।
চারিদিকে সখি, শুভ চিহ্ন দেখি,
বুঝি এল প্রাণেশ্বর॥

আঙ্গিনায় দাঁড়াবেন হরি।
ঘোমটা টানিব, দ্রুত ঘরে যাব,
রুণু ঝুনু রব করি॥ ধ্রু॥
ঘরে লুকাইয়া, শ্রীমুখে চাহিয়া,
দেখিব পরাণ ভরি।

দেখিবারে মোরে, উকি বারে বারে,
মারিবেন গৌরহরি ॥
নয়নে নয়ন, হইলে মিলন,
বল কি করিব সখি।
বলরাম বলে, হইবে তা হলে,
লজ্জায় নমিত মুখী ॥

প্রভু বাচস্পতি-গৃহে আসিলেন, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া সংবাদ পাইলেন। কিন্তু যাইবার আজ্ঞা নাই, সময়ও পাইলেন না, যাইতে পারিলেন না। প্রভু কুলিয়া আসিলেন, মধ্যে একটী নদী। সন্ন্যাসীর একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। প্রভু হঠাৎ স্বদলে নবদ্বীপ যাইলেন, অমনি ঘোষণা পড়িয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর সহিত চলিলেন, স্ত্রীলোকগণ ছাদে উঠিলেন। প্রভু আপনার ঘাটে উঠিলেন,—তাহার সন্তরণের, বিকালে ও সন্ধ্যায় বসিবার, বয়স্যগণ সহিত হাস্য কৌতুক ও বিদ্যাযুদ্ধ করিবার স্থান। প্রভুর পায়ে খড়ম, ধীরে ধীরে নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠিলেন। শুক্লাম্বর আসিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু নিজ পরিচিত যত বৃক্ষ লতা ঘর দেখিতে দেখিতে চলিলেন, ক্রমে নিজগৃহে আসিলেন, আসিয়া গৃহের সম্মুখে দাড়াইলেন,—সেখানে, না যেখানে ছয় বৎসর পূর্ব্বে গয়ার গদাধরের পাদপদ্ম বর্ণনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শচীর সঙ্গে প্রভুর অন্য স্থানে দেখা শুনা হইয়াছিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এই একবার। তিনি স্বামীর কাছে কি যাইবেন? প্রভু স্ত্রী লোকেয় মুখ দেখেন না। স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিলে দূরে গমন করেন, তিনি কি সাহসে প্রভুর নিকটে যাইবেন? বিশেষতঃ সেখানে লক্ষ লোক, তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনবিংশতি, তিনি কোণের কুলবধু, সূর্য্যের মুখ দেখেন না। প্রভু প্রকাশ্য স্থানে লক্ষ লোক পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া। সেখানে হিন্দু-মহিলা পূর্ণ-যৌবনা গৌরাঙ্গের ঘরণী কিরূপে যাইবেন?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বেণী বাঁধেন নাই, বেশভূষা করেন নাই, কারণ, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আছে। শ্রীমতী পতির নিকট গমন করিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পারিলেন না। জন্মের মত দেখিয়া লইবেন মনে এইরূপ বাসনা। আবার ভাবিলেন তাঁহার পতি তাঁহার ইহকাল পর কালের আশ্রয়, তাঁহার নিকট যাইবেন তাহাতে আবার লোকাপেক্ষা কি? ইহা ভাবিতে ভাবিতে শেষে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তখন সেই মলিনবেশে,

আপাদ মস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া, দ্রুতগমনে যাইয়া তাঁহার গৃহের সম্মুখে রাজপথে, গলায় বসন দিয়া প্রভুর চরণে একটি কাতর ধ্বনি করিয়া পড়িলেন।

প্রভু স্ত্রীলোক দেখিয়া "কে তুমি?" বলিয়া দুই পদ পশ্চাৎ হঠিলেন। প্রভুর প্রশ্নের উত্তর কেহ দিলেন না। প্রভু যখন নিজ গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে প্রাচীন পরিচিত সমস্ত দ্রব্য এ জন্মের মত দেখিয়া লইতেছেন, তখন সকলে অবশ্য নীরবে রোদন করিতেছেন। এখন হঠাৎ সম্মুখে এই কাণ্ড দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও নীরব হইলেন, হইয়া এক চিত্তে পলকহারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সেই সাড়ে চারি হস্ত পরিমিত সুন্দর সুগঠিত মনুষ্যটি ও তাঁহার পদতলে মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া পতিতা পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে লাগিলেন।

কেহ যদি উত্তর না করিলেন, তখন শ্রীমতী স্বয়ংই কথা কহিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি তোমার দাসীর দাসী।"

প্রভু বুঝিলেন যে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া। তখন দুঃখে প্রভুর মুখ আন্ধার হইয়া গেল।

প্রভু কষ্টে সৃষ্টে বলিলেন, "তোমার কি প্রার্থনা?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "প্রভু! ত্রিজগত উদ্ধার করিলেন কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী ভবকূপে পড়িয়া রহিল!"

তখন ক্রন্দনের রোল উঠিল, সকলে কান্দিতেছেন কেবল প্রভু ও বিষ্ণু-প্রিয়া ছাড়া। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে-ছেন, "তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি তোমার নামের সার্থকতা কর, তুমি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া হও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তোমাকে ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।

প্রভু আবার চুপ করিলেন, তখন পায়ের দুখানি খড়ম খুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন, "হে সাধ্বি, আমি সন্ন্যাসী, আমার দিবার কিছুই নাই। তুমি আমার খড়ম লও, ইহা দ্বারা আমা জনিত যে তোমার বিরহ তাহা শান্তি করিও।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন সেই খড়ম দ্বয়কে প্রণাম করিলেন, করিয়া উহা উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন, ধরিয়া উহা চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। লক্ষ লোক তখন হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত।

পঞ্চম খণ্ড।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক

গ্রন্থিত।

কলিকাতা—২নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেনে

পত্রিকা-প্রেসে,

শ্রীকেশবলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

বিজয়া দশমী দিবসে প্রভু প্রায় শতাবধি নীলাচলবাসী ভক্তের সহিত শ্রীগৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য জননী ও গঙ্গা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন। জননীকে দর্শন দিবেন ইহা তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদিগের নিয়ম যে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার জন্মের মত জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। যে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর ভিন্ন সকলেই তাঁহার সহিত চলিয়াছেন। যে দিন প্রভু বাঙ্গালা দেশে শ্রীপাদ অর্পণ করিলেন, সেই দিবস হইতে একদিনের জন্যও তিনি একটু আরাম করিতে পারেন নাই। যেখানে উপস্থিত হয়েন সেইখানেই লোকারণ্য। যখন পথ চলিয়াছেন তখনও সঙ্গে সঙ্গে লোক চলিয়াছে। কেবল শ্রীনবদ্বীপ আসিয়া বাচস্পতির বাড়িতে দুই এক দিন গোপনে থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর, প্রভু আসিয়াছেন এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর অমনি লোকারণ্যের সৃষ্টি হইল।

প্রভু শ্রীজননীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে চলিলেন। সেই সঙ্গে সকলেই চলিলেন। সকলেই যে প্রকৃত বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া চলিলেন তাহা নহে, প্রভু চলিয়াছেন কাজেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। প্রভু চলিতেছেন তাঁহারা থাকিবেন কেন? শ্রীবৃন্দাবন গমন করিতেছেন সেই আনন্দে প্রভু বিহ্বল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে যে অসংখ্য লোক চলিয়াছে তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য নাই। যেমন নদী, যত সমুদ্রাভিমুখে গমন করে ততই পরিসর

হয়, সেইরূপ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যতই গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে কত লোক যে চলিল তাহা ঠিক করা যায় না। সহস্র হইলে পারে, দশ সহস্র হইলে পারে, লক্ষ হইলেও পারে। গৌড়ীয় পাদশা তাঁহার প্রাসাদ হইতে দূরে প্রভুভক্তগণের কলরব শুনিয়া বিপদ আশঙ্কা করিয়া ভীত হয়েন। প্রভুর সঙ্গে কত লোক, তাহা এই ঘটনা দ্বারা কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

সঙ্গে এত লোক, ইহাদিগের আহার কে দিতেছে? অবশ্য ইহাদিগের পথের সম্বল কিছু নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপবাস করিতে হইতেছে না। প্রভু তাঁহার বহু সহস্র পার্ষদ সঙ্গে করিয়া গমন করিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। যে গ্রামে প্রভু মধ্যাহ্ন করিবেন, সেই গ্রামস্থ লোকে জানিতে পারিয়াই আতিথ্য সমাধার নিমিত্ত যত্নশীল হইতেছে। একজন কি দুই জনে এ ভার সমাধা করিতে পারেন না। গ্রাম সমেত লোকে একত্রিত হইয়া আতিথ্য ভার লইতেছেন। প্রভু গঙ্গার ধার দিয়া গমন করিতেছেন।

প্রভুর সঙ্গে অন্যান্য ভক্তের সহিত, গোবিন্দ ঘোষও গমন করিতেছিলেন। পথে এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষা (ভোজন) করিয়া, মুখশুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। গোবিন্দঘোষ নিকটে ছিলেন, তিনি গ্রামের ভিতর ছুটিলেন, আর একটী হরীতকী আনিয়া প্রভুকে তাহার এক খণ্ড দিলেন।

পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন। আহার অন্তে, আবার হাত পাতিলেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ, তাঁহার বহির্ব্বাসে যে হরীতকী খণ্ড বান্ধা ছিল, তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভু যেন তখনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কল্য তুমি যখন আমাকে মুখশুদ্ধি দাও তখন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য চাহিবা মাত্র কিরূপে দিলে?" গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "প্রভু, কল্য যে হরীতকী পাইয়াছিলাম তাহার কিছু রাখিয়াছিলাম; অদ্য তাহাই দিলাম।"

প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার এখনো সঞ্চয় বাসনা সম্পূর্ণরূপ যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত গমন করিতে পারিবে না।" ইহা শুনিয়া গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া গেল

প্রভু বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি এখানে থাক। তোমার দ্বারা আমি বিস্তর কার্য্য সাধন করিব। আমার ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয় বাসনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তোমার হৃদয়ে কোন বাসনা নাই। তুমি এখানে থাক; তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অচিরাৎ আমি নির্দ্দেশ করিয়া দিব।"

গোবিন্দ হাহাকার করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিলেন, "তুমি শান্ত হও, আমি আবার তোমার নিকটে আসিব, আর সেই বার তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তোমার দ্বারা আমি বহু কার্য্য সাধন করিব, এই জন্য তোমার বিরহ জনিত দুঃখ আমি স্ব ইচ্ছায় স্কন্ধে লইলাম। তুমি এখানে থাকো। আমি সত্বর তোমাকে সন্দেশ পাঠাইয়া দিব।"

গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন। প্রভু আবার আসিবেন, আসিয়া আর তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনকে সান্ত্বনা করিলেন, ও গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর করিয়া সেখানে দিবানিশি ভজন করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া রাখি।

এক দিবস গোবিন্দ গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গার স্রোতে একখানি কি ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল। তখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, বোধ হইল যেন একখানি পোড়া কাঠ। শ্মশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া দিয়া, আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

একটু পরে দেখিলেন যেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ! আমি আসিতেছি। তুমি যেখানি পোড়া কাঠ ভাবিতেছ, উহা যত্ন করিয়া কুটীরে রাখিয়া দাও।" গোবিন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি ব্যাপার? অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, সুতরাং কাঠখানি লইয়া কুটীরে রাখিয়া দিলেন।

পর দিবস প্রাতে দেখেন যে, সে পোড়া কাঠ নয়, একখানি কাল পাথর! ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বপ্নকে সত্য মানিয়া লইয়া প্রত্যহ শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া সত্যই গোবিন্দের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত।

বহুতর লোক সঙ্গে, সুতরাং প্রভু ও ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত, গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এত লোকের আহারীয় কিরূপে সংগ্রহ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে, যাহার যাহা ছিল, আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভুর ভিক্ষা হইল, ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন, তৎপরে গোবিন্দও প্রসাদ পাইলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, প্রস্তরখানি পাইয়াছ?" গোবিন্দ করযোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" প্রভু বলিতেছেন, "কল্য ঐ প্রস্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।" কিন্তু প্রভুর এ কথা অপরে কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

পর দিবস একজন ভাস্কর আপনি আসিয়া উপস্থিত। প্রভু তাহাকে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল। তখন প্রভু গোবিন্দের সেই কুটীরে সেই শ্রীমূর্ত্তি নিজ হস্তে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন "গোপীনাথ," আর এইরূপে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ প্রকাশ পাইলেন।

ঠাকুর স্থাপিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকে দিলাম। ইহাকে সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত দুঃখ পাইবে না। আমি বলিয়াছিলাম এবার আসিয়া আর তোমাকে ত্যাগ করিব না। এই আমি তোমার কাছে রহিলাম।"

গোবিন্দের মন শ্রীগৌরাঙ্গে, গোপীনাথে নহে। তিনি প্রভুর এই আজ্ঞা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তুমি এখানে থাকো, এই ঠাকুর সেবা কর, ও বিবাহ কর। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের করুণার সীমা দেখান হইবে। শ্রীভগবান তোমার দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে, তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল। এরূপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" ইহাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন, আর গোবিন্দ ও গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন।

প্রভুর আজ্ঞা ক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে গোপীনাথের সেবা করেন, আর গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া জীবন ধারণ করেন।

কিছুকাল পরে গোবিন্দের একটী পুত্র হইল। কিন্তু পুত্রটী রাখিয়া গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন।

গোবিন্দের ঘাড়ে এখন দুইটী সেবার বস্তু পড়িল,—গোপীনাথ ও তাঁহার শিশু পুত্র। গোবিন্দ ইহাতে কিরূপ বিব্রত হইলেন, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। কষ্টে সৃষ্টে দুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলেন! এইরূপে ক্রমে পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইল। গোবিন্দ গোপীনাথকে পাঁচ বৎসরের শিশু ভাবিয়া বাৎসল্য ভাবে সেবা করেন।

তাঁহার মন এখন দুইজনেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কখন তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া ভাবেন, এই "গোপীনাথ," আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন, এই তাঁহার পুত্র। কখন গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন, কখন পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে দেন। কখন গোপীনাথকে দুঃখ দিয়া পুত্রের সেবা করেন, কখন পুত্রকে দুঃখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন।

এই অবস্থায় আছেন, এমন সময় রসিকশেখর শ্রীভগবান গোবিন্দের পুত্রটী লইলেন!

তখন গোবিন্দ মর্ম্মাহত হইয়া গোপীনাথকে ভুলিয়া গেলেন। অনেক ক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু এমন প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনাথের ঘরে হত্যা দিয়া উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।

প্রকৃত মনের ভাব এই যে, তাঁহার গোপীনাথের উপর রাগ হইয়াছে। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "কি অন্যায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, আর ঠাকুর এমনি অকৃতজ্ঞ যে সচ্ছন্দে আমার পুত্রটী লইয়া গেলেন!"

গোবিন্দ মনোদুঃখে ঠাকুরের আগে পড়িয়া রহিলেন, পার্শ্ব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোন সেবা হইল না, তাঁহাকে সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিতে হইল। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "যেমন আমার বুকে শেল হানিলেন তেমনি খুব হইয়াছে। এখন ঠাকুর উপবাস করিতেছেন, দেখি এখন উহাঁকে কে খাইতে দেয়। আমিও উহাঁকে অপরাধ দিয়া উহাঁর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।"

কিন্তু গোপীনাথ, গোবিন্দের এই চরিত্রে, রাগ করিলেন না। কারণ গোবিন্দ জীব, ও গোপীনাথ ভগবান। যেমন সন্তানে মাকে দুঃখ দিয়া থাকে, সেইরূপ জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিয়া থাকে।

মাতা ইহাতে কখন কখন ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু ভগবানের ইহাতে ক্রোধ হয় না, তিনি জীবগণের সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন।

যখন নিশি হইল, তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ বাপ! ক্ষুধায় মরি, তোমার দয়া নাই। সারা দিন গেল, তুমি জল বিন্দুটুকু আমাকে দিলে না?" গোপীনাথ এইরূপে গোবিন্দের সহিত কথা বলিলেন। গোপীনাথে ও গোবিন্দে মাঝে মাঝে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিত। যখন গোপীনাথের কথা শুনিতেন, তখন বিশ্বাস করিতেন যে গোপীনাথ কথা কহিলেন। কিন্তু একটু পরে ভাবিতেন যে, তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে।

গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ একটু লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করিব? আমি চারি দিকে অন্ধকার দেখিতেছি, আমা দ্বারা তোমার সেবা হইবে না।" গোবিন্দ শোকে এরূপ অভিভূত যে, গোপীনাথ যে তাঁহার সহিত কাতর ভাবে কথা বলিলেন, ইহাতেও তিনি কোমল হইলেন না।

গোপীনাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "লোকের যদি একটা ছেলে দৈবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা ছেলেকে আহার না দিয়া সেই সঙ্গে বধ করে? তোমার এক পুত্র দৈবে মরিয়াছে তাহার নিমিত্ত ক্ষোভ কর, তাহাতে দুঃখ নাই, আমাকে অনাহারে কেন বধ কর?"

তখন গোবিন্দ বলিতেছেন, "ঠাকুর, আমার পুত্রটী কাড়িয়া লইলে, তোমার একটু দয়া হইল না? তুমি যে আমাকে বাপ্ বাপ্ করিতেছ, সে সমুদায় তোমার বাহ্য।"

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ! এরূপ বিপদ যে কেবল তোমার একা হইল, তাহা নহে; লোকের চিরকালই এরূপ হইয়া থাকে? দুঃখ সম্বরণ কর। তোমার পুত্রের ভালই হইয়াছে।"

গোবিন্দ কিছু ফাঁফরে পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। শেষে সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর, সব বুঝিলাম। আমার পুত্রের উত্তম গতি হইয়াছে তাহা ঠিক। কিন্তু আমাকে তুমি পুত্রশোক দিলে কেন? মাতৃহীন বালকটীকে হঠাৎ আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলে, তোমার একটু দয়া হইল না?"

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তোমাকে একটী অতি গোপনীয় কথা বলি। যাহার দুই পুত্র, সে পিতার পুত্র আমি হইতে পারি না। তুমি ছিলে পিতা, আমি ছিলাম এক পুত্র, সে বেশ ছিল। কিন্তু যখন তোমার আর একটী পুত্র হইল, তখন আমি আর থাকিতে পারি না। আমি যদি যাইতাম, তবে তুমি হয়ত তোমার দুই পুত্রই হারাইতে,—আমাকেও পাইতে না, আর তোমার পুত্রকেও পাইতে না। তোমার সে পুত্র যাওয়াতে এখন তুমি আমাকেও পাইবে, তাহাকেও পাইবে। গোবিন্দ! দুঃখ সম্বরণ কর, যেমন তোমার এক পুত্র গিয়াছে, তেমনি আমি তোমার পুত্র রহিয়াছি।"

গোবিন্দ একেবারে নিরুত্তর, আর কথা কাটাকাটী করিতে পারিলেন না। তখন হঠাৎ একটী উত্তর মনে আসিল। গোবিন্দ বলিতেছেন, "তুমি ত আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র, সকল প্রকার ভাল, তাহা বেশ জানি; কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কার্য্য করিবে? তুমি কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে?"

অমনি গোপীনাথ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "তথাস্তু! গোবিন্দ, তুমি আমার পিতা। যদিও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য রাজসিক, তবু তুমি পিতা যখন আপন মুখে পুত্রের নিকট শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে, তখন আমি শাস্ত্র মত তোমার শ্রাদ্ধ করিব, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।"

তখন গোবিন্দ রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "বাপ! আমি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে উত্তম হইয়াছে, তোমার বালাই লইয়া গিয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্নান করিয়া তখনি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন।

ইহার কিছু কাল পরেই গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি গোপীনাথের সেবার উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন, ও আপনার প্রধান শিষ্যের হস্তে গোপীনাথকে সমর্পণ করিলেন। ঐ অগ্রদ্বীপে ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি দেওয়া হইল।

গোবিন্দ ঘোষের নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাঁহার নিকট ছিলেন না। শিষ্যগণ রোদন করিলেন, আর তাঁহার পুত্র রোদন করিলেন। কথিত আছে যে, গোবিন্দ ঘোষের অন্তর্ধানের সময় স্বয়ং গোপীনাথ, তিনি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায়, রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার

পদ্ম চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। পিতৃ-বিয়োগে রোদন করা কর্ত্তব্য, গোপীনাথ এ কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি কেন করিবেন?

গোপীনাথ নূতন সেবাইতকে নিশি যোগে বলিতেছেন, "গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি এক মাস অশৌচগ্রহণ ও হবিষ্যান্ন করিব। তুমি আমাকে কল্য স্নান করাইয়া সময়োচিত বসন পরাইবা।" তখন সেবাইত এই অলৌকিক ব্যাপারে কিছুকাল স্তম্ভিত থাকিলেন। পরে সাহসী হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সত্য কি তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ? যদি সত্য তুমি কথা কহিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি কিরূপে কাচা পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? ঠাকুর, এ লীলা সম্বরণ করুন্।"

তাহাতে গোপীনাথ বলিলেন, "আমি আমার পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিব। মাসান্তে আমি শাস্ত্র মত সর্ব্ব সমক্ষে সমুদায় কার্য্য করিব, ও নিজহস্তে পিণ্ডদান করিব। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই।"

সেবাইত প্রাতে এই কথা সকলের নিকট বলিলেন। সকলে ভগবানের করুণায় গদ গদ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞার উপর আবার কথা কি? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই করা হউক।

তখন এই কথা সর্ব্ব দেশে প্রচার হইল। মধুমাসে কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইল। বহুতর লোকের সমাগম হইল। তখন কাচা গলায় দিয়া গোপীনাথকে শ্রাদ্ধস্থানে আনা হইল!

যখন সভার মধ্যে কাচা গলায় দিয়া গোপীনাথকে আনা হইল, তখন সভাস্থ সকলে ভাবে নিমগ্ন হইলেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন, কেহ ধূলায় গড়াগড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেহ ভাবে মূর্চ্ছিত হইলেন। ভগবানের কারুণ্যে সকলে উন্মাদ হইলেন। কেহ গোপীনাথকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা ঘোষ-ঠাকুরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বালক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী সকলেই বলিতে লাগিলেন, যেমন ভক্ত তেমনই ঠাকুর, যেমন দাস তেমনি প্রভু, যেমন পিতা তেমনি পুত্র!

কথিত আছে যে, সর্ব্ব সমক্ষে গোপীনাথ নিজ হস্তে গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের এই অপরূপ লীলা অদ্যাবধি অগ্রদ্বীপে বৎসর বৎসর হইতেছে। আর এখনও একান্ত ভক্তগণ এই অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। যদি গোবিন্দ ঘোষের ঔরস পুত্র বাঁচিয়া

থাকিতেন, তবে বড় না হয় বিংশতি বৎসর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করিতেন। কিন্তু গোপীনাথ এই চারি শত বৎসর গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিলেন। এইরূপ পিতৃভক্ত পুত্র কেবল গোপীনাথই হইতে পারেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন, "হে গোবিন্দ! তোমা দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইবে। এরূপ সৌভাগ্য তুমি পরিত্যাগ করিও না।" হায়! একথা কাহাকে বলিব? শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের এই চারি শত বৎসর শ্রাদ্ধ করিতেছেন! জয়দেব "দেহি পদ পল্লব" পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনী রাখিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি কিরূপে লিখিবেন যে, ভগবান রাধার পায় ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং আসিয়া সেই শ্লোক পূরণ করিলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার নিমিত্ত গলায় কাচা পরিলেন! জীবগণ কি নির্ব্বোধ! কি মূঢ়মতি! এরূপ প্রভুকে ভুলিয়া থাকে।

প্রভু গঙ্গার ধারে ধারে বৃন্দাবনে চলিলেন। প্রভুর নিত্য সঙ্গী অসংখ্য লোক। প্রভুকে দর্শন করিতে সহস্রেক লোক আসিতেছে, ইহাতে দিবানিশি তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কোলাহল হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কেবল নৃত্য গীত ও হরি হরি ধ্বনি। কিন্তু প্রভুর ইহাতে রসভঙ্গ নাই, যেহেতু তিনি আপনার মনের আনন্দে বিহ্বল। সকলের ইচ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবে, প্রভুর নিকটে যাইবে, প্রভুর সঙ্গে কথা কহিবে। প্রভুর অপার মহিমা; যদিও লক্ষ লোকে তাঁহার দর্শন ও সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছে, তবু কাহারও মনের বাঞ্ছা অপূর্ণ রহিতেছে না। এইরূপে মহা কলরব ও হরিধ্বনির সহিত মহাপ্রভু গৌড় নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে বাঙ্গালার মুসলমান রাজার বাসস্থান। রাজা বহু লোকের কলরব শুনিয়া সহজে ভয় পাইলেন। যাহাদের যত বড় সম্পত্তি তাহাদের তত অধিক ভয়। তিনি ভাবিলেন, বুঝি কোন বিপক্ষ লোক তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। রাজারা ভাবেন যে, তাঁহারা বড় ভাগ্যবান ও তাঁহাদের রাজ্যভোগের নিমিত্ত সকলে তাঁহাদিগকে হিংসা করে। কিন্তু এখানকার কয়টি রাজা পরকালে রাজা হইয়াছেন? লোকের কলরব শুনিয়া গৌড়ের রাজা ভয় পাইলেন। তখন সশঙ্ক চিত্তে তাঁহার মন্ত্রী কেশব ছত্রিকে ডাকাইলেন। এখানে বলা উচিত যে, রাজা হোসেন সা যদিও মুসলমান, কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্য সমুদয় হিন্দুমন্ত্রিগণই নির্ব্বাহ করিতেন। কেশব

ছত্রি বলিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে, একজন সন্ন্যাসী জনকয়েক চেলা লইয়া বৃন্দাবন যাইতেছেন, তাহাতে এই কলরব হইতেছে। কেশব ছত্রির মনের ভাব এই-যে, যদি মুসলমান রাজা জানিতে পান যে, প্রভুর সঙ্গে লক্ষ লোক, তাহা হইলে হয়ত তিনি প্রভুর উপর বল প্রয়োগ করিবেন। কেশব ছত্রি যদিচ এইরূপ করিয়া, ব্যাপার কিছু গুরুতর নয় বলিয়া, রাজাকে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু রাজা উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না। সেই নিমিত্ত তিনি দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী আর দুই জন হিন্দু মন্ত্রীকে ডাকাইলেন।

এই দুই জন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়াছেন। ইঁহারা দুই ভাই, বুদ্ধি ও বিদ্যা বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজার অধীনে কাজ করেন, সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ কাজও তাঁহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানেরা যে মন্দির ভগ্ন করিতেছে, গো বধ করিতেছে, দেশ উজাড় করিতেছে, এ সমস্ত কার্য্য ইঁহারা দুই ভ্রাতা নিজ হাতে না করুন, ইহাতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। ইঁহারা বাহ্যদৃষ্টিতে ঠিক মুসলমান, কার্য্যেও অনেকটা মুসলমানের মত, অথচ অন্তরে ঘোর হিন্দু; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পালন করেন। পণ্ডিত সাধু বৈষ্ণবগণে তাঁহাদের বাড়ী অহোবহ পূর্ণ থাকে। বাড়ী কানাই নাটশালা গ্রামে। এই কানাই নাটশালা প্রভু পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। যখন গয়া হইতে প্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে, আগমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনচ্ছলে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন *। এই কানাই নাটশালা গ্রামে সমগ্র কৃষ্ণলীলার মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ বিদেশ হইতে উহা দর্শন করিতে লোক আসিত। এই সকল কীর্ত্তিও সেই দুই ভ্রাতার, যাঁহারা উপরে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

---

* প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবে তিনি আপনার হৃদয়ে আপনি প্রবেশ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? প্রভুর দুই ভাব,—ভক্তভাব ও ভগবৎ ভাব। অর্থাৎ ভক্তের জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তিনি তাহাই দেখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই, ভক্ত যখন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, প্রভু এই লীলার দ্বারা তাহাই দেখাইয়াছিলেন।

দবির খাস ও সাকর মল্লিক রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা এই সন্ন্যাসীর কথা আবার তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা যদিও প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই, তবুও তিনি যে শ্রীভগবান তাহা তাঁহাদের মনে এক প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা শত মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিলেন। তাঁহারা প্রভুর পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, বোধহয় স্বয়ং শ্রীভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসিরূপে জগতে বিচরণ করিতেছেন। আরও বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যাঁহার কৃপায় অধীশ্বর হইয়াছ, তিনি এখন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তিবলে মুসলমান রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং অতি নম্র হইয়া বলিলেন, "আমারও ঐরূপ কিছু বোধ হয়। আমি রাজা, লোকের জীবন মরণের কর্ত্তা। কিন্তু আমি যদি কাহাকেও বেতন না দিই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ আমার কথা শুনিবে না। আমার সৈন্যগণ যদি ছয় মাস বেতন না পায়, তবে অমনি আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিবে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী দরিদ্র, ইঁহার কাহাকেও এক পয়সা দিবার সঙ্গতি নাই, তবুও লক্ষ লোক আহার নিদ্রা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাবহ হইয়া ফিরিতেছে। ঈশ্বরশক্তি ব্যতীত সামান্য জীবের এরূপ শক্তি সম্ভাবিত হয় না।"

রাজা যদিচ এইরূপ ভাল কথা বলিলেন, তবু দুই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে আশ্বস্ত হইলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, প্রভুকে এই স্বেচ্ছাচারি-মুসলমান রাজার নিকট থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাহার পরে তাঁহারা প্রভুকে দর্শন না করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন ও তাঁহার দর্শন সুলভ হইয়াছে। এরূপ সৌভাগ্য তাঁহারা কেন ছাড়িবেন? সুতরাং নিশীথ সময়ে, তাঁহারা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, অতি গোপনে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, যদিও গভীর রজনী হইয়াছে, তবুও কেহ ঘুমান নাই। সকলেই প্রেমের হিল্লোলে আনন্দ-কোলাহল করিতেছেন। অনেক কষ্টে কোন কোন পার্ষদের ও পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। তখন তাঁহাদের কাছে, অতি দীনভাবে, প্রভুর দর্শন ভিক্ষা করিলেন। অবশ্য ইঁহাদের পরিচয় পাইবা মাত্র ভক্তগণ তটস্থ হইলেন। এই দুই ভাই নদীয়া পণ্ডিত-গণের প্রতিপালক বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভদ্রলোক মাত্রেই জানেন।

বিশেষতঃ তাঁহারা প্রভূত ধনবান্ ও ক্ষমতাবান্ বলিয়া আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই ভাইকে অতি যত্নে প্রভুর নিকট লইয়া চলিলেন। প্রভু কৃষ্ণ-প্রেমরসে নিমগ্ন। শ্রীনিত্যানন্দ চেষ্টা করিয়া তাঁহার আবিষ্ট চিত্ত ভঙ্গ করিয়া, দুই ভাইয়ের আগমন গোচর করিলেন। প্রভুও তাঁহাদের প্রতি শুভদৃষ্টি করিলেন। তখন দুই ভাই দুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ও মুখে আর এক গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া, গলায় বসন দিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; আর বলিলেন, "প্রভু, পতিত ও কাঙ্গাল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তুমি ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছ, অতএব আমাদের ন্যায় দয়ার পাত্র তুমি আর পাইবে না। তুমি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ। কিন্তু তাহারা নির্ব্বোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছে। আমাদের যত পাপ সমস্তই জ্ঞানকৃত, আমাদের ন্যায় অধমের তোমার কৃপা বিনা আর গতি নাই।"

এ কথা পূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি বলবান্ তাহারই অন্তরে অভিমানের সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বলবান্ সে তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি পায় না, কি পাইলেও উহা তাহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না। এই দুই ভাই গৌড়দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা পুরুষ, সুতরাং দীনতাই ইঁহাদের ঔষধ। ইঁহারা দৈন্যের অবতার হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। ফলকথা, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইবার পাত্র, অথচ নরকে আছেন। তাঁহারা যে প্রেম পাইবার পাত্র সে জ্ঞান তাঁহাদের আছে, আবার এ জ্ঞানও আছে যে, শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক এরূপ ভাগ্য পাইয়াও তাঁহারা বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই অনুতাপ তখন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। তাঁহারা প্রভুকে যাহা বলিলেন, প্রকৃতই মনে মনে তাঁহাদের ঐরূপ বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ তাহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগা।

এই দুই ভাই তখন এক প্রকার বাঙ্গালা দেশের অধিপতি। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, অর্থাৎ তাঁহারা, স্বয়ং বাদশাহ ব্যতীত আর সকলের উপর কর্ত্তা। তাঁহাদের এইরূপ নিষ্কপট দীনতা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। প্রভু দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা উঠ, দৈন্য সম্বরণ কর। তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমরা আমাকে বারংবার যে দৈন্য পত্র লিখিয়াছ তাহা দ্বারা তোমাদের মন আমি বেশ জানিয়াছি। তোমাদের কথা ভাবিয়া আমি একটী শ্লোক করিয়াছিলাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু

শ্লোকটী বলিলেন। শ্রীমুখের শ্লোক এই যথা :—

পরব্যসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বদয়ত্যন্ত র্নবসঙ্গরসায়নং॥

প্রভুর শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—"যাঁহাদের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা সেইরূপ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণ-রস আস্বাদন করিয়া থাকে।" লোকে বলে যে, পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে পরকীয়া রস কেন? ইহার অর্থ এই যে, প্রেমান্ধ কুলটার অবস্থা ও কৃষ্ণ-প্রেমে অভিভূত জীবের অবস্থা একই প্রকার। কৃষ্ণ-প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা পরকীয়া রস ব্যতীত অন্য উপমার দ্বারা জীবকে বুঝাইবার যো নাই। নিজে পবিত্র হইলে এ সমুদায় অপবিত্র বোধ হয় না। শ্রীরামানন্দ রায় দেবদাসীগণ লইয়া তাঁহার নাটকাভিনয় করিতেন, করিয়া স্বয়ং প্রভুকে দেখাইতেন। কিন্তু যাঁহারা উহা দেখিতেন, অভিনেত্রী বেশ্যা বলিয়া তাঁহাদের রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে এ সমুদায় বিধি পবিত্র লোকের জন্য।

সে যাহা হউক, প্রভু বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার প্রিয়, এমন কি এই গৌড় সান্নিধ্যে আসিবার আমার যে কি প্রয়োজন তাহা কেহ জানে না। সে কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন। অদ্য হইতে তোমারা দুই ভাই সনাতন ও রূপ নামে খ্যাত হইবে।"

যখন প্রভু প্রকাশ হইলেন, তখন তাঁহার কথা জগতে সকলে শুনিলেন, —কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু রূপ সনাতন তাহা বিশ্বাস করিলেন, করিয়া প্রভুকে দৈন্য পত্র লিখিলেন অর্থাৎ পত্রে আপনাদিগের উদ্ধার ভিক্ষা করিলেন। অবশ্য প্রভু উত্তর দিলেন না। রূপ সনাতন আবার লিখিলেন। প্রভু তবু উত্তর দিলেন না। এখন তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইতে তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন। কেন না, এ দুই ভাই দ্বারা তিনি জীব উদ্ধার করিবেন।

প্রভুর দুই চারিটী কথায় দুই ভাই চিরদিনের নিমিত্ত শ্রীপ্রভুর দাস হইলেন। এরূপ অচিন্ত্য শক্তি জীবে সম্ভবে না। এই দুই ভাই মহা বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী; যুদ্ধপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার অধীনে দাস্যবৃত্তি ও নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়া মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন, আর

অমনি তাঁহাদের পুনর্জন্ম হইল। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত জীব মাত্রে কি না করে, যাহার নিমিত্ত তাঁহারা দুই ভাই নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়াছেন, এখন প্রভু-দর্শনে সেই সমুদয় ঐশ্বর্য্য মলের ন্যায় একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই দুই ভাই কিরূপ শক্তিসম্পন্ন হইলেন তাহা পরে বলিব। যাইবার সময় জেষ্ঠ সনাতন প্রভুকে এই কথা বলিলেন, "প্রভু, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে সুখ পাইবেন না।" আর নিত্যানন্দ প্রভুকে গোপনে বলিলেন, "যদিও প্রভু স্বয়ং ভগবান, সকলের কর্ত্তা, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের ভয় যায় না। প্রভুকে এ স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকটে থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাঁহাকে এখান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।"

প্রভাতে প্রভু আপনি বলিলেন, "কল্য নিশিযোগে সনাতনের মুখে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ভালরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যদি যাই তবে একা যাইব। কিন্তু আমি যেন বাজী পাতাইয়া লক্ষ লোক সঙ্গে লইয়া চলিতেছি! শ্রীবৃন্দাবন অতি গুপ্ত ও পবিত্র স্থান। সেখানে কলরব শোভা পায় না। যাঁহারা আমার সঙ্গে চলিতেছেন, আমি ইহাঁদের নিবারণ করিতে পারি না। অতএব আমি এই উদ্‌যোগে বৃন্দাবনে আদৌ যাইব না। এখন হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া নীলাচলে যাইব। আর সেখান হইতে বৃন্দাবন যাইব।" ইহাই বলিয়া প্রভু পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ দেশাভিমুখে ফিরিলেন।

ভবভূতি বলেন, মহাজনের মন যদিও শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল, কিন্তু প্রয়োজন মত উহা বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়। তাহার প্রমাণ এই দেখ। কোথা নীলাচল, আর কোথা গৌড়। যে বৃন্দাবনের নামে প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই বৃন্দাবনে যাইবার জন্য, দুই মাস হাঁটিয়া বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, প্রায় অর্দ্ধ পথ আসিয়াছেন। একটী কথা, যাহা তোমার আমার কাছে সামান্য, প্রভু তাহা দ্বারা চালিত হইয়া, এ সমুদয় পরিশ্রম ও কষ্টের ফল ত্যাগ করিলেন। প্রভু যে পথে আসিয়াছেন সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন!

প্রভু ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় গঙ্গার পরপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "নরোত্তম দাস" বলিয়া কয়েক বার ডাক দিলেন, দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

যদি প্রভু সুধু "নরোত্তম" বলিয়া উক্তি করিতেন, তবে ভক্তগণ ভাবিতে পারিতেন যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, কারণ তাঁহার এক নাম

"নরোত্তম"। কিন্তু "নরোত্তম দাস" শুনিয়া কেহ কিছু ঠাহরিতে পারিলেন না। তাহার বহু বৎসর পরে, সেই স্থানে যখন শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় উদয় হইলেন, তখনই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান প্রভু, নরোত্তম দাস বলিয়া ডাকিয়া, তাঁহাকেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রভু পথে ভক্তগণকে, যাহার যেখানে বাড়ী, সেখানে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীখণ্ডের পরে অগ্রদ্বীপে আইলেন। সেখান হইতে নদীয়ায় না যাইয়া দ্রুতপদে একেবারে শান্তিপুরে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণ, প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ, পথ হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্রভু শান্তিপুরে যাইতেছেন ও সেখানে শচীমাতার নিমিত্ত কিছু দিন থাকিবেন। প্রভু যে গৌড় হইতেই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, একথা কেহ কেহ কোন এক প্রকারে পূর্ব্বে জানিতেন। সে বড় রহস্যের কথা। বৃন্দাবনে প্রভু হাঁটিয়া যাইতেছেন, এই নিমিত্ত পরম শক্তিসম্পন্ন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রভুর গমন সুলভের নিমিত্ত, মনে মনে একটী জাঙ্গাল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই মানসিক পথের দুই ধারে সুগন্ধি কুসুম-শোভিত বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিলেন, তাহার উপর কোকিল ও ময়ুর বসাইলেন। এইরূপে মনে মনে প্রভুকে প্রত্যহ লইয়া যাইতেছেন। প্রভুর প্রত্যেক শ্রীপদের নিম্নে একটী পদ্মফুল রাখিতেছেন, যেন পদে ব্যাথা না লাগে। ব্রহ্মচারী এইরূপে প্রভুকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। কিন্তু আর এই জাঙ্গাল বান্ধিতে পারেন না। বহুকষ্টেও জাঙ্গাল বান্ধিতে না পারিয়া বুঝিলেন যে, প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না। তখন তিনি একথা প্রকাশ করিলেন, করিয়া বলিলেন যে, প্রভু এবার বৃন্দাবন যাইবেন না। কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবেন।

উপরে ব্রহ্মচারীর যে রঙ্গ বলিলাম, ইহাকে বলে মানসিক সেবা, ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতিশীঘ্র লাভ করা যায়, এইরূপ করিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গ করাই প্রকৃত ভজন।

শচীমাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন। পুত্রকে বিদায় দিয়া শচী সাধারণের চক্ষে বড় দুঃখে দিন কাটাইতেন। কিন্তু প্রভুর কৃপায় তাঁহার অন্তরে কোন দুঃখ ছিল না। যেহেতু প্রভু যেই তাঁহার নিকট বিদায় লইতেন, অমনি তিনি কৃষ্ণ-বিরহে বিহ্বল হইয়া

সংসারের সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। শচীর মনের ভাব যে, তিনি যশোদা। মনের ভাবত বটেই, প্রকৃতও তিনি তাহাই। আর তাঁহার যে পুত্র কৃষ্ণ, তিনি মথুরায় গিয়াছেন। যে কোন ভাবেই হউক, কৃষ্ণ সম্বন্ধ থাকিলেই, তাহা আনন্দময়। বিরহ বড় দুঃখের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণবিরহ বড় সুখের সামগ্রী। সুতরাং যদিও শচীর ভাব দেখিয়া লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি আনন্দে বিহ্বল থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন লোক আসিল। শচী ভাবিলেন, ইনি বিদেশী, অবশ্য মথুরার সংবাদ রাখেন। শচী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কি মথুরা হইতে আসিতেছ, আমার কৃষ্ণের সংবাদ বলিতে পার?" এ কথা শুনিয়া, কেবল তাহার কেন, যে কেহ শুনিল সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কখন বা শচী, যশোদা যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া কৃষ্ণকে বাঁধিতে চলিলেন; কখন বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুদায় আর কিছুই নয়, কেবল শ্রীকৃষ্ণ শচীর সহিত এইরূপে খেলা করিতেন। তুমি আমি যাহাই ভাবি না কেন, ভাগ্যবতী শচী শ্রীভগবৎ সংসর্গে অতি আনন্দে দিন কাটাইতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থাও ঠিক শচীর ন্যায়।

শচী শুনিলেন, নিমাই শান্তিপুরে যাইতেছেন, আর সেখানে তাঁহার নিমিত্ত কিছু দিন অপেক্ষা করিবেন। অমনি শচীর আবার জগতের কথা মনে পড়িল, আর তিনি "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। গঙ্গাদাস, মুরারি এবং অন্যান্য নদীয়ার ভক্তগণ শচী মাতাকে লইয়া শান্তিপুরে চলিলেন। এ দিকে প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত হঠাৎ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে উদয় হইলেন। হঠাৎ প্রভুর উদয় দেখিয়া অদ্বৈত আনন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এদিক হইতে শচী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচী দোলা হইতে বাহির হইলে প্রভু অমনি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "তুমি যশোদা, তুমি দেবকী, তুমি জীবের বন্ধু, তুমি কৃপাময়ী স্নেহময়ী, আমার এ দেহ তোমার, তুমি এক তিলে আমাকে যে সেবা করিয়াছ, বহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পারিব না।" প্রভু জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, স্তুতি করিতেছেন, আর রোদন

করিতেছেন। শচী হাঁ করিয়া পুত্রমুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী পূর্ব্বে একবার যাহা বলিয়াছিলেন, আবার সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, "নিমাই, তুমি আমাকে প্রণাম কর; তাহাতে আমার ভয় করে।" প্রভু বলিলেন, "মা, আমি কৃষ্ণভক্তির কাঙ্গাল। যদি আমার কিছু কৃষ্ণভক্তি হইয়া থাকে সে কেবল তোমা হইতে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি।"

শচী অভ্যন্তরে গমন করিলেন, আর অমনি রন্ধনের ভার লইলেন। রন্ধন হইল, নিতাই গৌর দুই জনে ভোজনে বসিলেন। প্রভু কি কি ভালবাসেন, শচী তাহা জানেন, তাই সেই সমুদায় সামগ্রী সংগ্রহ করা হইয়াছে। সে সমুদায় সামগ্রীও যে বড় দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান, তাহা নহে। প্রভুর শাকে বড় রুচি, তাই শচী বিংশতি প্রকারের শাক রন্ধন করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভুকে বড় ভালবাসেন, আর প্রভু যাহাকে বা যে দ্রব্য ভালবাসেন, তিনিও তাহাকে ও সেই দ্রব্যকে ভক্তি করেন এবং ভালবাসেন। প্রভু শাক ভালবাসেন, তাই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস আর শাককে শাক বলেন না, শাককে বলেন "শ্রীশাক।" প্রভুদ্বয় ভোজনে বসিলেন, ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিলেন, শচী একটু আড়ালে বসিয়া ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভুর আনন্দের সীমা নাই, কাজেই নানাবিধ রহস্য কথা বলিতে লাগিলেন। সম্মুখে নানাবিধ শাক দেখিয়া "শ্রীশাক"গণের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমি শাকের পক্ষপাতী বলিয়া তোমরা আমাকে অন্তরে অন্তরে বিদ্রূপ কর, কিন্তু শাকের কি মহিমা তাহা শ্রবণ কর। এই যে হেলেঞ্চা শাক, ইনি দেহরক্ষা করেন, আর পরোক্ষে কৃষ্ণভক্তি দান করেন।" এ কথা শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, গম্ভীর ও নিরপেক্ষ ভাবে অন্যান্য শ্রীশাকের গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "বাস্তু শাক ভোজনে রাধারাণীর কৃপা হয়।" হায়! যদি বাস্তু শাক ভোজনে রাধা-কৃষ্ণের কৃপা হইত, তবে দুবেলা এই শাক খাইতাম। সে যাহা হউক, এইরূপ হাস্যকৌতুকে ভোজন সমাপ্ত হইল। তখন সকলে সেবার পাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন।

প্রভুর যদিও সত্বর যাইতে মন, কিন্তু মাধবেন্দ্রনির্য্যাণ তিথি সম্মুখে। মাধবেন্দ্র, অদ্বৈত প্রভুর গুরু। তাই আচার্য্য তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রভু সেই মহোৎসবের অনুরোধে আর কয়েক দিবস, শান্তিপুরে রহিলেন। এই অবকাশে প্রভু

গৌরীদাসের স্থানে শান্তিপুরের ওপারে কালনায় গমন করিলেন। তখন শীতকাল প্রায় গিয়াছে, ভক্তগণ সকলে রবির তাপে কষ্ট পাইতেছেন। প্রভু তখন কালনায় এই অদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন, "বড় গ্রীষ্ম হইতেছে, একবার নাম-কীর্ত্তন কর, শরীর জুড়াইয়া যাউক।" তাই এই গীতের সৃষ্টি হইল, "হরি বল জুড়াক্ হিয়া রে।" বড় গ্রীষ্ম হইতেছে, হরিনাম কর শরীর শীতল হইবে, এই কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র কেবল আমার প্রভু। গৌরীদাসের ওখানে মহামহোৎসব হইল। গৌরীদাস নিতাই গৌরের চরণে পড়িয়া বর মাগিলেন যে, তাঁহারা দুই জনে তাঁহার বাড়ীতে থাকুন। যেহেতু তাঁহারা না থাকিলে তিনি প্রাণে মরিবেন। প্রভু বলিলেন, তথাস্তু। তাই দুই ভাই ঠাকুরঘরে রহিলেন। পাছে প্রভু পলায়ন করেন, এই ভয়ে গৌরীদাস ঠাকুরঘরে শিকল দিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, গৌর-নিতাই দুই ভাই বাহিরে দাঁড়াইয়া। তখন তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া দেখেন যে, যে জীবন্ত ঠাকুর ঘরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন গৌরীদাস বলিলেন, "ও হইল না, যাঁহারা ঘরে আছেন, তাঁহারা যাউন, তোমরা আইস।" ইহাই বলিয়া বাহিরের সেই জীবন্ত ঠাকুরদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাহিরের দুই ভাই ঘরে আসিয়া বিগ্রহ হইলেন, আর পূর্ব্বে যাঁহারা বিগ্রহ-রূপে ছিলেন, তাঁহারা জীবন্ত হইয়া বাহিরে চলিলেন! এইরূপ বার বার হইতে লাগিল, কাজেই নিরুপায় হইয়া গৌরীদাস যা পাইলেন তাহাই রাখিলেন,—ভালই পাইলেন। জনশ্রুতিতে যেরূপ কাহিনী শুনা যায়, তদ্রূপ বলিলাম। কিন্তু পদকল্পতরুতে এই সম্বন্ধে দীন কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ রচিত এই তিনটী পদ আছে :—

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বোলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া [illegible]॥

তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি,
তবে সভার হয়ে পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি,
তবে জানি পতিত-পাবন॥
প্রভু কহে, গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস,
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে,
ভকত-বৎসল তেঞি গায়॥

---

(২)

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে,
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
রহিলাম এই দুই ভাই॥
এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই মূর্ত্তি মূর্ত্তি লৈয়া,
আইলা পণ্ডিত বিদ্যমান॥
চারি জনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
ভাবে অশ্রু বহয়ে বয়ান॥
পুন প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঞি খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥

শুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ,
চারিজনে ভোজন করিলা।
পুষ্প মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা॥
নানা মতে পরতীত, করাইয়া ফিরাইল চিত,
দোঁহারে রাখিয়া নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই থায় মাগি,
দোঁহে গেলা নীলাচল পুরে॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তাঁর পদ করি আশ,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

---

(৩)

শ্রীবৃন্দাবন নাম, রত্ন চিন্তামণি ধাম,
তাহে কৃষ্ণ বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল,
অম্বিকা নগরে যার বাস॥
নিতাই চৈতন্য যার, সেবা কৈলা অঙ্গীকার,
চারি মূর্ত্তে ভোজন করিলা।
পূরুবে সুবল যেন, বশ কৈল রাম কানু,
পরতেক এথন রহিলা॥
নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে,
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই॥
প্রেমে লম্ফ ঝম্ফ যার, পুলকিত হুহুঙ্কার,
ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণে হাস।
তাঁর পাদপদ্ম রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

প্রভু শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর মহোৎসব পর্য্যন্ত রহিলেন। এই মহোৎসবের রন্ধনের ভার সমুদায় শচীদেবীর উপর পড়িল। এই মহোৎ-সবের সঙ্গে প্রভুর নদীয়া-বিহার ফুরাইল। প্রভু জননীর নিকট বিদায় লইলেন। শচী বুঝিলেন, এই শেষ দেখা, অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষে এই শেষ দেখা। যেহেতু শচী ইচ্ছা করিলেই দিব্যচক্ষে প্রভুকে সর্ব্বদা আপন ঘরে দেখিতে পাইতেন।

এই সময়ে রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণে পড়িলেন। সপ্তগ্রামের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই কায়স্থ; ইঁহারা বারো লক্ষ কাহনের অধিকারী। সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া যখন শান্তিপুরে আইসেন, তখন রঘুনাথ বালক; প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ৫।৭ দিন প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, এবং সংসারে বাস অসহ্য হইয়া পড়িল। প্রভু সেখান হইতে নীলাচল গমন করিলে, রঘুনাথ বারংবার সেখানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করেন আর ধরা পড়েন। এবার প্রভু শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ পিতার নিকট অনেক মিনতি পূর্ব্বক আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে অনেক কৃপা করিয়া উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও, স্থির হইয়া অন্তর নিষ্ঠা কর। সংসারের কাজ সমুদায় করিও, কিন্তু উহাতে অনাবিষ্ট থাকিও, আর লোক দেখাইয়া কপট বৈরাগ্য করিও না। অনায়াসে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিও, কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হইও না। লোক একে-বারে সাধু হয় না; তুমি এইরূপ ব্যবহার কর, উপযুক্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন।" ইহাই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে গৃহে বিদায় করিয়া দিলেন। হে গৃহী পাঠক মহাশয়গণ! প্রভুর এই শিক্ষাগুলি পালন করিতে চেষ্টা করুন।

প্রভু সেখান হইতে কুমারহট্টে আসিলেন। শ্রীবাস তখন তাঁহার কুমারহট্টস্থ আলয়ে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন, ও বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর সহিত নিজগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু অবশ্য শ্রীবাসের বাড়ী ভিক্ষা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কিরূপে সংসার সমাধা করেন, যেহেতু তাঁহার পরিবার বৃহৎ ও তিনি কিছুই করেন না। শ্রীবাস ইহাতে হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, "এই আমার সঙ্কল্প।" শ্রীবাস এই সঙ্কেত দ্বারা ইহাই বলিলেন যে, "এক দিন,

দুই দিন, তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিব, ইহাতে যদি কৃষ্ণ অন্ন না দেন, তবে গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" প্রভু ইহাতে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার শ্রীভগবানে এত বিশ্বাস? আচ্ছা আমারও বর শ্রবণ কর। আমি তোমাকে বর দিতেছি যে, যদি লক্ষ্মী স্বয়ং কখনও উপবাস করেন, তবু তুমি কখনও অন্নকষ্ট পাইবে না।"

শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীবাসের দৌহিত্র। তিনি তাঁহার গ্রন্থে এই কাহিনী বলিয়া গৌরব করিয়া বলিতেছেন, "তাই, সেই বরে আমার দাদার ঘরে অন্ন কষ্ট নাই।" প্রভু সেখান হইতে তাঁহার মাসী ও তাঁহার মাসীপতি চন্দ্রশেখরের বাড়ী গমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদের ঘরের ছেলে, তাই অভ্যন্তরে গমন করিলেন, এমন সময় একটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি পুত্রবতী হও।" একথা শুনিয়া সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভু ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কেন, কি হইল?" তখন শুনিলেন সেই যুবতী শ্রীখণ্ড ভগবান আচার্য্যের স্ত্রী।

শ্রীভগবান আচার্য্য "প্রভুকে না দেখিলে মরেন।" এই নিমিত্ত বিবাহ করিয়া, স্ত্রীকে শ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকট বাস করেন। তাহার পরে ভগবানের স্ত্রী চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রভু এই সমুদয় কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নয়। তুমি সত্যই পুত্রবতী হইবে।" ইহার পর প্রভু নীলাচলে গমন করিয়া ভগবানকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, "তুমি গৃহে গমন কর। তোমার পুত্র সন্তান হইলে তখন তুমি আমার নিকট আগমন করিও।" এই আজ্ঞায় শ্রীভগবান দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার দুইটী মহাতেজস্বী পুত্র হইল।

প্রভু নীলাচলাভিমুখে দ্রুত চলিলেন, পানিহাটী রাঘবের বাড়ীতে দুই এক দিবস রহিলেন। সেখান হইতে বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের নিকট শ্রীভাগবত শুনিয়া অনেক নৃত্য করিলেন। পরে দ্রুতগতিতে নীলাচলে আগমন করিলেন। ধ্বনি হইল প্রভু আসিতেছেন, আর শ্রীক্ষেত্রের লোকে প্রভুকে দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। গদাধরও আইলেন। গদাধর প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া, আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন তিনি ধন্য, আর যিনি

মূর্চ্ছিত হয়েন তিনিও ধন্য। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের আর এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ"।

ভক্তগণ আসিয়াছেন। প্রভু ও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে একটুও আরাম পাই নাই। দিবানিশি লোকের কলরব। লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে চলিল। কানাই নাটশালা গ্রামে সনাতন আমাকে উপদেশ দিলেন যে, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়ায় সুখ পাইবেন না। আমি বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের মুখে আমাকে উপদেশ করিলেন। কারণ, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে গেলে লোকে ভাবিবে যে, আমি বাজীকর সাজিয়া, হৈ হৈ করিয়া, বৃন্দাবনে গমন করিতেছি। সে অতি নিভৃত পবিত্র স্থান, সেখানে একক যাইব, না হয় একজন সঙ্গে থাকিবে। আমি কাজেই সেখান হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আমি তখন বুঝিলাম যে, আমি গদাধরের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাই আমার যাওয়া হইল না। গদাধরকে দুঃখ দিয়া গমন করিলাম, আর তাহার ফল এই হইল যে, আমায় ফিরিয়া আসিতে হইল।"

ইহাতে গদাধর কৃতার্থ হইয়া গলায় বসন দিয়া চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার বৃন্দাবনে যাওয়া কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। বৃন্দাবন আর কোথা? যেখানে তুমি সেখানেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে যাইবে তাহাতে বাধা কি? সম্মুখে চারি মাস বর্ষা আসিতেছে, ইহার অন্তে আপনি সচ্ছন্দে গমন করিবেন।" সকলে ইহাতে বলিলেন, পণ্ডিতের যে মত ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। তখন প্রভু গদাধরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই দিবস প্রভু গদাধরের স্থানে সেবা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রচার কার্য্যের জন্য গৌড়ে রহিলেন। প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়া আসিয়াছেন, আমার সঙ্গে এই দেখা হইল, তাঁহারা এবার যেন আর নীলাচলে গমন না করেন। সুতরাং এবার রথ-যাত্রার সময় প্রভু কেবল নীলাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভ কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমায় বল্ রে, কত দূর বৃন্দাবন।
আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন॥"

গৌর-উক্তি—প্রাচীন গীত।

প্রভু যখন শান্তিপুর শচী মাতার নিকট বিদায় হয়েন, তখন বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি ভিক্ষা মাগিলেন। বলিলেন, "মা, বার বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইতে পারিলাম না। তুমি সচ্ছন্দ মনে আমাকে অনুমতি দাও।" শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "দিলাম"; ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনীর ন্যায় পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। প্রভু সে দর্শনে, মর্ম্মাহত হইয়া আপনার বদন হেট করিলেন, করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে প্রভু শান্ত হইয়া, একথা ওকথা বলিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিলেন, কিন্তু শচীর মনে একটী কথা বারংবার উদয় হইতে লাগিল। "নিমাই কান্দিল কেন?" "যাইবার সময় নিমাই কান্দিল কেন" শচী আপনাআপনি এই কথা প্রথমে ভাবিতে লাগিলেন। পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, ক্রমে মুরারিকে, শ্রীবাসকে, এইরূপে জনে জনে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "নিমাই যাইবার বেলা এরূপ কান্দিল কেন?" তাঁহারা ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, কান্দিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। ঠাকুর জননী-বৎসল, তাই বিদায় কালে কান্দিয়া ছিলেন। শচী প্রবোধ মানিলেন না। তিনি উত্তরে বলিলেন, তাহা নয় তোমরা নিমাইয়ের কি বুঝ? নিমাইয়ের সঙ্গে বিদায়ের বেলা যখন আমার চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, তখন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে একটী কথা বলিয়াছিল। তাহার অর্থ যে, "মা, এই জন্মের মত দেখা, আর দেখা হইবে না। তা না হইলে, যাইবার বেলা কান্দিবে কেন?" শচী, "যাইবার বেলা কেন কান্দিল" বলিতে বলিতে নবদ্বীপে গমন করিলেন, সেখানে যাইয়াও উহাই বলিতে বলিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু নীলাচলে কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ কর।

প্রভুর মুখে এক কথা; আর মনেও সেই ভাব যে, কবে বৃন্দাবন যাইব? কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা নিধুবন, কাঁহা কৃষ্ণ-বিহারের স্থান? কবে আমার বৃন্দাবন দর্শন হইবে? কবে আমি রাসস্থলীতে গড়াগড়ি দিব? কবে যমুনায় স্নান করিব? প্রভুর এইরূপ আক্ষেপ-উক্তিতে ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

প্রভুর ছলছল আঁখি, ম্লান বদন। সরূপকে নিকটে ডাকিতেছেন; সরূপ আইলেন, অমনি প্রভু তাঁহার হাত দু'খানি ধরিলেন, ধরিয়া অতি কাতরে বলিতেছেন, "সরূপ, আমাকে বৃন্দাবনে যাওয়ার সাহায্য কর, তোমায় মিনতি করি।" সরূপ আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন। রামরায় আইলেন, তাঁহাকেও নিকটে লইয়া বসিলেন। তাঁহার নিকটেও ঐ কথা, যথা—"আমার ভাগ্যে কি বৃন্দাবন দর্শন হইবে?" রামরায়ও আশ্বাস বাক্য বলিলেন। প্রভুকে যে কেহ দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভু তাঁহাকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, "তুমি সত্য করিয়া বল, আমার কি শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইবে?" এইরূপে প্রভু দিবানিশি কাটাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন যে, প্রভু বৃন্দাবন না দেখিলে প্রাণে মরিবেন। "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন," করিয়া প্রভু রোদন করেন, আর সেই সঙ্গে ভক্তগণও রোদন করেন। জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভুর অবতার, কিরূপে বৃন্দাবন যাইতে হয়, প্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন।

তখন সকলে যুক্তি করিয়া প্রভুকে বৃন্দাবন পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, এক জন ব্রাহ্মণ ভৃত্য সঙ্গে করিয়া, তীর্থ পর্য্যটন আশয়ে, নীলাচল আগমন করিতেছেন। ভৃত্যের সহিত তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল। প্রভু বনপথে যাইবেন এই স্থির হইল। দিন স্থির হইল, প্রভু আবার বিজয়া দশমী দিনে অতি প্রত্যূষে বৃন্দাবন চলিলেন। লোক সংঘট্টন ভয়ে প্রভুর গমনবার্ত্তা দুই চারি জন মর্ম্মি-ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিলেন না। প্রভু কটক ডাহিনে রাখিয়া নিবীড় বনপথে, ঝারিখণ্ড দিয়া চলিলেন।

প্রভুর সঙ্গী দুইজনের সহিত এই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা বড় একটা কথা বলিবেন না। প্রভু আপন মনে যাইবেন। তাই প্রভু আপনার মনে চলিয়াছেন। অগ্রে বলভদ্র পথ দেখাইয়া চলিতেছেন, প্রভু বিহ্বল অবস্থায়, পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবিষ্ট চিত্তে ঢলিতে ঢলিতে গমন করিতেছেন। মধ্যাহ্ন সময় হইলে সঙ্গিগণ প্রভুকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, প্রভু

পুত্তলিকার ন্যায় সেখানে বসিলেন। প্রভু আবিষ্ট চিত্তে স্নান করিলেন, ভোজন করিলেন, বিশ্রাম করিলেন; আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রজনী আসিল, আশ্রয় স্থান নাই। অমনি বনে রহিয়া গেলেন। শীত উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বনে কাষ্ঠের অভাব নাই। অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া সকলে নিশিযাপন করিলেন।

যে ঝারিখণ্ডে এখনও বন্যপশু ভয়ে দিবাভাগে বিচরণ করা যায় না, তখন সেখানকার কি অবস্থা ছিল, মনে করুন। প্রভু যে পথে চলিলেন, সে পথে কেহ কখন যান নাই, কাহারও যাইতে সাহস হয় না। প্রভু নিবীড় বনে প্রবেশ করিলেন, ১০।১৫ দিনের পথের মধ্যে লোকালয় নাই। অবশ্য ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার তাঁহাদিগকে ঘিরিল। বলভদ্রের ভয় হইল, কিন্তু প্রভুর হিংস্র জন্তুগণের প্রতি লক্ষও নাই। জন্তুগণ আসিল, আর প্রভুকে দর্শন করিয়া, হয় ফিরিয়া গেল, না হয় মোহিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। প্রভু স্নান করিতেছেন, এমন সময় হস্তিযূথ জলপান করিতে আসিল। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিংসাবৃত্তি অন্তর্হ্নত হইল। প্রভু গমন করিতেছেন, পথে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া রহিয়াছে। প্রভুর চরণ তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। সে কৃতার্থ হইয়া, অতি নম্রভাবে পথ ছাড়িয়া দিল। কখন কখন বা ব্যাঘ্র আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আবার মৃগ প্রভৃতি ঐরূপ আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এইরূপ ব্যাঘ্র ও মৃগে দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, এমন কি এক সঙ্গে চলিয়াছে। অতি হিংস্র জন্তুগণের মনেও কোমল ভাব আছে। দেখ না, ব্যাঘ্র পর্য্যন্তও আপন শাবককে লইয়া পালন করিতেছে, শাবকগণের নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বন্য কুকুরের হিংস্র ভাব দেখ, আর পালিত কুকুরের প্রভু-ভক্তি দেখ। অবশ্য বন্য কুকুরের হৃদয়ে এই কোমল ভাবের অঙ্কুর ছিল, আর উহা, মনুষ্য সহবাসে ক্রমে পালিত হইয়া সদ্‌গুণ বিশিষ্ট হইয়াছে। যদি ভারী বন্যা হয়, আর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এক স্থানে ব্যাঘ্র হরিণ প্রভৃতি সমবেত হয়, তবে কেহ কাহার হিংসা করে না। সাধারণ বিপদে তাহাদের হিংস্রভাব দূরীভূত হয়। সেইরূপ প্রভুর দর্শনে তাহাদের হিংস্রভাব বিলুপ্ত হইয়া কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কাজেই ব্যাঘ্র ও মৃগ মুখ শুঁকাশুঁকি করিতে লাগিল। এই মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া প্রভুর সঙ্গিগণ অবাক হইলেন এবং প্রভুও সুখী হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

প্রভু গীত ধরিলেন, আর সমস্ত জগৎ সুশীতল হইল। পক্ষী সকল আনন্দে সেই সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রভু উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিলেন, আর যেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধ্বনিত হইল। বৃক্ষ লতা কুসুমিত হইল, পুষ্প হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রভু আপনি এক দিন সহজ অবস্থায় বলভদ্রকে বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃপাময়, এই বনপথে আমাকে আনিয়া বড় সুখ দিলেন।" প্রত্যহ বন্য-ভোজন, সর্ব্বদা জনশূন্যতা, পক্ষীর কোলাহল, ময়ূরের নৃত্য, পশুগণের স্বাভাবিক জীবন, এই সমুদায় প্রভুকে মোহিত করিল।

প্রভু কখন কখন বনত্যাগ করিয়া গ্রাম পাইতেছেন। কিন্তু লোক-সমাজ অতি অসভ্য। তাহারাও তাহাদের সঙ্গী ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় হিংস্র। কিন্তু তবু প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহারা পরিশেষে ভক্তিতে উন্মত্ত হইতেছে। এমন কি, গ্রাম সমেত বৈষ্ণব হইতেছে। এইরূপে প্রভু বারাণসীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে অনেকে স্নান করিতেছেন। হঠাৎ সকলে দেখিলেন যে, একটী অতি দীর্ঘকায়, পরম সুন্দর, পরম মধুর ও পরম স্নিগ্ধবস্তু, প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি বয়সে যুবক, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়, তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, তাঁহার চক্ষু কমলদলের ন্যায় করুণা-মকরন্দ পূর্ণ, তাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্র হইতেও সুখকর। সকলে দেখিলেন যে, তিনি মস্তক অবনত করিয়া, বিহ্বল অবস্থায়, কৃষ্ণ-নাম জপিতে জপিতে, তাঁহাদের মধ্যে উদিত হইলেন। সেই পরম শুভদর্শন সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। এই সমুদায় লোকের নয়ন অন্য দিকে আর গেল না, প্রভুর শ্রীমুখে আকৃষ্ট হইয়া রহিল। কেহ বা আকৃষ্ট হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইনি যিনি হউন, আমাদের জাতীয় মনুষ্য নহেন।

এই সমুদায় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ইতিপূর্ব্বে প্রভুকে দেখিয়াছেন। প্রভুর দোসর জগতে নাই, সুতরাং যিনি একবার তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। এই লোকটীও কাজেই দর্শনমাত্রই প্রভুকে চিনিলেন, তখন তিনি দ্রুতগমনে অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, "আমি তপন মিশ্র।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রভু যখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাপার গমন করেন, তখন সেই দেশের একজন প্রধান লোক,

প্রভুকে শ্রীভগবান জানিয়া, তাঁহার শরণাগত হন। আর প্রভু তাঁহাকে বারাণশী গমন করিতে আদেশ করেন ; বলিয়াছিলেন যে, "তুমি তথায় গমন কর, তোমার সহিত আমার সেখানে দেখা হইবে।" সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী এখন সম্পূর্ণ হইতেছে। তপন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তখন কাশীতে চন্দ্রশেখর নামক বৈদ্য ছিলেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপে প্রভুকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

কাশী ও নদীয়া ভারতবর্ষে দুই প্রধান স্থান। নদীয়া ন্যায়ের স্থান, কাশী বেদের স্থান। নদীয়ায় তন্ত্র-চর্চ্চা, আর কাশীতে জ্ঞান-চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হয়। নদীয়া গৃহস্থ-পণ্ডিতের, এবং কাশী সন্ন্যাসি-পণ্ডিতের স্থান। এই সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী। পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্মচর্চ্চায় ইনি ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। যদি চ ন্যায়শাস্ত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বড়, কিন্তু সরস্বতী আবার বেদে সার্ব্বভৌম অপেক্ষা বড়। প্রেম ও ভক্তিধর্ম্মের দুই প্রধান কণ্টক—নৈয়ায়িকগণ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ। নৈয়ায়িকের শিরোমণি সার্ব্বভৌম প্রভুর অনুগত হইয়াছেন। এখন মায়াবাদিগণের সর্ব্বপ্রধান প্রকাশানন্দ বাকী আছেন। এখন যেই মায়াবাদিগণের সর্ব্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহার নিকট প্রভু আপনি আসিয়া উপস্থিত।

প্রভুর অবতারের কথা প্রকাশানন্দ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন ; শুনিয়া প্রথমে কেবল হাস্য করিয়াছিলেন। তাহার পরে শুনিলেন যে, প্রবলপ্রতাপান্বিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার অনুগত হইয়াছেন। তখন একটু উত্তেজিত হইলেন ; ভাবিলেন এই নব অবতারটীকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া একটী তৈর্থিক দ্বারা প্রভুকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। * পত্র খানিতে সৌজন্যের লেশমাত্র নাই, বরং বিস্তর অবজ্ঞাসূচক বাক্য ছিল। সে পত্র খানিতে একটী শ্লোক লেখা ছিল; তাহার অর্থ এই যে, মূঢ় লোকই কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে বাস করে। প্রভু এই পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে একটী শ্লোক পাঠাইলেন। প্রভুর পত্র শিষ্টাচার-পরিপূর্ণ। এই পত্র পাইয়া প্রকাশানন্দ প্রভুকে কেবল গালি দিয়া আর

---

* প্রভু প্রকাশানন্দকে লইয়া যে লীলা করেন, তাহা বিস্তার করিয়া আমি অন্যত্র গ্রন্থে লিখিয়াছি। সেই কারণে এখানে সংক্ষেপে কেবল মূল ঘটনামাত্র লিখিব।

একটী শ্লোক লিখিলেন। তাহার অর্থ এই যে, "যে ব্যক্তি উত্তম আহার করে, সে কিরূপে ইন্দ্রিয় নিবারণ করে ?" প্রভু এই শ্লোকের কোন উত্তর দিলেন না।

অতএব প্রভু ও সরস্বতীতে বেশ জানা শুনা আছে। প্রভু কাশীতে আইলে সে কথা প্রকাশ পাইল। সূর্য্যের উদয় হইলে কি লোকের জানিতে বাকী থাকে ? সকলে বলিতে লাগিল যে, এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে 'স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে এ কথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তিনি সন্ন্যাসিগণের সহিত সর্ব্বদা গোষ্ঠী করিতেন। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্র তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়া দ্রুতগমনে এই শুভসংবাদ কাশীর সর্ব্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহাকে বলিতে চলিলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন যে, এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহার লক্ষণ দেখিলে জানা যায় যে, তিনি মনুষ্য নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুকে জানেন ও ঘৃণা করেন। মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট তাঁহার গুণবর্ণনা শুনিয়া মাৎসর্য্যে জ্বলিয়া গেলেন, বলিলেন, "জানি জানি, তাহার নাম চৈতন্য। তাহাকে সন্ন্যাসী কে বলে ? সে ঘোর ঐন্দ্রজালিক। শুনিয়াছি তাহাকে যে দেখে সেই শ্রীকৃষ্ণ বলে। আরও শুনিয়াছি যে, প্রবল প্রতাপান্বিত পণ্ডিত সার্ব্বভৌম, তিনিও নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার ভাবকালি এই কাশীতে বিকাইবে না। তুমি সাবধান হও, সেখানে যাইও না। এ সমুদায় লোকের সঙ্গ করিলে দুই কূল নষ্ট হয়।"

মহারাষ্ট্রীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া তাঁহাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। তিনি এই কথায় ভুলিবার নয়। প্রভুর কাছে আসিয়া সমুদায় কথা বলিলেন। বলিলেন, "প্রভু, এই গর্ব্বপূর্ণ সন্ন্যাসী বলে কি যে, তোমার ভাবকালি এই কাশীনগরে বিকাইবে না।"

প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভারি বোঝা লইয়া আসিয়াছি, যদি না বিকায় অল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিব, নতুবা একেবারে বিলাইয়া দিব।"

মহারাষ্ট্রীয়। প্রভু, আর এক তামাসা শুনুন। সে আপনাকে বেশ জানে; দেখিলাম, আপনার উপর ভারি রাগ। এমন কি, আপনার নামটা পর্য্যন্ত করিলে সহ্য হয় না। সে তিনবার আপনার নাম করিল, তিনবারই বলে 'চৈতন্য'; 'কৃষ্ণ-চৈতন্য' একবারও বলিল না।"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সে রাগের নিমিত্ত নয়। যাহারা কেবল 'আমি ঈশ্বর' 'আমি ঈশ্বর, ইহাই ধ্যান করে, তাহাদের মুখে সহজে কৃষ্ণ নাম আইসে না।" সে যাহা হউক, প্রভু পর দিন বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। তপন, মহারাষ্ট্রীয় ও চন্দ্রশেখর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রভু কাহাকেও লইলেন না।

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু প্রথমে যমুনা দর্শন করিলেন। এবার সত্য যমুনা, সেবারকার ন্যায় নয়। প্রভু জাহ্নবীকে যমুনা বোধ কবিয়া পূর্ব্বে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবার আর সে ভ্রম নয়। সত্য সত্যই যমুনা প্রভুর সম্মুখে,—যে যমুনাতীরে কৃষ্ণ বিচরণ করিয়াছেন, গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত কেলি করিয়াছেন। প্রভু ছুটিলেন, সম্মুখে যমুনা; প্রভু যমুনা দর্শনে অমনি ঝাঁপ দিলেন। বলভদ্র সঙ্গে দৌড়িয়া আসিয়াছেন। দেখিলেন, প্রভু ঝাঁপ দিলেন। শীতকাল, তিনি সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন না। কিন্তু প্রভু ঝাঁপ দিয়াছেন, আ'র উঠিবেন কেন? বলভদ্র ভয় পাইয়া পশ্চাৎ ঝম্ফ দিয়া প্রভুকে উঠাইলেন। প্রভু প্রয়াগে তিন দিন রহিলেন, কিন্তু যমুনা দর্শনে একেবারে প্রভুর অঙ্গ প্রেমে এলাইয়া পড়িল। প্রয়াগে কলরব উঠিল। লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতে আসিতেছে, আর প্রেমে পাগল হইয়া প্রভুর নিকট থাকিয়া যাইতেছে। প্রভু যে তিন দিন প্রয়াগে রহিলেন, সে তিন দিন কেবল হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছু শুনা যায় নাই। সেখান হইতে প্রভু দ্রুতপদে চলিলেন। ভিক্ষার নিমিত্ত যেখানে রহিতেছেন, সেইখানেই প্রভুর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভু দক্ষিণ দেশে যেরূপ লীলা করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু যথা চরিতামৃতে—

পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥

প্রভু আনন্দে যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন; আর যদিও শীতকাল, তবু একবার ঝাঁপ দিলে আর উঠেন না। সুতরাং প্রত্যেক বারে তাঁহাকে উঠাইতে হইতেছে। ক্রমে প্রভু সত্যই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর এক ক্ষোভ তিনি বৃন্দাবন দর্শন করেন নাই। এই ক্ষোভ জলন্ত অঙ্গাররূপে হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাই জনা জনার গলা ধরিয়া রোদন করিয়াছেন, "আমি কবে বৃন্দাবনে যাবো, কবে বৃন্দাবনের ধূলায় ভূষিত হই,

কবে কে আমাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবে।” প্রভু বৃন্দাবন নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠিতেন, বৃন্দাবন চিন্তা করিলে বিহ্বল হইতেন। শ্রীনবদ্বীপে যে দিবস প্রথমে ভক্তি হইতে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, সে দিবস ইহাই বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, “কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা বেহুলাবন, কাঁহা আমার ভাণ্ডীর বন, কাঁহা আমার মধুবন, কাঁহা যমুনা-পুলিন, কাঁহা গোবর্দ্ধন, কাঁহা শ্রীদাম সুদাম, কাঁহা নন্দ যশোদা, কাঁহা—” শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম আর মুখে আসিল না, অমনি ঘোর মূর্চ্ছায় ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। সে ছয় বৎসরের কথা। এই ছয় বৎসর, “কবে বৃন্দাবন যাইব” দিবানিশি এই যুক্তি করিয়াছেন। একবার চারি মাস বৃন্দাবনের পথে ভ্রমণ করিয়াছেন। আজ সত্যই সেই বৃন্দাবনে যাইতেছেন। এখন নিকটে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তরূপ কণ্টক কেহ নাই। জগদানন্দ, গদাধর, নিতাই, সরূপ, প্রভৃতি আপদ বালাই সঙ্গে থাকিলে তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এবার প্রভু একা, আপন মনে যাইতেছেন, সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কেবল বিহ্বল হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। যে বৃন্দাবনের নাম শ্রবণে প্রভু শিহরিয়া উঠিতেন উহা এখন সম্মুখে।

প্রভু শুনিলেন মথুরায় আসিয়াছেন, অমনি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। উঠিয়া ও হুঙ্কার করিয়া বিশ্রামঘাটে ঝম্পপ্রদান করিলেন। অবগাহনান্তে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর হুঙ্কারে দিক্ সকল কম্পিত হইতে লাগিল। অমনি লোক সংঘট্ট হইতে আরম্ভ করিল। লোক কৌতুক দেখিতে আগমন করিতেছে, আর প্রভুর দর্শনে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কোলাহল করিতেছে। এইরূপ মথুরায় আসিবা মাত্র মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা একেবারে অবাক হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যাঁহার দর্শনমাত্রে লোকে প্রেমে উন্মত্ত হয়, সে ত সামান্য জীব নয়! এ বস্তুটী কে? তবে কি আমাদের কৃষ্ণ আবার আসিলেন? কাহার মনে এরূপও উদয় হইল যে, ভক্তিতে নৃত্য, এরূপ ভজন কেবল মাধবেন্দ্র-পুরীর গণ ব্যতীত আর কেহ জানেন না। অন্য সকলে হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে এক জন নৃত্য করিতেছেন। প্রভু ঐরূপ নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দুই প্রহর গেল।

মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটী প্রভুকে ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া আসিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ, নাম—কৃষ্ণদাস। তাঁহার গৃহে আসিয়া প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তখন প্রেমে গদগদ হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ভক্তি কোথা পাইলে?" তাঁহার উত্তরে বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র অতি ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে সেই ভাল মানুষ ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া প্রভুর হাত ধরিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেন্দ্রের শিষ্য, অতএব তাঁহার পূজ্য। তখন কৃষ্ণদাস বুঝিলেন ও পরে শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্রের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণদাস জাতিতে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। সন্ন্যাসিগণ এরূপ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করেন না। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া, প্রভু তাঁহাকে রন্ধন করিতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাস অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি সনোড়িয়া, প্রভু যদি তাঁহার অন্ন গ্রহণ করেন, তবে লোকে তাঁহাকে নিন্দা করিবে। প্রভু এ কথা শুনিলেন না; বলিলেন, "ধর্ম্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহার নিমিত্ত এক মীমাংসা আছে। মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম। পুরী গোসাঞি তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব সেই আমার ধর্ম্ম।"

প্রভু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে চলিলেন। প্রভুর বৃন্দাবনদর্শন বর্ণনা করে ত্রিজগতে কাহারও সাধ্য নাই। কেবল "শ্রীবৃন্দাবন" এই নাম শ্রবণে প্রভুর যে রসের উদয় হয় তাহাতে জগত ভাসিয়া যায়, সেই প্রভু আপনি সেই শ্রীবৃন্দাবনের মাঝখানে। দূরদেশে থাকিয়া প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের একমাত্র রজ পাইলে তাহা লইয়া এক মাস অনন্দে যাপন করিতেন, এখন প্রভু বৃন্দাবন ভূমিতে। শ্রীবৃন্দাবন স্মরণমাত্র প্রভুকে আনন্দে উন্মত্ত করিত; এখন প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক পাতা প্রভুর চিত্তকে আনন্দ দিতেছে। প্রভু যমুনার নামে মূর্চ্ছিত হইতেন, অদ্য উহা সম্মুখে। প্রভু যমুনার জল পান করিতেছেন। কিন্তু পান করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। দারুণ শীতকাল, কিন্তু যমুনায় অবতরণ করিয়া আর উঠিতেছেন না প্রভু বৃক্ষ দেখিয়া উহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। আলিঙ্গন করিয়া অতি প্রিয়জন আলিঙ্গনে যে সুখ তাহাই অনুভব করিতেছেন; সুতরাং সে বৃক্ষ ছাড়িতেছেন না। কিন্তু প্রভু এইরূপ লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মাঝে। প্রভু

দুঃখ এই যে, তাঁহার মোটে দুই চক্ষু ও দুই কর্ণ, একটী দেহ ও একটী চিত্ত। প্রভু একটী ছিন্ন পত্র লইয়া ব্যথিত হইয়া উহাকে বুকে করিয়া রোদন করিতেছেন। যে নিষ্ঠুর সেই পত্রকে ছিন্ন করিয়াছে তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, আর সেই পত্রকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বারংবার চুম্বন করিতেছেন। প্রভুর অন্তরে এক একবার আনন্দের বান আসিতেছে, আর অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। প্রভুর এইরূপ মূর্চ্ছা ঘন ঘন হইতেছে। কখন কখন প্রভুর এরূপ ঘোর মূর্চ্ছা হইতেছে যে, সঙ্গিগণ ভীত হইয়া তাঁহার সন্তর্পণ করিতেছেন। প্রভু চলিয়াছেন নাচিয়া নাচিয়া। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, বৃন্দাবনের সহজ কথা সঙ্গীত ও সহজ চলন নৃত্য। শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীবৃন্দাদেবী যেন তখন জানিতে পারিলেন যে, বহু দিন পরে তাহার নাথ আসিয়াছেন। নতুবা সমস্ত বৃন্দাবন প্রফুল্লিত হইল কেন? লতা বৃক্ষ সজীব কেন? অকালে কেন বসন্তের উদয় হইল? যথা পদ :—

বৃন্দাবনে উপনীত, তরুলতা কুসুমিত,—ইত্যাদি।

প্রভুর মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি হইতেছে; বহিরঙ্গ লোকে দেখিতেছে যেন বায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া পুরাতন কুসুম শাখা হইতে আপনা আপনি মৃত্তিকাতলে পড়িতেছে। কিন্তু তাহা নয়, প্রভুর মস্তকে যে ফুল-বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে একটীও পুরাতন নয়। প্রভুর মস্তকে বাসী ফুল? তাহা কি হইতে পারে? প্রভুর মস্তকে আবার কুসুমমধু বর্ষিত হইতেছে, আর কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ মধুকর আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া গুন্ গুন্ করিতেছে। কথা কি, তিনি সকলের, আর সকলে তাঁহার। আ'জ্ না কা'ল না, চিরদিনের নিমিত্ত। তিনি সকলের প্রাণ, আর সকলে তাঁহার প্রাণ। এমত স্থলে যেরূপ প্রেমের তরঙ্গ সম্ভব তাহাই বৃন্দাবনে হইতে লাগিল। জড় ও জীব বহুবল্লভকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল।

বৃক্ষলতার যখন এরূপ দশা, তখন প্রাণিমাত্রের যে কিরূপ তাহা অনুভব করা যায়। মৃগপাল আইল, প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না। ময়ূর ময়ূরী প্রভুর অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া চলিল। শুক সারী উড়িয়া প্রভুর হস্তে ও মস্তকে বসিতে লাগিল, উড়িবে না তাহাদের ভয় নাই। ভৃঙ্গপাল তাঁহাকে ঘিরিয়া তাহাদের ভাষায় তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিল। প্রভু, মৃগের গলা ধরিয়া তাহাদের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। আর অমনি মৃগের নয়নে আনন্দধারার সৃষ্টি হইল। প্রভু শুক সারীর সহিত আলাপ

করিতে লাগিলেন। ময়ূর অগ্রে নৃত্য করিতেছে,—এমন সময় সম্মুখে দেখেন বহুতর গাভী রহিয়াছে।

অমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী, শ্যামলী, অমলী ও বিমলী প্রভৃতি সেখানে আবির্ভূতা হইলেন। প্রভু হুঙ্কার করিলেন, গো-পালও উচ্চপুচ্ছ করিয়া প্রভুর দিকে ছুটিয়া আইল। প্রভু বহুবল্লভ, সমস্ত গো-পাল প্রভুকে ঘেরিয়া নানা উপায়ে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্খ গো-রক্ষক এ সমুদায়ের কোন তথ্য জানে না। তাহারা গরু ফিরাইতে গেল, কিন্তু গো-পাল প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না। প্রভু চলিয়াছেন, সঙ্গে গো-পাল চলিল। প্রভু গো-পালের প্রতি চিরপরিচিতের ন্যায় স্নেহদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর তাহারাও প্রভুর প্রতি চিরপরিচিতের ন্যায় চাহিতে লাগিল। প্রভুর আনন্দধারা পড়িতেছে, গো-পাল গুলিরও সেইরূপ।

প্রভু এ বৃক্ষতল হইতে ও বৃক্ষতলে, এ বন হইতে ও বনে চলিয়াছেন। প্রভু কেবল নৃত্য করিতেছেন, অবসর নাই ক্লান্তিও নাই। আনন্দে সর্ব্বশরীর তরঙ্গায়মান হইতেছে। কখন রাধা-ভাব, কখন কৃষ্ণ-ভাব। মনানন্দে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ-বোল।" বৃন্দাবনে "হরি"বোল নাই। হরি বড় দূরের সামগ্রী। বৃন্দাবনের বুলি "কৃষ্ণ-বোল।" প্রভু কৃষ্ণ-বোল বলিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিতেছেন, আর যেন উহাতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জড়-দেহের প্রাণ—শোণিত, শ্রীবৃন্দাবনের প্রাণ—আনন্দ। শ্রীবৃন্দাবনের যিনি নাগর, তাঁহার নাম শুনিলে আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়। তাঁহার নাম শ্যামসুন্দর, কানাইয়ালাল, কৃষ্ণ, নটবর, কানু। তিনি কি করেন, না নিধু-বন, ভাণ্ডীরবন, মধুবন, তালবন, বেহুলাবন প্রভৃতিতে বিচরণ করেন। তিনি যমুনা-পুলিনে নিজ মনে বসিয়া বেণুগান করেন। বৃন্দাবনের সম্পত্তি —যমুনা-পুলিন, ধীর সমীর, গোচারণ, গোকুল, মালতীর মালা, ময়ূরপুচ্ছ। হে পাঠক মহাশয়, এই শ্রীবৃন্দাবন তোমাতে স্ফূর্ত্তি হউক, আমি বৃন্দাবন বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এই শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ং বৃন্দাবন-নাথ বিচরণ করিতেছেন। আর অধিক বলিবার ক্ষমতা নাই।

চণ্ডীদাস 'পিরীতি' এই তিনটি আখরের পূজা করিয়াছেন। কারণ এই প্রেম শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। আর তিনিই এই ধনের একমাত্র পূর্ণ অধিকারী। এবং অধিকারী হইতে সমর্থ ও উপযুক্ত। সেই তিনি আজ প্রেমে অভিভূত ও বিদগ্ধ, তাঁহার হৃদয় প্রেমে জর জর। এই প্রেমধনের ধনী

বলিয়া তিনি পরমানন্দময়, এই প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার এই বৃহৎ সৃষ্টি। তিনি চিরদিন প্রেমে মজিয়া আছেন। আচ্ছা, এই যে শ্রীভগবান, তিনি কি করেন? কেমন করিয়া তিনি তাঁহার চিরদিনের দিবানিশি যাপন করেন? তাঁহার কি বিরক্তি হয় না? এমন কি অবস্থা হয় না, যখন তাঁহার সময় কাটান দুরূহ ব্যাপার হয়?

ইহার উত্তর শ্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রস্রবণ। তাহার প্রমাণ এই যে, প্রেমের যে অল্প ছায়া জগতে দেখা যায়, উহা হইতে অজস্র পীযূষ ধারা বহিয়া থাকে। সুতরাং যাহা প্রেমের ছায়ামাত্র, তাহা হইতে যখন এত আনন্দ, তখন তাঁহার সেই অখণ্ড পূর্ণ ও বিমল প্রেম-প্রস্রবণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয়? এই জগতে প্রেম নাই, প্রেমের ছায়া আছে। সেই ছায়ায় কি কি আছে দেখুন। জননী, শিশুসন্তান লইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন। দেখিবে যে তাঁহার বিরক্তি নাই, তিনি কেবল সেই শিশু সন্তানটী লইয়া অনন্ত জীবন কাটাইতে প্রস্তুত। যখন কোন কার্য্য নাই, তখন শিশুটী কোলে করিয়া তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই সুখে তাঁহার কাল কাটিয়া যাইতেছে। স্ত্রী, পৃথিবীর সমুদয় ত্যাগ করিয়া, পতিকে লইয়া জগতের এক কোণে থাকিবেন, তাঁহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে না। বিবাহ হইবে এই কথা শুনিয়া বর কন্যা আনন্দে ডগমগ। গর্ভ হইয়াছে জানিয়া গর্ভধারিণী আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল আর প্রেমের একটী বস্তু পাইয়া জনক জননী আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রেমের অনন্ত মুখ; এক এক মুখে এক এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমের সহায় পূর্ব্ব-রাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠা, মান, মিলন, বিরহ। এই সমুদয় প্রেমের চিরসঙ্গী, ইহারা প্রেমের পুষ্টিসাধন করে, আর এ সমুদয় একটী আনন্দের অকুল সাগর। এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। যাহার যত প্রেমের বস্তু তাহার ততটী সুখের প্রস্রবণ, তাহার তত সুখ। সুতরাং শ্রীভগবান্ আনন্দময়।

এই যে প্রভু আনন্দে মগ্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিতেছেন, ইহার মধ্যেও তাঁহার প্রিয় যে জীবগণ তাহাদিগকে বিস্মৃত হয়েন নাই। মুসলমান রাজার অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারেখারে গিয়াছে, ভদ্রলোকের বাস উঠিয়াছে, বৃন্দাবন জঙ্গলময় হইয়াছে। যে মাসে প্রভু সন্ন্যাস করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে ভুগর্ভ ও লোকনাথকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা

বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিবেন। তাঁহারা আসিয়া শুনিলেন যে, প্রভু সন্ন্যাস করিয়া দক্ষিণে গিয়াছেন। প্রভুকে তল্লাস করিতে তাঁহারা সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রভুকে সমস্ত দক্ষিণ দেশ তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। এই অবকাশে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর দেখা হইল না। প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ভকে যে ভার দিয়াছিলেন, আপনি তাহাই করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বৃন্দাবন উদ্ধার।

প্রভু বনভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে গমন করিলেন। আর অমনি একটী অপরূপ বালক আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বালকটী পঞ্জাব দেশস্থ লাহোর নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার। বয়ঃক্রম যখন ৭ বৎসর, তখন কোন এক রজনীতে সে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে, একটী পরম সুন্দর গৌরবর্ণ যুবক তাহার প্রতি প্রেমচক্ষে চাহিয়া রোদন করিতে করিতে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নাম গৌরাঙ্গ, এবং তাঁহার সহিত তাহার অর্থাৎ বালকের বৃন্দাবনে দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়া উঠিল। তাঁহার পিতা মাতা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। বালক গৌরাঙ্গের নাম করিতে করিতে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিল। সুতরাং ধ্রুবের কাহিনী যে কল্পিত নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল। ধ্রুব, পদ্মপলাশলোচন বলিয়া ছুটিয়াছিল, এ ব্যক্তি গৌরাঙ্গ বলিয়া ছুটিল। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ অবতার। প্রভু আপনি প্রহ্লাদের লীলা করিয়াছেন। প্রভু তাঁহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিন্তু পাঠ দিতে পারেন না। কৃষ্ণনাম বিনা তাঁহার মুখে আর কিছু আইসে না। অবশ্য এখানে ষণ্ডামার্ক কেহ ছিলেন না, কিন্তু তাহার থাকিবার প্রয়োজন কি? ষণ্ডামার্কের অভাব কি? অভাব প্রহ্লাদের। প্রহ্লাদের কাহিনী সপ্রমাণ হইল, ধ্রুবের বাকি রহিল; তাই লাহোরে ধ্রুব সৃষ্টি করিলেন। বালক পূর্ব্ব-দক্ষিণে ছুটিল, আর শ্রীভগবান যেরূপ ধ্রুবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাকে করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া আসিলেন। সেখানে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট, সেই বালক বাস করিতে লাগিল।

বালক বলে, আমার গৌরাঙ্গ কোথায়? লোকে বলে, গৌরাঙ্গ কে? এ কৃষ্ণের স্থান, এ গৌরাঙ্গের স্থান নয়। লোকে ভাবে বালকটী অর্দ্ধক্ষি...

কিন্তু সে অতি ভাল মানুষ, আর তাহাকে অতিশয় সন্তপ্ত দেখিয়া, লোকে তাহাকে স্নেহ করে। এইরূপে তাহার বহু বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নাচিতে নাচিতে গোবর্দ্ধনে আসিলেন, তখন সেই যুবক (কারণ তখন সে যুবক হইয়াছে) দেখিবামাত্র প্রভুকে চিনিল। বুঝিল যে, এই তাহার প্রাণনাথ, ইঁহারই নিমিত্ত সে দেশান্তরী, ইঁহারই নিমিত্ত সে বৃক্ষতলবাসী, উদাসীন। ইনিই তাহাকে পাগল করিয়া দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা হইতে এত দূর লইয়া আসিয়াছেন। বালক ভাবিতেছে, আমি ত প্রাণনাথ পাইলাম, প্রাণনাথ কি আমাকে চিনিবেন? এইরূপ ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণযুবক প্রভুর পদতলে পড়িল।

যখন বিদেশিনীরূপে কৃষ্ণ, রাধার সমীপে উদয় হইলেন, এবং তাহার পরে যখন তাঁহার স্ত্রীবেশ ঘুচাইলে দেখা গেল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—

"এই ত আমার প্রাণনাথ হে।
আমি পেলাম, আমি পেলাম, আমি পেলাম হারাধনে হে।"

আবার যখন বহুবিরহে রাধা-কৃষ্ণ মিলন হইল, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—

"বহু দিন পরে, বঁধু এল ঘরে।"

উপরে যে দুইটী মিলনের পদ দিলাম, যুবক এই দুই ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

যুবক প্রণাম করিলে, প্রভু অমনি সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন, করিয়া মধুর হাসিয়া, তাহাকে চিরপরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। যুবক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভু যুবককে বলিলেন, "তোমার নাম কৃষ্ণদাস। তুমি যাও, পশ্চিম দেশ উদ্ধার কর।" যুবক প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহাতে প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি কাঙ্গাল, বিদ্যা বুদ্ধি হীন, আমি কিরূপে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিব।" প্রভু তাঁহার নিজের গলা হইতে গুঞ্জামালা খুলিয়া তাহার গলায় দিলেন। বলিলেন, "এই ধর মালা ধর, এখন শীঘ্র গমন কর।" ইহাতেই তিনি জীব-নিস্তারের শক্তি পাইলেন! কৃষ্ণদাস যেখানে গমন করেন, অমনি লোক আসিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইতে লাগিল। আবার তাহা অপেক্ষা

আশ্চর্য্য এই যে, তিনি প্রভুকে অল্পক্ষণ মাত্র দর্শন করিলেন, ইহাতেই ভক্তি-ধর্ম্ম কি, সমুদায় তাঁহার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হইল। প্রভুর গুঞ্জামালা পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম হইল "কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী।" তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গেলেন। সেখানে কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা ভক্তমালে :—

"বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার।
অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥
গৌরাঙ্গ ভজয়ে লোক তার উপদেশে।
প্রভুর দোহাই ফিরিল দেশে দেশে॥"

গুঞ্জমালী মালোবারে শ্রীগৌর-নিতাই মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বনোয়ারিচন্দ্রকে আনাইলেন। তাঁহাকে সেই গাদির মহান্ত করিয়া অন্য স্থানে চলিলেন। এইরূপে গুজরাটে যাইয়া আবার গৌর-নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গুঞ্জমালী প্রেমানন্দে গুজরাট মাতাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার যশ শুনিয়া সেখানে গৌড়ীয় শ্রীচক্রপাণি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। দুই জনে পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন করিলেন, এইরূপ সেখানে দুটী গাদি হইল। গুঞ্জমালীর গাদির নাম বড় গৌড়িয়া, ও চক্রপাণির গাদির নাম ছোট গৌড়িয়া হইল। যথা ভক্তমালে :—

"ছোট গৌড়িয়া আর বড় যে গৌড়িয়া।
অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া॥"

সেখান হইতে গুঞ্জমালী নিজ দেশে আসিয়া ওলম্বা বা ওলয়া নামক গ্রামে আর এক সেবা প্রকাশ করিলেন। সেখান হইতে সেই তরঙ্গ সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিল। যথা ভক্তমালে :—

"পঞ্জাবের পশ্চিমে সিন্ধু নাম দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিল প্রবেশ॥
হিন্দু যতেক ছিল বৈষ্ণব করিল।
মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হইল॥
গোসাঞিির সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
বৈষ্ণব আচার করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
যবনের আচার ত্যজিল সর্ব্বজন।
হরিনাম জপে মালা, তিলক ধারণ॥"

সে কালে ইহা হইয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। অন্যত্র দূরের কথা, এখন কি বাঙ্গালায়ও আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রভুর প্রতাপ একবার স্মরণ করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকার মধ্যে যাঁহাদের কথা উল্লেখ আছে, শ্রীগৌর-লীলায় সকলকেই দেখিতেছি। প্রহ্লাদ পাওয়া গেল, ধ্রুব পাওয়া গেল, কৃষ্ণ পাইলাম, বলরাম পাইলাম। এই বলরামের কথা একবার ভাবুন। শ্রীনিতাই ঠিক বলরামের মত। ঠাকুরের দাদা, চঞ্চল, প্রেমে মাতোয়ারা।

ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন জীবের চরম সৌভাগ্য। একজন অন্য জনকে নানা উপায়ে বাধ্য করে। কেহ উৎকোচ দেয়, দিয়া বাধ্য করে। যেমন কালীমার ভক্তগণ কালী মাতাকে ছাগ দান করে। কেহ খোসামোদ করিয়া বাধ্য করে। যেমন কোন ভক্ত শ্রীভগবানকে "তুমি দয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ভুলাইয়া শেষে বলেন, "অতএব আমাকে টাকা দাও, ঐশ্বর্য্য দাও" ইত্যাদি। কেহ জীবের উপকার করিয়া ভগবান্‌কে বাধ্য করে। যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণ্যকার্য্য করিয়া ভাবে যে ভগবানের উপকার করিলাম। আবার কেহ আনুগত্য দেখাইয়াও বাধ্য করে, যেমন প্রভুভক্ত দাস তাহার প্রভুকে, কিম্বা প্রজা রাজাকে বাধ্য করে। ইহাকে বলে ভক্তি। ব্রজলীলার রস আর কিছু নয়, শ্রীভগবানকে নিজজন বলিয়া ভজনা করা। কিন্তু সর্ব্ব জগতে শ্রীভগবান বরদাতা রাজা বলিয়া পূজিত হন। "তিনি আমার, আমি তাঁহার", জীবে ও ভগবানে এই সম্বন্ধ। সুতরাং তাঁহাকে আপন বলিয়া ভজনা করাই শ্রেয়, অন্য ভজন কেবল বিড়ম্বনা, আর তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা মাত্র। কুরুক্ষেত্র যজ্ঞের সভায় শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আছেন, এমন সময় যশোদা দূর হইতে "গোপাল" "গোপাল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন দুই ভাইয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। "কে ডাকে আমাকে?" শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নে বলরাম বলিতেছেন যে, "যে ডাক শুনিতেছি এ যে ব্রজের ডাক, অন্য স্থানের নয়; বোধ হয় জননী যশোদা আসিয়াছেন।" ব্রজের ডাক এখন বুঝিলেন কি? "হে দয়াময়!" মথুরার ডাক, আর "হে গোপাল" ব্রজের ডাক।

কৃষ্ণলীলা-স্থান এই ব্রজরস প্রস্ফুটিত করে। রাসস্থলী-দর্শনে হৃদয়ে রাসরসের উদয় হয়। কিন্তু রাসস্থলী কোথায়? রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড দর্শনে ব্রজলীলার স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু সে কুণ্ডদ্বয় কোথায় ছিল? সে সমুদায়

লুপ্ত হইয়াছিল, কোথা কি ছিল, কেহ তাহা অবগত ছিলেন না। প্রভু এই যে আনন্দে বিরচণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে আবার জীবের উপকারের নিমিত্ত তীর্থ উদ্ধার করিতেছেন। এইরূপ তিনি হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কোথা? কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। তখন আপনি যাইয়া এক ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাই এখন শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড হইয়াছেন!

প্রভু যেখানে যে দেশে গমন করেন, সেখানে এই কথা আপনা আপনি প্রচার হয় যে, কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনেও অবশ্য তাহাই হইল। সকলে বলিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন। যখন কৃষ্ণ আসিয়াছেন জনরব হইল, তখন ভব্য লোকে বুঝিল যে, এই যে কাঞ্চন-বর্ণের সন্ন্যাসী যুবক আসিয়াছেন, ইনিই সে কৃষ্ণ। কিন্তু ইতর লোকে কৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণ যে তাহাদের সম্মুখে তাহা তাহারা দেখিল না। বৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন বলিয়া জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটী কাহিনী শ্রবণ করুন।

জনরব উঠিল যে, কৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন আর তিনি প্রত্যহ রজনীতে যমুনায় কালীয় দমন করিয়া থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিতে লক্ষ লক্ষ লোক রজনী যোগে যমুনা তীরে দাঁড়াইয়া থাকে। কেহ কিছু কিছু দেখে, কেহ কিছু দেখিতে পায় না। শেষে প্রকাশ পাইল যে, জালিয়াগণ মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত আলো জ্বালিয়া নৌকায় বিচরণ করে। তাহাই দেখিয়া কোন মূর্খ লোকে উপরোক্ত জনবর তুলিয়াছে।

কিন্তু এরূপ দীপ জ্বালিয়া জালিকগণ চিরদিন মৎস্য ধরিতেছে, এরূপ জনরব পূর্ব্বে কখন হয় নাই কেন? কথা এই, শ্রীভগবান আসিয়াছেন তাহা লোকের মনে আপনি উদয় হইয়াছে। শ্রীভগবান ছন্নভাবে আছেন, সুতরাং সকলে খুজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ধরিতে পারিতেছেন না। ভক্ত জন প্রভুকে ধরিল, সাধারণে তল্লাস করিয়া আর কাহাকে না পাইয়া জালিকের কার্য্য কৃষ্ণের কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল।

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। দিবানিশি নৃত্য করিতেছেন, ও মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতেছেন। প্রভু কোথায় আছেন কোথায় যাইবেন, তাহা কেহ জানেন না। প্রত্যহ বহুলোক আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে, ইহার মধ্যে

প্রভু অবশ্য কিছু জানেন না। এ সমস্ত নিমন্ত্রণের কথা তাঁহাদের ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত নিমন্ত্রণের মধ্যে ভট্টাচার্য্য একটী গ্রহণ করেন। ইহাতে বহুলোক বঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যহ বহুলোকে, প্রভুকে নিমন্ত্রণ লইবার নিমিত্ত, ভট্টাচার্য্যকে অনুনয় বিনয় করেন। এদিকে দিবানিশি কোলাহল, কোথা হইতে যেন লক্ষ লক্ষ লোক, আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন ও হরিধ্বনি করিয়া দেশ তরঙ্গায়মান করিল। প্রভুর কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহ্বল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য সামান্য জীব। এই অবস্থা ক্রমে ভট্টাচার্য্যের অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার প্রভুকে লইয়া সর্ব্বদা তাঁহার ভয়। কখন কোথায় তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন তাহার ঠিকানা নাই, আর ঝাঁপ দিয়া উঠিবেন কি না তাহারও ঠিকানা নাই। এক দিন প্রভু এইরূপে যমুনায় ঝম্প দিয়া আর উঠিলেন না। তখন ভট্টাচার্য্য ও প্রভুর অন্যান্য ভক্তগণ হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাকে জলে তল্লাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু হঠাৎ পাইলেন না। অনেক তল্লাসের পরে তাঁহাকে পাইলেন, ও তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন। ভট্টাচাচার্য্য ভাবিলেন যে, প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা তিনি; মহামূল্য ধন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রভু দিব্যোন্মাদে দিবানিশি বিচরণ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে কোন ক্রমে বৃন্দাবনের বাহির করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই।

ইহাই সংকল্প করিয়া অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া একদিন করজোড়ে প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু ভট্টার্য্যের আকিঞ্চনে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি?" ভট্টাচার্য্য তখন কড়জোড়ে বলিলেন "মকর সংক্রান্তি সম্মুখে, এখন যদি গমন করেন তবে সময়ের মধ্যে আমরা প্রয়াগে উপস্থিত হইতে পারি। এখন প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।"

ঠাকুর বলিলেন, "তাহাই হউক। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, সুতরাং আমার এ দেহ এখন তোমার। তুমি যখন যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি সেই খানেই যাইব।" এই মধুর বাক্যে ভট্টাচার্য্যের নয়ন দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল। তখন পরদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিবেন ইহাই সাব্যস্ত হইল।

প্রিয়স্থান বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া প্রভু অত্যন্ত বিকল হইলেন। কিন্তু মায়া তাঁহার অধীন। মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা মাত্রে মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যেমন নৌকা দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে, কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইয়া দিবামাত্র উহা আবার, যেরূপ উত্তরমুখে চলে; সেইরূপ যেই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন, অমনি প্রভু তাঁহার চিত্তকে নীলাচলচন্দ্রের দিকে প্রয়োগ করিলেন। তখন নীলাচলচন্দ্র বলিয়া পূর্ব্ব দিকে ছুটিলেন। প্রভু যে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতেছেন, ভট্টাচার্য্য এ কথা গোপন রাখিলেন, যে হেতু উহার প্রচার হইলে লোকের সংঘট্টে তাঁহাদের যাওয়া হইবে না। তবে পথে সহায়তার নিমিত্ত কৃষ্ণদাসকে ও প্রভুর রাজপুত একটি ভক্তকে সঙ্গে লইলেন। সাকুল্যে তাঁহারা এই পাঁচ-জন,—যথা, প্রভু, ভট্টাচার্য্য ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণ ভৃত্য, কৃষ্ণদাস ও রাজ-পুত ভক্ত।

প্রভু আপন মনে চলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন এক দিন পথে, কোন গোপবালক বেণু বাজাইল। অমনি প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় সেইখানে পড়িলেন। এমন সময় কি কেহ বাঁশী বাজায়? কিন্তু এই যে বংশী ধ্বনি, সেও রাখালের ইচ্ছায় হয় নাই। প্রভু অপরূপ লীলা করিবেন বলিয়া সে এই বংশীধ্বনি করিয়াছিল।

প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া সন্তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় একজন পরম সুন্দর পাঠানযুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার পুত্র, নাম বিজলী খাঁ। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মগুরু আছেন। তিনি পরম গম্ভীর ও ধার্ম্মিক; আর কতক-গুলি সৈন্যও আছে, সকলেই অশ্বারোহী। প্রভুর রূপ তেজ দেখিয়া তাহারা অবশ্য কৌতূহলী হইয়া তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তরুণ যুবক মুসলমান রাজপুত্রের মনে সন্দেহ হইল যে, এই সন্ন্যাসীর নিকট ধন ছিল, আর এই সঙ্গিগণ উহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত উহাঁকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছে। ইহাই ভাবিয়া সে তখনি প্রভুর ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। অবশ্য তাঁহারা কতরূপ বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না। কথা এই, বালকের হস্তে ছুরিকা ও জীবের হস্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্ব্বদা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে।

পাঠান রাজপুত্রের যথেচ্ছাচার করিবার শক্তি আছে। পথিকগণ দুর্ব্বল, সুতরাং বল প্রয়োগের এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন?

জীব নাকি বড় দুর্ব্বল, তাই বল প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা তাহাদের বড় প্রবল।

ভক্তগণ কত বলিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর দাস, ও প্রভু প্রেমে অচেতন হইয়াছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা শুনিল না। সেখানেই তাঁহাদিগকে বধ করিবে ইহারই উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা হইতে পারে না যে, প্রভুর সেবা করিতে করিতে তাঁহার দাসগণ প্রাণ হারাইবেন। কাজেই প্রভু চেতন পাইলেন, চেতন পাইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া হরিধ্বনি ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর হুঙ্কারে তাহাদের মনে ভয়ের উদয় হইল। তখন তাহারা বুঝিল যে নৃত্যকারী বস্তটী মহাপুরুষ, আর ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। অতএব তাহারা ভয়ে ভয়ে ভক্তগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল, ইহাতে ভক্তের বন্ধন প্রভুর দেখিতে হইল না। তখন নানা উপায়ে প্রভুর শান্তি করিয়া ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বসাইলেন। এ পর্য্যন্ত প্রভু, পাঠান-গণকে লক্ষ্য করেন নাই।

পাঠানগণের অবশ্য ভক্তির উদয় হইয়াছে। প্রভু বসিলে তাহারা এরূপ আকৃষ্ট হইল যে, সকলে আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। পাঠান রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, "ইহারা কয়েক জন তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছিল। ইহারা চোর, তোমার ধন-লোভে তোমাকে প্রাণে মারিতে-ছিল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়, ইহারা আমার সঙ্গী; আমি কাঙ্গাল, আমার ধন নাই। আমার মূর্চ্ছার পীড়া আছে, আর ইহারা কৃপা করিয়া আমাকে সন্তর্পণ করিয়া থাকেন।"

বিজলী খান তখন অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার গুরু তখন ধর্ম্মের কথা তুলিলেন। প্রভু কৃপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন; তাহার পরে যাহা হইবার তাহাই হইল। রাজকুমার, তাঁহার গুরু, আর তাঁহাদের সৈন্যগণ সকলে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। স্থূল কথা এই, ভাগ্যবান পাঠান-গুলিকে কৃপা করিবেন বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে সেখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধর্ম্মগুরু তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বিহ্বল হইলেন, প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন রামদাস।

"তা সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বেড়ায় মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজলি খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব॥"

এরূপ শক্তি সম্পন্ন অবতার জগতে কে কোথা দেখিয়াছেন? এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা নিরপরাধ তৈর্থিক বধ করিতেছিল, এক ঘণ্টা পরে সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে! তাহারা কাহারা? ইহারা মুসলমান, হিন্দুধর্ম্মের পরম বিদ্বেষী!

প্রভু তাঁহার বৃন্দাবনের সঙ্গিগণকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, প্রয়াগ পর্য্যন্ত অবশ্য প্রভুর সহিত আসিবেন। প্রভুর সহিত তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে সকলে নির্ব্বিঘ্নে প্রয়াগে আসিলেন; সেখানে, প্রভুর যমুনার নিকট বিদায় লইতে হইবে। কাজেই হঠাৎ প্রয়াগ ত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রভু কিছু কাল সেখানে রহিয়া গেলেন। ইহাতে এই হইল যে, বৃন্দাবনে যেরূপ কলরব হইয়াছিল, প্রয়াগেও সেইরূপ হইল। কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিল, আসিয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য ও হরিধ্বনি করিতে লাগিল। প্রয়াগ লোকারণ্য হইল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন:—

"গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে॥"

প্রেমকে বন্যার সহিত তুলনা কেবল প্রভুর অবতারে হইয়াছিল। এমন সময় রূপ গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী দুই ভাই, গৌড়-রাজ্যেশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা দক্ষিণের ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা দেশে বাস করেন। স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রী ও মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের আর এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম অনুপম, তিনি বাড়ী থাকিতেন। বাড়ী রামকেলী গ্রাম, গৌড়ের নিকট, যাহা কানাইর নাট-শালা বলিয়া অভিহিত। মুসলমান রাজার কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাদের জাতি গিয়াছে, অর্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছেন। যখন মুসলমানগণ হিন্দুগণের

দেব-দেবী কি মন্দির ভগ্ন করেন, তখন তাহার মধ্যে তাঁহাদের থাকিতে হয়। না থাকিলে চাকুরি থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত টান হিন্দু-ধর্ম্মে, তবু ঐশ্বর্য্যলোভে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারেন না। করেন কি, না, এদিকে যদিও তাঁহারা সমাজে স্থগিত, তবু নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া সর্ব্বদা গোষ্ঠি করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও এরূপ লোকের সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তি করেন না। প্রথম কারণ তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, জলের ন্যায় অর্থ বিতরণ করেন; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, অথচ পরম জ্ঞানী। বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ, দিবানিশি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেলা, এমন কি, সেকালে রামকেলী গ্রাম একটী অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

এমন সময়ে প্রভুর প্রকাশ হইল। এই দবির খাস ও সাকর মল্লিক এক প্রকার বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, এই সমুদায় দেবতা মানেন। প্রভু অবতীর্ণ হইবামাত্র তাঁহাদের প্রভুতে অনেকটা বিশ্বাস হইল, আর তখন প্রভুকে গোপনে পত্র লিখিতে লাগিলেন। পত্রের তাৎপর্য্য এই, "প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছ, আমাদের ন্যায় পতিত আর পাইবে না, আমাদিগকে উদ্ধার কর।"

প্রভু এ সমুদায় পত্রের উত্তর দিলেন না, তবে করিলেন কি না, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে একেবারে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন! প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ইঁহারা সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত হইলেন। সনাতন, প্রভুকে বলিলেন যে, "বৃন্দাবনে যাইতে হইলে একা গমন করিলে ভাল হয়।" প্রভু বলিলেন, "রামকেলি গ্রামে আমার আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি।" তাহার পরে প্রভু আবার বলিলেন, "তোমরা গৃহে যাও, কৃষ্ণ অচিরাৎ তোমাদিগকে কৃপা করিবেন।" ইহা বলিয়া প্রভু বৃন্দাবনে না যাইয়া, সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ও তাহার পরে শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিয়া এই প্রয়াগে আসিয়াছেন।

এদিকে এই দুই ভাই, যদিও পূর্ব্বে প্রভুর কথা মাত্র শুনিয়া, তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, এখন প্রভুর দর্শনে তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শতগুণ বদ্ধমূল হইল। সুধু তাহা নয়, তাঁহাদের ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হইল। আর চাকুরী করিতে পারেন না, এমন কি, ঘরে থাকিতেও

পারেন না। তবে রাজার ভয়ে দুই ভাই একেবারে চাকুরী চাড়িতে সাহসী হইলেন না। রূপ কনিষ্ঠ, তিনি গৃহে আসিলেন, আসিয়া রহিয়া গেলেন, রাজ-সভায় গমন করেন না। সনাতন গৌড়ে রহিলেন, কিন্তু রাজকার্য্য আর করেন না, বাসায় বসিয়া থাকেন। রাজা সনাতনকে বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় আইসেন না। রাজা তাহার পরে চিকিৎসক পাঠাইলেন। তিনি যাইয়া বলিয়া দিলেন যে, সনাতনের পীড়া নহে। রাজা তখন স্বয়ং সনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। রাজা বলিলেন, "তোমাদের দুই ভাইকে লইয়া আমার সকল কার্য্য, এক ভাই দরবেশ হইল, তুমি কার্য্য করিবে না, আমার কার্য্য চলে কিরূপে?" সে দিন সনাতন একরূপ রাজাকে বুঝাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন। এমন সময় রাজা উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে চলিলেন, আর সনাতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তখন প্রভুর কৃপায় সনাতন বলিলেন যে, তিনি যাইবেন না। এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য সহজ জ্ঞান থাকিতে কেহ করে না, কারণ এরূপ কার্য্যের ফল তখনি প্রাণদণ্ড। কিন্তু সনাতনের তখন প্রাণের মমতা ছিল না, যেহেতু প্রভুর সহিত মিলনে তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ও অনুতাপ হইয়াছে। তখন সনাতনের আপনাকে করিয়া এরূপ ঘৃণা হইয়াছে যে, প্রাণবধ যে একটা দণ্ড, তাহা তাঁহার আর বোধ নাই। তখন তাঁহার হৃদয় কেবল অনুতাপানলে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, যেন মরিলেই বাঁচেন। যেরূপ শূলরোগী কি মহাব্যাধি-গ্রস্ত লোক ভাবে যে, "মরিলেই বাঁচি," সেইরূপ সনাতনের তখন অন্তরে শূল-রোগের ও মহাব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রভুর কৃপায় রাজা সনাতনকে বধ করিলেন না, তবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে নগর ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। সনাতন সেই ঘোর নরকসদৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন। একে কারাগার, তাহাতে আবার সে কালের, সুতরাং ঐশ্বর্য্যশালী সনাতনের অবস্থা মনে করুন।

রূপ পূর্ব্বেই গৌড় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আর কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত লোকে অনায়াসে পরকাল নষ্ট করে, এখন ইহারা কয়েক ভাই কিরূপে

ঐশ্বর্য্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রূপ ও সনাতনের সন্তান নাই, তবে কনিষ্ঠ অনুপমের একটী পুত্র আছেন, নাম শ্রীজীব। তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দিয়া গদিতে বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহা বিলাইয়া দিবেন মনস্থ করিবেন। ইঁহারা জানিতেন যে প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন। কবে যাইবেন তাহা জানিবার নিমিত্ত সেখানে দুই জন চর পাঠাইয়াছিলেন। প্রভু যেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিলেন, অমনি তাহারা আসিয়া বলিল যে, প্রভু বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়াছেন। তখন তাঁহারা দুই ভাই, রূপ ও অনুপম, কারাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তাঁহারা দুই ভাই প্রভুর উদ্দেশে বৃন্দাবন চলিলেন, তিনি অর্থাৎ সনাতন, যে গতিকে পারেন খালাস হইয়া পশ্চাৎ আসিতে থাকুন। তাঁহার খালাসের নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রা মুদিখানায় গচ্ছিত রহিল। এইরূপ পত্র লিখিয়া তাঁহারা দুই ভাই, রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনাভিমুখে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

তাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া ছেঁড়া কন্থা ও কৌপীন অবলম্বন করিয়া, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া, প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। মনে কেবল এক ভাব, প্রভুকে কিরূপে দর্শন করিবেন। শয়নে স্বপনে কেবল এই এক কথা ভাবেন। সুতরাং যাঁহারা কখনও কষ্ট পান নাই, তাঁহারা যে পথে পথে, অনিদ্রায়, অনাহারে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন দুঃখ হয় নাই। এত যে অতুল ঐশ্বর্য্য, উহা বিলাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গে কপর্দ্দক মাত্র নাই। যাহা আপনি আইসে, তাহাই ভোজন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। উদ্দেশ্য এক, লক্ষ এক, আশা এক—প্রভুর চরণ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের পাপ বৃহৎ, প্রভু ব্যতীত তাঁহাদের উপায় আর নাই। প্রভুকে ধ্যান করিতে করিতে পাগলের ন্যায় চলিয়াছেন। প্রয়াগ যাইয়া দেখিলেন কি হইতেছে, না লক্ষ লক্ষ লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রয়াগে প্রভুর যে কাণ্ড তাহা বর্ণনা করা জীবের অসাধ্য।

শ্রীরূপ ও অনুপম এই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন যে, প্রভু এখানে আছেন, নচেৎ এ বন্যা কেন? নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ধূম দেখিলে অগ্নি নির্দ্দেশ যায়। সেইরূপ যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলিয়া প্রেমে উন্মত্ত

হইয়া নাচিতেছে, অতএব নিশ্চয় প্রভু সেখানে আছেন। ইহাই ভাবিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, প্রকৃতই প্রভু সেখানে। মধ্যাহ্নের সময় প্রভু নিভৃতে উপবেশন করিলে, দুই ভাই অতি দীনভাবে, দশনে তৃণ ধরিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীনের ন্যায়, কাঁপিতে কাঁপিতে, কান্দিতে কান্দিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে, প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। বলিলেন, "হে দীন-দয়াময়, হে পতিতপাবন, তোমা ব্যতীত আমাদের ন্যায় পতিতকে আর কে আশ্রয় দিবে?"

প্রভু, রূপকে রজনীতে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ-নাথ তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তখন সহাস্যে বলিলেন, "উঠ রূপ! দৈন্য কেন কর? কৃষ্ণের কৃপা অপার। তিনি তোমাদিগকে বিষয় কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া বলদ্বারা দুই ভাইকে হৃদয়ে আনিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদের বৃত্তান্ত সমুদায় শুনিলেন। রূপ যখন বলিলেন যে, সনাতন বন্দী আছেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বলিলেন যে, "না, তিনি আর বন্দী নাই। তিনি আমার এখানে আসিতেছেন।" প্রভু রূপকে পাইয়া কিছুকাল প্রয়াগে বাস করিতে বাধ্য হইলেন, যে হেতু রূপের সহিত তাঁহার অনেক কার্য্য ছিল।

প্রভু ভুবনবন্ধু, যত প্রেম-পাগলামি করুন না কেন, জীবের প্রতি মমতা জীবের মঙ্গল কামনা, বরাবর তিনি হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন যাইবেন ছল করিয়া পদব্রজে নীলাচল হইতে গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে গিয়াছিলেন। কেন না, দুই ভাই রূপ সনাতনকে আপনার রূপ ও গুণ দেখাইয়া ভুলাইয়া কুলের (ঘরের) বহির করিবেন। কারণ তাঁহাদের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধার করে এমন আর কেহ তখন ছিলেন না। কার্য্য কি? না, বৃন্দাবনের কর্ত্তৃত্ব ভার, এবং পতিত জীবগণের উদ্ধার।

মনে ভাবুন, বৃন্দাবন কৃষ্ণ-লীলার স্থান। শ্রীপ্রভু জীবহৃদয়ে, সেই শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণকে চেতন করাইতেছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যে ধর্ম্ম, তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বৃন্দাবন। সেখানে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন সেনা-পতিগণের প্রয়োজন যে, তাঁহারা সেই স্থান বিপক্ষগণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। প্রভুর ভক্তের মধ্যে যাঁহারা বৃন্দাবন শাসন করিত

তাঁহাদের কার্য্য পশ্চিম দেশে প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার, ও জঙ্গলময় শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার। আর কার্য্য বলিতেছি। বৃন্দাবন ভারতের যত সাধু ও জ্ঞানীর বিচরণের স্থান। এই সেনাপতিগণকে এইরূপ হইতে হইবে যে, যে কোন সাধু কি জ্ঞানী সেখানে গমন করুন না কেন, তাঁহাদের সেই গৌর-ভক্তগণের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। এইরূপ দুরূহ কার্য্য করে কে? এ সমুদায় কার্য্য যিনি করিবেন, তাঁহাকে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই।

এই বৃন্দাবনবাসী প্রভু-ভক্তগণের আর এক প্রধান কার্য্য ছিল। প্রভুর শক্তিতে তখন দেশে প্রবল এক বৈষ্ণবদলের সৃষ্টি হইয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীবাস যে প্রার্থনা করেন, "আমাদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাউক," তাহা হইয়াছে। তাঁহাদের শাসনের নিমিত্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন। নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবতারের ধর্ম্ম। ইহা নূতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানিপণ্ডিতগণ, আর তাঁহারাই হিন্দুগণের নেতা। অতএব ভক্তি বলিয়া একটী নূতন শাস্ত্র করিতে হইবে। তাহার পরে নূতন সমাজ করিতে হইলে যেরূপ নিয়মাবলীর প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদায় করে কে? এমন শক্তি কাহার? করিলেই বা জগতে মানিবে কেন? তাই প্রভু স্বয়ং রূপ সনাতন, দুই ভাইকে আনিতে রামকেলিতে গিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের এক ভাই সম্মুখে, সুতরাং তাঁহাকে লইয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীরূপসনাতনকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে শিক্ষা দিয়া প্রভু তাঁহাদের দুই ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। সেখানে দুই ভাই যাইয়া যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন, তাহাতে আবার প্রতিপন্ন হইবে যে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু লোক চিনিতেন। "আবার" বলি কেন, না প্রভুর লীলা মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। কোথা কোন ভক্তি-আচার্য্য গোপন ভাবে বাস করিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিতেন, যেমন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। আবার কাহার নিকটে আপনি যাইতেন, যেমন রূপসনাতন।

এই প্রয়াগে দুইজন মহাজনের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের এক জন বল্লভভট্ট। এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তাঁহাদের নেতা। ইনি কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া ভাগ-

মতের টীকা করিয়াছেন। তিনি বাল-গোপাল উপাসক। বল্লভভট্টকে অদ্যাপি তাঁহার দলস্থগণ পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহার বাড়ী প্রয়াগের নিকট আড়ুলি বা আউলি গ্রামে। মহাপ্রভুর আগমনে প্রয়াগের নিকটস্থ দেশসমূহ তরঙ্গায়মান হইয়াছে, সুতরাং বল্লভভট্ট ভাবিলেন এই গৌড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিয়া আসি। তাই প্রয়াগে আসিলেন, আসিয়া শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবামাত্র ভক্তিতে গদ গদ হইলেন। তখন অনেক বিনতি করিয়া, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাড়ী লইয়া চলিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বেশ জানেন যে, ভট্টের মনে গর্ব্ব রহিয়াছে, আর তিনি মনে মনে প্রভুকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন। কিন্তু প্রভুর জীবের প্রতি স্নেহ ও প্রেম ব্যতীত, দ্বেষ কি হিংসা সম্ভব হয় না। প্রভু ভট্টের বাড়ী চলিলেন, আর ভট্ট তাঁহাকে নৌকায় করিয়া লইয়া চলিলেন।

ভট্টের বাড়ী যমুনার তীরে, সুতরাং যমুনা দিয়া নৌকা চলিল। বোধ হয় সেই লোভেই বা প্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনা দেখিয়া প্রভু হুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, সকলে ধরিয়া উঠাইলেন। তাহাতেই বা রক্ষা কি? কারণ প্রভুকে নৌকায় উঠাইলে তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন! তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। এই যে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন, তবু ভট্টের নিকট বলিয়া প্রভু অনেক ধৈর্য্য ধরিয়াছেন। কারণ ভট্ট বহিরঙ্গ লোক, বহিরঙ্গ সঙ্গে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় না। যথা চরিতামৃতে :—

"যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী যখন প্রভুকে প্রথমে দর্শন করেন, তখনই প্রভুতে বিশ্বাস হইয়াছে; কিন্তু একটু বাকি আছে। তখন ভাবিতেছেন, "কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণের চরণজ্যোতি ধ্যান করিবেন আশা করিয়া যোগিগণ সহস্র সহস্র বৎসর যাপন করেন, অথচ কৃতকার্য্য হয়েন না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণকুমার, যাহাকে বালক বলিলেও হয় তাঁহাকে দেখিতেছি কি না, তিনি প্রাণপণে শ্রীকৃষ্ণের হাতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না।" শ্রীমতী শাশুড়ী-ননদীর নিকট আছেন। এমন সময় বংশীধ্বনি হইল, রাধা ঠাকুরাণীর অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। মনে মনে বলিতেছেন, "বন্ধু, অসময় বাঁশী বাজাইয়া আমাকে লজ্জা কেন দাও?" আর

নানা চেষ্টা করিয়া শাশুড়ী ননদীর নিকট প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু "দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে নিবারণ"। প্রভু যত্ন করিয়া ধৈর্য্য ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবাধ্যপ্রেম কথা শুনে না।

প্রভুর সঙ্গে ভট্টের বাড়ী চলিয়াছেন—কৃষ্ণদাস প্রভৃতি, যাঁহারা বৃন্দাবন হইতে তাঁহার সহিত আসিয়াছেন, আর রূপ ও অনুপম। প্রভু আড়াইলি গ্রামে গমন করিলে, অনেকে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন, কিন্তু ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, আমি গোসাঞিকে আনিয়া অকার্য্য করিয়াছি। ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন আর উঠেন না। আমি প্রয়াগ হইতে উহাঁকে আনিয়াছি সেখানে রাখিয়া আসিব, তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয়, সেখান হইতে তাঁহাকে আনিও। ভট্ট নিমন্ত্রিতগণকে সেবা করাইয়া আবার নৌকায় করিয়া তাঁহাদিগকে প্রয়াগে রাখিয়া গেলেন। ভট্ট ইহার কিছুকাল পরে নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন, ও সেখানে গদাধরের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন, কিন্তু সে পরের কথা।

ভট্টের ওখানে প্রভুর নিকট রঘুপতি উপাধ্যায় আগমন করিলেন। ইনি ত্রিহুতের পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত। ইহার কৃত কবিতা পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত আছে। প্রভু প্রয়াগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রূপকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার লুকাইতে যাওয়া বিফল চেষ্টা, তথাপি দশাশ্বমেধ ঘাটে একটী নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিবার চেষ্টা করিলেন এবং এইরূপে দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। প্রভু রূপকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা শ্রীচরিতামৃতে আছে। প্রভু বারাণসী চলিলেন, রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর বলিলেন "তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না।" ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র কোমল হইলেন না। রূপ যেমন বলিলেন, "প্রভু, তোমার সঙ্গ ছাড়া হইলে আমি বাঁচিব না।" প্রভু অমনি সন্তুষ্ট না হইয়া বরং রুক্ষভাবে বলিলেন, "সে কি? বৃন্দাবনে যাও, আমার আজ্ঞা পালন কর, কাজ কর, জীবের মঙ্গল সাধন কর, আপনার সুখ-আশা বিসর্জ্জন দিয়া বৃন্দাবনে যাও। তাহার পরে ইচ্ছা হয় আমার সহিত নীলাচলে দেখা করিও।" ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ফেলিয়া চলিলেন, আর—

"মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ রহিল পড়িয়া॥"—চরিতামৃতে।

শ্রীরূপের কথা আর একটু বলি। রূপ ও অনুপম শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া দেখেন যে সেখানে সুবুদ্ধি রায়! প্রভুর কি ভঙ্গী! এই শ্রীরূপ গৌড়ীয় পাতসার মন্ত্রী। সুবুদ্ধি স্বয়ং গৌড়ের পাতসাহ। রূপ হোসেন সাহার চাকুরী করিতেন, আবার হোসেন সাহা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং সুবুদ্ধি রায়ের চাকুরী করিতেন। কারণ সুবুদ্ধি গৌড়ের রাজা ছিলেন। রূপ প্রভুর কৃপায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে, আর সুবুদ্ধি রায়ও প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনে। হোসেন, যখন গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন, তখন তিনি দিঘী খনন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে অপরাধ পাইয়া রাজা সুবুদ্ধি হোসেনকে চাবুক মারেন, আর তাহার দাগ হোসেনের অঙ্গে রহিয়া যায়।

কিছুকাল পরে এই হোসেন সুবুদ্ধিকে বিতাড়িত করিয়া আপনি রাজা হইলেন। কিন্তু সুবুদ্ধিকে, পূর্ব্ব-প্রতিপালক ভাবিয়া, বধ না করিয়া, বরং তাঁহাকে অতি আদরের সহিত রাখিলেন। দৈবাৎ হোসেনের স্ত্রী জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর গাত্রে যে চাবুকের দাগ ইহা সুবুদ্ধি রায় কর্ত্তৃক হইয়াছে। তখন সে তাহার স্বামীকে বাধ্য করিয়া, সুবুদ্ধির মুখের মধ্যে বল দ্বারা জল ঢালিয়া দেওয়াইয়াছিল।

এই জন্য সুবুদ্ধি রায়ের জাতি গেল। তিনি কিছু ইচ্ছা করিয়া এই জল পান করেন নাই। কিন্তু সমাজ তাহা শুনিলেন না, তাঁহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আনিতে বারাণসী নগরীতে গেলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, তাঁহার তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্য সুবুদ্ধি ইহাতে সম্মত হইলেন না। সেই সময় প্রভু বৃন্দাবন যাইতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সুবুদ্ধি, প্রভুর কথা শুনিয়া, তাঁহার নিকট যাইয়া আশ্রয় লইলেন ও তাঁহার নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণনাম সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" সুবুদ্ধি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন, রূপ যাইয়া তাঁহাকে পাইলেন। তাই প্রভুর কৃপায় গৌড়ের বাদসাহ ও মন্ত্রী উভয়ে এক সময়ে বৃন্দাবনে।

এদিকে প্রভু, প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া, বারাণসী আসিলেন। পথে দেখেন, চন্দ্রশেখর দাঁড়াইয়া তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন! চন্দ্রশেখর প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, প্রভু আসিতেছেন, তাই তিনি পথে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রভু তাঁহার পুরাতন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। তপন মিশ্রের বাড়ী ভিক্ষা করেন, চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাস করেন। ইহার দুই এক দিন পরেই একদিন সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "দ্বারে যে বৈষ্ণব বসিয়া আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর প্রভুর আজ্ঞানুসারে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভুকে যাইয়া বলিলেন, "কৈ, দ্বারে কোন বৈষ্ণব পাইলাম না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি দ্বারে কি কাহাকেও দেখিলে না?" তাহাতে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "দ্বারে একজন দরবেশকে দেখিলাম।" তখন প্রভু বলিলেন, "তাহাকেই লইয়া আইস।" এই দরবেশই—সনাতন।

ইনি কারাগারে, তাঁহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া কারা-রক্ষককে উৎকোচ দিয়া বাহির হইলেন। সে ব্যক্তি সপ্ত সহস্র মুদ্রা পাইয়া তাঁহাকে লইয়া রজনীতে গঙ্গা পার করিয়া দিল। সনাতন, ঈশান নামক ভৃত্যের সহিত, গঙ্গা পার হইলেন। পার হইয়াই বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন। সঙ্গে সম্বল মাত্র নাই, পরিধান একবস্ত্র। কিন্তু আহার কি আরামের ভাবনা আর তখন তাঁহার নাই। সনাতন কিরূপে প্রভুর নিকট যাইবেন ইহাই ভাবিয়া চলিতেছেন। দিবানিশি চলিয়া চলিয়া পাতড়া পর্ব্বতে আসিলেন। কোন ভূমিকের সাহায্যে সেই পর্ব্বত পার হইয়া আবার চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ঈশানের নিকট অষ্ট মোহর ছিল, তাহা সনাতন জানিতেন না। সেই স্থানে জানিতে পারিলেন। ভূমিক তাহার সপ্ত মোহর লইলেন, আর একটী মোহর লইয়া সনাতন ঈশানকে দিলেন, দিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। ঈশান বাড়ী ফিরিলেন, ফিরিয়া একজন মহাতেজস্বী প্রচারক হইলেন। ঈশানের বংশগণ, এখনও আছেন। প্রভুকে কেবল একবার দর্শন করিয়াছেন, সনাতনের এই শক্তি। আর সনাতনের সঙ্গে কেবল দুই দিবস ভ্রমণ করিয়াছেন, ঈশানের এই শক্তি। আর ইহাই এত তেজস্কর হইল যে, তাঁহার পশ্চাৎ শত শত শিষ্য গুরু বলিয়া তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

সনাতন দিবানিশি চলিতেছেন, এইরূপে হাজিপুরে আসিলেন। সেখানে সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম করিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ-নাম জপিতেছেন। এ জগতে কে কাহার তল্লাস লয়? এক শ্রীভগবান আমার, আর আমি তাঁহার। তিনি ছাড়া কে জানে যে সেখানে সনাতনের ভার জীব

বিরাজ করিতেছেন? সেই সময় সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, সেই হাজিপুরে, গৌড়ের বাদসাহের নিমিত্ত ঘোড়া কিনিতে বাস করিতেছিলেন। তিনি উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া, আরাম করিতেছিলেন। যে ব্যক্তি নাম জপিতেছিলেন, তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া সনাতনের স্বরের মত বোধ হইল। তখন শ্রীকান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া টুঙ্গি হইতে নামিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া, দেখেন সনাতনই বটে, তবে মুখে দাড়ি, ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধান, দেহ জীর্ণ শীর্ণ, আর বদনে উদাস ও বৈরাগ্য! ইহাতে শ্রীকান্ত একেবারে অবাক হইলেন! একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "একি, তুমি এখানে?" তিনি গৌড়ের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তখন সনাতন সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলিলেন। শ্রীকান্ত বলিলেন, "বাড়ী চল।" সনাতন বলিলেন, "আমার বাড়ী কোথা? আমার বাড়ী আমি যাইতেছি।" শ্রীকান্ত বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মুখে উপদেশ আসিল না। যেখানে ঘোর বৈরাগ্যের তরঙ্গ, সেখানে বিষয়-রূপ কুটা স্থান পাইবে কেন? শ্রীকান্তের কথা সনাতনের হৃদয়ে স্থান পাইল না, ভাসিয়া গেল। শ্রীকান্ত বুঝিলেন, সনাতন যাইবেন, ফিরিবেন না। শ্রীকান্ত অর্থ দিলেন, সনাতন লইলেন না। দারুণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একখানা শাল দিলেন, তাহাও তিনি লইলেন না। শ্রীকান্ত কান্দিতে লাগিলেন। পরে একখানা ভোট কম্বল দিলেন। নিতান্ত অনুরোধে ও শ্রীকান্তের দুঃখ হইবে ভাবিয়া সনাতন তাহা লইলেন, লইয়া আবার অনন্ত পথে চলিলেন। শ্রীকান্ত হা করিয়া সাশ্রুনয়নে দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

একটী গীতের কিয়দংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। সেটী শচীমাতার উক্তি, যথাঃ—

"তোমারা কেউ দেখেছ যেতে,
আমার সোণার বরণ গৌর-হরি অনেক সন্ন্যাসী সাথে। ধ্রু।
তাহার ছেঁড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢুলে পড়ে গায়ে যেন পাগলের প্রায়,
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে দণ্ড করোয়া হাতে।"

শচীমাতা ইহাই বলিয়া নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পরে নদীয়া নগরে, তাঁহার পুত্রকে তল্লাস করিতেছেন। এই গেল গানের ভাব। গৌড় হইতে বৃন্দাবন চারি মাসের পথ। গৌড় হইতে বৃন্দাবনে যাইবার নানাবিধ পথ। সনাতন কি প্রভুকে ইহাই বলিয়া তল্লাস করিতে করিতে যাইতেছিলেন?

যথা :—"তোমরা কি এই পথে একজন সন্ন্যাসী যাইতে দেখিয়াছ? তাঁহার কচি বয়স, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়? তিনি প্রেমে উন্মত্ত, তাই পাগলের মত ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পরিধান কৌপীন, ও গাত্রে ছেঁড়া কাঁথা, আর তাঁহার মুখে কেবল হরেকৃষ্ণ নাম?" সনাতন তাহার কিছুই করেন নাই। সনাতন একমনে গিয়াছিলেন। লোকের নিকট একবারও প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ সনাতন জানিতেন যে, সূর্য্য উদয় হইলে লোকে আপনি জানিতে পায়। প্রভু যেখানে আছেন সেখানে লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে, সেখানে লোকে তাঁহার কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলিবে না। কোথাও যদি বৃহৎ ঝড় হয়, তাহার নিদর্শন বহুদূর হইতে পাওয়া যায়। প্রভু যেখানে উদয় হইয়াছেন, সে দেশ আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সনাতন জানিতেন যে, প্রভুর অবস্থিতির বহুদূরে থাকিতে তিনি জানিতে পারিবেন যে, প্রভু অগ্রে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া নৃত্য করিতেছেন! প্রভু যে গ্রাম দিয়া গমন করেন সেখানে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার গমনের সাক্ষী থাকে। তিনি যে পথ দিয়া গিয়াছেন, তাহার দুধারে তাঁহার গমনের সাক্ষী রাখিয়া যান। প্রভু যে মুখে যাইতেছেন, যে দিকে তিনি আসিতেছেন, এই সংবাদ, তাঁহার বহু অগ্রে চলিয়া যায়।

সনাতন যেই মাত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সেই শুনিলেন যে প্রভু ঐ নগরে আছেন। তাঁহার কি বাড়ীর নম্বর তল্লাস করিতে হইল? তাহা নয়। কোথা আছেন, না চন্দ্রশেখরের বাড়ী। চন্দ্রশেখরের বাড়ী কোথা? যে দিকে লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে! সনাতন এই সংবাদে অতি আশ্বাসিত ও পুলকিত হইলেন, হইয়া আস্তে আস্তে চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দ্বারে বসিলেন। অভ্যন্তরে প্রভু, দ্বারে সনাতন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতেছেন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে, এই দুই এক মাস হাঁটিয়া আসিয়াছেন। সনাতন, প্রভুকে সম্মুখে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্বাসিত হয়েন নাই। কারণ তাঁহার হৃদয়ে যে অনুতাপ তাহাতে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই। ভাবিতেছেন, প্রভু কি তাঁহাকে কৃপা করিবেন, তিনি না ঘোর নারকী? এই যে সনাতন আপনাকে ঘোর নারকী ভাবিতেছেন, ইহা তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাঁহার যে হৃদয়ের অনুতাপ সে কাল্পনিক নয়, সে প্রকৃত; তাই প্রভুর নিকট যাইতে ভয় হইতেছে। অনুতাপ কাল্পনিক

হইলে সে অনুতাপে বিশেষ কোন লাভ নাই। শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা যায় না।

ওদিকে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানিয়াছেন যে সনাতন আসিয়াছেন; জানিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, দ্বারে যে বৈষ্ণব আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া আনো। চন্দ্রশেখর আজ্ঞা শুনিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই। তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় বসিয়া আছেন; মুখে দাড়ি, বেশ ঠিক দরবেশের ন্যায়। তাই প্রভুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল একজন দরবেশ আছেন। প্রভু বলিলেন, "তাহাকেই লইয়া আইস।"

চন্দ্রশেখর অবাক! যাহারা দরবেশ, তাহাদের উপর সাধারণতঃ লোকের কি বৈষ্ণবগণের বড় শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের যে সমুদায় ক্রিয়া আছে, তাহা অনুমোদনীয় নহে। প্রভুকে রাজরাজেশ্বরগণ চেষ্টা করিয়া দর্শন পায় না। আজি প্রভু এই দরবেশকে আপনি ডাকিতেছেন! দরবেশের উপর চন্দ্রশেখরের বড় ভক্তি হইয়াছে। বলিতেছেন, "কে গা আপনি, আপনাকে প্রভু ডাকিতেছেন।" প্রভু ডাকিতেছেন, ইহাতে সেই দরবেশ চন্দ্রশেখরের নিকট "আপনি" হইয়াছেন।

তখন হর্ষে, আশয়ে, চিন্তায়, ভয়ে, ভক্তিতে, সনাতনের অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইল। তিনি চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "প্রভু ডাকিতেছেন? সত্যই ডাকিতেছেন? আমাকে ডাকিতেছেন?" চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা মহাশয়, প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? আপনার ভুল হয়েছে, প্রভু আমাকে ডাকিবেন কেন? প্রভু আর কাহাকে ডাকিতেছেন।" চন্দ্রশেখর বলিলেন, "হাঁ আপনাকেই ডাকিতেছেন।" সনাতনের সন্দেহ গেল না। প্রভু তাঁহাকে চকিতের ন্যায় একবার মাত্র দেখিয়াছেন। লক্ষ ভুবনপাবন ভক্তে প্রভুর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন) অস্পৃশ্য পামর; প্রভুর তাঁহার কথা মনে থাকিবে কেন? থাকিলেই বা এমন নরাধমকে তিনি ডাকিবেন কেন? চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "ঠাকুর, আপনার ভুল হইয়াছে, আপনি ভিতরে গমন করুন, আবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে, প্রভু কাহাকে ডাকিতেছেন।" সনাতন এইরূপ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

এই সমুদায় প্রলাপ শুনিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন; "আপনাকেই ডাকিতেছেন, অতএব চলুন।"

তখন সনাতন (যথা ভক্তমালে)—

"দুই গোচ্ছা তৃণ করে এক গোচ্ছা দন্তে ধরে
পড়িলা গৌরাঙ্গ-রাঙ্গাপায়।
দুনয়নে শতধারা রাজদণ্ড-জন পারা
অপরাধী আপনা মানয়॥
"তোমার চরণ নাহি ভজি মোর গতি এহি
সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয় ভোগ কামাদি ষড়্‌বর্গ রোগ
তাহে ভ্রমি সুখ বুদ্ধি করি॥
নীচ সঙ্গে সদাস্থিতি নীচ ব্যাপারে মতি
নীচকর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এহেন দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়া শুনি কেনু কর্ম্ম
কেবল হইল উপহাস॥
শরণ লইনু প্রভু হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু
করুণা কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গাচরণে মতি ত্রৈলোক্যের সারগতি
এ অধম জনারে বিচার॥"
সনাতনের আর্ত্তনাদ শুনিয়া দৈন্য বিষাদ
ছল ছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন দিতে চায় সনাতন পাছে ধায়
কহে "মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শ যোগ্য প্রভু মুঞি ছার নহি কভু
ঘৃণাস্পদময় এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য সাধুর সভায় বর্জ্জ্য
মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ॥"
প্রভু কহে "সনাতন দৈন্য কর সম্বরণ
তোর দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয় ভাল মন্দ না গণয়
হইল যে তোমার সম্মুখ॥

কৃষ্ণ কৃপা তোমা পরি যতেক কহিতে নারি
উদ্ধারিলা বিষয় কূপ হতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ কৃষ্ণভক্তি মতি অহো
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে॥"

প্রভু কাশীতে রহিলেন, কারণ সনাতনকে শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রয়াগে রূপকে শিক্ষা দিয়াছেন, এখন সনাতনকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দুই ভাইকে বৃন্দাবনে রাখিয়া তাঁহাদের দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে প্রভুর দুইমাস লাগিয়াছিল, শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এ সমুদয় তত্ত্ব বিবরিত আছে।

প্রভু যখন বৃন্দাবন যাইতে যাইতে কাশী ত্যাগ করেন, তখন প্রকাশানন্দ বড় খুসি হইলেন। তখন তিনি যেখানে সেখানে যখন তখন বলিতে লাগিলেন "ঐ কৃষ্ণচৈতন্য মূর্খসন্ন্যাসী, আপনার ধর্ম্ম জানে না, বেদ বেদান্ত পাঠ ত্যাগ করিয়া নৃত্যগীত করে, ভাবকালী দ্বারা ইতর লোকদের ভুলায়। আবার সে ব্যক্তি মহা ঐন্দ্রজালিক, নানা রূপ আশ্চর্য্য দেখাইয়া বড় বড় লোককেও মুগ্ধ করে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নাকি তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এমন কি তাহাকে নাকি যে দেখে সেই কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু এ সমুদায় ভাবকালী কাশীনগরীতে চলিবে না।

যখনই প্রভুর প্রভাব শুনিতেন, তখনই প্রকাশানন্দ উল্লিখিত ভাবে প্রভুকে নিন্দা করিতেন। কাশী ত্যাগ করিয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে, প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি ঠিক তাহাই হইয়াছে। ভয়ে চৈতন্য আমাদের নিকটে আসে নাই, পলাইয়া গিয়াছে। দেখিও এ নগরে সে আর আসিবে না।" কিন্তু প্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, এবং নগরে আবার কোলাহল হইল, তখন প্রকাশানন্দের পূর্ব্বকার কথা রহিল না। তখন সে কথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য আবার আসিয়াছে? তা আসুক, দেখিও সে দূরে দূরে থাকিবে, আমাদের এদিকে কখনও আসিবে না। তবে দেখিও, তোমরা তাহার নিকট যাইও না। তাহার বড় শক্তি, সর্ব্বভৌমের ন্যায় প্রচণ্ড লোকক্কে ভুলায়, তোমাদের ভুলাইবে বিচিত্র কি? তাহার যে মত তাহা পালন করিলে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হয়।"

প্রকৃত কথা প্রকাশানন্দের যে বিশ্বাস, তাহাতে তিনি বৈষ্ণবগণের মতে এক প্রকার নাস্তিক। কাজেই প্রভুর ধর্ম্মে ও প্রকাশানন্দের ধর্ম্মে সম্প্রাতির সম্ভাবনা নাই। প্রকাশানন্দের নিকট এই নিন্দা শুনিয়া, যে প্রভুকে কখন দেখে নাই সে প্রভুর দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্তু যে একবার সে চাঁদমুখ দেখিয়াছে, সে আর তাহা শুনিবে কেন? যাহা হউক, প্রকাশানন্দ প্রভুর এই উপকার করিলেন যে, প্রভুকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্জ্জনে সনাতনকে শিক্ষা দিবার অবকাশ করাইয়া দিলেন। প্রকাশানন্দের উত্তেজনায় অনেকে প্রভুর নিকট যাইতে বিরত হইল, তাহাতে প্রভু একটু আরাম করিবার অবকাশ পাইলেন।

এদিকে প্রভুর ভক্তগণ মহাক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারা প্রভুকে প্রকৃতই প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসেন, তাঁহারা প্রভুর নিন্দা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের দুঃখ প্রভুর নিকট জানাইতে লাগিলেন। প্রভু শুনিতেন আর ঈষৎ হাস্য করিতেন, কিছু বলিতেন না। তখন ভক্তগণ এক পরামর্শ করিলেন। সেখানে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি বড় লোক। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহার চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ এক প্রকার কাশীর রাজা। তাঁহার প্রতি এই ব্রাহ্মণের বড় ভক্তি ছিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শ-. করা, ...নি। অপ-
প্রভুর চরণ আশ্রয় করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে প্র...দিতেছেন?”
তাই তাঁহাকে প্রভুর চরণে আনিবার নিমিত্ত তাঁ... “আমার সম্প্রদায় অতি হীন,
করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ...ভার মধ্যে আমার বসা কর্ত্তব্য
ভাবিলেন যে, প্রকাশানন্দ সরল-চিত্ত সাধু। প্রভু...সী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন।
তাঁহার কারণ প্রভুকে কখনও দেখেন নাই। এক...মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, পুরি
দেখেন তবে তাঁহার দুর্ম্মতি ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশান... প্রভুর দৈন্যে মুগ্ধ
আসিবেন না, প্রভুকেও তাঁহার নিকট যাইতে বলিতে পারেন ...সভার
ইহার উপায় কি? তখন তিনি প্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এক পরামর্শ সাব্যস্ত করিলেন। ভাবিলেন যে কাশীর সমুদায় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিবেন, করিয়া প্রভুকে মিনতি করিয়া সেখানে লইয়া যাইবেন। এই পরামর্শ সাব্যস্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দশসহস্র সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রকাণ্ড আয়োজন করিলেন। তাহার

পর সকল ভক্তগণ জুটিয়া প্রভুর নিকট গমন করিয়া নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন, “প্রভু, আমরা জানি যে সন্ন্যাসি-সমাজে আপনি গমন করেন না। কিন্তু আমার বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে।”

প্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাই এ সমুদায় ষড়্‌যন্ত্রের মর্ম্ম বুঝিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণ সকলে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশ্য। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন; করিয়া বলিলেন, “তোমাদের যাহা অভিরুচি।”

তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন!

প্রকাশানন্দ শুনিলেন যে, “চৈতন্য” নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, আর এ কথা এই দশসহস্র নিম...সন্ন্যাসী শুনিলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ সম্ভবতঃ একটু চিন্তিত হইলেন। এই “চৈতন্য”, যাহাকে তিনি প্রকাশ্যে বার বার নিন্দা করিয়াছেন, এখন অনায়াসে তাঁহার স্থানে,—তিনি যেখানে সর্ব্ববলে বলীয়ান, সেখানে—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিতেছে! ইহার মানে কি? সার্ব্বভৌমের ন্যায় তাঁহাকেও ভুলাইবে নাকি?

সন্ন্যাসিগণ সভায় বসিয়া প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা দেখিবেন, চলিবে না। কে ...গবান বলিয়া পূজা করে, সে সন্ন্যাসী না জানি কেমন।

যখনই প্রভুর প্রভাব শুনি প্রভৃতি চারিজন ভক্ত সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে নিন্দা করিতেন। কাশী আমি আমার “প্রবোধানন্দের জীবন-চরিত” প্রকাশানন্দ বলিলেন,

ভয়ে চৈতন্য আমাদের সভায় “ঐ চৈতন্য আসিতেছেন” বলিয়া একটী ধ্বনি এ নগরে সে আর মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন যে, সাড়ে এবং নগরে এমনি দীর্ঘ, কাঁচাকাঞ্চন বর্ণের একটি যুবা পুরুষ, অতি মন্থর কথা গতিতে, অবনত মুখে আগমন করিতেছেন। মুখের এরূপ কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট, ও কমল নয়ন। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া যেন সশঙ্ক ও সলজ্জ হইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার চারিজন ভক্ত। সন্ন্যাসিগণ বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছেন। প্রভু অগ্রে আসিয়া মুখ উঠাইয়া যোড়করে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। পরে বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের

যে স্থান ছিল, সেখানে পাদ প্রক্ষালন করিলেন; করিয়া—সেই খানেই বসিলেন!

সন্ন্যাসিগণ এ পর্য্যন্ত তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প, এমন কি বালক বলিলেও হয়। প্রভুর বয়ঃক্রম তথন একত্রিশ, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অল্প বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। মুখে ঔদ্ধত্যের চিহ্নও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় এরূপ সরল নিরীহ ভালমানুষ ত্রিজগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল, যেন অন্তরে দুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে।

প্রভুর মুখ দেখিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শক্রতা মূহূর্ত্তমধ্যে বিলুপ্ত প্রায় হইল। বরং সেই মুখ যেন তাঁহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ সদাশয়, মহাজন। তাঁহার সভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়া অপবিত্র স্থানে বসিলেন, ইহা সামান্যত তিনি করিতে দিতেন না। তাহার পরে প্রভুর উপর যত রাগ থাকুক, তিনি যে একজন প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা তিনি তখন বেশ বুঝিয়াছেন।

আবার প্রভুর বদনদর্শনে ও তাঁহার দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সঙ্গে সেই সহস্রাধিক সন্ন্যাসী সকলেই দাঁড়াইলেন। তখন প্রকাশানন্দ প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! সভার মধ্যে আগমন করুন। অপবিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন?"

ইহাতে প্রভু করযোড় করিয়া বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি হীন, আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ। আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্ত্তব্য নয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, পুরি প্রভৃতি উচ্চ, এবং ভারতী নীচ। এ কথা শুনিয়া ও প্রভুর দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া, সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একেবারে সভার মধ্যস্থানে লইয়া বসাইলেন।

মহানুভব সরস্বতীর তখন শক্রতা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসল্য স্নেহের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও সুন্দর মুখ, দীনভাব ও চরিত্র দেখিয়া সরস্বতী বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর প্রতি ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইহাতে মনে একটু

অনুতাপের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি শুনিয়াছি আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এবং আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য। কিন্তু আমাদের মনে একটি দুঃখ আছে। আপনি এই স্থানে থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন?"

প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় অবনত মুখে রহিলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সমুদায় মনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের সাম্প্রদায়ক সন্ন্যাসী হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হয়েন না কেন? শুনিতে পাই সন্ন্যাসীর যে প্রধান ধর্ম্ম বেদ পাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় কার্য্য, নৃত্য গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে আপনি নিমগ্ন থাকেন। আপনি সুবোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি এ সমস্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।"

সরস্বতীর প্রকৃতই তখন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছিল। আবার, প্রভুর নিকটে বসিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, এ ব্যক্তি নিতান্ত তাহা নয়। এই জন্য, আপনি যে পূর্ব্বে প্রভুকে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, ও কতক কৌতূহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত, আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয় বিরক্তির সহিত, উপরোক্ত কথা গুলি জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভু কি উত্তর করেন ইহা শুনিবার নিমিত্ত সভাস্থ লোকে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কথা এই, প্রভুকে দেখিয়া সরস্বতী ও তাঁহার সহস্রাধিক শিষ্যের মন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটি হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা, ছলনা করিয়া মনুষ্য সমাজে বেড়াইতেছেন।

যেরূপ সরস্বতী বাৎসল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ গুরু-বুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন

করিতেছি। আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিনি দেখিলেন যে, আমি মূর্খ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্খ, তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি দুঃখিত হইও না। তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি।' ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন, 'বাপু এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠস্থ কর :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর গলার স্বর সঙ্গীত হইতে মধুর। তিনি যখন মলিন মুখে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে লাগিলেন, তখন সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

প্রভু যে শুদ্ধ এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্যাও করিলেন। ব্যাখ্যা অদ্ভুত। এ ক্ষুদ্র শ্লোকের মধ্যে এত অর্থ আছে জগতে পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,—

"গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন, এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি নাই; অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ-নাম জপ কর, তোমার আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না; ইহাতে তোমার কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতির যে দুর্লভ ধন কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও লভ্য হইবে।"

সন্ন্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রভুর কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভুর নিকট হরের্নাম শ্লোকের ব্যাখা শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালক সন্ন্যাসী একজন প্রবল পণ্ডিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেবের এই আজ্ঞা পাইয়া মন দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। কিন্তু নাম জপিতে জপিতে আমার মন ভ্রান্ত হইল। ক্রমে আমার সব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি শেষে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য, কখন গান করিতে লাগিলাম, তনু ও মন এলাইয়া গেল ও এক প্রকার পাগল হইলাম। তখন আমি ভীত হইয়া আপনার অবস্থার কথা বিচার করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমার এ কি দশা হইল? এ ত উন্মত্ত জনের অবস্থা। তবে কি আমি সত্যই পাগল হইলাম? এই সমস্ত ভাবিয়া ব্যস্ত ও ভীত হইয়া আবার গুরুর শরণাপন্ন হইলাম; এবং তাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম যে, 'প্রভু, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, ইহার এ কি প্রকার শক্তি?

আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি কৃষ্ণনাম জপিতেছিলাম, জপিতে জপিতে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া গেল, এখন আমি হাসি কাঁদি নাচি গাই, এমন কি, আমি নাম জপিয়া এক প্রকার পাগল হইয়াছি। এখন আমি এ দায় হইতে কি করিয়া উদ্ধার হই, আপনি তাহার বিহিত আজ্ঞা করিয়া দিউন।'

আমার গুরুদেব এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, 'তোমার এ বিপদ নয়, এ তোমার সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণনামের শক্তিই ঐরূপ। উহাতে ঐরূপ হৃদয় চঞ্চল করে, শ্রীকৃষ্ণের চরণে রতি উৎপাদন করে। জীবের যে পরম পুরুষার্থ, যাহা হইতে জীবের আর সৌভাগ্য হইতে পারে না, তাহাই, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম, তুমি পাইয়াছ।'

গুরু ইহাই বলিয়া আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনাইলেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগোদ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

"এই প্রকারে যিনি অনুরাগ-বিগলিত চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণনাম লইয়া হাস্য, রোদন, হুংকার, গীত ও নৃত্য করেন, তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন।"

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

"যে কেহ হউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর সকল নিগমের সুফল-স্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণনাম একবার হেলায় অথবা শ্রদ্ধায় গান করে, তাহা হইলে, হে ভৃগুবর, সেই কৃষ্ণের নাম তাহাকে উদ্ধার করেন।"

তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তোমহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনোঽকৃচ্ছ্রং চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং॥

"যে কৃতি ব্যক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণকথামৃত সাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছ্রলভ্য চতুর্ব্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন।"

তদনন্তর গুরুদেব বলিলেন, 'তুমি কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কৃতার্থ হইলাম।' গুরুর এই আজ্ঞা শুনিয়া আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাঁহার আজ্ঞা দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিয়া থাকি। ইহাতে আমি যে ক্রন্দন ও হাস্য প্রভৃতি করি তাহাতে আমার

হাত নাই। ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি, ইচ্ছা করিয়া করি না।”

শ্রীগৌরাঙ্গ দৈন্যের সহিত যখন কথা কহিতে লাগিলেন, তখন যেন মধু বরিষণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত কোমল হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে প্রকাশানন্দের কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাঁহার তিনটি প্রশ্ন। প্রথমে বেদান্ত পড় না কেন? দ্বিতীয় নৃত্য গীত কর কেন? তৃতীয় আমাদের, অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণের, সহিত ইষ্ট গোষ্ঠি কর না কেন? প্রভু ইহার উত্তরে বলিলেন, বেদান্ত না পড়িলে চলে, হরিনামই যথেষ্ট। আবার বলিলেন, বেদান্ত পড়িলে কোন ফল নাই। কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই, নাই, নাই। নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, আমি যে নৃত্য গীত করি, সে ইচ্ছায় করি না। নামের শক্তিতে প্রেমোদয় হয়, প্রেমোদয় হইলে নৃত্য গীত আপনি আইসে। তিনি যে সন্ন্যাসিগণের সহিত কেন মিলিতে যান না, তাহার বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না।

প্রকাশানন্দের চিত্ত তখন প্রভুকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তখনও তাঁহার অভিমান আছে। তখনও তিনি ভাবিতেছেন যে, এ একটী সুন্দর বস্তু, ইহার কথা অতি মিষ্ট, এ যুবক সুবোধ, তবে একটু চঞ্চল। যদি আমার কাছে কিছুকাল থাকে, তবে এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী হইবে। ইহার কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে, ইহা বড় মঙ্গল; কিন্তু ইহার বেদান্তের প্রতি ভক্তি নাই, সে বড় দোষের কথা।

প্রভু চুপ করিলে, প্রকাশানন্দ একটু চিন্তা করিয়া পরে বলিতেছেন, “এ অতি উত্তম কথা। ইহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণ-নাম লও, ইহাতে সকলের সন্তোষ। কৃষ্ণপ্রেম হওয়া বড় ভাগ্যের কথা তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদান্ত পড় না কেন? বেদান্তের উপর তোমার অশ্রদ্ধা কেন?”

প্রভু বলিলেন, “শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর না দিই, তবে আমার অপরাধ হইবে। উত্তর দিলেও যদি আপনা-দের তুষ্টিকর না হয়, তাহা হইলে আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলেও আমার অপকার হইবে। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ না লয়েন, তবে আমি সরল ভাবে বলিতেছি যে, আমি কেন বেদান্ত পাঠ করি না।”

ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি কি বলিতেছেন? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব ইহা কি হইতে পারে? আপনার মুখে মধু ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাধুরীপূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। আপনি অন্যায় বলিবেন ইহা কখনও সম্ভাবনা হইতে পারে না, আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করুন।"

প্রভু বলিলেন, "বেদান্ত ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ সম্ভবে না। এই বেদান্তের সূত্রে যে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব। শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা শঙ্করের বাক্য, ঈশ্বর বাক্য নহে। সূত্রের প্রকৃত অর্থ কি তাহা পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে। সে সূত্র থাকিতে ভাষ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ব্যাখ্যার তখনি প্রয়োজন, যখন সূত্র বুঝিতে কষ্টকর হয়। আমরা দেখিতেছি সূত্রের অর্থ সরল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বুঝা কষ্ট। আপনারা দেখিবেন যে, সূত্রের অর্থ একরূপ, এবং শঙ্করাচার্য্য কোন উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত তাহার অর্থ আর একরূপ করিয়াছেন। স্থূল কথা, সূত্র অতি সরল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যেরূপ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনঃকল্পিত, সূত্রের অর্থের সহিত উহা মিলে না।"

সন্ন্যাসীরা ইহাতে একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা জগদ্‌গুরু বলিয়া মান্য করেন। তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করাতে তাঁহারা উহা প্রমাণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে? শঙ্করাচার্য্য জগতের নমস্য, তাঁহাকে সকলেই গুরু বলিয়া মান্য করিয়া থাকে, আপনি যে তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড় সাহসিকতার কথা।"

প্রভু বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্য জগতের গুরু সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বর সকল অপেক্ষা বড়, বেদ তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা। এ সূত্রের যে সরল অর্থ তাহা ঈশ্বরের বাক্য। শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন উহা সরল নহে। আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেখাইতেছি যে, শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য নিজ মতস্থাপন, ও তাঁহার ভাষ্য মনঃকল্পিত।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আর সন্ন্যাসিগণ স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের কথা তাঁহার মুখে বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন, ও তাঁহাদের কাহারও কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রবণ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে সেই বিচারের সার সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীরা শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন, তাঁহাদের গুরু যেরূপ বুঝাইতেন তাঁহারা সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলের যেন চক্ষু ফুটিল। তখন পরস্পরে এই ভাবে মুখ চাওয়া-চাই করিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ-চৈতন্য সুধু পরম সুন্দর ও পরম ভক্ত নন, পরম পণ্ডিতও বটেন। প্রকাশানন্দের অভিমান ছিল যে, জগতে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার যত অনর্থের মূল এই পাণ্ডিত্য অভিমান। এখন শ্রীগৌরাঙ্গসেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, সোহহং ধর্ম্ম মানেন। তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী, সুতরাং ভক্তির বিরোধী। তাঁহার মতে, আমি যেই, ঈশ্বরও সেই। ভক্তি আর কাহাকে করিব? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বেদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যাইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্য আপন মত চালাইবার জন্য সূত্রের মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মত চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেখাইতে হইয়াছে যে, সূত্র তাঁহার মতের পোষণ করিতেছেন। তাই তিনি আপনার মনের মত সূত্রের অর্থ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে, সূত্রের প্রকৃত অর্থ কি তাহা আপনারা চেষ্টা করিয়া না বুঝিয়া, শঙ্কর যেরূপ বুঝাইয়া আসিয়াছেন সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছেন।

প্রভু এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরল, তাহার টীকার আবশ্যক করে না। সেই সরল অর্থের সহিত শঙ্করের মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি যেরূপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ আপনি ন্যায্য কথাই বলিতেছেন। আপনি পরম পণ্ডিত তাহাও জানিলাম। শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিলেন, এ আপনার অসীম

শক্তির পরিচয়। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। সূত্রের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সূত্রের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটি একটি সূত্র বলিতে লাগিলেন, আর অর্থ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে অর্থ করিলেন যে, ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরম পুরুষার্থ।

অগ্রে প্রভু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দুষিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার বদনে সূত্রের অর্থ শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শুদ্ধ ভাবুক সন্ন্যাসী নহেন, বয়ঃক্রমে যদিচ বালক, কিন্তু ক্ষমতায় শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বড়।

প্রকাশানন্দের তখন এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম হইল। প্রথমে প্রভুর উপর সম্পূর্ণ ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘৃণা ছিল। ঘৃণা ইহা বলিয়া—যে তিনি মূর্খ ও বঞ্চক। ক্রোধ ইহা বলিয়া—যে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র গোপাল ভট্টকে কুপথে লইয়াছেন। দ্বেষ ইহা বলিয়া—যে কৃষ্ণচৈতন্য জগতে অনেকের নিকট তাঁহা অপেক্ষা পূজিত। এখন দেখিলেন, কৃষ্ণচৈতন্য পরম ভক্ত, পরম পণ্ডিত, সর্ব্বপ্রকারে পরম সুন্দর। দেখিলেন, তাঁহার প্রকৃতি মধুর। আর দেখিলেন যে, ভক্তি বলিয়া যে দ্রব্য উহা অতি সুস্বাদু, আর এই মহাতত্ত্ব সেই বালক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি শিখিলেন। এই সমস্ত কারণে প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তখন মনে হইল যে তিনি এই সুন্দর প্রকাণ্ড বস্তুটীকে অন্যায় করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ, মহাশয় ব্যক্তি। তিনি তখন অতি কাতর হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি জানেন, আপনাকে আমি বরাবর নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, আমি দম্ভে উন্মত্ত ছিলাম ও আপনাকে জানিতাম না। এখন আপনাকে জানিলাম; দেখিলাম আপনি স্বয়ং বেদ ও নারায়ণ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম। ভক্তি যে পদার্থ, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতাম না, পরন্তু ঘৃণা করিতাম, অদ্য আপনার শ্রীমুখে উহা যে কি তাহা বুঝিলাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অদ্য বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণই সত্য, সর্ব্ব জীবের প্রাণ; তাঁহার চরণসেবাই জীবের চরম ধর্ম্ম। আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

তখন সন্ন্যাসিগণ ভক্তিতে গদ গদ হইয়াছেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দের নিকট ভক্তিসম্বন্ধে উপরি উক্ত সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ মাত্র সকলে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

পাঠকগণ, প্রভু হরের্নাম শ্লোকের কিরূপ অর্থ করিলেন একবার অনুভব করুন। শ্লোকের অর্থ এই। এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই। হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিনাম ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, তপস্যা, পূজা, অর্চ্চনা, ইহার কিছুতেই গতি হইবে না, কেবল হরিনামে হইবে। অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন নাই, দেবদেবী পূজা পর্য্যন্ত বিফল।

সন্ন্যাসিগণ পরে ভোজনে বসিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর করিয়া বসাইলেন। ভিক্ষা অন্তে প্রভু বাসায় চলিয়া আসিলেন। তখন সন্ন্যাসীদের মধ্যে, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা বলিতে লাগিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে অমৃত বৃষ্টি হইল। এতদিন পরে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া সংসার জয় করা যায় না। সংসার জিনিবার একমাত্র উপায় হরিনাম। অতএব এত দিন যে পণ্ডশ্রম করা গিয়াছে, আর তাহাতে প্রয়োজন নাই, এখন ভাই সকলে হরি হরি বল। শঙ্করাচার্য্যই হউন, আর যিনিই হউন, কাহারও উপরোধে পরকাল নষ্ট করা যায় না।

তখন প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা অদ্বৈত মত স্থাপন করা, এই সংকল্প করিয়া তিনি তাঁহার মনের মত সূত্রের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ যখন পড়িতাম, তখন মুখে হয় হয় বলিতাম, মনে প্রতীত হইত না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সরল অর্থ করিলেন, অমনি সেই অর্থ হৃদয়ে প্রতীত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ দিয়া সার তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি, আর আমার জানিবার কিছু নাই।"

প্রকাশানন্দের সভায় এইরূপ গোল হওয়াতে সমস্ত কাশী নগরীতে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। তখন নানা দেশীয় পণ্ডিত আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। বারাণসী পরিত্যাগ করিবার পাঁচ দিন থাকিতে প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিতে ও ভিক্ষা করিতে সম্মত হয়েন।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ, কাশীর অন্যান্য সাধু ও পণ্ডিতগণ, সকলে প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। প্রকাশানন্দ, গৌড়ীয় নবীন সন্ন্যাসীর মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সে দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তখন প্রভুর বিশ্রামের মুহূর্ত্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রভুর কাছে আসিয়া কেহবা দর্শনে, কেহবা স্পর্শনে, কেহবা বচনে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর কাছে বিদায় লইলেন। সমস্ত বারাণসী নগরে কৃষ্ণ-নামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, ও লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, প্রকাশানন্দের বজ্রের ন্যায় দৃঢ় মন নম্রীভূত হইল। যদি বয়োজ্যেষ্ঠা কোন নারী প্রেমে আবদ্ধ হয়েন, তবে তিনি একেবারে পাগলিনী হইয়া থাকেন। যিনি শিক্ষা দ্বারা হৃদয় কঠিন করিয়াছেন, তাঁহার যদি কোন কারণে উহা দ্রবীভূত হয়, তবে তাঁহার প্রস্তরবৎ হৃদয় হইতে হুহু করিয়া জল উঠিতে থাকে। প্রকাশানন্দ স্বভাবতঃ সহৃদয় লোক। তিনি স্বভাবতঃ রাধার গণ, অর্থাৎ—প্রেম উৎকর্ষই তাঁহার প্রকৃতি অনুমোদনীয়। দৈব বশতঃ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন; যেমন লোকে বাঁধ দ্বারা নদীর স্রোত বন্ধ করে, তিনি সেই রূপে তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে তাঁহার সেই বাঁধ অল্প ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তাঁহার হৃদয়, যাহা তিনি শুখাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা আর্দ্র হইল। তখন শ্রীভগবানের সৌরভ তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ায় তিনি অভিনব এক অতি সুস্বাদু আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন। তিনি শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবৎসল ভগবানকে ভক্তি করা সুধু বেদের উপদেশ নয়, মনুষ্যের পরম পুরুষার্থও বটে।

কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় হইল, চিন্তাটি তিনি তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটী এই—

সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযূষসিন্ধোঃ
কোটিং বর্ষেৎ কিমপিকরুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্চলেন।
কোঽয়ং দেবঃ কনককদলীগর্ভগৌরাঙ্গ যষ্টি
শ্চেতঃ কস্মান্মম নিজপদে গাঢ়যুক্তশ্চকার॥

অন্বয়ার্থ।—যাঁহার অঙ্গযষ্টি কনককদলীর গর্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ, এবং

যিনি করুণরস-সিক্ত অঞ্জনপূর্ণ নেত্র দ্বারা নিবিড় উজ্জ্বল রসময় প্রেমরূপ সুধাসিন্ধুকোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, ইনি কে এবং কেনই বা আমার চিত্তকে নিজ চরণারবিন্দে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত করিলেন ?

সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি হইতে উত্থিত অভিনব সুখ অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, তিনি যে কঠোর জীবন যাপন করিতে ছিলেন, তাহার মধ্যে এরূপ আনন্দ তাঁহাকে কে আনিয়া দিল ? সে এই নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! ভাবিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার যে ঋণ ইহা শুধিবার নহে।

যাঁহারা মহা সন্ন্যাসী কি মহা নাস্তিক, তাঁহারাও ভক্তিরূপ সুধা আস্বাদন মাত্র মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ একটী সাধুর কথা আমি শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি। তিনি আকাশ ভজন করিতেন, কিন্তু যখন একটা পূর্ব্বরাগের কীর্ত্তন শুনিলেন, অমনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, প্রভুর কথা ভাবিতে ভাবিতে অমনি গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইল, তাই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপরের লিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই যে সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট নবীন পুরুষটি, ইনি কে ? ইনি প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন, কেন ? ইনি আমার কাছে চা'ন কি ? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, কেন ? আর আমার চিত্ত, আমার কথা না শুনিয়া, উহাঁর চরণমুখে কেন ধাবিত হইতেছে ? এ বস্তুটি কে ? এটি কি মনুষ্য, কি কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা ?

এই যে সরস্বতী ঠাকুরের মনের ভাব ইহাকে রতি বলে, ইহাই প্রেমের বীজ। কৃষ্ণপ্রেমে ও সামান্য প্রেমে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ! কোন স্ত্রী, কোন পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করেন। সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট তাঁহার প্রিয়জন একটী অনির্ব্বচনীয় দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি তাঁহার নিমিত্ত জাতি, কুল, সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন।

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের উদয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার দেহ দ্বারা জীবকে এ সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ! শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধামে কৃষ্ণে রতি হইল, তাহার পরে গৌড়ের নিকট কানাই নাটশালায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে প্রেমের উদয় হইল। এইরূপ শ্রীবিগ্রহ, চিত্রপট দর্শনে, কি স্বপ্নে, কি সাক্ষাদ্দর্শনে প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাদ্দর্শনে প্রকাশানন্দের রতি হইয়াছে। আপনি বেশ বুঝিতেছেন যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার চিত্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিতেছেন না। কেবল তাঁহাকে ভাবিতেছেন, ভাবিতেছেন তিনি কে? কখন আপনার উপর, কখন তাঁহার উপর ক্রোধ হইতেছে; ভাবিতেছেন, তিনি কেন আমার মাথা খাইতেছেন, আমি এখন কি করিব? তাঁহার কাছে কি যাইব? না যাইয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু যাইতে লজ্জা করে, লোকে কি বলিবে? সরস্বতীর হৃদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময় তিনি কোলাহল শুনিতে পাইলেন।

যে দিবস প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হন, সেই দিন অবধি প্রভুর বাসায় লোকের সংঘট্ট হইতে আরম্ভ হয়, ইহা উপরে বলিয়াছি। তিনি যখন স্নান করিতে গমন করিতেন, তখন পথের দুই ধারে লক্ষ লোক দাঁড়াইয়া রহিত। তিনি যখন আসিতেন, তখনও দুই ধারে লক্ষ লোক থাকিত, সকলে হরিধ্বনি করিত ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মিলনের পরে প্রভু মোটে চারি পাঁচ দিন কাশীতে ছিলেন। সুতরাং এ সমুদায় ঘটনা এই চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই হয়। সেই মিলনের দুই তিন দিন পরে প্রভু এক দিন পঞ্চনদে স্নান করিয়া ঐ পথে বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিতে গমন করিলেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করিয়া এইরূপ বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া বাসায় আসিতেন।

প্রভুর সঙ্গে ভক্ত চারিজন ছিলেন। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতন। শ্রীগৌরাঙ্গ বারাণসী নগরীতে তাঁহার প্রেমভাব গোপন করিয়া রাখিতেন। অন্য দিন বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া আপনার অনিবার্য্য প্রেম সম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন। কিন্তু সে দিবস সামলাইতে পারিলেন না। বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে ভক্তগণও উন্মত্ত হইলেন, তাঁহারা উপরিউক্ত চারিজন হাতে তালি দিয়া এই পদ গাইতে লাগিলেন :—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

প্রভুর সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তাহারা কলরব

করিতে ছিল। আবার প্রভুর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া সেই কলরব শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

এই যে অদ্যকার কাণ্ড বর্ণনা করিতেছি, ইহা হইবার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ প্রভুর আগমনাবধি, কাশীধামে লোকের মন কর্ষিত হইতেছিল। সেখানকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। তাঁহারা জানেন, বেদাভ্যাস যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধর্ম্ম। তাই যাঁহারা বড়লোক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সেই রূপ সাধন ভজন করেন। শ্রীভগবদ্ভক্তি বলিয়া যে বস্তু উহার নাম মাত্র শুনিয়াছেন, উহা ব্যাপার কি তাহা জানেন না। এরূপ ভক্তিবিমুখ স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে না, কি অঙ্কুরিত হইলে তাহা জীবিত থাকিবে না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা প্রভু জানিতেন। আর প্রভুর কৃপায় এখন তাঁহার ভক্তগণ এই তত্ত্ব বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ হয় প্রভু পূর্ব্বে কাহারও সহিত মিশেন নাই।

কিন্তু যদিও তিনি কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করেন নাই, তবু শুদ্ধ তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ভক্তির উদয় হইয়াছে। তাঁহার দূর দর্শনে, হাব ভাব কটাক্ষে, তাঁহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটী কলরব হইয়াছে যে, একটী অলৌকিক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে ইনি বড় মহাজন, কেহ বলিতেছেন ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলায় এই একটী অদ্ভুত ঘটনা বরাবর লক্ষিত হয়। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তখনই শ্রীভগবান আসিতেছেন কি আসিয়াছেন এইরূপ লোকের মনে হইত। শ্রীনবদ্বীপে তাঁহার প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণ দেশে যখন যেখানে যাইতেন, ঐরূপ লোকের মনের ভাব হইত। যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন সেখানে জনরব হয় যে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন। বারাণসীতেও ঠিক সেইরূপ লোকের মনে উদয় হইয়াছিল যে, সেই নগরে কি একটা বৃহৎ কাণ্ড ঘটিবে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। তাহার পরে যখন সন্ন্যাসিসভায় প্রভু জয়লাভ করিয়া আসিলেন, তখন সমুদায় বারাণসী প্রভুকে লইয়া উন্মত্ত হইল।

এইরূপ যখন সর্ব্ব সাধারণের মনের ভাব,—যখন কাশীবাসিগণের মন কর্ষিত ও দ্রবীভূত করা হইল,—তখন ভক্তিবীজ রোপণ করিবার সময়

হইল, আর তাই প্রভু উহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই নিমিত্ত প্রকাশানন্দের সহিত মিলিলেন।

প্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যেই নৃত্য আরম্ভ করিলেন আর অমনি তরঙ্গ উঠিল, সেই তরঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ, পরে দর্শক লক্ষ লোকে প্লাবিত হইলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন একথা মুখে মুখে নগরময় হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোক নৃত্য দেখিতে আসিল, ও সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রভু নৃত্যকালে মুখে হরি হরি ধ্বনি করিতেছিলেন। আর সহস্র সহস্র লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ইহাতে অতিশয় কলরব হইল। প্রকাশানন্দ যখন বাসায় বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, কৃষ্ণ-চৈতন্য বস্তুটি কি, তখন তিনি এই কলরব শুনিতে পাইলেন। এমন সময় একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সভায় সংবাদ দিল যে, কৃষ্ণ-চৈতন্য নৃত্য করিতেছেন, তাহাই দেখিয়া লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে।

এই কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী ব্যগ্র হইয়া সভা সমেত উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিতে ধাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বচন শুনিয়াছেন, রূপও দর্শন করিয়াছেন, ও তাঁহার নয়নবাণের শক্তিও অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব কি নৃত্য কখনও দর্শন করেন নাই। আজ বিধি সেই শুভদিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্য দর্শনে সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিগলিত হইয়াছেন, আজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। জগৎমান্য, গম্ভীর প্রকৃতি, বিজ্ঞোত্তম, জ্ঞানময়, কৌপীনধারী সন্ন্যাসীঠাকুর, ধৈর্য্যহারা হইয়া, বালকের মত, দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিয়া, সন্ন্যাসীদিগের ঘৃণনীয় সামগ্রী নৃত্য দেখিতে দৌড়িলেন!

প্রকৃত কথা কি শ্রবণ করুন্। সরস্বতী তখন ভিতরে বাহিরে কেবল গৌরময় দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি প্রভুর নিকট গমন করেন, তাঁহার নিকট উপবেশন করেন, কি তাঁহার কথা শুনেন, অন্ততঃ একবার উকি মারিয়া মুখ খানি দেখিয়া আইসেন; কিন্তু প্রভুর সহিত মিলন হইতেছে না। প্রভু আইসেন না, তিনিও অভিমানে যাইতে পারেন না। তিনি কাশীর একরূপ রাজা, ভারতের সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী। তিনি এখন চঞ্চল

বালকের ন্যায় বালক-চৈতন্যকে দেখিতে যাইবেন, ইহা কিরূপে হয়? "দারুণ কুলের দায়," তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটী সুযোগ পাইলেন, আর অমনি প্রাণনাথকে দেখিতে দৌড়িলেন।

তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদ্গণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নৃত্যকারী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রকাশানন্দ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন তাহা তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, সে শ্লোকটি এই ঃ—.

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডৌপ্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্ব্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্॥

অস্যার্থ।—"যিনি নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে করচরণকে আস্ফালন করাইতেছেন, যিনি সুবর্ণদণ্ড সদৃশ বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরঙ্গায়মান করিতেছেন, এবং যিনি উন্মত্তের ন্যায় হরি হরি এই আনন্দজনক ধ্বনি দ্বারা জগতের অশুভ ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতুল রসমুগ্ধ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে বন্দনা করি।"

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুকে দেখিলেন যেন সোণার পুত্তলি ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন। প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। আনন্দে চন্দ্রমুখ প্রফুল্ল হইয়াছে। কমললোচন দিয়া পিচকারীর ন্যায় ধারা ছুটিতেছে ও সেই নয়নের জল দ্বারা চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদায় লোকের অঙ্গ বিধৌত হইতেছে। সরস্বতী, সম্মুখে এক অপরূপ অনির্ব্বচনীয় ছবি দর্শন করিলেন। দর্শনে প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, যেন মূর্চ্ছিত হয়েন।

পরে একটু সম্বিৎ পাইয়া তিনি কোথায়, কি দেখিতেছেন, ইহা অনুভব করিলেন। এইরূপ একটু নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, ও বহুকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

বিজ্ঞ লোকের পক্ষে নয়নবারি-নিক্ষেপ বড় লজ্জার কথা, সরস্বতীর পক্ষে ত বটেই। সেই শতসহস্র লোকমধ্যে সরস্বতী রোদন করিবেন, ইহা কিরূপে হইবে? কিন্তু তিনি দুর্ব্বার নয়নধারা নিবারণ করিতে

পারিতেছেন না। আনন্দধারার সৃষ্টি হইল ও উহা মুখ বুক বহিয়া পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, তখন দেখিতেছেন কিনা, যেন একটি তেজোমণ্ডিত সুবর্ণের পুত্তলি নৃত্য করিতেছে। হয় জ্ঞান হইতে ভক্তি নতুবা ভক্তি, হইতে জ্ঞানের উদয় হইল। তখন দেখিলেন যে, যে নবীন সন্ন্যাসীটী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্ন্যাসী নন, স্বয়ং শ্রীহরি, সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরস্বতী প্রভুকে চিনিতে পারিলেন! বুঝিলেন যে, শ্রীহরি কপটসন্ন্যাসী রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন কিরূপ দেখিতেছেন তাহাও তাঁহার নিজ কৃত আর একটী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই ঃ—

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটীঃ প্রহসনম্।
বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটী রিব তনু
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটম্ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থ।—"যিনি কোটী নবমেঘসদৃশ অশ্রুধারাপূর্ণ নয়নযুগল ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রেম-সম্পত্তি দ্বারা কোটী বৈকুণ্ঠাদি অবজ্ঞা করাইতেছেন এবং যিনি অঙ্গলাবণ্য ও মাধুর্য্য দ্বারা কোটী অমৃতসিন্ধু উদ্গার করিতেছেন, অহো! আমি সেই কপট সন্ন্যাস শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে। দেখিতেছেন জগত একেবারে সুখময়। দুঃখের লেশ মাত্র এখানে নাই। অন্তরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুণ্ঠে গমন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছে। গৌরাঙ্গের রূপ চুমকে চুমকে পান করিতেছেন। আর যেন ক্রমে উন্মত্ত হইতেছেন।

নয়নের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন। তখন তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভুতে লীন হইয়া গেল। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার পদ সেইরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভুর অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইতেছে, তাঁহারও সেইরূপ হইতে লাগিল।

সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হয়েন তাহা তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতটি করিয়াছিলাম, যথা :—

প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ, কি ক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ,
নাচিলেন কটি দোলাইয়া।
কি ক্ষণে ও নয়নে, চাহিলেন মোর পানে,
অঙ্গ মোর উঠিল কাঁপিয়া॥
আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল বলি,
গলিয়া গলিয়া যেন পড়ে।
কঠিন হইয়া ছিনু, নিবারিতে না পারিনু,
প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে॥
হাম চির কুলবালা নাহি জানি প্রেমজ্বালা,
আজ একি দায় হ'ল মোরে।
গৌর বর্ণ চৌর এলো, যাহা ছিল সব নিল,
নিয়ে গেল কুলের বাহিরে॥
নিরমল কুলখানি সন্ন্যাসীর শিরোমণি,
কলঙ্ক ভরিল ত্রিজগতে।
বলরাম বলে শুন, সন্ন্যাসে কি প্রয়োজন,
পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রীতে॥

প্রভু দুই বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহ্য জ্ঞান মাত্র নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। প্রকাশানন্দ যে আসিয়াছেন, আর তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তাহাও প্রভু জানেন না।

লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভুর চৈতন্য হইল ও তখনি নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেখেন, প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তখনি প্রকাশানন্দ প্রভুর দুটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ আস্তে ব্যস্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাধী করেন? আপনি জগদ্‌গুরু, আমি আপনার

শিষ্যের উপযুক্ত নহি। অবশ্য আপনার কাছে ছোট বড় সমান, আর লোক শিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্য্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম।

প্রভু যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরস্বতী জানিতে পারিলে করিতে দিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে প্রতীত হইয়াছে যে প্রভু স্বয়ং তিনি। এমন বস্তুকে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহার আর অভিমান রহিল না। প্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীভগবন্! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ধরিলাম তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শ হতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপু র্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

পূর্ব্বে আমি আপনার নিন্দা করিয়া আপনার চরণে অপরাধী হইয়াছি, কিন্তু শাস্ত্রে জানি যে ভগবানে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে কৃপা করুন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান্ বোধ করেন, ইহাতে আমারও অপরাধ আপনারও অপরাধ। আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আর মুখে আনিবেন না।

সরস্বতী বলিলেন, আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্। কিন্তু যদি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন, তবু আমি পাষণ্ড, আপনি ভক্ত, আমার পূজ্য। আপনার কৃপা পাইলে আমি কৃতার্থ হই।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু উঠিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। যেরূপ কথা হইতে লাগিল উহা বহুলোকের শুনিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রভু চুপ করিলেন। প্রকাশানন্দও তখন ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিলেন।

জীবকে দুই রূপে বিভক্ত করা যায়, যাঁহারা পরকাল মানেন ও যাঁহারা মুখে বলেন পরকাল মানেন না। যাঁহারা পরকাল মানেন, তাঁহারা পাঁচটি রসের, কি তাহার একটি কি কতকটীর আশ্রয় করিয়া মহাপথের

"সম্বল" করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি রস, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

শান্ত কাহারা, না যাঁহাদের হৃদয়ে উদ্বেগ নাই। তাঁহারা নানা রূপ সাধনে আপনার আত্মাকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের, অপর কাহারো বস্তু নন। যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাসনাতে মনকে দুঃখ দিতে সক্ষম, সে গুলি তাঁহারা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে যে সুখোৎপত্তি তাহাতে যদিও বঞ্চিত থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বাসনাজনিত দুঃখ হইতেও অব্যাহতি পান। শান্ত রস আশ্রয় করিয়া যে যে সম্প্রদায় সাধন করেন, তাঁহাদের কাহারো নাম উল্লেখ করিতেছি, যথা—বৌদ্ধ, যোগী, ইত্যাদি। তাঁহারা নানা কথা বলেন, যথা—শ্রীভগবানও যে, আমিও সে। কেহ বলেন শ্রীভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাকে ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না, আমি নিজেই আমার ভাল মন্দের কর্ত্তা, অর্থাৎ আমি আপনার কর্ম্মফল ভোগ রিব। কাজেই ইহাঁরা স্বভাবতঃ ভগবদ্ভক্তিকে তত শ্রদ্ধা করেন না।

যাঁহারা দাস্য রসের সাধনা করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক বস্তু ভাবনা করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট আধ্যাত্মিক কি বিষয় ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—"হে আমার সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ইহা দাও।" এই প্রার্থনা তাঁহাদের সাধনা। এই দাস্য রস দ্বারা হিন্দুগণের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়, ও অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ ভজনা করিয়া থাকেন। দাস্য রস ও ভগবদ্ভক্তি এক জাতীয় বস্তু। যাঁহারা দেবীকে মা বলিয়া ও শঙ্করকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদের ভজন দাস্য ভক্তির অনুগত। দাস্যের পরে আর তিনটি রস,—যথা সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—ইহা ভক্তির বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই রস ভগবদ্ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীভগবানকে আত্মীয় জ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে সখা, পতি, কি পুত্র বলা যায় না। শ্রীভগবান ঐশ্বর্য্যময়, এই জ্ঞান থাকিতে এইরূপ আত্মীয়তা হয় না। এই তিনটি রস দ্বারা বৈষ্ণবগণ ভজনা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত এই রস অন্য কোন ধর্ম্মে নাই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি

প্রাণনাথ ভাবে ভজনা করা মনুষ্যের অসাধ্য, অতএব যাঁহারা এ সব কথা বলেন, তাঁহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন। যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ বলা যায় না, ইহা সত্য, ও বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা গোপী অনুগত হইয়া এ সমুদায় রসের পুষ্টি করেন। সে কিরূপ, না, বৈষ্ণব আপনি শ্রীভগবানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন না, তবে যশোমতীর কি শচীর দ্বারা সম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু বলিয়া ডাকিবেন না, কিন্তু শ্রীমতীর দ্বারা ডাকাইবেন। যথা গোপী-অনুগত-শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন শ্রবণ করুন—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
অনেক পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে তারা বলে কত
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে গোকুল নগরে
দুকুলে হইল হাসি॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হয়ে
সদা অন্তরেতে থাক॥

এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন, ইহা চিত্তকে আনন্দে

পরিপ্লুত করে! কিন্তু কোন্ জীব শ্রীভগবানকে এরূপ সম্বোধন করিবার শক্তি ধরেন? যদি কোন জীব শ্রীভগবানকে এরূপ সম্বোধন করেন, তবে তিনি হয় দাম্ভিক, নয় বাতুল। তাই বৈষ্ণবগণ শ্রীমতী রাধার দ্বারা শ্রীভগবানকে এরূপ নিবেদন করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ বাসায় আসিলেন। তিনি এক প্রকার ছিলেন, দুই তিন দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্ব্বে ছিলেন মায়াবাদি-সন্ন্যাসী, এখন হইলেন কুলটা প্রেমপাগলিনী। কয়েক দিনের মধ্যে ভজন পথের এক সীমা হইতে অন্য এক সীমায় আসিয়াছেন। পূর্ব্বে ছিলেন তেজস্কর স্বাধীন পুরুষ, এখন হইলেন যেন প্রেমভিখারিণী অবলা! সৌভাগ্যের মধ্যে তাঁহার মনের মধ্যে যে সমুদায় ভাব-তরঙ্গের খেলা খেলিয়াছিল তাহা তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাঁহার নিজ গ্রন্থে, অতি জীবন্তরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে প্রকাশানন্দ অনুভব করিলেন তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়ে মলা মাত্র নাই, উহা পবিত্র হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন। ফল কথা, পাপ দুই প্রকারে ধ্বংস করা যায়, এক অনুতাপ দ্বারা দগ্ধ করিয়া, আর এক ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি দ্বারা ধৌত, কি উহার গুণ পরিবর্ত্তিত করিয়া। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কেহ পবিত্র হয়েন, কেহ তাঁহার পাপরূপ যে অঙ্গার, তাহাকে একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা অগ্নি করিয়া থাকেন।

এইরূপে অন্তরের অতি কুপ্রবৃত্তি, ভক্তি কর্ত্তৃক শোধিত হইলে উহা সুন্দর আকার ধরে। তখন সেই কুপ্রবৃত্তি মহা উপকারী ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। যেমন আলকাতরা হইতে ম্যাজেণ্টা হয়, সেইরূপ পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহা উপকারী কোন বস্তুরূপে পরিণত করা যাইতে পারে।

যাঁহারা অনুতাপানলে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে বিচারপতি ভাবে ভজনা করেন। যাঁহারা তাঁহাতে ভক্তি অর্পণ দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে স্পর্শমণিরূপে ভজনা করেন।

প্রকাশানন্দ তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্।

যদ্দত্তশ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং ॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অধর্ম্মে আবিষ্ট, যে কখন পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন রচিত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-সুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে নমস্কার।"

আবার বলিতেছেন, যথা ৭৬ শ্লোকে—"অতি পাতকী, নীচজাতি, দুরাত্মা, দুষ্কর্ম্মশালী, চণ্ডাল, সতত দুর্ব্বাসনারত, কুস্থান জাত, কুদেশবাসী অর্থাৎ কুসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নষ্ট ব্যক্তিদিগকে যিনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগৌরহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

আবার ১১১ শ্লোকে—"অকস্মাৎ সহৃদয় শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলে যাহাদিগের যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি কিছু মাত্র ছিল না, পাপকর্ম্মের নিবৃত্তির কথা আর কি বলিব, এই সংসারে তাঁহারাও হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ-শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে নাই।"

সরস্বতী বলিতেছেন যে, এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক জীবগণ অনায়াসে উদ্ধার পাইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপী পবিত্রীকৃত হইতেছে? যথা চতুর্থ শ্লোক—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা-
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্ণঃ সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুং ॥

অর্থাৎ,—"যিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিঙ্গিত, বা কীর্ত্তিত অথবা রূপ-লাবণ্যাদি দ্বারা বশীভূত হইলে কিম্বা দূরস্থ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক নমস্কৃত বা আদৃত হইলেই প্রেমের গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।"

সরস্বতী ভাবিতেছেন, তিনি যে নিষ্পাপ হইয়াছেন, নির্ম্মল হইয়াছেন, অর্থাৎ শীতল হইয়াছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই, কেবল প্রভু গৌরাঙ্গ তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন, আর একবার তাঁহাকে স্পর্শ

করিয়াছিলেন। যদি এখানে কেহ বলেন যে, সরস্বতী কি পূর্ব্বে নির্ম্মল ছিলেন না? তাহার উত্তরে বলিব যে, না; যেহেতু তখন তাঁহার ঈর্ষা, ক্রোধ, নীচত্ব, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক পরিমাণে ছিল। এ সমুদায় থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। এখন শীতল হইয়াছেন, জ্বালা মাত্র নাই, তাই বুঝিতেছেন যে নীরোগ অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়াছেন। যে রোগী ও যে সুস্থ সে আপনাপনি বুঝিতে পারে।

পূর্ব্বরাগ উদয় হইবা মাত্র প্রথমেই কিরূপ বোধহয় তাহা শ্রীমতীর উক্তি এই পদে ব্যক্ত। যথা—

"সখি! বন্ধুয়া পরশমণি। ধ্রু।
সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণ খানি।"

অতএব পাপ মোচনের নিকৃষ্ট উপায় আত্মগ্লানি, উৎকৃষ্ট উপায় শ্রীভগবানের নাম কি গুণ সুধা রসে হৃদয়কে ধৌত কি সিক্ত করা।

এখানে সরস্বতী ঠাকুর প্রভু গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এক অপরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরূপ অমানুষিক শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে শুদ্ধ দর্শনে, এমন কি দূর দর্শনে অতি যে মহাপাপী সেও নির্ম্মল হইত, এবং অতি উপাদেয় ব্রজের নিগূঢ় রস পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিত। এরূপ শক্তি কোন জীব কখন প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়া পূজিত।

তাহার পরে সরস্বতী দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রকৃতি, রুচি, বিশ্বাস ও জ্ঞান, সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে, না, যাহার উপর ঘৃণা ছিল তাহাতে রুচি, যাহাতে রুচি ছিল তাহার উপর ঘৃণা হইয়াছে। এখনকার তাঁহার মনের ভাব শ্রবণ করুন। যথা তাঁহার শ্লোক—

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-
ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌর মধুনঃ॥

"আমি ব্রহ্ম এই মাত্র তত্ত্ব জ্ঞানে প্রফুল্লবদন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ধিক্, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকলে সর্ব্বদা আগ্রহ যুক্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্, উৎকট তপস্যাকারি ব্যক্তিদিগকে ধিক্, এবং যে সকল ব্যক্তি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের

বিষয়কে বশীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমিগণকেও ধিক্, অর্থাৎ এই সকল বিষয় রসে প্রমত্ত নরপশুগণ আমাদের শোচনীয়, যে হেতু ইহা-দিগের মধ্যে কেহই শ্রীগৌরপদাম্ভোজের মধুলেশও প্রাপ্ত হয় নাই।”

তিনি যাহা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা যাহারা করে তাহাদিগকে তিনি “নর-পশু” বলিতেছেন। উপরের শ্লোকে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, পূর্ব্বে তিনি নর-পশু ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ শ্লোক—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটি র্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটি র্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণ গণো যঃ স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাং॥

“বৈরাগ্য কোটিতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মৈত্র্যাদি অর্থাৎ শুচিত্বাদি কোটিতেই বা কি হইবে, নিরন্তর “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য বিষয়ক চিন্তা কোটিতেই বা কি হইবে, আর বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ভক্তি কোটিতেই বা কি হইবে, শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়-ভক্তগণের চরণ-নখ-জ্যোতি দ্বারা হর্ষপ্রাপ্ত মানবদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ গুণ সমূহ বর্ত্তমান আছে, তাহার কোট্যংশের একাংশও অন্যেতে নাই।”

যাঁহারা নিরাকারবাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোতিঃস্বরূপ ভাবিয়া যোগ-সাধন করেন, তাঁহাদের ফল ব্রহ্মানন্দ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছেন, তাঁহাদের ফল প্রেমানন্দ। সরস্বতী ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। যাঁহারা যোগ করেন তাঁহারা এই আনন্দের আস্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন প্রেমানন্দের আস্বাদ পাইয়া, সরস্বতী বলিতেছেন যে, প্রেমানন্দে যে হর্ষ আছে, ব্রহ্মানন্দে তাহার কোটী অংশের এক অংশও নাই।

সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে (সপ্তম শ্লোক) অবতার শিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ। কপিলদেবও অবতার, যিনি জীবকে যোগ শিক্ষা দেন। কিন্তু ইহাঁরা যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহৎ কার্য্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া, তাহার তুলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিমিত্ত দৈত্যনাশ। যোগ-শিক্ষা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা জীব উন্নতি করিবে। কিন্তু প্রেম-ধন যিনি দান করিলেন, তিনি জীবকে শ্রীভগবানের নিজ জন করিলেন।

সে জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, তাহার দৈত্যের কি অন্য কাহারও ভয় নাই। যে ব্যক্তি ভগবৎ প্রেম পাইল সে শ্রীভগবানের নিজ জন হইল, তাহার আর শ্রীরামের কি শ্রীনৃসিংহের দত্ত আশীর্ব্বাদে প্রয়োজন নাই।

সরস্বতী মনে বিচার করিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবশ্য সেই শ্রীহরি, সামান্য জীব নহেন। যেহেতু যাঁহার দর্শনমাত্রে মহাপাপী মহাপ্রেমী হয়, তিনি যে সামান্য জীব, ইহা হইতে পারে না, তিনি অবশ্যই সেই শ্রীভগবান।

কখন সরস্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্খ, নির্ব্বোধ, কি মুগ্ধ, কিন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মূর্খ কি নির্ব্বোধ নহেন? সার্ব্বভৌম যখন শ্রীপ্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কপটবেশ শ্রীহরি, সামান্য জীব নহেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে জীবে কি সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা সরস্বতী ঠাকুর,—যিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী,—নানা স্থানে বিচার করিয়াছেন। পাঠক মহাশয় এখানে আপনাকে একটী নিবেদন। যোগ ভাল, কি প্রভুর মত অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু যোগসাধন করা তোমার সাধ্যাতীত। সেখানে প্রভুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আর তোমার গতি কি আছে? যদি বল তিনি কে, তাঁহার পদে অবনত হইলে যদি আমার সর্ব্বনাশ হয়? কিন্তু সরস্বতীর ন্যায় মহাজন, যিনি যোগী, পরম জ্ঞানী, সন্ন্যাসীর শিরোমণি—তিনি যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা করিতে পার।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আমরা দর্শন করি নাই, তাঁহার সহিত সহবাস করি নাই। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত, অতএব তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি বিচারে অবশ্য লাভ আছে। অতএব সূক্ষ্মদর্শী সরস্বতী তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিব। সরস্বতী বলিতেছেন, প্রভুর "প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় হেমদণ্ডের ন্যায়"; তাঁহার "হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর"; তাঁহার "কপোল-দেশের প্রান্তভাগে মধুর মধুর হাস্যসমন্বিত"; তাঁহার "শ্রীমুখ প্রণয়াকুল"; তাঁহার "শ্রীমুখ ঈষৎ হাস্য শোভিত"; তাঁহার "স্নিগ্ধ দৃষ্টি"; তাঁহার "করুণাসিন্ধু অঞ্জনপূর্ণ নেত্র"; তাঁহার "নয়নপদ্ম

হইতে নিঃসৃত মনোহর মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু এবং উদ্গত রোমাঞ্চ দ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীঅঙ্গ"; তাঁহার "মুখসৌন্দর্য্য কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুদৃশ্য"; তিনি "প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষাও সুদৃশ্য"; তিনি "প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষা মনোহর কান্তি-ধারী"; যাঁহার "জপমালা শোভিত প্রেমে কম্পিত কর"; তাঁহার "শ্রীমূর্ত্তি লাবণ্য দ্বারা কোটী অমৃত সমুদ্রকে উদ্গার করিতেছেন"।

সরস্বতী প্রভুর ভাব কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন, এখন শ্রবণ করুন্। তিনি "করতলে বদর ফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া নয়নজলে সম্মুখস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন"; তিনি "নয়ন-বারিধারায় পৃথ্বী-তল পঙ্কিল করিতেছেন"; "যিনি নবীন মেঘ দেখিয়া উন্মত্ত হয়েন, ময়ুর-চন্দ্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়েন, গুঞ্জাবলী দর্শনে কম্পিত-কলেবর হয়েন, যিনি শ্যামকিশোর পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন।"

সরস্বতী, প্রভুর রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে করিতে যেমন মনে একটি ভাবের উদয় হইত, অমনি উহা শ্লোকরূপে প্রকাশ করিতেন। কোন এক দিন প্রভুর রূপ কি গুণ লিখিতে অপারগ হইলেন, হইয়া এই শ্লোকটী করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক ঃ—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি
বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেহম্ভোধিকোটি :র্মধুরিমনি:সুধাক্ষীরমাধ্বীক কোটি
র্গৌরোদেবঃ সজীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ॥

"যিনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সকলের আহ্লাদজনক, কোটি মাতৃসদৃশ স্নেহবান, কোটি কল্পবৃক্ষসদৃশ দাতা, কোটি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর-স্বভাব, অমৃতের ন্যায় মধুর এবং কোটি কোটি বিচিত্র প্রণয় রসের প্রদর্শক, সেই শ্রীগৌরদেব জয়যুক্ত হউন।"

বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া দেখিলেন ভাষায় কুলায় না, তাই লিখিলেন "মধুরং মধুরং মধুরং" ইত্যাদি এইরূপ মধুরং মধুরং বলিয়া শ্লোক সাঙ্গ করিলেন। সেইরূপ সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর রূপ ও গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া ভাষায় উহা না পারিয়া "কোটী" "কোটি" "কোটি" বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

সরস্বতীর তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, এখন আর

তাহা নাই। তাঁহার যে সমস্ত বিষয়ে রুচি ছিল তাহাতে অরুচি হইয়াছে, কাশী নগরী বাস পর্য্যন্ত। কাশীবাসে আর বাসনা নাই। যে সমস্ত সঙ্গী ও শিষ্যগণকে সহচর ভাবিয়া শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন, তাহাদের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইয়া গিয়াছে। শিষ্যগণ পড়িতে আইলে পড়ান না, পলায়ন করেন। লোকে দেখিতে আইলে লুকাইয়া থাকেন, কি তাহাদের সহিত আলাপ করেন না। কাশীবাসিগণ তাঁহাকে কেহ শ্রদ্ধা করেন কি না সে বিষয়ে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই।

এ যাবৎ বহুতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করেন। এ পর্য্যন্ত নানা নিয়ম পালন বহুদিন হইতে করিয়া আসিয়াছেন, এখন সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। বেদ পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে সমস্ত বিধি পালন করিয়াছিলেন সে সকল নিয়ম পালন করিতে আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হইতেছে না; তবে করিতেছেন কি, তাহা বলিতেছি; তাঁহার গ্রন্থেই তাঁহার হৃদয় তরঙ্গের পরিস্ফুট বর্ণনা আছে।

তিনি করিতেছেন কি, না একটু একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রভু যেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহারই অনুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চেতনা হইতেছে, আর তিনি আপনার মনকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন; মনকে পাইতেছেন না। আর যে স্থানে তাঁহার মন ছিল সে স্থানে দেখিতেছেন সোণার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। আর সরস্বতী বলিতেছেন,—কি সুন্দর মুখশ্রী, কি মধুর নৃত্য! আবার বলিতেছেন, হে মন-চোর, তুমি আমার সমুদায় হরণ করিলে? সরস্বতী বলিতেছেন ঃ—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকী বৈদিকী যা
যা বা লজ্জা প্রহসনসমুদ্গান নাট্যোৎসবেষু।
যে বা ভূবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থ ধর্ম্মা,
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোপি মে তীব্রবীর্য্যঃ॥

"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আসিয়া আমার নিষ্ঠা প্রাপ্ত লৌকিকী, আর বৈদিকী যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহসন উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন নাট্যাদি বিষয়ক যে লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কারণ স্বরূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল।"

এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও সামান্যপ্রেম এক জাতীয় দ্রব্য। কুল-টাগণ কাহারো প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কুল, শীল, স্বামী, সন্তান সমুদায় বর্জ্জন করে। তাহারা অবশ্য কুল রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সরস্বতীর ঠিক সেই দশা হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভু তাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতেছেন।

তিনি যে জপ, তপ, প্রাণায়াম প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম করিতেন, তাহা গিয়াছে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহ-ধর্ম্ম গিয়াছে, নৃত্য গীত প্রভৃতিতে যে ঘৃণা তাহা গিয়াছে। কেন না, একজন বলবন্ত গৌরবর্ণ চোর তাহা সমুদায় হরণ করিয়া লইয়াছেন!

প্রকাশানন্দ ভাবিতেছেন, ঐ নবীন সন্ন্যাসী কি শক্তিধর পুরুষ! তখন আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রকাশানন্দ! তুমি না বড় তেজস্কর পুরুষ ছিলে? একটি গৌরবর্ণ যুবা আসিয়া তোমার দশা কি করিল?" ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া পাগলের ন্যায় হাস্য করিতে-ছেন। আবার ভাবিতেছেন ঃ—

"আমি প্রকাশানন্দ, আমি নৃত্য করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না? হে গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, আমি এমন গম্ভীর অটল ছিলাম, আমাকে পাগল করিলে? আমার নৃত্য দেখিয়া কাশীবাসিগণ আমাকে কি বলিবে? ছি! আমি যে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি!"

রজনীযোগে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু বাহু পসারিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরি-লেন। ধরিয়া দুজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে প্রভু প্রকাশা-নন্দের হৃদয় একেবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী চেতন পাইলে আবার চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "জীবের এইরূপ পদে পদে বিপদ, এ সময় যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে? প্রভু, এখন আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবন যাও, সেই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।"

ইহাতে প্রকাশানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।"

প্রকাশানন্দ তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার মনের ভাব যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিয়া আমি এই গানটী করিয়াছিলাম ঃ—

কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে ? ধ্রু।

চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে,
এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে ॥

ছিলাম প্রবীণ, অটল গম্ভীর,
টলিত না মন কোন কালে।

নাথ, করিলে কি কাজ, গেল ভয় লাজ,
বালকের মত চপল করিলে ॥

সংসার বন্ধন, করিয়া ছেদন,
সকল তেজে সন্ন্যাসী হইলাম।

আমি, কাটিলাম বন্ধন, একি বিড়ম্বন,
আবার তুমি প্রেম ফাঁদে ফেলিলে ॥

প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে বৃন্দাবনেই তুমি আমাকে দর্শন করিতে পারিবে।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, তুমি ত আমাকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না ?

প্রভু কহিলেন, সত্যই, স্মরণ করিলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।

সরস্বতী কহিলেন, আপনার প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম। প্রভু কহিলেন, এই আনন্দ তোমার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আর অদ্যাবধি তোমার নাম "প্রবোধানন্দ" হইল।

প্রভু এক পথে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন, প্রবোধানন্দ অন্য পথে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রবোধানন্দ, পূর্ব্বে যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তবু দশ সহস্র শিষ্য সহিত সহবাস ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ, তর্ক, বিচার করিতেন। এখন অন্য এক আকার ধরিলেন। এখন বৃন্দাবনে নন্দকূপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে মহাপ্রভুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে মূঢ় জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করে। এখন আপনিই কাশীত্যাগ করিলেন ? পূর্ব্বে ভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম কাপুরুষের আশ্রয় ভাবিতেন, এখন অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা, ছাড়িয়া দিয়া কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই হৃদয়ের তরঙ্গে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।

এই অমূল্য গ্রন্থ খানির দ্বারা জীবগণ এই কয়েকটী মহা উপকার পাইতেছে। আমরা প্রকাশানন্দের ন্যায় সূক্ষ্ম ও দূরদর্শীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কিরূপ বস্তু ছিলেন জানিতে পারিতেছি। মনে থাকে যেন, মহাপ্রভু সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বচক্ষে, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া লেখা।

দ্বিতীয়ত, শ্রীভগবানের অবতার মানিতে লোকে সহজে পারে না। প্রকাশানন্দের কাহিনী শ্রবণে অবতারে বিশ্বাস সুলভ হইতে পারে।

তৃতীয়ত, ইহা আমরা জানিতেছি যে, প্রকাশানন্দের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী, যিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি প্রেম ও ভক্তির আস্বাদন করিয়া, পূর্ব্বে যে ব্রহ্মানন্দ (অর্থাৎ জ্ঞান হইতে যে আনন্দ উত্থিত হয়) ভোগ করিতেন, তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেই পর্য্যন্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে, যে পর্য্যন্ত তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ অহেতুকী ভক্তির সুধা যিনি পান করিয়াছেন তিনি আর জ্ঞান-যোগে মুগ্ধ হয়েন না।

কথা এই, অনেক যোগী ও জ্ঞানী আপনাদিগের ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য অপেক্ষা বড় ভাবেন। তাঁহারা ভাবেন যে, যে সামান্য ভক্ত তাহার কোন অলৌকিকী শক্তি নাই; তাঁহার অপেক্ষা, যাঁহার মস্তকে পীপিড়ার ঢিবি হইয়াছে তিনিই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী শেষোক্ত, তাঁহার পরীক্ষিত, পদ্ধতি ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিলেন, করিয়া ভক্তের যে প্রেমানন্দ তাহাই লইলেন।

প্রবোধানন্দকে বৃন্দাবনে বিদায় করিয়া দিয়া, প্রভু দেশাভিমুখে চলিলেন। সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনুমতি দিলেন না। প্রভু চলিলেন, আর ভক্তগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রভু যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে, আবার সেইরূপ পূর্ব্বকার ন্যায় বন্যপশুগণের সহিত খেলা করিতে করিতে, চলিলেন। শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে, মুরারীর কড়চা অনুসারে, এই সময়কার একটী বড় মধুর কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রভু একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গী দুই জন, বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য একটু পশ্চাতে। একটী গোপযুবক ঘোলের কলস লইয়া বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। প্রভু তৃষ্ণার্ত্ত, গোয়ালার নিকট সেই তক্র চাহিলেন। সরল গোয়ালা প্রভুর সম্মুখে কলস রাখিল, আর প্রভু কলসস্থ সমুদায় ঘোল পান

করিলেন। গোপযুবক প্রভুকে বলিল, ঠাকুর ইহার মূল্য দিতে আজ্ঞা হয়। তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ মূল্য লইয়া কি করিবে? গোপ বলিল যে, তাহার স্ত্রী আছে ও বৃদ্ধ মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে। প্রভু তখন, বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য, যাঁহারা পশ্চাতে আসিতেছেন তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, উহাদের নিকট তক্রের উচিত মূল্য পাইবে। গোপযুবক তাই বলভদ্রের অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, প্রভু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন, গোপযুবকের স্ত্রী ও বৃদ্ধ মাতা আছে। আমারও ত স্ত্রী ও মাতা আছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছি, ভাল করিতেছি না। এই ভাবিয়া প্রভু তাহাদের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন, ও তখনি অন্তরীক্ষে এক দেহ লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, হইয়া জননী ও ঘরণীর সহিত মিলিত হইলেন। এই বলিয়া ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গীত সমাপন করিলেন।

ওদিকে গোপযুবকের কথা শ্রবণ করুন। বলভদ্র আসিলে গোপ ঘোলের মূল্য চাহিল। বলিল, ঐ যে আগের ঠাকুর যাইতেছেন, তিনি আমার এক কলস ঘোল সমুদায় পান করিয়াছেন, মূল্য চাহিলে বলিলেন, আপনারা দিবেন। বলভদ্র প্রভুর ভঙ্গী দেখিয়া অবাক! গোপকে মিনতি করিয়া বলিলেন, "গোপ! যিনি তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী তাঁহার অর্থ কোথা? আর আমরা তাঁহার ভৃত্য আমাদেরও অর্থ স্পর্শ করিতে নাই। ঠাকুর তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তোমার খুব ভাল হইবে।"

গোপ একথা শুনিয়া সুখীই হউক কি দুঃখীই হউক আর কিছু বলিল না, ঘোলের কলস লইয়া বাড়ী যাইবে ভাবিল। কিন্তু কলস তুলিতে গিয়া দেখে উহা এত ভারি যে তাহা তুলিতে পারে না। তখন উকি মারিয়া দেখে যে কলস স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ! গোয়ালার উহা দর্শন মাত্র জ্ঞানোদয় হইল। তখন কলস ফেলিয়া দৌড়িল, দৌড়িয়া প্রভুর লাগ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বলিল "প্রভু, আমি মূর্খ গোয়ালা, আমাকে ভুলান কি আপনার কর্ত্তব্য? আমি বৃথা ধন চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার মতি দান করুন।" প্রভু তাহাকে আশ্বাস বাক্য বলিয়া বিদায় করিলেন। গোপযুবক সামান্য অর্থ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুর নিকটে অর্থ ও পরমার্থ দুই পাইলেন।

মুরারিগুপ্তের কড়চায় প্রভুর তক্রপানলীলা এইরূপ বর্ণিত আছে—

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ পথিগচ্ছন্ কৃপানিধিঃ।
দৃষ্ট্বা গোপমুবাচেদং সতক্রংকলসং প্রভুঃ॥
পিপাসিতোঽহং তক্রং মে দেহি গোপ যথাসুখং।
শ্রুত্বা পরমহর্ষেণ সম্পূর্ণকলসং দদৌ॥
হস্তাভ্যাং কলসংধৃত্বা সতক্রং ভক্তবৎসলঃ।
পিত্বাগোপকুমারায় বরং দত্বাযযৌ হরিঃ॥

"এই প্রকার প্রভু পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ তক্র-কলস সহ যাইতেছে, দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, অহে গোপ, আমি পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে তক্র প্রদান কর। গোপ তাহা শুনিয়া অতিশয় হর্ষভাবে সেই তক্র-কলস প্রভুকে প্রদান করিল। ভক্তবৎসল প্রভু দুই হস্ত দ্বারা সেই তক্র-কলস ধারণ পূর্ব্বক পান করিলেন এবং সেই গোপকুমারকে বরদান করিয়া যথা স্থানে গমন করিলেন।"

প্রভু দ্রুতগতিতে বন্যপশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশেষে পুরী নগরীতে পৌঁছিলেন, ও সেখানে আঠারনালা হইতে ভক্তগণের নিকটে তাঁহার আসিবার সংবাদ পাঠাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। ইহা কিরূপ তাহা বলিতেছি। অতি রৌদ্রে জীবমাত্র হাহাকার করিতেছে, মৎস্যগণ জল না পাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় এক পশলা অতি শীতল ও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইল। তখনি সফরি মৎস্যগণ পুনর্জীবন পাইয়া দিগ্বিদিগ জ্ঞান শূন্য হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেইরূপ ভক্তগণ মরিয়াছিলেন, প্রাণ পাইয়া প্রভুর নিকট দৌড়িলেন। সকলে গমন করিয়া দেখেন যে, প্রভু ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। পুরী ও ভারতীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, স্বরূপ প্রভৃতি অন্যান্য সন্ন্যাসী আর গৃহি-ভক্তগণ সকলে প্রভুকে প্রণাম করিলেন, সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভুকে লইয়া জগন্নাথমন্দিরে শ্রীমুখ দর্শনে চলিলেন। সে দিবস সার্ব্বভৌম প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, অদ্য তিনি কোথায়ও যাইবেন না, সকলের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবেন। বহুদিনের পরে ভক্তগণ ও প্রভু একত্রে বসিয়া মহানন্দে ভোজন করিলেন। আসুন ভক্তগণ, আমরা এই প্রভুভক্তে মিলন ও ভোজন অন্তরে দাঁড়াইয়া দর্শন করি।

প্রভুর সন্ন্যাসের পরে এই ছয় বৎসর গত হইল। নবীন যুবাকালে অর্থাৎ যখন উনবিংশতি বৎসরের তখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন; করিয়া সেখানে "হরিনামের নৌকা সাজাইয়া জীবগণকে পার করিয়াছিলেন।" সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বে প্রভু ন'দে হইতে মন্দার দিয়া গয়াধামে গমন করেন। সন্ন্যাসের পরে রাঢ় দেশে তিন দিবস ভ্রমণ করেন, তাহার পরে নীলাচলে, এবং নীলাচল হইতে সমস্ত দক্ষিণ দেশ শ্রীপদ দ্বারা পবিত্র করেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বৃন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ করিয়া গৌড়দেশ দিয়া গৌড়নগর পর্য্যন্ত গমন করেন। আবার সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নীলাচলে পুনরাগমন করেন। শেষে বনপথে বারাণসী হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন, সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার নীলাচলে আইসেন। এইরূপ ভ্রমণে প্রভুর সন্ন্যাসের পরে ছয় বৎসর গেল। প্রভুর বয়স তখন ৩০ বৎসর। প্রভু তাহার পরে অষ্টাদশ বৎসর প্রকট থাকেন। এই ১৮ বৎসর প্রভু বরাবর নীলাচলে বাস করেন, আর কোথায়ও গমন করেন না।

প্রভু এই অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস করেন, ইহার মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা তাহাই মাত্র বর্ণন করিব। প্রভু বনপথে বৃন্দাবন হইতে আসিবা মাত্র সরূপ অমনি শ্রীনবদ্বীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত দিন স্থির করিলেন, শিবানন্দ সেন পথের ব্যয়ের ভার লইলেন।

ভক্তগণ আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চারি মাস প্রভুর নিকট বাস করিলেন; পূর্ব্বের ন্যায় দিন দিন মহোৎসব, জলক্রীড়া ও কীর্ত্তন হইতে লাগিল; পূর্ব্বের ন্যায় মন্দিরমার্জ্জন, রথাগ্রে নৃত্য, বন্যভোজন ইত্যাদি হইল; পূর্ব্বের ন্যায় নন্দোৎসব হইল, ও পরে চারি মাস থাকিয়া ভক্তগণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হরিদাসের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। তিনি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর ঘরের নিকট বাসা, প্রভু প্রত্যহ স্নান করিয়া একবার তাঁহাকে দেখা দিয়া যান, আর প্রত্যহ গোবিন্দ তাঁহার প্রসাদ তাঁহাকে দিয়া আইসেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুকাল পরে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও জাতি ভ্রষ্ট। তাই আর কোথায় যাইবেন, হরিদাসের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। রূপ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে, প্রভুর তখনি সেখানে আসিবার কথা। এই কথা হইতে হইতে চন্দ্রবদন হরেকৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে আগমন করিলেন। তখন প্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হরিদাস ও রূপ উভয়ে প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

হরিদাস বলিলেন, প্রভু, দেখুন রূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন। প্রভু তখন সহর্ষে শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে রূপ, হরিদাসের বাসায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ নীলাচল হইতে বিদায় হইয়া গেলেন, রূপ তখনও রহিলেন। বলিতে কি, প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া কাছে রাখিলেন। কেন? ক্রমে ক্রমে রূপকে তাঁহার কার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত। প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সে বৎসর প্রভু যখন রথাগ্রে নৃত্য করেন, তখন একটী শ্লোক বলেন। শ্লোকটী কাহার রচিত, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু কাব্য প্রকাশে উদ্ধৃত আছে। শ্লোকটী এই:—

যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে॥

শ্লোকটীর অর্থ এই। কোন নাগরী তাঁহার পতিকে বলিতেছেন, "হে নাথ! সেই তুমি সেই আমি। সেই আমরা মিলিত হইয়াছি। কিন্তু তবু

আমাদের সেই যে প্রথম নিভৃতস্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে সুখ হইয়াছিল, তাহা আর এখন পাইতেছি না।"

এ শ্লোকটী যে অদ্ভুত তাহা রসজ্ঞ মাত্রে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু জগন্নাথ রথে চড়িয়া সুন্দরাচলে চলিয়াছেন, প্রভু সেই রথাগ্রে নৃত্য করিতেছেন। সে অবস্থার সহিত এ শ্লোকের সম্পর্ক কি? শ্লোকটী আদিরস ঘটিত নায়িকার উক্তি, ইহাতে কি আছে যে প্রভু রথাগ্রে নৃত্যের সময় উহা আস্বাদন করিবেন? প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, আর কেবলমাত্র সরূপ উহার ভাব বুঝিয়া আস্বাদ করিতেছেন, অপর সকলে কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ভাগ্যবান রূপ ইহা বুঝিলেন, বুঝিয়া আপনি ঐ ভাবের একটী শ্লোক করিলেন। সে শ্লোকটী এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ংকৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

রূপ এই শ্লোকটী তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু স্নান করিয়া গমনের বেলা প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। সেই নিয়মানুসারে এক দিবস সেখানে আসিলেন, কিন্তু তখন রূপ স্নানে গিয়াছেন। প্রভু সেখানে কাহাকে না দেখিয়া বাসায় যাইতে, চালে তালপত্র দেখিলেন; দেখিয়া উহাতে লিখিত শ্লোকটী পড়িলেন। পড়িতে-ছেন, এমন সময় সমুদ্রস্নান করিয়া রূপ আসিলেন। প্রভু রূপকে দেখিয়া সহর্ষে তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "তুমি আমার মনের কথা কিরূপে জানিলে?" শ্রীরূপ একথায় কৃতার্থ হইলেন। প্রভু তাহার কিছু পরে সরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রূপ আমার মন কিরূপে জানিল?" তাহাতে সরূপ বলিলেন, "ইহাতে ইহাই বুঝা গেল যে তিনি তোমার কৃপাপাত্র।"

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছি। যশোদার ভজন—বাৎসল্য রস লইয়া। শ্রীরাধার ভজন—মধুর রস লইয়া। রাধাকৃষ্ণ ভজনের উপকরণ—আদি অর্থাৎ মধুর রস। এসম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আরো পরে বলিব। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা যখন তাঁহার রথাগ্রে নৃত্য বর্ণনা করি, তাহাতে কতক লিখিয়াছি। শ্রীজগন্নাথ রথে, নানা কোলাহল

হইতেছে, বাদ্য বাজিতেছে। শ্রীজগন্নাথ রথে, কিন্তু তাঁহার রাধা কোথায়? প্রভু রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া তখন আপনাকে রাধা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাধা দূরে দাঁড়াইয়া, আর জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রথের উপর, ভিন্ন লোকের মধ্যে রহিয়াছেন। তাহা কিরূপে হইবে, রাধার তাহা সহ্য হইবে কেন? প্রভু মনে মনে রথের উপরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি এখানে কেন? এত লোকের মাঝে কেন? ওরা তোমার কে? চল, তুমি আমি দুইজনে নিভৃত স্থানে গমন করি, করিয়া প্রাণ জুড়াই।" ফলকথা, প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতে গিয়াই বাহ্য হারাইয়াছেন। তখন রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, তিনি রাধা, কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাইতে স্বীকৃত হইয়া রথে উঠিয়াছেন। প্রভু (রাধা) ভাবিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, এই আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। প্রভু আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছেন। কাজেই কাব্যপ্রকাশের শ্লোক হৃদয়ে উদয় হইয়াছে, আর সেই শ্লোক শুনিয়া রূপ গোস্বামী বুঝিয়াছিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। রূপ কাব্য-প্রকাশের ভাব লইয়া রাধাকৃষ্ণ লীলায় আরোপ করিয়াছেন, করিয়া শ্রীমতী কর্ত্তৃক ইহাই বলাইতেছেন, যথা—"হে কৃষ্ণ, যদিচ তুমি আর আমি দুজনেই এখানে, তবুও আমার সেই বৃন্দাবনের কথা,—যেখানে নিধুবনে তোমায় আমায় প্রথমে দুজনে প্রীতি করি,—মনে পড়িতেছে। এ মিলনে আমি সে মিলনের সুখ পাইতেছি না।"

শ্রীরূপকে দশমাস নিকটে রাখিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ করিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, "একবার সনাতনকে এখানে পাঠাইয়া দিও।" রূপ গৌড়পথে, এ জীবনের মত বৃন্দাবন গমন করিলেন!

কিন্তু সনাতনে ও রূপে প্রভুর ইচ্ছায় দেখা শুনা হয় নাই। প্রয়াগে, রূপ ও অনুপমকে বিদায় দিয়া, প্রভু বারাণসী আসিলেন। আসিয়া সনাতনকে পাইলেন। রূপ ও অনুপম বরাবর বৃন্দাবনে গমন করিলেন। করিয়া আবার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে সনাতন, প্রভুর নিকট বারাণসীতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এমত স্থলে রূপ অনুপম ও সনাতনে পথে দেখা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা হইল না। যেহেতু, একজন রাজপথে আর একজন নির্জ্জন পথে গিয়াছিলেন। রূপ

ও অনুপম বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গৌড়ে আগমন করিলেন, সেখানে অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল। তখন রূপ একক প্রভুর ওখানে গমন করিলেন; করিয়া কি কি করিলেন উপরে বলিয়াছি।

এদিকে সনাতন বৃন্দাবনে যাইয়া শুনিলেন যে, রূপ দেশাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তখন তিনি ফিরিলেন, কিন্তু আর দেশে গমন করিলেন না। প্রভু যে পথে বৃন্দাবন আসিয়াছিলেন ও নীলাচলে গিয়াছেন সেই পথে, অর্থাৎ সেই ঝারিখণ্ড দিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন, পথে যাইতে তাঁহার গাত্রে কণ্ডূ হইল। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, ঝারিখণ্ডের বারি পান করিয়া তাঁহার ব্যাধি হইয়াছিল। তাহাই হউক, কি ইহাও হইতে পারে যে, তিনি পূর্ব্বে নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই পাপের নিমিত্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। সে যাহা হউক, সনাতনের ব্যাধি হইলে তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইল না। লোকে তাঁহাকে সম্রাটের প্রধান অমাত্য বলিয়া বহু মান্য করিত, এখন ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া সকলে অস্পৃশ্য ভাবিবে, কেহ নিকটে আসিবে না, ইহাতেই সনাতনের মনে মহা আনন্দ। সনাতনের এরূপ মনের ভাবের কারণ বলিতেছি। সনাতনের পূর্ণ মাত্রায় চৈতন্যের ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। জগতের আদর ও ঘৃণা তাঁহার নিকট তখন উভয়ই সমান হইয়াছে। যে সমুদায় পাপ করিয়াছেন, সে সমুদায় এখন জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় হৃদয়ে ক্লেশ দিতেছে। কিসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, সেই চিন্তা দিবানিশি করিতেছেন। প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া নিতান্ত আশান্বিত হইয়াছেন বটে, পরকালে যে উদ্ধার পাইবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে মনে গৌরবের সৃষ্টি হয় নাই। প্রভু তাঁহাকে বড় আদর করেন বটে, একথাও বলেন যে, তাঁহার স্পর্শ দেবগণও বাঞ্ছা করেন। কিন্তু সনাতনের মনে সে সব কথা ধরে না। তিনি ভাবেন প্রভু করুণাময়, পাপী উদ্ধারের নিমিত্ত গোলোক ত্যাগ করিয়া ধরাধামে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় অধম জীব লইয়াই প্রভুর ঠাকুরালী। অতএব সনাতনকে যে তিনি আদর করিবেন, তাহা বিচিত্র কি? তাহাতে তাঁহার (সনাতনের) কোন গৌরব নাই, প্রভুরই গৌরব। বরং প্রভু যে তাঁহাকে এত আদর করেন, তাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি অতি অধম, কারণ অধম উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর অবতার।

আবার ইহাও ভাবেন ও দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, যে পরিমাণে তিনি এ জগতে দণ্ড পাইবেন, সেই পরিমাণে তাঁহার পাপক্ষয় হইবে। যে পরিমাণে লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, সেই পরিমাণে প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিবেন। অতএব তাঁহার এই যে কুষ্ঠ হইয়াছে, ইহাতে সনাতনের মন কিছু মাত্র বিচলিত হয় নাই। ভাবিতেছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া রথ-চক্রের নীচে অপবিত্রদেহ নষ্ট করিবেন। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। আপনি এক প্রকার জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে, আর কাহারও নিকট যাইতে অধিকার নাই, তাই তল্লাস করিয়া হরিদাসের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। সনাতন আসিয়া হরিদাসের চরণ বন্দন করিলেন। হরিদাস উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর কখন দর্শন পাইবেন, সনাতন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, স্বয়ং শ্রীপ্রভু ভক্তগণ সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস ও সনাতন উভয়ে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু দেখিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।" প্রভু সহর্ষে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে দুই বাহু প্রসারিয়া ধাইলেন। ধাইলেন কেন, না সনাতন পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন বলিয়া। সনাতন বলিতেছেন, "প্রভু, করেন কি? আমাকে ছুঁইবেন না। একে আমি ঘোর:পাপী, অস্পৃশ্য পামর, তাহার ফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইয়াছে, ও তাহা হইতে ক্লেদ পড়িতেছে।" প্রভু সে সব কিছু শুনিলেন না, বল দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর প্রকৃতই সনাতনের কুষ্ঠের ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া গেল। প্রভু তখন সনাতনকে ভক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, সনাতন সকলের চরণে পড়িলেন। প্রভু ও ভক্তগণ পিঁড়ায় বসিলেন, সনাতন ও হরিদাস দুই জনে পিঁড়ার তলে বসিলেন। তখন সকলে ইষ্ট গোষ্ঠী করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠ রূপ এখানে দশমাস ছিলেন। কিন্তু অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে," ইহাই বলিয়া প্রভু অনুপমের ভক্তির প্রশংসা করিলেন।

সনাতন ভ্রাতৃবিয়োগের কথা পূর্ব্বে শুনেন নাই, এখন শুনিয়া একটু কাতর হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, যত প্রকার অন্যায় ও অধর্ম্ম, আমাদের কুলধর্ম্ম। ইহা সত্ত্বেও তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয়

দিয়াছ। স্বুতরাং আমাদের সমস্তই মঙ্গল। অনুপম, ভাই আমার, বড় ভক্ত ছিলেন। প্রভুর শ্রীমুখ হইতে যে তাঁহার ভক্তির প্রশংসাবাদ শুনিলাম তাহার পোষকতায় এক কাহিনী বলিতেছি। আমার ভাই অনুপম রঘুনাথ উপাসক। আমরা দুই জন, আমি আর রূপ, তাঁহাকে বলিলাম, যদি রসের ভজন করিতে চাহ, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। অনুপম আমাদের অনুরোধে তাহাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু সমস্ত রজনী কাঁদিয়া কাটাইলেন। প্রাতে আমাদের চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না। ইহাতে তাঁহার ভজনের দার্ঢ্য দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলাম।"

প্রভু বলিলেন, "মুরারিকেও আমি ঐরূপ পরীক্ষা করিতেছিলাম। মুরারি রঘুনাথ ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজন করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। শেষে আমার কাছে রঘুনাথ ভজন ভিক্ষা করিলেন।" তাহার পর প্রভু একটী অদ্ভুত কথা বলিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আমরা এখানে ভক্তের গুণানুবাদ করিতেছি, কিন্তু ভক্তের যে ঠাকুর শ্রীভগবান, তিনিও সেইরূপ মহাশয়,—বন্ধু। ভক্ত-সেবক, ঠাকুরকে ছাড়েন না সত্য, আবার ঠাকুরও, যদি সেবক দৈব দুর্ব্বিপাকে বিপথে যায়, তবে তাহাকে চুলে ধরিয়া সৎপথে আনেন।"* প্রভু বলিলেন, "সনাতন, তুমি এখানে হরিদাসের সহিত কৃষ্ণকথায় যাপন কর। তোমরা দুইজনে কৃষ্ণপ্রেম-প্রধান। কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন।"

সনাতন হরিদাসের ওখানে থাকিলেন। গোবিন্দ প্রত্যহ উভয়ের নিমিত্ত প্রসাদ আনয়ন করেন। সনাতন ভয়ে কোথাও যান না, যেহেতু তিনি নীচজাতি, অর্থাৎ তাঁহার জাতি গিয়াছে। দ্বিতীয় তিনি কুষ্ঠগ্রস্ত। হরিদাসের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে গমন করেন না, দূর হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন। সনাতনের মনে সংকল্প রহিয়াছে তিনি রথের চক্রে প্রাণ দিবেন। আবার প্রভু প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, আর আলিঙ্গন করেন, ইহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সেই ক্লেদ লাগিয়া যায়। ইহা সনাতন সহ্য করিতে পারেন না, কাজেই শীঘ্র শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই যেন অব্যাহতি পান, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব হইল।

---

* প্রভু! এই আশ্বাসবাক্য তোমার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব তোমার যেন সে কথা মনে থাকে।

সনাতনের এরূপ মনের ভাব সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর অবশ্য অগোচর নাই। তিনি এক দিবস আসিয়া বলিতেছেন, "সনাতন, শ্রবণ কর। এক কথা তোমাকে বলিব। যদি দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তবে আমি এক মুহূর্ত্তে কোটীবার দেহ ত্যাগ করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া সনাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিতেছেন, "ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ, সে ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নয়, সে তমোধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কোন কারণে স্বহস্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস, ভক্তি কি প্রীতি অতি অল্প! সে তো নিতান্ত স্বার্থপর। সেরূপ ব্যক্তি মনে ভাবে যে আপনাকে দুঃখ দিয়া কৃষ্ণের কৃপা আহরণ করিবে, কিন্তু কৃষ্ণ ত নিষ্ঠুর নহেন। তবে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিতে চাহেন বটে, তাঁহারা কৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না, না পারিয়া মরিতে চাহেন, কিন্তু সেরূপ লোক অতি বিরল, তাঁহাদের পক্ষে নিয়মও অন্যরূপ। যদি কৃষ্ণ-বিরহে কেহ মরিতে চাহেন, কৃষ্ণ অমনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন, হইয়া তাঁহাকে মরিতে দেন না। যাঁহারা আপন প্রাণ দিয়া কৃষ্ণকে জব্দ করিতে চাহেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে জব্দ করিতে পারেন না। অতএব, সনাতন, তোমার আত্মহত্যারূপ এই কুবাঞ্ছা ছাড়, কীর্ত্তন ও ভজন কর, তবে শ্রীকৃষ্ণ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে জাতি বিচার নাই, বরং যাহারা হীন জাতি, তাহাদের ভজন সুলভ হয়। যে হেতু, যাঁহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বড় অভিমানী, আর অভিমানিগণ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে অধিকারী নহে।"

সনাতন তখন চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, আমার সংকল্প প্রভুর গোচর হইয়াছে! আবার আমার সংকল্প প্রভুর অভিমত নহে। প্রভুর ইচ্ছা নহে যে আমি প্রাণত্যাগ করি। প্রভুর আমার উপর এত স্নেহ কেন? এই সকল কথা মনে উদয় হওয়ায় তিনি দ্রবীভূত হইলেন; হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি অন্তর্যামী ভগবান, কৃপালু, সর্ব্ব জীবের প্রাণ, আমাকে মরিতে দিবে না। প্রভু, তুমি আমাকে বাঁচাইতে চাও কেন? আমার ন্যায় ছারের দ্বারায় তোমার কি লাভ হইবে?"

প্রভুও তখন দ্রবীভূত হইলেন। প্রভু কাহারও চক্ষের জল দেখিতে পারেন না। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, বল কি? তোমার দ্বারা আমার কোন কার্য্য হউক না হউক সে আমার বিচারের বিষয়। তোমার

তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। তুমি তোমার এই দেহ আমাকে দিয়াছ, সুতরাং ঐ দেহটী তোমার নহে, আমার; তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহ এ তোমার কি বিচার?"

একটু থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "তোমার দেহকে তুমি ছার বল, কিন্তু আমি ঐ দেহে অনেক কার্য্য সাধন করিব। বৃন্দাবন ও মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান। সেখানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন। আমি তোমাকে সেখানে রাখিব। তুমি বলিতেছ তোমার দেহ কি কাজে আসিবে? তোমার ঐ দেহ দ্বারা কোটী কোটী জীব উদ্ধার পাইবে।" তাহার পর হরিদাসকে বলিতেছেন, "হরিদাস, অন্যায় দেখ। সনাতন তাঁহার দেহটী আমাকে দান করিয়াছেন, এখন উনি উহা নষ্ট করিতে চাহেন। জীবের উপকারের নিমিত্ত ঐ দেহ দ্বারা আমি নানা কার্য্য সাধন করিব। তাহাই তিনি অতি নিষ্প্রোয়জনীয় বলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহেন, আমি ইহা কিরূপে সহ্য করিব?"

সনাতন গদ গদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার হৃদয় আমরা কিছু জানি না। তুমি যাহাকে যেরূপ নাচাও সে সেইরূপ নাচে। যদি তোমার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, এই ছার দেহ দ্বারা তুমি কোন কার্য্য করিবে তবে তাহাই হউক। আমার উহাতে কথা কি?" প্রভু ইহাতেও সম্পূর্ণ আশ্বাসিত হইলেন না। সনাতনের হস্ত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "বল সনাতন, আমার মাথার দিব্য, তুমি আপনার দেহ নষ্ট করিবে না?" সনাতনও তখন অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তিনি সম্মত হইলেন। বলিলেন যে, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব।" প্রভু ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি মনে কি কর, তাহা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরূপে বুঝিব? ইহারা কয়েক ভ্রাতা কোথায় ছিল, কি ছিল? ইহাদিগকে আনয়ন করিলে, করিয়া এখন বলিতেছ, ইহাদিগের দ্বারা অতি মহৎকার্য্য সাধন করিবে। এ তোমার ভঙ্গী আমরা কিরূপে বুঝিব?"

সনাতন বৈশাখ মাসে আসিয়াছেন, প্রভুর সঙ্গে আছেন, তাঁহার নিতি নিতি ভক্তি ও প্রেম বাড়িতেছে। প্রভুর সহিত দিনের মধ্যে একবার মাত্র দেখা হয়, আর প্রভু প্রত্যহই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, আর প্রত্যহই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ক্লেদ লাগিয়া যায়। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ

মাস আসিল, গৌড়ীয় ভক্তগণ শচী মাতার আজ্ঞা লইয়া প্রভুকে দর্শন-নিমিত্ত নীলাচলে আসিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। এক দিন যমেশ্বর টোটায় এইরূপ মহোৎসব হইল। প্রভু সেখানে সনাতনকে না দেখিয়া ডাকিতে পাঠাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে বেলা দুই প্রহরাধিক, সূর্য্যতেজে সকলে ম্রিয়মাণ। সনাতন প্রভুর আহ্বান জানিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তখন তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন।

প্রভু বলিলেন "সনাতন, কোন পথে আসিলে?" সনাতন বলিলেন, "সমুদ্র পথে।" প্রভু বলিলেন, "সেকি? সমুদ্র পথ বালুকাময়, সে পথে এ রৌদ্রে চলা ফেরা করা যায় না। পায়ে অবশ্য ব্রণ হইয়াছে। তুমি কেন মন্দিরের শীতল পথে আসিলে না?"

সনাতন বলিলেন, "কই, আমি তো কিছুই দুঃখ পাই নাই।" প্রকৃত কথা এই যে, প্রভু ডাকিতেছেন, এই আনন্দে, তপ্ত বালুকায় পায়ে যে ব্রণ হইয়াছে তাহা সনাতন জানিতে পারেন নাই। পরে সনাতন বলিতেছেন, "মন্দির পথে আসিতে আমার সাহস হইল না, যেহেতু আমি নীচ, কি জানি কাহাকে স্পর্শ করিব, করিয়া অপরাধী হইব।" প্রভু ইহাতে গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "তুমি যে ইহা করিবে তাহা আমি জানি। তুমি তোমার স্পর্শদানে ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার যদি এরূপ দৈন্য না হইবে তবে তোমার এরূপ শক্তি কিরূপে হইবে? আমি এরূপ দৈন্য চিরদিন বড় ভালবাসি। তাহার পরে যে প্রকৃত মহান্, তাহার যে দৈন্য সে আরো মধুর। ভক্তগণকে তোমার চরিত্র দেখাইবার নিমিত্ত আমি তোমাকে এই দুই প্রহর বেলায় ডাকিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে সমুদ্র পথে কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক আইসে না। কিন্তু তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই শত শত লোকের সম্মুখে তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইহাও সকলে দেখিলেন যে, সনাতনের অঙ্গের ক্লেদ প্রভুর অঙ্গে লাগিয়া গেল!

সনাতন যদিও দিন দিন প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন, তবু তাঁহার মনে দুটী ক্ষোভ রহিয়াছে। তিনি ব্যাধিগ্রস্থ, তিনি যে মহাপাপী তাহার সাক্ষী তাঁহার সেই রোগ, তাঁহার দ্বারা জগতে কি উপকার হইবার সম্ভব? লোকে তাঁহাকে মানিবে কেন? কুষ্ঠগ্রস্থ বলিয়া সকলে ঘৃণা

করিয়া নিকটেও আসিবে না। যে ব্যক্তি মহাপাপী ও সেই নিমিত্ত শ্রীভগবানের দণ্ড পাইয়াছে, তাহার নিকট লোকে ভক্তি কেন শিখিবে, তাহাকে লোকে কেন ভক্তি করিবে?

তাহার পরে প্রভু তাঁহাকে প্রত্যহ আলিঙ্গন করেন, সেও তাঁহার মহা দুঃখ। পাছে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে এই ভয়ে তিনি রাজপথে গমন করেন না; প্রভু তাঁহাকে স্বয়ং বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করেন, তাঁহার ইহা কিরূপে সহ্য হইবে? ইহাও হইতে পারে যে, প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গ ক্লেদময় করিতেন, ইহাও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্লেশের কারণ হইত। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যে সনাতনের কণ্ডূরস লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তাঁহারই মনে অবশ্য ক্ষোভ হইত। অবশ্য সনাতনের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। যে হেতু প্রভু তাঁহাকে বলদ্বারা আলিঙ্গন করিতেন। তবুও সনাতন আপনাকে ভক্তগণের নিকট অপরাধী ভাবিয়া সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকিতেন। অন্যান্য সময় প্রভু, সনাতনকে গোপনে আলিঙ্গন করিতেন, কিন্তু সে দিন সর্ব্ব ভক্ত সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বে সনাতন মরিতে চাহিয়াছিলেন, এখন বুঝিয়াছেন, তাহা হইবে না। যে হেতু সে কার্য্যটা পাপ, আর উহাতে প্রভুর ইচ্ছা নাই। তবে কি করিবেন, অতএব শীঘ্র শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করাই কর্ত্তব্য, ইহাই স্থির করিলেন। সেই নিমিত্ত সনাতন একদিন জগদানন্দকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! এখানে দুঃখ খণ্ডাতেই আসিলাম; ভাবিলাম রথের চাকায় প্রাণ দিব, কিন্তু তাহা হইল না, প্রভু তাহা করিতে দিলেন না। প্রভু আমাকে বলদ্বারা আলিঙ্গন করেন, কত নিষেধ করি কোন মতে শুনেন না, আমার গাত্রের ক্লেদ তাঁহার অঙ্গে লাগে, ইহা আমার কি কাহার সহ্য হয়? কিন্তু করি কি, প্রভু স্বেচ্ছাময়। এখন আমাকে পরামর্শ বল, আমি কি করিব?"

জগদানন্দ, প্রভু ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ভাল মানুষ, বুদ্ধি তত সূক্ষ্ম নয়। সনাতনের ক্লেদ যে প্রভুর অঙ্গে লাগে ইহাও তাঁহার ভাল লাগে না। তাই উপদেশ করিতেছেন, "সনাতন, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, তোমার এখানে আর থাকা উচিত নয়। প্রভু তোমার গোষ্ঠীকে বৃন্দাবন দিয়াছেন, অতএব তুমি এই রথযাত্রা দেখিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।" সনাতন বলিলেন, "এই বেশ যুক্তি, তাহাই আমার করা উচিত।"

জগদানন্দের সঙ্গে আলাপে সনাতন স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহাকে যে প্রভু আলিঙ্গন করেন, ইহা অন্ততঃ কোন কোন ভক্তের সুখকর নহে। ইহাতে তিনি শীঘ্র নীলাচল ত্যাগ করিবার সংকল্প দৃঢ় করিলেন; আর ইহাও সংকল্প করিলেন যে, প্রভুকে আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে দিবেন না। জগদানন্দের সহিত এই কথাবার্ত্তা হইবার পরে প্রভু আসিলেন। সনাতন আর প্রভুর নিকটে গমন করিলেন না, দূর হইতে প্রণাম করিলেন। প্রভু ডাকিতেছেন, "সনাতন, নিকটে আইস।" সনাতন বলিলেন, "নিকটে আর না, এখান হইতেই ভাল।" প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইলেন, আর সনাতন পশ্চাতে হঠিতে লাগিলেন। প্রভু মহা বিপদে পড়িলেন।

কিন্তু প্রভুর সহিত সনাতন পারিবেন কেন? প্রভু, সনাতনকে তাড়াইয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলদ্বারা হৃদয়ে আনিলেন। হৃদয়ে আনিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরে হরিদাসকে ও সনাতনকে লইয়া পিঁড়ায় বসিলেন। যখন প্রভু পার্ষদগণ সহ আসিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হয়েন, তখন হরিদাস ও সনাতন পিঁড়ার তলে বসেন, আর প্রভুর সহিত ভক্তগণ পিঁড়ার উপরে বসেন। কিন্তু এখন সেখানে অন্য কেহ নাই, সুতরাং মর্য্যাদা রক্ষার আর প্রয়োজন নাই, তাই তিন জনে একত্র হইয়া বসিলেন।

এ কিরূপ শ্রবণ করুন। বহিরঙ্গ সম্মুখে স্ত্রী স্বামীকে সমীহা করেন, স্বামীর অতি নিকটে গমন করেন না। নির্জ্জনে শয়নাগারে তাঁহার সে ভাব কিছুই থাকে না। তাই শ্রীভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ, ভক্তের সঙ্গে আর এক সম্বন্ধ। ভক্ত সম্মান চান, যেহেতু তিনি জীব। শ্রীভগবানের সম্মানের প্রয়োজন কি? তিনি না অনন্ত গুণে প্রকাণ্ড? তিনি চান ভালবাসা। যদি স্ত্রী স্বামীর কোলে বসিয়া থাকেন, আর সেখানে কোন বহিরঙ্গ লোক আইসে, তবে তিনি লজ্জা পাইয়া ক্রোড় ত্যাগ করিয়া দূরে বসেন। সেইরূপ যখন শ্রীভগবান হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া পিঁড়ার উপর একত্রে বসিয়া ইষ্ট গোষ্ঠী করিতেছিলেন, তখন যদি কোন ভক্ত সেখানে যাইতেন, তাহা হইলে হয়তো হরিদাস ও সনাতন তখন পিঁড়ার তলে যাইতেন। শ্রীভগবান নিজ জন, হৃদয়ের ধন। শ্রীভগবান স্ত্রী ও স্বামী হইতেও অন্তরঙ্গ। আর এই জ্ঞান, কথায় ও কার্য্যে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু জগতে আবির্ভূত হয়েন।

সনাতন তখন কাতর হইয়া মনের সমুদায় কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রভু, আমি আমার হিত দেখিতেছি না। আসিলাম উদ্ধারের নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদে পদে অপরাধ হইতেছে। একে আমি নানা প্রকারে নীচ, আমাকে কেহ যে স্পর্শ করে সে যোগ্য আমি নই, তাহাতে আবার আমার অঙ্গে কুষ্ঠ। কোথা আমি জীবগণ হইতে দূরে থাকিব, না আমি তোমা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি। লোকে তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করে, কিন্তু আমার অঙ্গের দুর্গন্ধময় ক্লেদ তোমার অঙ্গে লাগে। ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য বড় ক্লেশ পায়েন, পাই-বারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে যে, আমার অঙ্গের ক্লেদ তোমার শ্রীঅঙ্গে লাগিবে? কিন্তু করি কি? তুমি পতিতপাবন, পরম দয়াল, ভাল মন্দ ও চন্দন বিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, তুমি ঘৃণা না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রভু, তোমার হৃদয় আমি একটু বুঝি। তুমি যে এইরূপ দুর্গন্ধ ক্লেদ পর্য্যন্ত অঙ্গে মাখিতে কুণ্ঠিত হও না, তাহার কারণ এই যে, আমাকে ঐরূপ না করিলে পাছে আমি মনে ক্লেশ পাই। কিন্তু প্রভু স্বরূপ বলিতেছি, তুমি যে আমাকে স্পর্শ কর ইহাতে আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাই। তুমি যদি আমাকে আলিঙ্গন কি স্পর্শ না কর, তাহা হইলেই আমার সুখ। তুমি আমাকে মরিতে দিবে না, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব। এখন তুমি আমাকে বিদায় দাও। তুমি আমাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছ, আমি সেখানে যাই, যাইয়া যে কয়েকদিন বাঁচি, সেইখানেই যাপন করি। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত জগদানন্দের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলাম, তিনিও বলিলেন যে আমার এস্থান শীঘ্র ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করাই কর্ত্তব্য।"

সনাতন এইরূপ বলিলে, প্রভু প্রথমে জগদানন্দের প্রতি উগ্র হইলেন। বলিলেন, "বটে! জগদানন্দ বালক, (বটুয়া) তাহার এত স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে তোমাকে উপদেশ দেয়? সেকি তাহার আপনার মূল্য ভুলিয়া গিয়াছে? কি ব্যবহারে, কি পরমার্থে, তুমি তাহার গুরুর তুল্য, তোমাকে সে উপদেশ দেয়, তাহার এত বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে? তুমি প্রবীণ, আমাকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়া থাক, আর আমি সেই সমুদায় উপদেশ বহুমান্য করি, তোমাকে উপদেশ দিতে তাহার সাহস হইল?"

সনাতনের মনে পূর্ব্ব হইতে ক্ষোভ রহিয়াছে, ক্ষোভের কারণ পূর্ব্বে

বলিয়াছি। তিনি প্রভুর এই গৌরবজনক কথা শুনিয়া কোমল হই-লেন না, বরং ব্যথা পাইলেন। তিনি প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিতেছেন; "আজ আমি কে তাহা জানিলাম, আর পণ্ডিত জগদানন্দের সৌভাগ্য জানিলাম। আমাকে প্রভু তুমি ভিন্ন ভাব, তাই আমাকে সম্মান এবং স্তুতি কর; আর পণ্ডিত তোমার নিজ জন, তাই তাহাকে সেই রূপ ব্যবহার কর। আমার এ বড় দুর্ভাগ্য, আমাকে অদ্যাপি তোমার আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না। করি কি, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান।"

যদিও আমার সরল প্রভুকে এ কথা বলা সনাতনের পক্ষে অন্যায়; যেহেতু প্রভু যে তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন সে তিনি বহিরঙ্গ বলিয়া নয়, প্রকৃতই তিনি স্তুতির উপযুক্ত বলিয়া, তবু পুরাতন রাজমন্ত্রীর বাগ্‌জালে সরল প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন। তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছ। আমি যে তোমাকে স্তুতি করি সে তুমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে তোমাকে স্তুতি করায়। জগদানন্দ আমার নিকট তোমা অপেক্ষা প্রিয় নহে। কোথা তুমি, আর কোথায় জগদানন্দ! তুমি শাস্ত্রে ও সাধনে সর্ব্বাংশে প্রবীণ, আর জগদানন্দ বালক। তুমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় উপ-দেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন করিয়াছি। সেই বালক তোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা আমি কিরূপে সহ্য করি? মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। তাহার পরে সনাতন, তোমার দেহ তুমি বিভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু সরল কথা শুনিবে? আমার কাছে তোমার দেহ অমৃত সমান লাগে। তুমি বল, তোমার গাত্রে দুর্গন্ধ, কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতো বোধ হয় না? আমার নাসিকায় তোমার গাত্রের গন্ধ যেন চন্দনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।"

এ কথা ঠিক। যে দিন প্রভু সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন করেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে সনাতনের অঙ্গের দুর্গন্ধ দূরীকৃত হইয়া সুগন্ধির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সনাতন তাহা জানিতে পারেন নাই। অন্য সকলে উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন, আরো শুন। তোমার দেহ তুমি মনে ভাব অতি ঘৃণার দ্রব্য, কিন্তু উহা প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। ওরূপ পবিত্র দেহে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না। আমি সন্ন্যাসী, আমার এখন

বিষ্ঠা চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিত, আমি কিরূপে তোমার দেহকে ঘৃণা করিব। তোমার দেহকে ঘৃণা করিলেই আমি কৃষ্ণের স্থানে অপরাধী হইব।” সনাতন তখন একটু কোমল হইয়াছেন, হইয়া বলিতেছেন, “প্রভু, তাহা নয়। তুমি যত কিছু বলিতেছ এ সমুদায় বাহ্য প্রতারণা, উহা আমি মানিব না। তুমি যে আমাকে ঘৃণা না করিয়া গ্রহণ করিয়াছ তাহার কারণ এই যে, তুমি দীন দয়াল। তোমার কার্য্য আমাদের ন্যায় অধমগণকে কৃপা করা। তোমার ঠাকুরালী কেবল আমাদের ন্যায় পতিতগণকে লইয়া।”

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, “যদি স্বরূপ কথা শুনিতে চাও, তবে তাহা বলিতেছি। আমি আমাকে তোমাদের লালকরূপ অভিমান করিয়া থাকি। যেন আমি তোমাদের মাতা। এমত স্থলে মাতা কি সন্তানের কোন মন্দ, মন্দ বলিয়া দেখে? বালকের লালা প্রভৃতি মাতার সর্ব্বাঙ্গে লাগে, তাহাতে কি তাহার দুঃখ কি ঘৃণা হয়? বরং মহা সুখ হয়।”

হরিদাস বলিতেছেন, “সে যাহা হউক, প্রভু তোমার গম্ভীর হৃদয় আমরা কিছুই বুঝি না। কাহাকে, কি নিমিত্ত, কিরূপ কৃপা কর, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। বাসুদেব তোমার অপরিচিত, অপিচ তাহার গাত্রে যে কুষ্ঠ তাহাও অতি ভয়ঙ্কর। তাহার গলৎকুষ্ঠে তাহার অঙ্গে কীড়াময় হইয়াছিল। তাহাকে একবার মাত্র দর্শন দিলে ও আলিঙ্গন করিলে, করিয়া তাহাকে পরম সুন্দর করিলে। অথচ সনাতন তোমার—” ইহা বলিয়া হরিদাস নীরব হইলেন।

এই হরিদাস ভঙ্গীতে, এত দিনে, তাঁহার মনের ভাব বলিলেন। প্রভু স্বয়ং ভগবান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিলে করিতে পারেন। সনাতন তাঁহার প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাঁহার নিজের, ইহা বরাবর বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন, উহার দ্বারা তিনি অনেক কার্য্য করিবেন। সে দেহ তিনি অনায়াসে ভাল করিলেই পারেন, অথচ ইহা করেন না, কেন? এই সকল কথা হরিদাস পূর্ব্বে মনে মনে ভাবিতেন, এখন সাহস করিয়া প্রকারান্তরে প্রভুকে উহা জানাইলেন। হরিদাস যদিচ এ কথা বলিলেন, কিন্তু সনাতন আপনার পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি ভঙ্গীতে প্রভুকে এ পর্য্যন্ত একবারও বলেন নাই। তুমি আমি এই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে, শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইলে প্রথমেই

বলিতাম, "প্রভু, আগে আমার রোগটী আরাম করিয়া দেও, পরে আর কথা।"

যখন হরিদাস এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে প্রভুর নিকটে সনাতনের নিমিত্ত বলিলেন, প্রভুর উহা বুঝা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি যেন মোটে বুঝিলেন না। বাসুদেব বলিয়া কোন এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার গলৎকুষ্ঠ ছিল, তাহাকে তিনি আলিঙ্গন মাত্র আরোগ্য করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিত বাসুদেবকে • আরাম করিলেন, অথচ পরিচিত সনাতনকে সে কৃপা করেন না, এ সমুদায় কথা তিনি যে বুঝিয়াছেন কি শুনিয়াছেন, তাহা কি সনাতন কি হরিদাসকে বুঝিতে দিলেন না। তিনি পূর্ব্বকার কথা লইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "যে ব্যাক্তি ভক্ত তাহার দেহ অপ্রাকৃত, উহাতে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না। শুন হরিদাস, সনাতনের দেহে এই যে ব্যাধি ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিলেন। যদি আমি এই ব্যাধি দেখিয়া ঘৃণা করিতাম, তবে শ্রীকৃষ্ণের স্থানে অপরাধী হইতাম। সনাতন, তুমি দুঃখ করিও না। আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাহার কারণ এই যে, উহাতে আমি বড় সুখ পাইয়া থাকি। এ বৎসর তুমি আমার এখানে থাকো। বৎসরান্তে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইব।"

এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডূ গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥

চরিতামৃত।

এখন ভক্তগণ, আপনারা বিচার করুন, প্রভু কেন কয়েক মাস সনাতনকে এরূপ দুঃখ দিলেন? তিনিতো অনায়াসে দর্শনমাত্র সনাতনকে আরাম করিতে পারিতেন? কারণ বাসুদেবকে ঐরূপ আরাম করিয়াছিলেন। সনাতনের মনে যেটুকু দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। তাঁহার ব্যাধি হয়েছে বেশ, তিনি মহাপাপী অবশ্য তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে মরিতে দিবেন না, অথচ ব্যাধি আরাম করিবেন না। অধিকন্তু, প্রভু তাঁহাকে সর্ব্ব সমক্ষে মহা সম্মান করিবেন, এমন কি তাঁহার অঙ্গের ক্লেদ লক্ষ্য না করিয়া আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করিবেন, ইহাতে ভক্তগণ প্রভুকে কিছুই না বলিয়া; নিরপরাধ সনাতনকে নিন্দা করেন। অতএব সনাতন সংকল্প করিলেন, এখানে তিনি থাকিবেন

না, শীঘ্র বৃন্দাবনে যাইবেন। তাঁহার মনে এ দুঃখ উদয় না হইলে তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া ওরূপ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহিতেন না। কিন্তু ইহা তিনি কখনও মুখে বলেন নাই যে, "প্রভু আমার ব্যাধিটী ভাল করিয়া দাও।"

প্রভু, সনাতনের দ্বারা জীবকে অনেকগুলি উপদেশ শিক্ষা দিলেন। প্রথম, কুকর্ম্ম করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়, তিনি জীবগণকে দেখাইলেন যে, ভক্ত কখন নীচ হইতে পারে না, তাঁহার অঙ্গে যদি কুষ্ঠও হয়, তবু তিনি পূজার পাত্র। প্রভু যেমন করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি সেরূপ ভাবে কোন ব্যাধিগ্রস্ত ভক্তকে করিতে পারি? প্রভু আরও দেখাইলেন যে, যদিও তিনি সনাতনকে অতীব সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনের দৈন্য হ্রাস না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

আর সনাতনের দ্বারা প্রভু দেখাইলেন যে, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা জানেন যে শ্রীভগবান জীবের মঙ্গলময় পিতা, তাঁহার নিকট কোন বিষয় চাহিতে নাই, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাই সনাতন, স্বয়ং শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইয়া, এক দিনও প্রভুর নিকট আপনার রোগের কথা বলেন নাই। এ সমুদয় দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু সনাতনকে দর্শন মাত্র আরোগ্য করেন নাই। সনাতনের আর এখন কোন কষ্ট নাই, এখন আর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু প্রভুর গণের আপনার সুখ অনুসন্ধানের অনুমতি এই। বৃন্দাবনে যাও, যাইয়া জীব উদ্ধার কর, আপনার আরামের নিমিত্ত এখানে থাকিবে না, ইহা প্রভুর আজ্ঞা। সনাতন আর কিছু কাল থাকিয়া বৃন্দাবনে চলি-লেন; কোন পথে না, যে পথে প্রভু গিয়াছিলেন। সে পথ ও যেখানে তিনি যে লীলা করিয়াছেন প্রভুর সঙ্গী বলভদ্রের নিকট লিখিয়া লইলেন। বিদায়ের সময় হইল, গলাগলি হইয়া প্রভু ও সনাতন রোদন করিতে লাগিলেন।

"দুই জনের বিচ্ছেদ দশা ন যায় বর্ণনা।"

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইয়াছে, তবু প্রভুর ক্ষমতা নাই যে সনাতনকে রাখেন। সনাতনেরও ক্ষমতা নাই যে থাকেন। কারণ তাহা হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। অতএব গৌরভক্তের কর্ত্তব্য জীবের

সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্ত জীবন যাপন করা। সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন, তাহার পরে শ্রীরূপ, যিনি গৌড়ে ছিলেন, তিনিও গেলেন। তাহার অনেক দিন পরে, তাঁহাদের কনিষ্ঠ অনুপমের পুত্র, যাঁহাকে তাঁহারা রাজপাটে রাখিয়াছিলেন, আর দেশে থাকিতে না পারিয়া তিনিও গিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনিও বৃন্দাবনে দৌড়িলেন। তাঁহার নাম শ্রীজীব। পূর্ব্বে সনাতন, সনাতনের পরে রূপ, রূপের পর জীব বৃন্দাবনের কর্ত্তা হইলেন। এই গোষ্ঠী বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিলেন। যে বৃন্দাবন কেবল জঙ্গলময় ছিল, যেখানে প্রভুর চর লোকনাথ ভূগর্ভ প্রথমে যাইয়া কোথা রাসস্থলী খুঁজিয়া পান নাই, সে স্থল সাধুময় হইল। ইহার এক একজন সাধু ভুবন পবিত্র করিতে সক্ষম।

এখানে এই তিন গোস্বামীর কার্য্য বর্ণনা করিয়া শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিব। যথা :—

"দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দুঁহে সব নির্ব্বাহিল॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি॥
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার॥
আর যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন॥
রূপ গোঁসাই কৈল রসামৃতসিন্ধুসার।
কৃষ্ণভক্তি রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর।
কৃষ্ণরাধা-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার॥
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল॥

তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপাম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম॥
সর্ব্বত্যাগী তিঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥
ভাগবত সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবতসিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার॥
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম-লীলারস সার দেখাইল॥
ষট্‌সন্দর্ভ কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দুঁহে বিস্তার করিল।"

দুই ভাই কান্থা ও করঙ্গ সম্বল করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে যাইয়া দেখেন যে, বৃন্দাবনের স্থান ব্যতীত আর কিছু নাই। মুসলমান দস্যুর উৎপাতে পবিত্র স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক মাত্র নাই, কোন দেবালয় নাই, কোন তীর্থস্থানের চিহ্ন নাই, থাকিবার মধ্যে আছে কেবল অসভ্য বনবাসিগণ, যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ধন ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই উজাড় বৃন্দাবন উদ্ধার করা প্রভুর আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা তাঁহারা পালন করেন এরূপ ধন জন কিছুই তাঁহাদের নাই। থাকিবার মধ্যে ছিল কি না প্রভুদত্ত শক্তি। সেই শক্তিই তাঁহাদের ধন জন হইতে অধিক সহায়তা করিল।

তাঁহাদের বৈরাগ্য এরূপ যে, পাছে মায়ায় আবদ্ধ হন তাই দুইভাই এক স্থানে থাকিবেন না; এক বৃক্ষতলে দুই রাত্রি বাস করিবেন না, পাছে সে বৃক্ষের উপর মমতা হয়। শীতে বৃষ্টিতে বৃক্ষতলে বাস, উপবাস করেন তবু ভিক্ষা করিতে যান না। কিন্তু গীতার শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন, তাহা ত জানেন? তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আমি তাহার অন্ন আপন স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া যাই। অর্জ্জুন মিশ্র পাকামী করিয়া এই শ্লোক কাটিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "আমি বহিয়া লইয়া যাইব" একথা কখনো হইতে পারে না। কৃষ্ণ আপনি তাঁহার সুকুমার স্কন্ধে করিয়া অন্ন বহিয়া লইয়া যাইবেন ইহা কি ভাল কথা? ভক্ত একথা কিরূপে লিখিবে? তাই ভক্ত-প্রবর অর্জ্জুনমিশ্র শ্লোক কাটিয়া লিখিলেন, "আমি বহাইয়া লইয়া যাই।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বটে? তুমি বুঝি আমার বড় পদ বাড়াইলে'? আমি আমার এমন ভক্ত, যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া উপবাস করে, তাহার নিমিত্ত অন্ন লইয়া যাই, তাহাতে যে সুখ তাহা অন্যকে কেন দিব? এরূপ অন্ন বহনে যে সুখ তাহা হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব? তাই বলিয়া অর্জ্জুন মিশ্রকে দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই স্বভাব। সেখানে রূপ সনাতন কেন অনাহারে থাকিবেন?

দুই ভাই ছেঁড়া কান্থা স্কন্ধে করিয়া সেই জঙ্গলে গমন করিলেন। ক্রমে দুই একজন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ক্রমে উদিত দিবাকরের ন্যায় তাঁহাদের তেজ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে স্বয়ং সম্রাট আকবর তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিলেন। আকবর আগমন করিলেন, শুধু তাহা নয়, সেই ভারতবর্ষের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত সম্রাট তাঁহাদের চরণে শরণ লইলেন। আকবর ধন দিতে চাহিলেন, সনাতন বলিলেন, "আমরা কৃষ্ণের দাস, আমাদের ধনের অভাব কি?" অমনি আকবর দর্শন করিলেন যে, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন রত্নমাণিক্যে খচিত! আকবর তখন বলিলেন যে, "অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন, আমি সামান্য রাজা, যিনি রাজার রাজা তিনি তোমাদের অধীন।"

যখন এই দুই ভিক্ষুক বৃন্দাবনে গমন করিলেন, তখন সেই জঙ্গলময় স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিচরণ করিত। পরে সেখানে মন্দিরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। গোবিন্দ দেবের মন্দির হইল, মদনমোহনের মন্দির হইল। গোবিন্দের মন্দিরের ন্যায় সুন্দর দেবস্থান জগতে নাই। এখন উহা করিতে গেলে কোটী টাকা ব্যয় হয়। গোস্বামিগণ বৃক্ষতলে বসিয়া এই টাকা সংগ্রহ করেন। আপনারা বলিতে পারেন, সেই ভিক্ষুকগণ এক কোটী টাকা কোথায় পাইলেন?

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আমাদের জাতীয় বস্তু নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং তিনি ব্যতীত এ শক্তি কাহার সম্ভবে? তিনি বলিলেন, "সনাতন বৃন্দাবনে যাও—যাইয়া উহা উদ্ধার কর।" সনাতনের গাত্রে এক ভোট কম্বল ছিল, মূল্য ৩৲ টাকা। প্রভু ইঙ্গিতে বলিলেন, "বৃন্দাবন যাবে, তবে অগ্রে এই তিন মুদ্রার কম্বলখানি পরিত্যাগ কর, তবে বৃন্দাবনে আমার আজ্ঞা পালন করিতে যাইও।" তাই সনাতনের নিঃসম্বল হইয়া যাইতে হইল। রূপ সনাতনের যে অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা দ্বারা

শ্রীবৃন্দাবনে অনেক মন্দির হইত, কিন্তু তাহা হইবে না। প্রভু সে অতুল ঐশ্বর্য্যের এক কপর্দ্দকও লইয়া যাইতে দিলেন না। কাঙ্গালের কাঙ্গাল করিয়া বলিলেন, "যাও এখন বৃন্দাবন উদ্ধার কর গিয়া।" আর তাঁহারা সেখানে যাইয়া শত শত মন্দির করিলেন, তার মধ্যে এমন মন্দির ছিল যাহা প্রস্তুত করিতে কোটী মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

কেন এই দুই ভাই অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, রত্নখট্টার স্থানে বৃক্ষতলে শয়ন করেন? কেন ইহাঁদের কথা লোকে এরূপ মান্য করিতে লাগিল, তাঁহাদের চরণে যথা সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হইল? কেন একজন সম্রাট, যিনি অনায়াসে তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধীন হইলেন? কিরূপে এই দুই ব্যক্তি বিনা সম্বলে এক জঙ্গলের মধ্যে মহানগরীর সৃষ্টি করিলেন? কিরূপে ইহাঁরা সহস্র সহস্র পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসীকে প্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু (যাঁহাকে তাঁহারা কখনও দেখেন নাই) স্বয়ং শ্রীভগবান? ইহার উত্তর এই যে, আমাদের শ্রীপ্রভু সত্য বস্তু, তাঁহার মধ্যে কিছু ভেল্‌কী নাই, সমুদায় খাঁটী। তাই কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্রে, রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ, মনুষ্যে যে শক্তি সম্ভবে না তাহা পাইয়াছিলেন। প্রভুর মধ্যে কিছু ভেল্‌কি থাকিলে, তিনি সনাতনকে সেই কম্বলখানি ফেলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেন না। তাহা হইলে তিনি রূপ সনাতনের অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইতেন না। তিনি ভেল্‌কী হইলে রূপ সনাতনের ঐশ্বর্য্য দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে মন্দির স্থাপন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদাসের কি শক্তি তাহা অনুভব করুন। এই দুই কাঙ্গাল দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু বৃন্দাবনের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগর সৃষ্টি করাইলেন।

এখন রামানন্দ রায়ের মহিমা কিছু বলিব।

প্রভুর জ্ঞাতি শ্রীহট্টবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। ইচ্ছা যে, প্রভু তাঁহার সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুম্ব, প্রভুর উপর তাঁহার অধিকার আছে। প্রভু তো কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য আর কিছু বলেন না, তাই কাজেই প্রভুর কাছে যাইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনাও।" প্রভু বলিলেন, "আমি কৃষ্ণ-কথা বলিতে জানি না, উহা রায় রামানন্দ জানেন, আর আমি তাঁহার কাছে শুনিয়া থাকি। তোমার কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে বড় ভাগ্যের কথা,

তাঁহার কাছে যাও।” ইহাই বলিয়া প্রভু সেই সরল পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ-টিকে বিদায় করিয়া তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রদ্যুম্ন করেন কি, রামানন্দ রায়ের নিকট চলিলেন, যাইয়া ভৃত্য মুখে শুনিলেন যে তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরে সভায় আসিবেন। ভৃত্য যত্ন করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, মিশ্র মহাশয় বসিয়া আছেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “রামানন্দ রায় এখন কি করিতেছেন?” ভৃত্য কহিলেন, “তিনি দেবদাসীগণকে অভিনয় শিখাইতেছেন।” প্রদ্যুম্ন ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভৃত্য তাঁহাকে সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন। ভৃত্য বলিলেন যে, রায়ের নিজকৃত নাট্যগীতি আছে, তাহার নাম জগন্নাথবল্লভ। শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় হয়। সেই নিমিত্ত, মন্দিরে যে দেবদাসীগণ আছে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী ও যুবতীগণকে লইয়া, রামরায় তাঁহার নিভৃত নিকুঞ্জে, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দেন। সে দিবস দুইজন দেবদাসী লইয়া অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন। তিনি কিরূপ শিক্ষা দিতেছেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ কথিত আছে:—

“তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥”

রায় নিভৃত স্থানে এই সমুদায় কাণ্ড করিতেছেন। মিশ্রঠাকুর সভায় বসিয়া এই সমুদায় কথা শুনিলেন, শুনিয়া অবাক হইলেন!

অবশ্য রায়ের প্রতি মনে মনে তাঁহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। একটু পরে রামরায় আসিলেন। আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া মিশ্রের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। রামরায়ের কাণ্ড শুনিয়া মিশ্রের আর তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে রুচি হইল না। তিনি দুই চারিটি বাজে কথা বলিয়া পলায়ন করিলেন।

প্রদ্যুম্ন আবার প্রভুর নিকট উপস্থিত। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃষ্ণ-কথা শুনিলে?”

প্রদ্যুম্ন বলিলেন যে, তাঁহার ভাগ্যে উহা ঘটে নাই। তাহার পরে আস্তে আস্তে প্রকারান্তরে রামরায়ের কুৎসা গাইতে লাগিলেন; বলিলেন “প্রভু, তোমার রামরায়কে তুমি জানো, আমাদের কিন্তু তাহার কার্য্যপ্রণালী সব

ভাল লাগে না। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতী লইয়া, নির্জ্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, অঙ্গ মার্জ্জন করান, আর অভিনয় শিক্ষা দেওয়া, এ সব ক্রি বড় ভাল কাজ হইল ?" প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রভুর কৃপাপাত্র ব্যতীত কেহ বুঝিবে না যে, কিরূপে নাটক অভিনয় করিতে হয়, তাহা দেবদাসী-গণকে শিক্ষা দেওয়া শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার একটা কার্য্য ! স্থূল কথায় ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। ' লোকে নাট্যশালা করে, করিয়া উহা হইতে আনন্দ অনুভব করে। সংগীত দ্বারাও উহাই করে। লোকে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। যাঁহারা কৃষ্ণের অধীন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ মমতা কি প্রীতি করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা করে যে তাঁহাকে এই সমুদায় আনন্দের আস্বাদ করান। যত ভাল ভাল দ্রব্য আছে, স্ত্রী তাহা স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামরায় কবি, কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ, আপনি নাটক করিয়া নাট্যশালা করিয়া কৃষ্ণকে উহা দেখাইবেন শুনাইবেন, —সেই নিমিত্ত, যেন রসাভাস না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়, তাই দেবদাসী-গণকে শিক্ষা দিতেছেন। সুন্দরী ও যুবতী কেন বাছিয়া লইয়াছেন, না—তাঁহা-দিগকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপী সাজিতে হইবে। তাঁহাদিগের রূপ না থাকিলে যে রসাভাস হইবে ! যিনি কুরূপা, তিনি কি শ্রীমতী রাধিকা সাজিতে পারেন ?

রামানন্দের যে এই ভজন, ইহাই সর্ব্বোত্তম ; ইহা হইতে সূক্ষ্ম সুপবিত্র সুধাময় ভজন আর হইতে পারে না। এ ভজন জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও ছিল না, কেবল বৈষ্ণবগণের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই কবিতাটি আছে যথা :—

পূর্ণ চাঁদ আলা, বন ফুল মালা,
বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দুর্ব্বারি, রস কবিতার,
পদ্ম-ফুল মকরন্দ ॥
সুস্বর, সুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ,
সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ।
প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাসি আর,
লজ্জা, আলিঙ্গন, মান ॥
এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বরে।

বলরাম দীন, নীরস কঠিন,
কি দিয়া তুষিবে তাঁরে ॥

জীব আপন প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে শ্রীভগবানকে ভজন করে। কেহ একটী জীব হত্যা করিয়া তাহার রুধির ভগবানকে দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চান। কেহ তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া ভুলাইতে চান; বলেন "তুমি বড় দয়াল, তুমি বড় মহাজন" ইত্যাদি। কেহ বা আপনার পাপের নিমিত্ত কান্দিয়া আকুল হয়েন, মনে ভাবেন তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া ভগবান তাহার দোষ ভুলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যেমন ভগবান তেমন তাহার ভজন। যে প্রভু লোভী মাংসাশী তাঁহাকে রুধির দিতে হইবে। যে প্রভু দাম্ভিক, অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ও নির্ব্বোধ, তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া নানা রূপ বঞ্চনা করিয়া ভজনা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আর একরূপ, তিনি কি তাহা বলিতেছি।

আমাদের যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সরল, সুবোধ, সুরসিক, দয়ালু, অক্রোধ, পরমানন্দ, স্নেহশীল, স্বার্থশূন্য। এরূপ বস্তুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা একটু ভাবিলেই স্থির করা যায়, আর সেই ব্যবহারই আমাদের ভজন। গোপীগণ করেন কি না, এরূপ বস্তুকে কবিতার রসদ্বারা এবং স্নেহ, আলিঙ্গন, মান প্রভৃতি দ্বারা ভজন করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে গীত শ্রবণ করান, কবিতার রস আস্বাদন করান। সুতরাং রামানন্দ রায় যে শ্রীকৃষ্ণকে নাটকাভিনয় দেখাইবেন তাহার বিচিত্রতা কি? তাই রামানন্দ বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতী ও রসিকা দেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন না তাহাদিগকে ব্রজগোপী, কৃষ্ণের প্রণয়িনী সাজিতে হইবে। যিনি কৃষ্ণের প্রণয়িনী তিনি যদি কুরূপা, কুশীলা কি কঠিনা হয়েন তবে তাহা বড় অস্বাভাবিক হয়। রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, তাই সেবাটী যাহাতে ভাল হয় তাহাই করিতেছেন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কি শুন নাই যে, যাঁহারা বৃন্দাবনের ভজন করেন তাঁহাদের হৃদ্‌রোগ কি কাম-রোগ থাকে না? রামরায় নির্ব্বিকার, তাঁহার হৃদয়ে বিকার নাই। তুমি আবার যাও, যাইয়া বল যে আমি তোমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া দ্রুতবেগে রামরায়ের নিকট আবার উপস্থিত হইলেন; হইয়া বলিতেছেন যে, "আমি প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে

চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমি উহা জানি না, তবে রামরায়ের কাছে শুনিয়া থাকি। আপনার এত বড় মহিমা। আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপনার নিকট প্রভু পাঠাইয়া দিলেন।”

রামরায় ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, “প্রভু আমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করেন বটে, কিন্তু যিনি শ্রবণ করেন তিনি আবার আমার মুখে বক্তা। যাহা হউক, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব, আমি যাহা জানি আপনাকে বলিব। এখন আপনি বলুন আপনি কি কৃষ্ণ-কথা শুনিবেন?”

ব্রাহ্মণ ইহার কি উত্তর করিবেন, কৃষ্ণ-কথা বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন, বস্তু কি তাহা জানেন না। তাই দীন ভাবে বলিতেছেন, “আমি প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই উত্তর করুন।” তখন রামরায় একটু ভাবিয়া কৃষ্ণ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথায় কথায় রস উঠিল, রামরায় ভাসিয়া চলিলেন, সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঠাকুরও চলিলেন। রসপানে উভয়ের বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। শেষে বেলা যায় দেখিয়া, ভৃত্য আসিয়া রামরায়কে এক প্রকার বল দ্বারা উঠাইয়া লইয়া গেল।

কৃষ্ণ-কথা কি, ব্রাহ্মণ ঠাকুর জানিতেন না। কিন্তু পাঠক, আপনি কি জানেন, উহা কি? কৃষ্ণ-কথায় এমন কি আছে যে উহা বলিতে কি শুনিতে জীব বিহ্বল হয়? শ্রীভগবান্ “পুরুষোত্তম,” “নরোত্তম”, “সর্ব্বাঙ্গসুন্দর”, তাঁহার সকল গুণ আছে, গুণ আছে পূর্ণ মাত্রায়, অথচ দোষের লেশ মাত্র নাই। এরূপ বস্তু লইয়া আলোচনা করিবার বিষয়ের অভাব নাই। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখ যে, চক্ষুর অগোচরে কীট কেমন সুন্দর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার একটী দেহ আছে, দেশ আছে, ঘর আছে, স্ত্রী পুত্র আছে, অথচ সে বস্তুটী নয়নের অগোচর। ইহা দেখিলে, যে কারিগর উহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভালবাসার ন্যায় অনির্ব্বচনীয় একটী ভাবের উদয় হয়। আবার এই জগৎ নিরীক্ষণ কর দেখিবে, তিনি যেমন কীটাণু সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি অননুভবনীয় প্রকাণ্ড বস্তুও সৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সকলে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে, কাহার সাধ্য অন্যথা করে। যখন এই সমুদায় মনে চিন্তা কর, তখন এই সমুদায় বৃহৎ বস্তু স্রষ্টার উপর আর এক প্রকার ভালবাসার

ন্যায় ভাবের উদয় হয়। কবিকর্ণপূর বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের সৃষ্টি প্রক্রিয়াদি বিচারে তত সুখ নাই, যত তাঁহার হৃদয় বিচারে আছে। অতএব শ্রীভগবান যে খুব ক্ষমতাবান এ তাঁহার বড় মহিমা নহে। তাঁহার বড় মহিমা এই যে তিনি অতি মধুর প্রকৃতি। এক জন দিব্য কারিগর, বেশ পুতুল গড়িতে পারেন। কিন্তু তিনি আবার এমনি দয়ালু যে পরদুঃখ দেখিলে আমার প্রভুর মত উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠেন। এখন বিবেচনা করুন সেই ব্যক্তির কোন্ গুণ বিচারে অধিক সুখ। তাঁহার কারিগরি বিচারে, না তাঁহার হৃদয় বিচারে? শ্রীকৃষ্ণের কারিগরি আলোচনাকে যদিও কৃষ্ণ-কথা বলে, কিন্তু সে নিকৃষ্ট। প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা কি, না শ্রীকৃষ্ণের অন্তর বিচার ও চর্চ্চা করা; কারণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর পবিত্র, সরল ও সমুদয় উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

আমার ভালবাসার অনেকগুলি বস্তু আছে, তাহাদের নিমিত্ত আমি অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে পারি। কিন্তু তাহারা সকলে স্বার্থপর ও মলিন। আমার শ্রীকৃষ্ণ কেবল নিঃস্বার্থ নিজজন। আমার কৃষ্ণ আমায় প্রতিপালন করেন, অথচ তাঁহার ভাব যেন আমিই তাঁহার প্রতিপালক। আমি তাঁহার নিকট সকল বিষয়েই ঋণী, কিন্তু তাঁহার ভাব যেন তিনিই আমার কত ধার ধারেন। আমার কৃষ্ণকে যদি আমি একবার স্মরণ করিলাম, তবে যেন তিনি কৃতকৃতার্থ হইলেন। অথচ তিনি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলেন না। আমি শ্রীকৃষ্ণের একটী চিত্র দেখিয়াছিলাম। বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার বোধ হইল যেন তিনি অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছি, তিনি যেন আমার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মনে মনে কি প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন। আমি স্বার্থপর জীব, আমার মনে একটু কষ্ট হইল। ভাবিলাম যে, আমি তাঁহার শ্রীবদন এক মনে দর্শন করিতেছি, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না, আপনার মনে কি ভাবিতেছেন। তখন হঠাৎ একটী কথা মনে হইল। তখন আমার মনে উদয় হইল যে, তা বটে, শ্রীকৃষ্ণের অন্যমনস্ক হইবার কথাই বটে। ঘাড়ে তাঁহার কত বড় সংসার! এ ত্রিজগতকে ত পালন করিতে হইবে? এইরূপে যখন আমার হৃদয়ে "অন্যমনস্ক কৃষ্ণ" উদয় হয়েন, তখন আমি তাঁহাকে আর বিরক্ত করি না, পাছে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত হয়। আবার ইহাও কখন বোধহয় যে, যেন শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবিতেছেন,

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন ছল ছল করিতেছে, তখন মন কি করে একবার ভাবিয়া দেখুন।

শ্রীনন্দনন্দনে, ভজিনু কি ক্ষণে, কান্দি কান্দি কান্দি মনু।
তাঁর দুঃখ দেখি, মোর দুঃখ সখি, সকলি ভুলিয়া গেনু॥

মনে ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণের নয়নে জল, ইহা কে সহ্য করিতে পারে? ইচ্ছা করিতেছে যে জলপূর্ণ রাঙ্গা আঁখি মুছাইয়া দিই। আবার ভাবি যে, না, তাহাতে রসভঙ্গ হবে। এই যে গোপনে রোদন করিতেছেন, হয় ত আমি কাছে গেলে তিনি লজ্জা পাইবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে যেন শ্রীকৃষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া দেখিলেন যে আমিও রোরুদ্যমান অবস্থায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় লজ্জা পাইলেন, পাইয়া পীতাম্বর দিয়া তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিলেন, আর আমার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত বদনে মধুর হাস্য আনিলেন।

কথা কি, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার যাহা পর্য্যালোচনা কর তাহাই মধুর। তাঁহার দর্শন মধুর, তাঁহার গন্ধ মধুর, তাঁহার চরিত্র মধুর। তাই কবি বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন :—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্ম্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

সখীগণ শ্রীরাধার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিতেন। চণ্ডীদাসের প্রথম পদই এইরূপ কৃষ্ণ-কথা। যথা "কেবা শুনাইল" গীতের অনুবাদে রাধা বলিতেছেন, "সখি! শ্যাম-নাম আমাকে কে শুনাইল? কত কথা কত নাম শুনি, এক কাণে শুনি অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্যাম-নামের কি অদ্ভুত শক্তি? যেই নামটী শুনিলাম, অমনি আর এক কাণ দিয়া বাহির না হইয়া, হৃদয়ে বসিয়া গেল। না হয় সেই নাম হৃদয়ে চুপ করিয়া থাকুন। কিন্তু হৃদয়ে যাইয়া আমাকে অস্থির করিলেন। আমার মুখে এখন কেবল কৃষ্ণ-নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। নামে এত মধু যে বদন ছাড়িতে চাহে না।" রাধা এইরূপে কৃষ্ণ-কথা বলিতেছেন আর আনন্দে গলিয়া পড়িতেছেন, আর যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ রসে পরিপ্লুত হইতেছেন। এই গেল প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা।

এই গেল প্রভুর শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রতি ব্যবহার। এখন ছোট হরিদাসকে প্রভুর দণ্ড করিবার কথা শ্রবণ করুন। প্রভুর নিকট দুই হরিদাস

বাস করেন, ছোট ও বড়। বড় হরিদাসকে সকলে চিনেন। ছোট হরিদাস উদাসীন, কীর্ত্তনীয়া। প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া থাকেন। একদিন শ্রীভগবান্ আচার্য্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ভিক্ষায় বসিলে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এরূপ সূক্ষ্ম তণ্ডুল কোথায় পাইলে?" আচার্য্য বলিলেন যে, "মাধবী দাসীর নিকট এই তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছি।" প্রভু বলিলেন, "কে আনিল?" আচার্য্য বলিলেন যে, "ছোট হরিদাস।" প্রভু তখন আর কিছু বলিলেন না। তবে বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, "ছোট হরিদাসকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।"

ইহাতে ছোট হরিদাস মর্ম্মাহত হইলেন। অন্য সকলেও ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তখন প্রভুর কাছে সকলে তাঁহার ক্ষমার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। হরিদাস মাধবীদাসীর নিকট তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছেন, প্রভু সেই উপলক্ষ করিয়া বলিলেন যে, সে উদাসীন, তাহার প্রকৃতি সম্ভাষণ নিষেধ, অতএব সে দণ্ডার্হ। ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এখানে শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিব :—

"তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিলেন প্রভু পাশ॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বারমানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

এখন এ পর্য্যন্ত সমুদায় বুঝা গেল, কিন্তু মাধবী দাসীতো প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি নহেন। তিনি যদিও স্ত্রীজাতি, কিন্তু একে বৃদ্ধা, তাহাতে রমণীর শিরোমণি। এই মাধবীর মহিমা শ্রবণ করুন্ :—

"মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥

সরূপ গোসাই আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি তিন, তার ভগিনী অর্দ্ধজন॥”

হরিদাস এই মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। তবে তাঁহাব এত কি অপরাধ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক তবু বৃদ্ধা, আবার এদিকে পরম পণ্ডিতা। এমন কি, লোকে তাঁহাকে এক প্রকার পুরুষ বলিয়া মানিত। তাঁহাদের কাহিনী চতুর্থ খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাঁহার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করায় এমন কি অপরাধ? অবশ্য, সন্ন্যাসীর প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ নিষেধ, কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ কোন কুকার্য্য হইতে পারে না। এটী কেবল শাসন বাক্য, আর কিছুই নয়। রাম রায় যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া নিভৃতে অনেক সময় বাস করেন, তাহাতে দোষ হয় না। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া হরিদাসের কি এত অপরাধ হইল? বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সম্ভাষণ যে একেবারেই না করিতেন এরূপ নহে। তাঁহার মাসী কি অদ্বৈতগৃহিণী, ইহাঁদের নিকট এ সমুদায় নিয়ম বড় একটা পালন করিতেন না, সেথানে হরিদাসকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন?

প্রভু হরিদাসকে ত্যাগ করিলে সকলে তাঁহার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে এক বৎসর গেল। তখন হরিদাস নীলাচল ত্যাগ করিয়া প্রয়াগে গমন পূর্ব্বক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সমুদয় কাহিনী পড়িলে একটু মনে মনে বোধ হয় যে, প্রভু ছোট হরিদাসকে যে দণ্ড করেন, উহা একটু অধিক হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বলিতেছি। প্রভুর সঙ্গে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী, ইহাদের ভালমন্দের নিমিত্ত প্রভু দায়ী। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ পতিত হয়েন, তবে তাঁহারাই যে শুধু মারা যান এরূপ নহেন, জীব উদ্ধারের ব্যাঘাত হইবে। প্রভুকে লইয়া তখন সমস্ত ভারতবর্ষে চর্চ্চা হইতেছে। প্রভুর ভক্তগণকে লইয়াও সেইরূপ। হরিদাস অল্প বয়স্ক যুবক। ঝোঁকের উপর সন্ন্যাসী হইয়াছেন, অথচ চরিত্র বিষয়ীর মত। প্রভুর উহা সহ্য হয় না, তাই ধর্ম্ম-স্থাপন ও জীব উদ্ধারের নিমিত্ত হরিদাসকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য ভাবিলেন। তাঁহার প্রতি দণ্ড কঠিন কি লঘু হইয়াছিল তাহা তাঁহার অপরাধ

না জানিলে নির্ণয় করা যায় না। তিনি যে মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করেন, সে অবশ্য উপলক্ষ মাত্র। অপরাধ অবশ্য আরও কিছু ছিল। কারণ প্রভুর শ্রীমুখের বাক্যে তাহাই বোধহয়। হরিদাসের বৈরাগ্য "মর্কট বৈরাগ্য" তিনি "ইন্দ্রিয় চরাঞা" বেড়ান, ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর কোন বিষয় অগোচর ছিল না। হরিদাস দৌর্ব্বল্যবশত সন্ন্যাসী হইয়াও "ইন্দ্রিয় চরাই-তেন" তাই দণ্ড পাইলেন, মাধবীর নিকট যে তণ্ডুল ভিক্ষা উহা উপলক্ষ মাত্র। হরিদাস নিজে তাহা বুঝিয়াছিলেন, আর সেই অনুতাপানলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ছোট হরিদাস সাধু, মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁহাকে লইয়া আমি বিচার করিতে পারি না। তবে মহাপ্রভুর এই লীলার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ঠাকুর দেখিলেন যে, এই যুবক-সন্ন্যাসী, তাঁহার এই নিত্য পার্ষদ, তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য হয় নাই ও তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগাভিলাষী হইয়া উহার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাকে দণ্ড করিলেন। আর হরিদাস মনস্তাপে দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কি হইল? প্রভুর বৈরাগী ভক্তগণের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। যথাঃ—

"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥"

কথা এই, সংসার ত্যাগ করিতে না পার, করিও না। সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণ-ভজন কর। যদি সংসার ত্যাগ করিবে তবে আর মর্কটবৈরাগ্য করিয়া আপনাকে, অন্য জীবকে, ও শ্রীভগবান্‌কে বঞ্চনা করিও না। শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভু স্বয়ং উদাসীন, প্রভু তাঁহাকে বল করিয়া সংসারে প্রবেশ করা-ইলেন। কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে লোকে আর বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিবে না। আবার হরিদাস বৈরাগী, প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। কারণ, দেখিলেন যে, বৈরাগিগণের মধ্যে যে কঠোর নিয়ম তাহা শিথিল হইতেছিল। মনে ভাবুন, হরিদাসকে দণ্ড করিলেন; আর শ্রীনিত্যানন্দকে কৌপীন ছাড়াইয়া আবার পট্টবস্ত্র পরিধান করানো, সেও এক প্রকার দণ্ড। এ দুই কার্য্যের এক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জীবের মঙ্গল। শ্রীনিত্যানন্দের সংসার-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই। হরিদাসের দণ্ডে লোকে বুঝিল যে, কৃষ্ণ-ভজনে প্রবঞ্চনা চলিবে না।

এখন, হরিদাসের প্রতি প্রভুর প্রকৃত দণ্ড হইল, কি অনুগ্রহ হইল, তাহা শ্রবণ করুন। হরিদাস গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাহাতে তাঁহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশয়, প্রভুর সহিত ভারতী গোসাঞির প্রথম মিলন স্মরণ করুন। ভারতী গোসাঞি চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়া প্রভুকে প্রথমে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর উহা ভাল লাগিল না। কৃষ্ণ-ভজনে এ সমুদায় প্রতারণা কেন? প্রভুর সম্মুখে ভারতী গোসাঞি চর্ম্মের অম্বর পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া। প্রভু বলিতেছেন, কৈ, ভারতী গোসাঞি কোথায়?" ভক্তগণ বলিতেছেন, "ঐ যে তোমার আগে।" প্রভু বলিলেন, "ইনি কখনো ভারতী গোসাঞি হইতে পারেন না। ভারত গোসাঞি কেন চর্ম্মাম্বর পরিধান করিবেন? কৃষ্ণ-ভজনে বাহ্য প্রতারণা নাই।" এই কথা শুনিয়া ভারতী তাড়াতাড়ি চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। যেরূপ প্রভু ভারতী গোসাঞির চর্ম্মাম্বররূপ বাহ্য প্রতারণা ঘুচাইলেন, সেইরূপ ছোট হরিদাসের বাহ্য প্রতারণা স্বরূপ যে মলিন দেহ, তাহা ঘুচাইলেন, ঘুচাইয়া দিব্য দেহ দিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। হরিদাস দেহত্যাগ মাত্রই দিব্য, পবিত্র, চিন্ময় দেহ পাইলেন। পাইয়া অমনি প্রভুর নিকট আসিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুর পার্ষদ হইলেন, হইয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রভুকে দিব্যদেহে কীর্ত্তন শুনাইতেন, আর উহা ভক্তগণ পর্য্যন্ত শুনিতেন। যথা চরিতামৃতে ঃ—

> "হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।
> *　　*　　*　　*
> মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
> *　　*　　*　　*
> আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।

কথা এই, হরিদাস যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথা গিয়াছেন, কেহ ইহা জানিতেন না। হঠাৎ ভক্তগণ অন্তরীক্ষে গীত শুনিতে লাগিলেন। স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, হরিদাস গাহিতেছেন। দেহ দেখিতে পান না, কেবল তাঁহার গীত শ্রবণ করেন। অতএব প্রভু যেরূপ হরিদাসকে ভক্তগণ সমক্ষে দণ্ড করিলেন, আবার সেই ভক্তগণকে দেখাইলেন যে, তিনি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া আবার কৃপাপাত্র করিয়াছেন, করিয়া প্রভুর

নিজের গায়করূপ মহাপদ দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছিলেন, "ছোট হরিদাস আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।"

প্রভু ছোট হরিদাসকে দণ্ড করিলেন। এখন স্বয়ং প্রভুকে দামোদর যে দণ্ড করিলেন তাহা শ্রবণ করুন। ইহাঁরা পঞ্চভ্রাতা, সকলেই উদাসীন। তাহার মধ্যে দামোদর ও শঙ্কর উভয়কে আমরা ভাল করিয়া জানি। শঙ্কর প্রভুর শেষ লীলায়, প্রভুর পদদ্বয় হৃদয়ে ধরিয়া নিদ্রা যাইতেন। দামোদর প্রভুর অতি নিজজন, এমন কি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবক। আবার জীব দামোদরের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ তাহা অপরিশোধনীয়। মুরারির কড়চা,—যাহার দ্বারা প্রধানত আমরা প্রভুর লীলা জানিতে পারি,—দামোদরের লেখা। মুরারি মুখে ঘটনাগুলি বলেন, আর দামোদর উহা শ্লোকবদ্ধ করেন। ইহাঁর এক গুণ যে, ইনি স্পষ্টবাদী। প্রভুকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট কথা বলিতে ছাড়েন না। একটী উড়িয়া ব্রাহ্মণশিশু প্রভুর নিকট আইসে, তাহার স্বভাব বড় মধুর। প্রভু স্বয়ং চিরদিন বালকের ন্যায়, কাজেই বালকের সঙ্গ বড় ভাল বাসেন। সে আসিলে তাহার সঙ্গে দুই একটা মধুর কথা বলেন। বালক প্রভুর প্রীতিবাক্য পাইয়া অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসে। কিন্তু দামোদরের ইহা ভাল লাগে না।

ইহার কারণ যে, সে বালক পিতৃহীন, ও তাহার মাতা অল্প বয়স্কা। দামোদর চুপে চুপে চোক পাকাইয়া সেই বালককে বলেন, "তুই এখানে প্রত্যহ আসিস্ কেন? আর আসিস্ না।" সে বালক তাহা শুনিবে কেন? প্রভুর মাধুর্য্য ও মধুর বাক্য তাহাকে আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রীতি করে যে পিতা, তাহার তাহা নাই। সে কাজেই আসিতে থাকিল। দামোদরের এইরূপ অন্তরে মহাকষ্ট, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। একদিন আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বালক উঠিয়া গেলেই বলিতেছেন, "গোঁসাঞি, এই অবধি সমস্ত পুরুষোত্তমে তোমার যশ প্রচার হইবে।" প্রভু দেখেন যে দামোদর রাগে গর গর। সরল প্রভু বলিতেছেন, "কিহে দামোদর, তুমি রোষ করিয়াছ বোধ হয়। আমার অপরাধ কি?"

তখন দামোদর বলিতেছেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার আবার বিধি নিষেধ কি? তবে জগত বড় মুখর। এই যে বালকটী উঠিয়া গেল উহার চরিত্র বড় মধুর। উহাকে যে তুমি কৃপা কর ইহাতে তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকের একটী মহৎ দোষ আছে যেহেতু তাহার মাতা বিধবা, যুবতী ও

সুন্দরী। আর তোমারও একটী দোষ আছে যে, তুমি যুবা ও পরম সুন্দর। এরূপ কার্য্য করিতে নাই, যাহাতে লোকে কাণাকাণি করে।”

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, আর মনে মনে আপনার ঘাইট মানিয়া লইলেন। তাহার কিছুকাল পরে, প্রভু দামোদরকে ডাকাইয়া বলিলেন, “দামোদর! তোমার ন্যায় নিরপেক্ষ সুহৃদ আমার আর নাই। আমার মাতাকে রক্ষা করার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। তুমি নবদ্বীপে যাও, যাইয়া মাতার নিকটে থাকিও, থাকিয়া আমার কথা তাঁহাকে বলিয়া তাঁহাকে শান্ত রাখিও।”

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুইজনে প্রভুর বাটীতে থাকেন, তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভৃত্য ঈশান। প্রভুর ইচ্ছা যে, আর একজন লোক এরূপ থাকেন যিনি তাঁহার সংবাদ বাড়ীতে ও বাড়ীর সংবাদ তাঁহার নিকট আনিতে পারেন। তখন এরূপ সাব্যস্ত হইল যে, দামোদর শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর বাড়ী যাইবেন। যখন ভক্তগণ রথ উপলক্ষে নীলাচলে আসিবেন তখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে আসিবেন, যখন তাঁহারা প্রত্যাগমন করিবেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। দামোদর যখন চলিলেন, তখন প্রভু জননীর নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইলেন। আর নানা কথা বলিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে আবার যখন দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শচীমাতা প্রভুর নিমিত্ত নানা সামগ্রী পাঠাইলেন, আর কত কথা বলিয়া দিলেন।

এইরূপে দামোদর দ্বারা প্রভু তাঁহার জননী ও ঘরণীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। যখন দামোদর আসিতেন, তখন শচী নিমাই আগমনের সুখ পাইতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াও সেইরূপ সুখ পাইতেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার অর্থ কড়ির প্রয়োজন ছিল না, বহুতর ভক্তে তাঁহাদের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতেন। প্রভু পাঠাইতেন প্রসাদ, প্রসাদী বস্ত্র, ও দেবীর নিমিত্ত সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাড়ী। দামোদর সেই সমুদায় উপঢৌকন লইয়া আসিলে, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া সেই উপঢৌকনের প্রত্যেক বস্তুতে প্রিয়মিলন সুখ পাইতেন। এইরূপে শচী দামোদরকে লইয়া বসিয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতেন, আর শ্রীমতী আড়ালে বসিয়া সমুদায় কথা শ্রবণ করিতেন। এই নিমাই-কথায় তাঁহাদের দিবানিশি সুখে যাইত।

আবার যখন দামোদর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, প্রভু তাঁহাকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া বাড়ীর সমুদায় কথা শুনিতেন। শ্রীভগবানের নর-

লীলার মধ্যে সাংসারিকী লীলা সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণ লইয়া বিব্রত, সকলে কোলে উঠিতে চায়। কেহ ক্রন্দন করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন; কাহাকেও কোলে লইয়া বেড়াইতেছেন, বা কোলে ঘুম পাড়াইতেছেন। ইহা স্মরণ করিলে কাহার না বিস্ময় ও আনন্দ হয়? আমাদের প্রভুর যে স্ত্রী ও জননীর সহিত গোষ্ঠী করা, ইহাও সেইরূপ তাঁহার ভক্তগণের বড় সুখকর।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রভুর লীলায় ছয়জন গোস্বামী, তাঁহারা বৃন্দাবনে বাস করেন। রূপ-সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতষ্পুত্র জীব, এই তিন জনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আর একজন গোস্বামী কিরূপে হইলেন, তাহা এখন শ্রবণ করুন্। রঘুনাথ দাসের পিতা বারলক্ষের অধিকারী, আম্বুয়া পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে* বাস। তিনি দেশের প্রকাণ্ড জমিদার, নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। তাঁহার পুত্র রঘুনাথের যৌবনকাল উপস্থিত না হইতেই প্রভুর অবতারের কথা শুনিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। পিতা মাতা অনেক যত্ন করিলেন, পুত্রকে অতি সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘুনাথের হৃদয় বিষয়ে মুগ্ধ হইল না। শেষে তাঁহাকে তাঁহার পিতা একবার কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চারি-দিকে প্রহরী, এক পদ পলাইবার যো নাই। রঘুনাথ তবুও সুযোগ পাইয়া বারে বারে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন। পরিশেষে একবার আর ধরা পড়িলেন না। প্রথম দিবসে ১৫ ক্রোশ হাঁটিয়া এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া গোয়ালা দুগ্ধ পান করিতে দিল। রঘুনাথ আবার চলিলেন। আপনার যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী, ও ১২ লক্ষের জমী-দারীতে পাছে তাঁহাকে ধরে বলিয়া উপবাস করিয়া দৌড়িতেছেন! বড়

* এই কৃষ্ণপুর বর্ত্তমান হুগলীর নিকটবর্ত্তী।

মানুষের ছেলে, পদতল শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল, হাটিতে পারেন না, তবু ভয়ে ভয়ে দৌড়িয়া ১৮ দিবসের পথ ১২ দিবসে আসিয়া উড়িয়া দেশে পৌছিলেন। পথে কেবল তিন দিবস আহার জুঠিয়াছিল। প্রভু বসিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মুকুন্দ সেখানে ছিলেন, তিনি প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, ঐ দেখুন, রঘুনাথ আপনাকে প্রণাম করিতেছে।" রঘুনাথ বড় মানুষের ছেলে, সকলে চিনিতেন।

ঠাকুর, রঘুনাথকে বড় কৃপা করিলেন, কারণ সেই যুবককে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই যুবক আলিঙ্গন পাইবার উপযুক্ত বটে। যে ব্যক্তি প্রভুর নিমিত্ত জগতের যত সুখ,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য,—ত্যাগ করিল, সে অবশ্য কৃপা পাত্র হইবার দাবী রাখে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন, যে, তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমার অনুগত হইয়াছ অতএব আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী! রঘুনাথকে প্রভুর কৃপা দেখিয়া অন্যান্য সকল ভক্তও তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাকে এতদিনে বিষয় হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান।" প্রভু দেখেন যে, সেই বড়মানুষের ছেলে অনাহারে, পথশ্রান্তে, অনিদ্রায় অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়াছেন। তখন কৃপার্ত্ত হইয়া সরূপকে বলিতেছেন, "সরূপ, আমার এখানে পূর্ব্বে দুই রঘু ছিলেন, এখন এই তিন রঘু হইল। এই রঘুকে আমি তোমাকে দিলাম। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, আমি এই অবধি এই রঘুকে সরূপের রঘু বলিয়া জানিব।" ইহা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া সরূপের হস্তে দিলেন। অমনি রঘু সরূপের চরণে পড়িলেন, সরূপ "তোমার যে আজ্ঞা" বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। প্রভু রঘুকে আবার বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, স্নান করিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আইস, গোবিন্দ তোমাকে প্রসাদ দিবে।" তাই রঘুনাথ স্নান করিয়া আসিলেন, আসিয়া প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র পাইলেন।

এখানে প্রিয়দাসের ভক্তমাল হইতে রঘুনাথের সম্বন্ধে একটী কাহিনী বলিব। উপবাসে ও পথশ্রান্তে রঘুনাথের জ্বর হইল। অষ্টাহ লঙ্ঘন করিয়া জ্বর ত্যাগ হইল। তখন ক্ষুধা হইয়াছে। জরান্তে যেরূপ রোগীর হইয়া থাকে, রঘুনাথের তাহাই হইয়াছে, একটু লোভ হইয়াছে। নানারূপ আহারীয় বস্তুর কথা মনে হইতেছে। কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ব্যতীত, মনে মনেও কিছু জিহ্বাগ্রে দিতে পারেন না। তাই সেই গভীর রজনীতে মনে মনে

প্রভুকে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। মনে মনে অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধ চাউল সংগ্রহ করিলেন, আর মনে মনে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ইত্যাদি বিবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া, মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভুকে বসাইয়া আকণ্ঠ পূরিয়া খাওয়াইলেন। পরে আপনিও প্রসাদ পাইলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে প্রভুর ভিক্ষার সময় হইলে প্রভু সরূপকে বলিতেছেন, "আমার আহারে রুচি নাই। রঘুনাথ অসময়ে আমাকে এরূপ গুরুতর আহার করাইয়াছে যে, আমি এখন আহার করিতে পারিব না।" এ কথার তাৎপর্য্য সরূপ অবশ্য বুঝিলেন না। পরে রঘুনাথকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সরূপ জিজ্ঞাসিলেন, "রঘুনাথ, তুমি নাকি প্রভুকে অসময়ে বড় ভোগ দিয়াছ? প্রভু বলিতেছেন, তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে।" রঘুনাথ অবাক্! তখন রঘুনাথ সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন।

এই রঘুনাথের কথা কিছু বলিতে হইতেছে, কারণ ইঁহার দ্বারা প্রভু অনেক কার্য্য সাধন করেন। প্রথমতঃ ইঁহার দ্বারা দেখাইলেন যে, মনুষ্য কতদূর বৈরাগ্য করিতে পারে। দ্বিতীয় এই যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণও ভক্তিবলে আচার্য্য হইতে পারেন। এখন রঘুনাথের বৈরাগ্য শ্রবণ করুন। রঘুনাথ ১২ লক্ষের অধিকারী, সেই তিনি এখন নীলাচলে প্রভুর অতিথি, প্রভুর প্রসাদ পাইতেছেন। পাঁচ দিন পরে উহা ছাড়িয়া দিলেন। করেন কি, সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া হরেকৃষ্ণ নাম জপ করেন। নিশিযোগে যখন জগন্নাথের মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়, তখন যদি দ্বারে কোন বৈষ্ণব উপবাসী থাকেন, তবে বিষয়ী লোকে কি জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাকে আহার দেন। রঘুনাথ দ্বারে যাহা পান তাহা দ্বারা জীবনধারণ করেন। কিছু দিন পরে উহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু রঘুনাথের ব্যবহার সমুদয় শ্রবণ করিতেছেন। যখন শুনিলেন যে, রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িয়াছেন, তখন প্রভু একটী শ্লোক পড়িলেন, যথা "অয়মাগচ্ছতি অয়ংদাস্যতি", ইত্যাদি, আর বলিলেন "রঘু বেশ করিয়াছে। সিংহদ্বারে আহারের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকা বেশ্যার আচার!" তাহার পরে রঘুনাথ জীবন রক্ষার নিমিত্ত আর এক উপায় করিলেন। দোকানীদিগের প্রসাদান্ন যাহা বিক্রয় না হয়, তাহা পচিয়া গেলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। রঘুনাথ সেই সমস্ত পরিত্যক্ত অন্ন সংগ্রহ করেন, করিয়া জল দ্বারা ধৌত করেন। এইরূপ মাজিতে মাজিতে মধ্যে যে টুকু মাজি অন্ন পাওয়া যায়, তাহাই রাত্রে লবণ দিয়া ভোজন করেন। প্রভু এই কথা শুনিলেন, শুনিয়া

সেই অন্ন দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া উহার একগ্রাস মুখে দিলেন, আর একগ্রাস লইত গেলে সরূপ হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আমাদের সমক্ষে তুমি ইহা বদনে দাও এ তোমার বড় অন্যায়।" প্রভু বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি প্রত্যহ এরূপ উপাদেয় বস্তু খাও! এমন সুস্বাদু প্রসাদ আমি কখনো খাই নাই।"

রঘুনাথের পিতামাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মুদ্রার সহিত নীলাচলে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ উহা লইলেন না। অবশ্য গৃহেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। সেইরূপ ঘোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও প্রভুর সহিত অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে যাপন করিলেন। প্রভুর অপ্রকটে রঘুনাথ গৌরশূন্য নীলাচলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ছুটিয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করিলেন; মনের ভাব ভৃগুপাত করিয়া অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তাহা ঘটিল না। কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আসিয়া তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে মিলিত হইলেন। রঘুনাথের প্রমুখাৎ প্রভুর লীলা শুনিয়া তিনি অন্ত্যলীলার অনেক লিখেন। এই রঘুনাথের প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় শ্রবণে কীর্ত্তনে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে রঘুনাথদাস বহুকাল জীবিত থাকেন। প্রভুর কার্য্য করিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাঁহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই সকলে দীর্ঘকাল জগতে বিচরণ করেন। কেহ একশত, কেহ নবতি, কেহ একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। অদ্বৈত প্রভু এই শেষোক্ত বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন।

রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষু কর্ণ গেল, এদিকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরহে এক প্রকার পাগল হইলেন। চলিতে পারেন না, হামাগুড়ি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়ান। কখনো যমুনা-

পুলিনে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "রাধে, রাধে" বলিয়া ডাকেন; কথনো নিকুঞ্জের মধ্যস্থানে তাঁহারা আছেন ভাবিয়া সেখানে নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার শেষ জীবন দর্শন করিয়া অন্যান্য ভক্তগণও উহা বর্ণন করিয়াছেন। দাস গোস্বামীর উক্তি এই গীত, সকলে অবগত আছেন, যথা—

"রাধে, রাধে,
তুমি কোথা লুকাইয়া আছ।"
গোসাঞি, একবার ডাকে যমুনা তটে,
আবার ডাকে বংশী বটে,
রাধে রাধে ইত্যাদি।

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন, দাস গোস্বামীর যে অতি কষ্টের জীবন, তাহাতে সুখ কোথায়? রাধাকৃষ্ণ ভজনের কি এই ফল? তাহার উত্তর এই যে, তিনি বারলক্ষের অধিকারী, তাঁহার বাটীতে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী বর্ত্তমান। কৈ তিনি তো কষ্টের জীবন ত্যাগ করিয়া বাটী গেলেন না? কথা কি, কৃষ্ণ-বিরহে যে সুখ তাহা অন্তরে, বাহিরের লোকে তাহা কিরূপে বুঝিবে?

দাস গোস্বামী যখন নীলাচলে কেবল নূতন আসিয়াছেন, তখন এক দিন তিনি সাহস করিয়া প্রভুর নিকটে একটি নিবেদন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "প্রভু, আমি কি করিব? আমাকে একটু উপদেশ দিতে কৃপা হয়।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাকে সরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি যত না জানি তিনি তাহা জানেন। তবে যদি আমার কাছে কিছু জানিতে চাও, তবে বলিতেছি। তুমি বৈরাগ্য করিয়াছ, সুতরাং শারীরিক সুখ ত্যাগ কর। গ্রাম্য কথা বলিও না, শুনিও না। দীন ভাবে মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা কর!" এখনকার লোকে অনেকে বিগ্রহ পূজার বিরোধী, তাঁহারা বলেন, "পুতুল পূজা কেন করিব? মনেই পূজা করিব।" কিন্তু এই যে মহাপুরুষ দাস গোস্বামী, প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন যে, তিনি "মানসে" শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করিবেন, তবু তিনি তাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই যে, তিনি মানসে রাধাকৃষ্ণ ভজন করিবেন, কিন্তু সে ভজনে তখন তাঁহার অধিকার হয় নাই, সুতরাং প্রভুর আজ্ঞা সত্বেও বিগ্রহ সেবা আরম্ভ করিলেন। অগ্রে বিগ্রহ সেবা করিয়া

পরে মানসে সেবা করিতে শিখিলেন, শেষে মানস সেবা ছাড়িয়া দিয়া বিরহে ব্যাকুল হইয়া বৃন্দারণ্যে রাধাকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সহিত লুকোচুরী খেলা আরম্ভ করিলেন।

রঘুনাথের ন্যায় ভগবান আচার্য্যও বিষয়ত্যাগী, তাঁহার পিতা শতানন্দ খান ধনবান্ লোক, কিন্তু শ্রীভগবান আচার্য্য সে অতুল বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে রহিলেন। প্রভুর কাছে থাকেন, প্রভুকে না দেখিলে মরেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পড়িতে গিয়াছেন। পড়িয়া মহা পণ্ডিত হইয়াছেন। তখন আপন বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার নিমিত্ত নীলাচলে দাদার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথা কি, তখন প্রভুর সঙ্গী যত লোক, সকলে যেমন জগৎ বিজয়ী ভক্ত, তেমনি আবার জগৎ বিজয়ী পণ্ডিত। কেহ পণ্ডিত হইলে প্রভুর সভায় যাইয়া তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিতে অভিলাষ হয়। কিন্তু প্রভু বাজে কথা শুনেন না, পাণ্ডিত্যে মন নাই, যদি ভক্তি বিষয়ক কোন প্রস্তাব হয় তবে নিতান্ত অনুরোধে তাহা শ্রবণ করেন। কিন্তু সেও অগ্রে নয়। যিনি যে কিছু পুস্তক প্রণয়ন করেন, কি শ্লোক লিখেন, তাহা স্বভাবতঃ প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা হয়। আর প্রভুর যদি একপ লোকের গ্রন্থ কি শ্লোক শুনিতে হয়, তবে আর তাঁহার দিবা রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রভুর নিকটে কোন গ্রন্থকার কি কবি অগ্রে যাইতে পারেন না। যদি কেহ প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র হয়েন তবে তিনি অগ্রে স্বরূপ গোস্বামীর কৃপা পাত্র হয়েন। স্বরূপ যদি দেখেন যে প্রভুকে পুস্তক কি শ্লোক শুনাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তবে প্রভুর নিকট লইয়া যান। গোপাল বেদান্ত পড়িয়া তাঁহার বিদ্যা দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা পান না। ভগবান গোপালকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন, প্রভু ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহাকে বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান ছোট ভাই গোপালকে স্বরূপের কাছে লইয়া গেলেন। স্বরূপের সহিত তাঁহার অতি সখ্য ভাব। বলিতেছেন "এসো ভাই, গোপাল পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট বেদান্ত-ভাষ্য শুনা যাউক।"

তখন, "প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচন॥
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়া বাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥

বৈষ্ণব হইয়ে শাঙ্করিক ভাষ্য যেবা শুনে।
সেব্য সেবক ছাড়ি, আপনাকে ঈশ্বর করি মানে॥”

সরূপ বলিলেন, “ভাই, তোমার একি কুবুদ্ধি হইল? আমরা এখন কি তাই শুনিব যে, ‘আমিও যে, কৃষ্ণও সে?” ভগবান আচার্য্য বলিলেন, “আমাদের বেদান্তে করিবে কি? আমরা কৃষ্ণের দাস। আমাদের কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্ত, আমাদের কি বেদান্তে মন ফিরাইতে পারে?” সরূপ বলিলেন, “তবু ওবেদান্তে যাহা শ্রবণ কর তাহাতে ভক্তের হৃদয় ফাটে। সমুদায় মায়া, ঈশ্বর কেহ স্বতন্ত্র নাই, মুক্তিই মনুষ্যের চরম ফল, ইত্যাদি কথা শুনিতে পারিব কি রূপে?” অতএব গোপালের বেদান্ত পড়াইয়া শুনান হইল না। তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, এমন সময় আউলির বল্লভ ভট্ট আসিয়া উপস্থিত। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে ইনি প্রভুকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি একজন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন। অতি স্বাধীন প্রকৃতি, এমন কি শ্রীধরস্বামীর টীকাকে দোষিতে তাঁহার কোনরূপ আশঙ্কা হয় নাই। প্রভুকে প্রথম দর্শনে চমকিত হয়েন, কিছুকাল সে চমক থাকে, এখন তাহার অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রভুকে প্রয়াগে দর্শন করিয়া বুঝিলেন, ইনিই শ্রীকৃষ্ণ। তখন হৃদয়ে যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল তাহা লোপ পাইল। প্রভুকে ভট্ট ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। বল্লভ সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবদিগের একটী নিয়ম আছে। ঠাকুর

ঘরে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী থাকে, তাহা ঠাকুরসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হয় না, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যাদি উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহা ঠাকুরসেবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন প্রভুতে ভট্টের ঈশ্বর-বুদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি সেবার দ্রব্যাদি দ্বারাই প্রভুর ভিক্ষা সম্পন্ন করিলেন। প্রভু নীলাচলে আসিলে ক্রমে ভট্টের পূর্ব্বকার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, ঈর্ষার সৃষ্টি হইল। এখন নীলাচলে প্রভুর সহিত এক প্রকার পাল্লা দিতে আসিয়াছেন। "চৈতন্য" একজন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক, তিনিও একজন তাহাই, অধিকন্তু তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, চৈতন্য তাহা করেন নাই। প্রভুকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করেন, তবে আপনাকেও কম শ্রদ্ধা করেন না। তিনি সংসারী, প্রভু সন্ন্যাসী, কাজেই তাঁহার প্রভুকে প্রণাম করিতে হইল। প্রভু বল্লভভট্টকে খুব আদর করিলেন। তখন ভট্ট বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "তোমাকে দর্শন করিবার বড় সাধ ছিল, অদ্য জগন্নাথ তাহা পূর্ণ করিলেন, তোমার দর্শন বড় ভাগ্যের কথা। তোমার স্মরণে লোক পবিত্র হয়। এমন কি, তুমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান্। তোমার শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে তুমি কৃষ্ণনাম লওয়াইয়াছ, প্রেমে ভাসাইয়াছ। এ সমুদায় কি কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত হইতে পারে?" এই যে ভট্ট বক্তৃতা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একটী কথাও অন্যায় নয়, কিন্তু তবু অক্ষরে অক্ষরে বুঝা যায় যে তিনি বক্তৃতা মাত্র করিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় গর্ব্বে পরিপূর্ণ। সে যাহা হউক, প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আপনি বলেন কি? আমি মায়াবাদিসন্ন্যাসী, আমি ভক্তির কি বুঝি? তবে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে সৎসঙ্গ দিয়াছেন, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। সেই এক সঙ্গ অদ্বৈত আচার্য্য, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে কেবল কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন। আর একজন শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। আর একজন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তিনি ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ। রস কাহাকে বলে তাহা শ্রীরামানন্দ রায় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আর একজন স্বরূপদামোদর, তিনি মূর্ত্তিমান্ ব্রজরস। আর একজন শ্রীহরিদাস, যাঁহার নিকট নামের মহিমা শিখিলাম, তিনি প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম লয়েন।"

ভট্ট বলিলেন, "এ সমুদায় ভক্তগণ কোথায়? আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে বাসনা করি।" প্রভু বলিলেন তাঁহাদিগকে এখানেই পাইবেন। তাঁহারা রথোপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন।

ভট্ট মহাপণ্ডিত লোক, নিজদেশে তাঁহার সমকক্ষ লোক পান নাই। নীলাচলে আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইতে আসিয়াছেন। এই যে নীলাচলে ভক্তির সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাকে ভক্তি স্পর্শ করিতে পারে নাই। হে দম্ভ! তোমাকে বলিহারি যাই, দম্ভ এইরূপ বিষবৎ সামগ্রী! মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিলেন, রথাগ্রে তাঁহার নৃত্য দেখিলেন, ইহাতেও মন দ্রব হইল না। কেবল তর্ক করিবেন, তর্ক করিয়া জয়লাভ করিবেন, এই মনের একমাত্র সাধ। প্রত্যহ প্রভুর সভাতে আগমন করেন, সেখানে শ্রীঅদ্বৈত, সার্ব্বভৌম, সরূপ প্রভৃতি মহাপণ্ডিত পার্ষদগণও থাকেন। ভট্ট আসিয়াই নানা তর্ক উত্থাপন করেন। ভট্ট নানা বাজে কথা বলিয়া প্রভুকে বিরক্ত করেন দেখিয়া প্রভুকে কোন কথা কহিতে অবকাশ না দিয়া, শ্রীঅদ্বৈত আপনি তাঁহার কথার উত্তর দিতেন। কিন্তু ক্রমে তিনিও আর পারেন না। কারণ ভট্টের যে সমুদায় কথাবার্ত্তা, সে ফল্গু, অর্থাৎ রসশূন্য কি পদার্থ শূন্য। তাঁহার একটী প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিবেন যে তাঁহার কথা কিরূপ অসার। বলিতেছেন, "আমি দেখি, তোমরা সকলে কৃষ্ণনাম লও, আবার কৃষ্ণকে প্রাণপতি বল, ইহা কিরূপে হয়? যে পতিব্রতা হয়, তাহার তো পতির নাম লইতে নাই?" এখন যাঁহারা দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে কি বিরহে কি হরিভজনে মুগ্ধ, তাঁহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন?

ভট্ট বালগোপাল উপাসক, আর প্রভুর গণ শ্রীরাধকৃষ্ণ উপাসক। অর্থাৎ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য রসে ভজন করেন, আর প্রভুর গণ মধুর রসে। তাই, বল্লভ মধুররসের ভজনাকে দুষিবার নিমিত্ত ছল উঠাইলেন যে, "তোমরা কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বল, আবার তাঁহার নাম লও কিরূপে?" যদি সেখানে ঐরূপ কেহ তার্কিক থাকিত তবে সেও বলিতে পারিত, "আচ্ছা তুমি তো কৃষ্ণকে আপনার পুত্র বলিয়া ভজনা কর, তবে তাঁহাকে প্রণাম কর কিরূপে?" ভট্টের জ্বালায় প্রভু ও প্রভুর গণ একেবারে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন।

একদিন বল্লভ বলিতেছেন, "শ্রীধর স্বামীর টীকায় অনেক দোষ আছে। আমি সে সমুদায় দেখাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু প্রকৃত কথা এই, শ্রীধরস্বামীর নিমিত্ত জীবে শ্রীভাগবত জানিয়াছে, শ্রীধরস্বামী না হইলে শ্রীভাগবত কেহ বুঝিতে পারিত না, সেই শ্রীধরকে ভট্ট বলিতেছেন, "আমি স্বামীকে মানি না।"

এখন ভট্ট নীলাচলে মাসাধিক বাস করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গ কেবল প্রভুর গণ লইয়া, আর কোথাও স্থান নাই; তাঁহার এই সকল তর্কে লোকে অস্থির হইয়া গিয়াছে। প্রভুর সভায় যাইয়া আস্ফালন করেন, প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত কিছু কিছু উত্তর করিতেন, এখন তিনিও তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভু কখনও কিছু বলেন না, চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, ভট্টের শাসন প্রয়োজন, তাই যখন ভট্ট বলিলেন, "আমি স্বামীকে মানি না", তখন প্রভু বলিলেন, "স্বামীকে যে না মানে, সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য।" প্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে এ কথা ঘোর দণ্ডের স্বরূপ হইল। ভট্ট অপ্রতিভ হইয়া ঘরে গেলেন।

ভট্ট তখন রজনীতে ভাবিতেছেন, "পূর্ব্বে গোঁসাই আমার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। এখানে আসিলেও প্রথমে সেইরূপ ছিল। আমি নিমন্ত্রণ করিলে গ্রহণ করিতেন, এখন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের অপ্রিয় হইয়াছি। সকলেই আমাকে দেখিলে আমা হইতে দূরে যায়। প্রভুর সভায় আমার কথা কেহ গ্রাহ্যও করেন না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোঁসাই আমাকে একটু কৃপা করেন দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি?" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সুবুদ্ধি আসিল। তখন আবার ভাবিতেছেন, "আমি এখানে আইলাম কেন? জয়লাভ করিতে? জয়লাভ করিয়া কি হইবে? এই যে বৈষ্ণবগণ এখানে দেখিলাম, ইহারা সকলেই আমা হইতে ভাল, কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছেন। আমি সে ধন হইতে বঞ্চিত, আমি বৃথা জয়ের আশায় সে মহাধন পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রভু আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কারণ কেবল আমার অভিমান। এই অভিমান গেলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

পরদিন প্রভাতে প্রভুর নিকট যাইয়াই চরণ ধরিয়া পড়িলেন। আর সব কথা সরল ভাবে বলিলেন। বলিলেন, "প্রভু, বুঝিয়াছি। তুমি পরম বন্ধু। তুমি আমার গর্ব্ব দেখিলে, দেখিয়া কৃপার্ত্ত হইয়া উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত আমাকে দণ্ড করিতেছ। পূর্ব্বে এই দণ্ডে আমার ক্রোধ হইত, এখন বুঝিলাম যে, এ দণ্ড নয়, তোমার মহাকৃপা।"

প্রভু অমনি দ্রবীভূত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দুইগুণ আছে, তুমি পণ্ডিত ও তুমি ভাগবত। যাহাদের এই দুইগুণ আছে, তাহাদের

গর্ব্ব থাকিতে পারে না। তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, গর্ব্ব ত্যাগ কর, তবে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন।"

ভট্ট প্রভুর মুখপানে চাহিয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই প্রণয়াকুল নয়ন স্নেহভরে তাঁহার পানে চাহিতেছে। তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রতি প্রভুর আবার কৃপা হইয়াছে। তাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহা না হইলে আমি আর এখানে তিষ্ঠিতে পারি না।" প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। ভট্ট তখনি মহাসমারোহ করিয়া প্রভুকে গণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন, নিমন্ত্রণে অনুপস্থিত রহিলেন কেবল শ্রীপণ্ডিত গদাধর গোঁসাই।

পণ্ডিত গোঁসাইর ন্যায় নিরীহ ভাল মানুষ জগতে কেহ নাই, হইবারও নয়। যখন ভট্ট প্রভুর গণের অপ্রিয় হইলেন, তখন তিনি গদাধরের শরণ লইলেন। গদাধর নিষেধ করেন, কিন্তু ভট্ট শুনেন না। ভট্টের তখন মন ফিরিয়াছে। তিনি এ পর্য্যন্ত বালগোপাল উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন, এখন প্রভুর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুর্য্য অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই গদাধরের নিকট বলেন যে তিনি তাঁহাকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করুন। গদাধর বলেন, "তাহা আমা দ্বারা হইতে পারে না। আমি প্রভুর দাসানুদাস, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কিছু করিতে পারি না। প্রভুকে আমি ভয় করি না, কিন্তু তুমি এখানে আইস বলিয়া, তাঁহার গণ আমাকে এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি প্রভুর শরণ লও, তবেই তোমার মঙ্গল।" সম্ভবতঃ গদাধরের উপদেশে ভট্টের প্রথম জ্ঞানোদয় হয়।

এই কথার পরে ভট্ট প্রভুর শরণাগত হয়েন। যে দিন ভট্ট সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সে দিবস গদাধর সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারেন নাই। প্রভু সভায় যাইয়া গদাধরকে না দেখিয়া, সরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দ এই তিনজনকে তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন, পথে সরূপ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই, তবে তুমি কেন প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সব বলিলে না?" গদাধর বলিলেন, "প্রভুর সহিত হঠ করা ভাল বোধ করি না। প্রভু অন্তর্যামী, আমি যদি নির্দোষ হই, তবে তিনি আমাকে আপনা আপনি কৃপা করিবেন।" তাহার পরে সভায়

যাইয়া গদাধর রোদন করিতে করিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "তুমি আমার উপর আদপে ক্রোধ কর না। কিন্তু তোমার ক্রোধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে, তাই তোমাকে চালাইবার নিমিত্ত আমি তোমার উপর কপট ক্রোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোনমতে তোমার ক্রোধ জন্মাইতে পারিলাম না। কাজেই আমি তোমার নিকট বিক্রীত।" প্রভুর বড় সাধ গদাধরের ক্রোধ দেখিবেন, কিন্তু তাঁহাকে রাগাইতে পারিলেন না, পরে বিক্রীত হইলেন!

ইহার কিছু দিন পরে, প্রভুর অনুমতি লইয়া, ভট্ট গদাধরের নিকট যুগল-ভজনের মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্য শ্রবণ করুন। ভট্ট নিজের দেশে অনেক শিষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বাল-গোপাল উপাসক। এদিকে তাঁহাদের নেতা সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যুগল-ভজন আরম্ভ করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাসক ভট্টের গোষ্ঠী এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থলে, এমন কি শ্রীবৃন্দাবনে পর্য্যন্ত বড় প্রবল।

হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তবুও তাঁহার সাধনের আগ্রহ কমে নাই। প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে জপ করেন। মনে বিশ্বাস, এই হরিনাম যে শুনিবে, কি স্থাবর কি জঙ্গম, সকলেই উদ্ধার হইয়া যাইবে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে হরিদাসের দ্বারা প্রভু জীবের নিকট নামের মাহাত্ম্য-প্রচার করেন। কিন্তু হরিদাস জীবকে আর একটী প্রধান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ দীনতা। হরিদাসের ন্যায় দীন ত্রিজগতে হয় নাই ও হইবে না। হরিদাসের দীনতা দেখিলে প্রভু বিকল হইতেন। হরিদাস কোথাও গমন করেন না, পাছে কোন সাধু মহান্তকে স্পর্শ করিয়া অপরাধী হয়েন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার স্পর্শ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বাঞ্ছা করেন। হরিদাস প্রভুদত্ত কুটীরে দিবানিশি বাস করেন এবং নাম জপ করেন। প্রভু প্রত্যহ সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া প্রত্যাগমন কালে একবার হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। কখনও বা পার্ষদ সঙ্গে করিয়া তাঁহার কুটীরে গমন করেন, করিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন। গোবিন্দ প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া যান।

এক দিবস গোবিন্দ আসিয়া দেখেন যে, হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন, আর মন্দ মন্দ নাম জপ করিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে জপিবার শক্তি নাই।

গোবিন্দ আসিয়া বলিলেন, "উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" হরিদাস গাত্রোত্থান করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "অদ্য আমি লঙ্ঘন করিব। যেহেতু আমার সংখ্যা-নাম জপ এখনও হয় নাই।" আবার বলিতেছেন, "মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই। সুতরাং কি করিব ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রসাদকে বন্দনা করিলেন, করিয়া একটী অন্ন বদনে দিলেন। হরিদাসের এইরূপ অবস্থা শুনিয়া প্রভু পরদিবস তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হরিদাস অমনি উঠিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস, তোমার পীড়া কি?" হরিদাস বলিলেন, "আমার শারীরিক পীড়া কিছু নাই। তবে মনই অসুস্থ, আমি আর সংখ্যা-নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ এখন সাধনে এত আগ্রহ কর কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও। তুমি জগতে নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে আসিয়াছ, তোমার কৃপায় জীবে উহা বেশ জানিয়াছে। তোমার দেহ পবিত্র, তুমি আর এরূপ করিয়া শরীরকে অনর্থক দুঃখ দিও না।"

তখন হরিদাস অতি কাতরে ও করজোড়ে বলিতেছেন, প্রভু ও-সব কথা এখন থাকুক। আমাকে একটী বর দিতে হইবে। তুমি অবশ্য লীলাসম্বরণ করিবে বুঝিতেছি। তুমি সেটী আর আমাকে দেখিতে দিও না। যাহাতে আমি এখন শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারি তাহার অনুমতি করিতে আজ্ঞা হয়। দোহাই প্রভু, আমাকে বিদায় দাও।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু বুঝিলেন হরিদাস তাঁহার নিজের মনের একান্ত বাঞ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রভুর আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল। বলিতেছেন, "হরিদাস, তুমি বল কি? তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, আমি কাহাকে লইয়া এখানে থাকিব? কেন তুমি নির্দ্দয় হইয়া তোমার সঙ্গ সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও? তোমরা ব্যতীত আমার আছে কে?"

হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, আমাকে এ সব কথা বলিয়া ভুলাইবেন না। কত কোটী মহান্ ব্যক্তি আপনার লীলার সহায় আছেন। আমি ক্ষুদ্র কীট মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এরূপ অন্যায় কথা তুমি কেন বল? আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু, আমি যাই।" ইহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে হরিদাস একেবারে প্রভুর পায়ে ধরিয়া পড়িলেন। আবার বলিতে-

ছেন, "আমার স্পর্দ্ধার কথা শ্রবণ করুন। আমি যাইব, কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া, আর তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে। বল প্রভু, আমাকে এই বর দিবে?"

যেমন অল্প মেঘে পূর্ণচন্দ্র আবরণ করে, সেইরূপ দুঃখে প্রভুর বদন আন্ধার হইয়া গেল। প্রভু কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণ মলিন বদনে ও অবনত মস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা কর কৃষ্ণ তাহাই পালন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমা বিহনে কি কষ্টে থাকিব তাহাই ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া বিমর্ষ চিত্তে প্রভু উঠিয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতে প্রভু স্বগণ সহিত হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বলিতেছেন, "হরিদাস সমাচার বল।" হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই হউক!" হরিদাস বুঝিয়াছেন যে, প্রভু তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছেন। ইহাই বলিতে বলিতে হরিদাস কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া আঙ্গিনায় আসিয়া প্রভুর ও ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিলেন। হরিদাস দুর্ব্বল, দাঁড়াইতে পারেন না, তখন প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া আঙ্গিনায় বসাইলেন, আর তাঁহাকে বেড়িয়া সকলে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস মধ্যস্থলে রহিয়াছেন কেন,—না মরিবার নিমিত্ত! ভক্তগণ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর হরিদাস যখন সুবিধা পাইতেছেন, তাঁহাদের চরণধূলী লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছেন। এইরূপে হরিদাস ভক্ত-পদধূলীতে ধূসরিত হইলেন। নৃত্য করিতেছেন সরূপ ও বক্রেশ্বর, আর গাইতেছেন কে, না স্বয়ং প্রভু, সরূপ, রামরায়, সার্ব্বভৌম ইত্যাদি। পরে প্রভু কীর্ত্তন রাখিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসের গুণ বলিতে লাগিলেন। অদ্য স্বয়ং প্রভু বক্তা, বর্ণনীয় কি, না হরিদাসের গুণ! ভক্তগণ হরিদাসের গুণ শ্রবণ করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া, হরিদাসের চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

হরিদাস তখন ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন। মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ পদধূলায় ভূষিত। মুখে বলিতেছেন, "প্রভু দয়াময়! শ্রীগৌরাঙ্গ! এ দীনকে চরণে স্থান দাও।" পরে প্রভুকে তাঁহার নিকট বসাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু বসিলেন। হরিদাস অমনি প্রভুর চরণ ধরিয়া আপনার হৃদয়ে স্থাপিত

করিলেন। প্রভু কিছু বলিলেন না। তিনিই না হরিদাসকে বর দিয়াছেন? তাহার পরে হরিদাস তাঁহার নয়নদ্বয় প্রভুর মুখচন্দ্রে অর্পিত করিয়া সুধাপান করিতে লাগিলেন। ইহাতে হইল কি, না তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমধারা পড়িতে লাগিল। তখন হরিদাস, প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

"নামের সহিতে প্রাণ করিল উৎক্রামণ।"

দুই দিবস পূর্ব্বে শরীরে কিছু অসুখ হইয়াছিল, এমন কিছু বেশী নয়। তাহার পর দিন প্রভুর নিকট বর প্রার্থনা করেন, তার তিন দিনের দিন আপনি কুটীরের বাহিরে আসিলেন, বসিলেন, শয়ন করিলেন, নানারূপে চির-দিনের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন। হরি-দাস যাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনে ভাবেন নাই। হরিদাসের অসুখ হই-য়াছে, তাই তাঁহার বাড়ী কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। হরিদাসের সহিত প্রভুর যে গোপনে কথা হইয়াছে, তাহা ভক্তগণ জানিতেন না। এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তখনি জানিলেন, যখন প্রভু হরিদাসের গুণ বর্ণন কালে বলিলেন যে, হরিদাস যাইতে চাহিলেন আমি রাখিতে পারিলাম না। হরিদাস আমাকে সম্মুখে রাখিয়া, গোলোকে যাইবেন এই প্রার্থনা করিলেন আর কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। ভক্তগণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হরিদাস যে গিয়াছেন কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে দেখিলেন হরিদাস প্রকৃতই অন্তর্ধান করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন ভক্তগণ বুঝিলেন যে হরিদাস গিয়াছেন, তখন সকলে গগন ভেদিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু করিলেন কি, না সেই হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া উঠাইলেন, উঠাইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল। প্রভুর আনন্দ কেন? হরিদাসের জয় দেখিয়া, আর ভক্তের প্রতাপ দেখিয়া। তখন ভক্তগণও সেই প্রভুর আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের পিতামাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা নাই, ভক্তই শ্রীভগবানের পরিবার। আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন যাঁহার ত্রিজগতে কেহ নাই, অথচ তাহাতে তাঁহার অভাব বোধ নাই। তাঁহার যদিও নিজের পুত্র নাই, তিনি সকল বালককে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। সকল স্ত্রীলোকই তাহার মা। তাঁহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। কেহ মরিয়াছে, তাহার

নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন। অন্যের সুখে আপনি সুখী হইতেছেন। শ্রীভগবান সেই প্রকার, তাঁহার কেহ নহে, তিনি সকলের। হরিদাসের মৃত দেহ কোলে করিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি। যেমন ঠাকুর আমার শ্রীপ্রভু, তেমনি ভক্ত আমার শ্রীহরিদাস। যেমন ভক্ত হরিদাস, তাঁহার অন্তর্দ্ধানও সেইরূপ।

প্রভু বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ তাঁহাকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তখন একখানা গাড়ী আনা হইল, ও তাহার উপরে সেই মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। গাড়ী চলিতেছে, প্রভু অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ভক্তগণ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহার পরে সেই মৃতদেহ গাড়ী হইতে অবতরণ করাইয়া স্নান করান হইল।

প্রভু বলিলেন, "অদ্যাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।"

তখন ভক্তগণ বালুকার মধ্যে সমাধি খনন করিলেন, হরিদাসের অঙ্গে মাল্য চন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিলেন। পরে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহকে সেই সমাধিতে শয়ন করাইলেন।

"চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলেন তাঁহার গায়॥"

তাহার পরে কবর পূর্ণ করিয়া তাঁহার উপর দৃঢ় করিয়া বাঁধা হইল। এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে আবার নর্ত্তন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তখন সকলে জলে ঝাঁপ দিয়া আনন্দে হরিধ্বনির সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে সকলে উঠিয়া হরিদাসের কবর প্রদক্ষিণ করিলেন, তাহার পরে প্রভু ঐ পথে একেবারে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। প্রভু যখন আনন্দে বিহ্বল থাকেন, তখন ভক্তগণের সহিত কোন পরামর্শ করেন না। প্রভু স্নান করিয়া চলিলেন, সকলে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভু বাসায় না যাইয়া মন্দিরে গমন করিলেন, কাজেই সকলে তাহাই করিলেন। প্রভু মন্দিরে কেন যাইতেছেন কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। সকলে ভাবিতেছেন প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন।

কিন্তু তাহা নয়। সেখানে পসারীগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বসিয়া আছে। প্রভু সেখানে যাইয়া কাপড় পাতিলেন; বলিলেন, "আমার হরিদাসের মহোৎসবের নিমিত্ত আমাকে ভিক্ষা দাও।" তখন ভক্তগণ প্রভুর কথা বুঝিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। পসারীগণ সকলে তটস্থ হইয়া ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল। সরূপ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। আর প্রভুকে নিবেদন করিলেন, "আপনি বাসায় চলুন। আমরা ভিক্ষা লইয়া যাইতেছি।" প্রভু ভক্তগণের সহিত বাসায় গমন করিলেন, সরূপ প্রভৃতি চারিজন বৈষ্ণব সঙ্গে রাখিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে এক একটী দ্রব্য দাও।" এইরূপে চারিটী বোঝা করিয়া তিনি বাসায় আসিলেন।

এদিকে নগরে হরিদাসের অপ্রকট সংবাদে মহা কোলাহল হইয়াছে। নগরময় হরিধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে। নীলাচলে মুসলমানের আসিতে নিষেধ। যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তখন হরিদাস রোদন করিয়া বলিলেন যে, তিনি কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, যেহেতু তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার নাই। তখন প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব। আজ সেই হরিদাসের অন্তর্দ্ধানে নীলাচলে বাল, বৃদ্ধ, যুবা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলে আনন্দে ও ভক্তিতে গদ গদ হইয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। তাই বলি ভক্তি, জাতির উপরে, সকলের উপরে।

সরূপ গোঁসাই যে চারি বোঝা ভিক্ষা লইয়া আসিলেন তাহাতে আর মহোৎসব হইত না। কারণ হরিদাসের ক্রিয়াতে প্রসাদ পাইতে নগর সুমেত লোকের সাধ হইল। তবে রামানন্দের ভাই বাণীনাথ বহু প্রসাদ আনিলেন, আর আনিলেন কাশীমিশ্র যিনি মন্দিরের কর্ত্তা।

বৈষ্ণবগণকে প্রভু সারি সারি বসাইলেন, আর চারিজন সহায় লইয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। যেন মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার সেই ভাব।

"মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাত্রে পঞ্চজনার ভোক্ষ্য পরিবেশে॥"

সরূপ প্রভুকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। করিয়া তিনি স্বয়ং, আর বলবান কাশীশ্বর, জগদানন্দ ও শঙ্করকে লইয়া পরিবেশন

আরম্ভ করিলেন। প্রভু ভোজন না করিলে কেহ ভোজন করেন না, কিন্তু সে দিবস প্রভুর কাশীমিশ্রের বাটীতে নিমন্ত্রণ ছিল। এমন কি, হরিদাসের অন্তর্দ্ধানের অতি অল্প পূর্ব্বেও প্রভু ব্যতীত কেহ জানিতেন না যে হরিদাস তখনি নিত্যধামে গমন করিবেন! কাশীমিশ্র প্রভুর ভিক্ষায় সামগ্রী সেখানে লইয়া আসিলেন, প্রভু সন্ন্যাসিগণ লইয়া বসিলেন! প্রভু যত্ন করিয়া সকল বৈষ্ণবকে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করাইলেন। কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভুর যেন এ নিজের কাজ। যেন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ।

ভোজনান্তে প্রভু সকলকে মাল্য চন্দন পরাইলেন। তাহার পরে বলিতেছেন:—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে কৈল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে করিল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হইবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয়ে ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ॥
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি করে হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥"

প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কৃপা

করিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া গেলেন।” বস্তুতঃ হরিদাসের অন্তর্দ্ধানে প্রভুর প্রাত্যাহিক একটী সুখের কার্য্য কমিয়া গেল। অর্থাৎ প্রত্যহ সমুদ্র স্নানঃসময়ে হরিদাসকে দর্শন দেওয়া যে কার্য্য ছিল, তাহা আর রহিল না। হরিদাস যে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই, প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। প্রভু যে লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহার সূচনা আরম্ভ হইল। হরিদাসের অন্তর্দ্ধান তাহার প্রথম লক্ষণ।

লোকে বলে যে মায়া ত্যাগ কর, করিয়া সাধু হও। কিন্তু মনুষ্য যদি মায়া ত্যাগ করিল, তবে তাহার আর রহিল কি? যাহার মায়া নাই সে তো অসুর। মায়া, মোহ, ইত্যাদি বড় ঘৃণার বস্তু বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়ামোহ বলে কারে? স্ত্রীকে ভালবাসা, সন্তানকে স্নেহ করা, পিতামাতাকে কি শ্রীভগবানকে প্রেমভক্তি করা, এ সমুদায় উপরোক্ত শাস্ত্রের হিসাবে “মায়া”। কিন্তু এ সমুদায় যদি পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র থাকিবে না। মায়া শূন্য যে মনুষ্য সে অসুর, রাক্ষস, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। আমাদের যিনি ভগবান্, তিনি মায়াময়, আমরা কিরূপে ও কেন মায়া ত্যাগ করিব? শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে কথায় কথায় জল, শ্রীকৃষ্ণ দীনদয়ার্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে পাগল, তবে মনুষ্য কিরূপে মায়ামোহশূন্য হইবে? এই যে নীলাচলে আমার প্রাণগৌরাঙ্গ প্রেমের হাট বসাইয়াছেন, ইহারা সকলে জুটিয়া এক বৃহৎ পরিবার স্বরূপ বাস করিতেছেন। এই পরিবার মধ্যে গৃহী আছেন, যেমন রামানন্দ; সন্ন্যাসী আছেন, যেমন পুরী, ভারতী; উদাসীন আছেন, যেমন হরিদাস। হরিদাস যখন অন্তর্দ্ধান করিলেন সেই পরিবার মধ্যে একজন অদর্শন হইলেন। হরিদাসের অভাব সকলে অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রভু পর্য্যন্ত। “এমন সঙ্গ আমি আর কোথায় পাইব?” হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই কথা।

হরিদাসের স্বচ্ছন্দ মরণ, ইহার নিমিত্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। ঠাকুর মহাশয়, রসিকানন্দ, প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য রূপে অপ্রকট হয়েন। প্রকৃত কথা, ভক্তি চর্চ্চার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন যোগ আর নাই। এই যোগের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভুর রাঢ় ভ্রমণকালীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। শরীররূপ উপপতির সহিত জীবাত্মারূপ রমণীর প্রীতি ধ্বংস করিয়া তাহার পরমাত্মরূপ পতির সহিত মিলন

সংঘটনের নামই "যোগ"। জীব "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া যতই সাধন করেন, ততই তাঁহার শরীররূপ উপপত্তির প্রতি প্রীতি লঘু হইতে থাকে। তাহার পরে ভক্তের এরূপ একটী অবস্থা হয় যে তাঁহাদের শরীর ও জীবাত্মার যে বন্ধন, তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থা হইলে জীব ভক্তিযোগীই হউন, কি জ্ঞানযোগীই হউন, তিনি আপনার শরীর হইতে অতি অনায়াসে আপনার জীবাত্মা নিষ্ক্রামণ করিতে পারেন। সুতরাং এরূপ অধিকারি জীব অনায়াসে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন। হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন; শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। তাই ভাবিলেন যে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। প্রভুর নিকট বর মাগিলেন। প্রভু দেখিলেন যে হরিদাসের এরূপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, তাই বর দিলেন। আর হরিদাস হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

যীশুখ্রীষ্ট অবতার, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিতে রক্তপিপাসু জাতি সমুদায় অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে। এই যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "প্রভু, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" এ কথা যখন আমরা প্রথম বাইবেল গ্রন্থে পাঠ করিলাম তখন আমাদের বিস্ময়ে আনন্দের উদয় হইল। তখন মনে এই ক্ষোভ হইল যে, আমাদের মধ্যে এরূপ উদাহরণ দেখাইবার কিছু নাই। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিগণ ঐ কথা লইয়া আমাদিগকে চিরদিন লজ্জা দিয়া আসিতেছেন; বলিতেছেন, "দেখাও দেখি, এরূপ মহত্ত্ব কোথায়, কোন্ কালে কেহ দেখাইতে পারে কি না?" আমরা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। কেন? কেন না আমরা তখন কেহ প্রভুর লীলা জানিতাম না। "আমরা" মানে—দেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত। কারণ প্রভুর ধর্ম্ম সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অপ্রচারিত থাকে, আর নবশাখগণ প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে প্রচারিত থাকে, তাহারা বিদ্যাচর্চ্চা করে নাই। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণব গোস্বামী তাঁহারা কেন প্রভুর লীলা জগতে প্রচার করেন নাই? সে কথার উত্তর আমরা কি দিব? তবে এই বলিতে পারি যে, যখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের, প্রভুর অপরিসীম কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন সে অনেকের চরণে শরণাগত হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। যাঁহারা গোস্বামী, পণ্ডিত, তাঁহারা শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন,

গোস্বামিগ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যিনি বড় জানেন, তিনি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেও যেখানে লীলা কথা আছে সেখানে নয়, যেখানে তত্ত্ব কথা আছে, সেখানে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিয়া যে একখানা গ্রন্থ আছে প্রায় কেহই তাহার সংবাদ রাখিতেন না। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি, প্রভু কে, তিনি কি করিয়াছিলেন, ইহা প্রায় কেহ জানিতেন না।

তাহার পরে প্রভুর লীলা পাঠ করিয়া দেখি যে যীশু যেরূপ মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, হরিদাস তাহা অপেক্ষাও মহত্ত্ব দেখান। যীশু তাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পিতা! ইহাদিগকে আমার হত্যারূপ অপরাধ হইতে মার্জ্জনা কর।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, ইহাদিগকে উদ্ধার কর!" আমার নিতাইয়ের মস্তক দিয়া রুধির পড়িতেছে আর তিনি মাধাইয়ের নিমিত্ত প্রভুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছেন। এ সমুদায় কেবল গৌরাঙ্গলীলায় পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়।

অপর, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন ভজনে, অনেক বাহ্য ক্রিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বিদেশী লোকে হাস্য করেন ও আমাদের দেশের বুদ্ধিমান লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়েন। মনে করুন, এক জাতির সহিত আর এক জাতির বিবাহ হইবে না। সুধু তাহা নয়, এক জাতির দুই শ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর বিবাহ হইবে না। দেখুন বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, উভয়েই ব্রাহ্মণ, অথচ ইহাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইবে না। ইহাতে হিন্দুকুল নির্ম্মূল হইতেছে। কিন্তু মহাপ্রভুর বিচারে, জাতি, কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি ধন, কি পদ লইয়া ছোট বড় বিচার নয়, কেবল ভক্তি লইয়া। হরিদাস মুসলমান, তাঁহার পাদোদক মহাকুলীন ব্রাহ্মণ কিরূপে পান করিলেন? ইহা সামাজিক নিয়মের ঘোর বিরোধী কার্য্য। কিন্তু প্রভুর ধর্ম্মে এ সমস্ত কিছু নাই। আবার, হরিদাস বৈষ্ণব, তাঁহাকে দাহ না করিয়া তাঁহাকে কবরে প্রোথিত করা হইল কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই, বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই সমুদায় ছাই মাটীর কথা লইয়া কচকচি নাই। যখন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেল, তখন উহা ভস্মসাৎ কর, কি মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বুদ্ধিমান্ পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমুদায় কতকগুলি অনর্থক সামাজিক নিয়মের নিমিত্ত হিন্দু সমাজে একতা নাই। এই জন্য উহা ছারে খারে গেল।

ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, ইহারা সকলেই প্রভুর দাস। রামানন্দ, প্রভুর বাম বাহু, বিশাখার অবতার। বাণীনাথ, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত, গোপীনাথ বিষয় কার্য্য করেন। ইহাদিগের দুই জন, রামানন্দ ও গোপীনাথ, প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যশাসন করেন। ইহাদিগকে অধিকারীও বলিত, রাজাও বলিত। ইহারা রাজার যে কার্য্য তাহা করিতেন, তবে মাসিক বেতন পাইতেন। এই রাজার রাজা যদি অসন্তুষ্ট হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইরূপ গোপীনাথ মালজ্যাঠার অধিকারী। তাঁহার নিকট মহারাজের লক্ষ কাহন পাওনা হইয়াছে। গোপীনাথ চিরদিন বড় বাবু লোক, অপব্যয়ে সমুদায় উড়াইয়া দেন। মহারাজ-সরকারে দেনা টাকা দিতে পারেন না, সেই ঋণ শোধের প্রস্তাবে বলিলেন, "আমার ১০।১২টী ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অন্যান্য দ্রব্য বেচিয়া দিব।" প্রতাপরুদ্রের কুমার, পুরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়াগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাঁহার এবিষয়ে বুৎপত্তি ছিল। তিনি অল্প মূল্য বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "আমার ঘোড়া তোমার মতন ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না। তবে এত কম মূল্য কেন বল?" সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিনি ঐরূপ ঘাড় ফিরাইতেন, ইহাতে তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপীনাথের ভরসা এই যে, তাঁহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রিয়পাত্র, সেই বলে রাজার পুত্রকে পর্য্যন্ত দুর্ব্বাক্য বলিতে সাহসিক হইয়াছিলেন। রাজপুত্র কাজেই রাজার কাছে গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের নিকট কোনক্রমে অনুমতি লইয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল। চাঙ্গ মানে এই যে, নিম্নে খড়্গ পাতিয়া উপরে মাচার উপর রাখা হয়। সেখান হইতে অপরাধীকে এরূপ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় যে, সে দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। গোপীনাথকে যখন চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্য গোল হইবার কথা। কয়েকজন আসিয়া প্রভুর স্মরণ লইল; বলিল, "প্রভু, রামানন্দের গোষ্ঠী তোমার দাস; তাহাদিগকে রক্ষা কর।"

এখন, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর দাস। প্রতাপরুদ্র আপনি প্রভুর নাম রাখিয়াছেন, "প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা"। প্রভু একটি কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়। প্রভুর একটী কথা বলাও কর্ত্তব্য, যে হেতু ভবানন্দ গোষ্ঠিসমেত

তাঁহার অনুগত, আর রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বলিলেও হয়। কিন্তু প্রভু কোমল হইলেন না ; বলিলেন, "গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই ঋণী। সে যে বেতন পায় তাহাতে অনায়াসে সুখে কাল কাটাইতে পারে, তাহা না করিয়া চুরি করিবে, করিয়া কেবল কুকার্য্যে রাজার অর্থ ব্যয় করিবে। সে ত অবশ্য রাজার নিকট দণ্ডার্হ। আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।"

প্রভু এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, গোষ্ঠিসমেত ভবানন্দকে রাজা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পরে জানা গেল যে কথাটী অলীক। যাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত হইলেন ; এমন কি, সরূপ পর্য্যন্ত জুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন ; বলিলেন, "প্রভু, রামানন্দ সবংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহারা তোমার দাস, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর।"

মনে ভাবুন, রাজা প্রতাপরুদ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার উপর কেহ কর্ত্তা নাই। তিনি যদি কোন আজ্ঞা করেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অবশ্য পালন করিতে হইবে, কাহারও এমন সাধ্য নাই যে, তাহাতে দ্বিরুক্তি করেন। প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র অবশ্য অনেক ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু বিষয় কার্য্যে গুরুর পরামর্শ কি আদেশ সকল সময় শুনিলে রাজ্যশাসন চলে না। আবার কাশী মিশ্র অন্যের ন্যায় রাজার অধীন, তিনিই বা সাহস করিয়া রাজ্য সংক্রান্ত কোন অনুরোধ রাজাকে কিরূপে করিবেন ? তবে তখন পুরীতে কেবল একজন ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞা রাজা অবহেলা করিতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগের প্রভু। রাজার ক্ষোভ যে, প্রভু তাঁহাকে কোন আজ্ঞা করেন না। তাই ভবানন্দ পরিবারের বিপদ হইলে, সকলে প্রভুর শরণ লইলেন। যখন সরূপ প্রভৃতি এইরূপ অনুরোধ করিলেন, তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা বল কি ? আমি সন্ন্যাসী হইয়া কি আমার ব্রত ভঙ্গ করিব ? তোমরা কি বল যে, আমি এখন রাজার কাছে যাই, যাইয়া আঁচল পাড়িয়া কৌড়ি ভিক্ষা করি ? আচ্ছা তাহাই না হয় করিলাম, কিন্তু তাহা হইলে, আমি একজন পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসী, আমাকে দুই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা দিবেন কেন ?"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোপীনাথকে খড়্গের উপর ফেলিতেছে ! এইবার দিয়া চারিবার এইরূপ সংবাদ রাজার নিকট হইতে আসিল। প্রভু তবু প্রতিজ্ঞা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা যদি এত ভয় পাইয়া থাক, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় লও, তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।" রামানন্দের ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রকৃত বিষয়ী এই গোপীনাথ। তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন

করেন, বাঁদরামী করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এ পর্য্যন্ত তিনি বিফলে জীবন কাটাইয়াছেন। তখন জগতের সমুদায় মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের নাম জপিতে লাগিলেন।

যখন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত্ত ভক্তগণ প্রার্থনা করিতেছেন, তখন সেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট গমন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "মহারাজ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। তাহার নিকট টাকা পাওয়ানা থাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? বিশেষতঃ ভবানন্দ পরিবার কেবল তোমার কৃপাপাত্র নহে, মহাপ্রভুর কৃপাপাত্রও বটে—" এই কথা শুনিতে শুনিতে রাজা বলিলেন, "সে কি! আমি তাহাকে বধ করিতে ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদায় হইবে না, তাহাতেই আমি সম্মতি দিয়া ছিলাম।" রাজা তৎপরে হরিচন্দনকে বলিলেন, "যাও, তুমি শীঘ্র যাও, তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিয়া।" ফল কথা, গোপীনাথ মহাপ্রভুর প্রিয়, এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একটু ভীত হইলেন।

ইহার পরে রাজা তাঁহার চিরপ্রথানুসারে, তাঁহার গুরু কাশীমিশ্রের পদসেবা করিতে আসিলেন। তখন কাশী মিশ্র বলিতেছেন, "দেব, আর এক কথা শুনিয়াছেন? মহাপ্রভু আর এখানে থাকিবেন না।" অমনি প্রতাপরুদ্রের মুখ শুখাইয়া গেল; বলিতেছেন, "সে কি? সব খুলিয়া বল।" তখন কাশী মিশ্র বলিলেন যে, "গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলে, নগর সমেত লোক যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার নিকট বিষয় কথা কেন?" রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তখন কাশী মিশ্র রাজার নিকট বলিলেন, "আপনার উপর ঠাকুরের কোন ক্রোধ নাই। তিনি বরং গোপীনাথকে নিন্দা করিলেন; বলিলেন, যে রাজার দ্রব্য অপহরণ করে, সে দণ্ডার্হ, আর রাজা তাহাকে দণ্ড করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার বিষয় কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, এস্থান হইতে আলালনাথে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন।"

রাজা বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর সংবাদ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরূপে বাঁচিব? আমি গোপীনাথের সমুদায় ঋণ মাপ করিলাম।"

তখন কাশী মিশ্র আবার বলিতেছেন, "আপনি গোপীনাথের ঋণ-মার্জ্জনা করিলে যে মহাপ্রভুর সন্তোষ হইবে তাহা বোধ হয় না। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে, আপনার ন্যায্য যাহা পাওনা, তাহা আপনি পরিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জন্য আপনার ন্যায্য পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ ভিন্ন সুখী হইবেন না।" রাজা বলিলেন, "তবে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিও না।" কথা এই যে, ভবানন্দের গোষ্ঠিকে আমি নিজ জন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বলি না। তাহার পর তাহারা গোষ্ঠিসমেত এখন মহাপ্রভুর প্রিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে। আমি তাহাকে আবার মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাই-তেছি। সে যে অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোধ হয় তাহার বেতন অল্প ছিল। এখন তাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি করিবে না।"

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাঁহাকে নেতধটী অর্থাৎ অধিকারীর সাজ পরাইলেন। তখন গোপীনাথ সেই রাজবেশে ভ্রাতাগণ ও পিতা সহ আসিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

প্রভুর লীলার মধ্যে এই একটী মাত্র বিষয় কথা আছে। তবু ইহাতে কয়েকটী মহা উপদেশ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু একটী কথা বলিলে, গোপীনাথের প্রাণ বাঁচে, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার পক্ষে রাজার নিকট অনুরোধ করা কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটী হইত। যখন গোপীনাথের নিমিত্ত সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তখন প্রভু বলিলেন যে, তাঁহারা যদি গোপীনাথের প্রাণ ভিক্ষা চাহেন তবে তাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতের প্রথম খণ্ডে "আমি ও গৌরাঙ্গ" শীর্ষক কবিতায় এই পদটি আছে :—

"(জীব) বিপদে পড়িলে স্বভাব দিয়াছ
সহজে তোমারে ডাকে।"

ইহার তাৎপর্য্য "হে প্রভু, আমি যে তোমার নিকট দুঃখ পাইয়া আর্ত্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও না। তুমি জীবের যেরূপ স্বভাব দিয়াছ, তাহাতে তাহারা বিপদে পড়িলে সেই স্বভাবানুসারে তোমাকে ডাকিয়া থাকে।"

এখানে এই কথার একটু বিচার করিব। শ্রীভগবান্ মঙ্গলময় ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার নিকট আবার প্রার্থনা কি? যাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা জানেন যে, যে শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার অন্ন তিনি স্বীয় মস্তকে করিয়া বহিয়া তাহার নিকট লইয়া যান। ইহাই যখন ভক্তের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তখন সেখানে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ এ কথা কেন বলিলেন যে, যদি তোমরা গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা চাও, তবে শ্রীজগন্নাথের নিকট প্রার্থনা কর।

কথা এই, ভক্ত দুই প্রকার আছেন। কেহ শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন, যেমন শ্রীনিবাস। তিনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্ন সংগ্রহের নিমিত্ত কোথাও গমন করেন না, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভক্তের সংখ্যা অতি বিরল। তাহার কারণ উপরের কবিতায় প্রকাশ। অর্থাৎ জীবের স্বভাব এই যে বিপদে পড়িলে শ্রীভগবানকে ডাকে। সামান্য বিপদে পড়িলে লোকে আপনা আপনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন একটু গুরুতর রকমের বিপদ হয়, তখন আর তাহা পারে না। তখন বলিয়া উঠে, "হে ভগবান, রক্ষা কর।" কেহ কেহ এমন আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন। নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন এ কথা বলি কেন, না প্রকৃতপক্ষে ইহারাও ভগবানে নির্ভরতা হৃদয় হইতে উৎপাটন করিতে পারেন না। এই নাস্তিকগণও বিপৎকালে বলেন, "হে ভগবান, যদি তুমি থাক, তবে রক্ষা কর।"

স্বভাবের ভুল নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মানুষের বিপদে এই কয়েকটী অতি নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায়। বিপদ হইলে যখন জীব স্বভাবতঃ শ্রীভগবানকে ডাকে, তাহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে, (১) শ্রীভগবান্ আছেন, (২) তিনি সুহৃৎ, ও (৩) তিনি জীবের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন। যদি ভবানন্দের গোষ্ঠি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহারা বিপদে ভীত হইতেন না। তাঁহারা নির্ভর করিতে পারিলেন না, তাই প্রভু বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথের নিকট ক্রন্দন কর।"

শ্রীভগবানের নৌকাখণ্ড লীলায় আছে যে, যখন শ্রীভগবান্ কাণ্ডারী হইয়া গোপীগণকে পার করিতেছেন, তখন তিনি মধ্য নদীতে নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। তখন গোপীগণ ভয় পাইয়া তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। জীব

যখন ভবসাগর পার হয়, তখন শ্রীভগবান নৌকা দোলাইয়া থাকেন, ইহাতে এই মহৎ উপকার হয় যে, তাহারা উহাতে শ্রীভগবানের অভয় পদাশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। বিপদ না হইলে আর তাহা করিতে চাহে না। প্রকৃত কথা, "সদানন্দ রাজ্যে পূর্ণানন্দ সন্তানে" বিপদ সম্ভবে না। যে সমুদায় বিপদ দেখা যায় সে সমুদায় মায়া, পরিণামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে বাস করিবে, এই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা। শ্রীভগবান আমাদের কি সুহৃৎ, কি নিঃস্বার্থ বন্ধু!

ষষ্ঠ অধ্যায়

জগদানন্দ সত্যভামার প্রকাশ। শিবানন্দ সেন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। প্রাণটি একেবারে শ্রীগৌরাঙ্গের পদে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত এক তিল বাঁচেন না। বুদ্ধি তত প্রখর নহে। কিন্তু অন্তরটী অতিশয় সরল। প্রভুর নিকট নীলাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনবদ্বীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর সংবাদ দিতে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। এবার দেশে আসিয়া মনে মনে একটী সংকল্প স্থির করিয়াছেন। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, দিবানিশি হা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন। তাহা জগদানন্দ দর্শন করেন, আর তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। মনে ভাবিলেন প্রভুকে কিছু শীতল তৈল মাখাইলে তাঁহার অন্তর শীতল হইবে। মনে সাধ, যদি কিছু শীতল সুগন্ধি তৈল সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে আপন হস্তে প্রভুর মস্তকে উহা মর্দ্দন করেন। মস্তিষ্ক শীতল হইলে অন্তরও শীতল হইবে, প্রভুও আর ঐরূপ হা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করি-বেন না। মনে মনে এই যুক্তি করিয়া এক কলস অতি উত্তম চন্দনাদি

তৈল প্রস্তুত করাইয়া, একটী লোকের মাথায় দিয়া একেবারে কাঁচনা-পাড়া হইতে নীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অগ্রে যাইয়া একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে চুপে সেই তৈলের কলস গোবিন্দের নিকট দিয়া বলিলেন, "তুমি এই তৈলের কলস রাখিয়া দাও, প্রভু'ক মাথাইব।"

গোবিন্দ বুঝিলেন যে, জগদানন্দের পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র, প্রভু সে তৈল কখনই ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু জগদানন্দের অনুরোধে অতি নম্র হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "জগদানন্দ অনেক কষ্ট করিয়া এক কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকারী, বায়ু ও পিত্ত উভয়ই শান্ত করে। তাঁহার ইচ্ছা আপনি ইহা মস্তকে দেন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই। বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈল। জগদানন্দ পরিশ্রম করিয়া তৈল আনিয়াছেন, জগন্নাথের মন্দিরে উহা দাও, প্রদীপে জ্বলিবে। তাহা হইলেই তাহার পরিশ্রম সফল হইবে।" গোবিন্দ আবার অনুরোধ করিলেন, প্রভু তবুও শুনিলেন না।

কিছু দিন গত হইলে জগদানন্দ আবার গোবিন্দের শরণ লইলেন। বলিলেন, "তুমি প্রভুকে আবার বল।" গোবিন্দ তাহাই করিলেন, বলিলেন, "পণ্ডিত (জগদানন্দ) বড় দুঃখিত হইবেন, তিনি বড় পরিশ্রম করিয়া বহুদূর হইতে তৈল আনিয়াছেন।" প্রভু ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হইল ভাল, সুগন্ধি তৈল আসিয়াছে এখন তৈল মাখাইবার জন্য একজন ভৃত্য রাখ, তাহা হইলে তোমাদের মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। তোমাদের এ বিবেচনা নাই যে, আমি সুগন্ধি তৈল মাখিলে লোকে আমাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস করিবে?" গোবিন্দ চুপ করিলেন।

পর দিবস প্রাতে জগদানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রভু বলিতেছেন, "পণ্ডিত, তৈল আনিয়াছ, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী ইহা মাখিতে পারি না। জগন্নাথকে ঐ তৈল দাও, প্রদীপ জ্বলিবে, তোমার শ্রমও সফল হইবে।" জগদানন্দ বলিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, এ মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল?" আর সে যে মিথ্যা কথা, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলস আনিয়া, প্রভুর সম্মুখে বলপূর্ব্বক আছাড় মারিয়া ভগ্ন করিলেন, করিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, যাইয়া দ্বারে খিল দিয়া শুইয়া থাকিলেন।

জীব মাত্রেই অজ্ঞ, সুতরাং শ্রীভগবানের চিরদিনই এইরূপ অবুঝ পরিবার লইয়া সংসার। বালক বলিতেছে, "মা, আমাকে চাঁদ ধরিয়া দাও।" আর চাঁদ না পাইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। বালক বলিতেছে, "আমি ঘোড়ায় চড়িব," জনক সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা করিতে দিতেছেন না, আর সন্তান মহাদুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এইরূপে জীবগণ যদিও কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুঝে না, তবু দিবানিশি ইহা দাও, উহা দাও, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর উহা না পাইয়া শ্রীভগবানের উপর রাগ করিতেছে।

জগদানন্দের এইরূপে দুই দিবস গেল, তিনি খিল খুলিলেন না, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রভু নিরুপায় হইয়া তিন দিনের দিন প্রাতে জগদানন্দের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "পণ্ডিত, উঠ শীঘ্র উঠ, আমি দর্শনে গেলাম, এখানে আসিয়া মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিব।"

জগদানন্দের অমনি সমুদায় রাগ গেল। তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যেথানে যাহা পাইলেন আনিয়া বিলক্ষণ আয়োজন করিলেন। জগদানন্দ বড় একটী কলার পাতা পাতিলেন, তাহাতে অন্ন দিলেন, ঘৃত ঢালিয়া দিলেন, কলার দোনায় নানাবিধ ব্যঞ্জন পিঠা পানা পূরিলেন, আর সকলের উপর তুলসীর মঞ্জরী দিয়া প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া, করজোড়ে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন।

প্রভু বলিলেন, "তাহা হইবে না, আর একখানা পাতা পাত, তোমায় আমায় দুই জনে ভোজন করিব।" ইহা বলিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিলেন।

তখন জগদানন্দের সমুদায় রাগ গিয়াছে, প্রেমে হৃদয় টলমল করিতেছে। গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, আপনি প্রসাদ লউন, আমি পরে বসিব।" প্রভু তাই করিলেন। মুখে অন্ন দিয়াই বলিতেছেন, "রাগ করিয়া রান্ধিলে এরূপ উত্তম আস্বাদ হয়! কি কৃষ্ণ আপনি ভোজন করিবেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমার হস্তে এই পাক করিয়াছেন? তাহা না হইলে অন্ন ব্যঞ্জন এরূপ সুস্বাদু কিরূপে হইল?" জগদানন্দের মুখে তখন হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, "যিনি খাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন তাহার সন্দেহ কি? আমি কেবল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।" এ

দিকে যে কোন ব্যঞ্জন ফুরাইতেছে, জগদানন্দ অমনি সেই ব্যঞ্জন আনিয়া ডোঙ্গা পূর্ণ করিতেছেন। প্রভু ভয়ে ভয়ে খাইতেছেন, কি জানি যদি জগদানন্দ আবার রাগ করেন! মধ্যে মধ্যে ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "আর না," কি "আর পারি না"। কিন্তু জগদানন্দ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না, ব্যঞ্জন ফুরাইলে ব্যঞ্জন, অন্ন ফুরাইলে অন্ন দিতেছেন। শেষে প্রভু কাতর হইয়া বলিলেন, "যাহা ভোজন করি, তাহার দশগুণ খাওয়াইলে, আর পারি না, আমাকে ক্ষমা দাও।" তখন জগদানন্দ নিরস্ত হইলেন।

ইহাকে বলে শ্রীভগবানকে জব্দ করিয়া বাধ্য করা। এরূপ ভজন বেশ সন্দেহ নাই, তবে গোড়ায় প্রেমের প্রয়োজন। জগদানন্দ রাগ করিয়া প্রভুকে জব্দ করিলেন না, করিতে পারিতেন না, প্রেম দ্বারা করিলেন।

ভিক্ষান্তে প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত, এখন তুমি ভোজন কর, আমি বসিয়া দেখি।" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু, আপনি যাইয়া আরাম করুন, আমি এখনই বসিব। যিনি যিনি আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহারা আসিলে সকলে একত্রে ভোজনে বসিব।"

জগদানন্দের বড় ইচ্ছা একবার বৃন্দাবনে গমন করিবেন। প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, জগদানন্দ গমন করেন। তাহার নানা কারণ। জগদানন্দ সরল, ভাল মানুষ, পথে মারা যাইবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রভুর পার্ষদ, জগতে ইহা সকলে জানে। কি বলিতে কি বলিবেন, কি করিতে কি করিবেন, শেষে আপনাকে, প্রভুকে ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করিবেন। তাই, যখন জগদানন্দ বলেন, "প্রভু, অনুমতি করুন, আমি একবার বৃন্দাবন যাইব," অমনি প্রভু বলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করিয়া দেশান্তরি হইবে, আমি তোমায় কিরূপে যাইতে অনুমতি দিই।" প্রকৃত কথা, জগদানন্দের কেবল চেষ্টা প্রভুকে আরামে রাখেন; কিন্তু প্রভু সে সমুদয় অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রভু ও জগদানন্দে কলহ। জগাই বলেন, "আমাকে প্রভু বৃন্দাবনে যাইতে অনুমতি করুন।" প্রভু বলেন, "জগদানন্দ, আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে আমাকে ক্ষমা কর।" জগদানন্দ কাজেই বৃন্দাবনে যাইতে পারেন না।

জগদানন্দ তখন সরূপের আশ্রয় লইলেন। সরূপ প্রভুকে ধরিলেন, এবং তাঁহাকে সম্মত করাইলেন। প্রভু জগদানন্দকে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, "নিতান্তই যাইবে তবে যাও, কিন্তু সেখানে বিলম্ব করিও না। কাশী পর্য্যন্ত ভয় নাই, তাহার ওদিকে একা গৌড়িয়া পাইলে দস্যুগণ অত্যাচার করে, সুতরাং সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যাইবে। বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতনের সঙ্গে থাকিবে, তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদও যাইবে না। সেখানে যে সমুদয় সাধু আছেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইও না, তাঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিবে। আর সনাতনকে বলিবে আমিও সত্বর বৃন্দাবনে যাইতেছি।"

প্রভু বৃন্দাবনে আর গমন করেন নাই, সুতরাং তিনি কি ভাবে কি বলিয়াছিলেন, হয় জগদানন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কি বলিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক, প্রভু যে পথ আবিষ্কার করেন, জগদানন্দ সেই বন পথে কাশী গমন করিয়া তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। সেখান হইতে বরাবর সনাতনের নিকট গমন করিলেন। সনাতন জগদানন্দকে পাইয়া একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, যেন স্বয়ং প্রভুকে পাইলেন। সনাতন দিবানিশি তাঁহার নিকট প্রভুর কথা শুনেন, আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা দেন। একদিন সনাতনকে ভিক্ষা দিবেন মনে করিয়া জগদানন্দ দুই জনের পাক চড়াইলেন। সনাতন যমুনায় স্নান করিয়া ভিক্ষার্থে আগমন করিলেন। তাঁহার মাথায় একখানা রাঙ্গা বহির্বাস বান্ধা। জগাই ভাবিলেন সে খানি অবশ্য প্রভুদত্ত, তাই গদ গদ হইয়া সেই বহুমূল্য সামগ্রীটাকে একদৃষ্টে দর্শন করিতেছেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানি তুমি কবে কোথায় পাইলে?" সনাতন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখানি প্রভু দত্ত ধন নহে; এখানি আমাকে মুকুন্দ সরস্বতী দিয়াছেন।" তখন জগদানন্দ যে হাঁড়িতে পাক চড়াইয়া ছিলেন উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের মস্তকে মারিতে চলিলেন!

সনাতন মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত, যেমন অপরাধ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই এই সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার তুমি আমাকে ক্ষমা কর, এরূপ আর করিব না।" সনাতনের হাসি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা

হইল, লজ্জা পাইলেন, পাইয়া আবার চুলায় হাঁড়ি রাখিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞী, আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আপনাকে ভুলিয়া তোমার ন্যায় ভক্তকে মারিতে যাইতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ইহা কে সহ্য করিতে পারে? তুমি প্রভুর প্রধান পার্ষদ, তোমার ন্যায় তাঁহার প্রিয় কয়জন আছে? তুমি কিনা অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র মস্তকে বান্ধ?" সনাতন হাসিয়া বলিলেন, "আমরা দূরদেশে থাকি, থাকিয়া জগদানন্দের গৌরাঙ্গপ্রেমের কথা শুনিয়া থাকি, চক্ষে দেখিতে পাই না। তাই দেখিবার জন্য মাথায় অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র বান্ধিয়াছিলাম। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এখন চক্ষে দেখিলাম। ধন্য তুমি জগদানন্দ!" প্রকৃতই জগদানন্দের পক্ষে প্রভুর মান্য দ্বিজোত্তম সনাতনকে (যিনি তাহার আমন্ত্রিত) মারিতে উদ্যত হওয়া যেমন তেমন প্রেমের কথা নয়। তখন সনাতনের কথা শুনিয়া, জগাই কান্দিয়া উঠিলেন এবং উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া গুণময় প্রভুর কথা কহিতে কহিতে তাপিত হৃদয় শীতল করিতে লাগিলেন। প্রেমচর্চ্চায় জীবগণকে অর্দ্ধ ক্ষিপ্ত করে, আর সেই ক্ষিপ্ততায় অপরূপ মাধুর্য্য রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোস্বামী। চারি জনের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে, যথা সনাতন, রূপ, জীব ও রঘুনাথ দাস। এখন রঘু-নাথ ভট্টের কথা কিছু বলিব। প্রভু যৌবনের প্রারম্ভে পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন করেন, এবং সেখানে তপনমিশ্রকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক বারাণসী যাইয়া বাস করিতে বলেন। তপন, সেই অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক শিশু-অধ্যাপকের আজ্ঞায় দেশত্যাগ করিয়া, সস্ত্রীক বারাণসীতে যাইয়া বাস করেন। প্রভু তপনকে বলিয়াছিলেন যে, পরে ঐ স্থানে অর্থাৎ কাশীতে

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং সে মিলন যে হইয়াছিল, এ সমুদায় কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তপন মিশ্র কেন যে ঐ বালক অধ্যাপকের কথায় দেশত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন, তাহার কারণ শাস্ত্রে এই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন যে, এই বালক অধ্যাপক আর কেহ নয়, অখিলব্রহ্মাণ্ডের পতি। কিন্তু প্রভু কেন তপনকে দেশত্যাগ করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করেন, ইহার কারণ বুঝা বড় কঠিন। তবে ইহা আমরা জানি যে তপন হইতে রঘুনাথ ভট্ট, এবং রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির। এ কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ। আবার এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৃন্দাবন ও কাশী এই দুই স্থানই ভারতের প্রধান স্থান। বৃন্দাবনে প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ভকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশীতেই বা একজন দূত না পাঠাইবেন কেন?

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিতে কাশী হইতে নীলাচল আগমন করিলেন। প্রভু রঘুনাথকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথও পিতা মাতার প্রণাম জানাইলেন। প্রভুর নিকট বাস করিয়া রঘুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা বর্ত্তমান ও বৃদ্ধ, পিতামাতার সেবা ত্যাগ করিয়া রঘুনাথ যে প্রভুর চরণে থাকিবেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে। সেই জন্য প্রভু তাঁহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন না। বলিলেন, "কাশী প্রত্যাবর্ত্তন কর ও সেখানে যাইয়া পিতা মাতার সেবা কর।" তাঁহাদের অন্তর্ধানে আবার আসিও। প্রভু আরও আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্যা-ধ্যয়ন কর এবং বৈষ্ণবের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অভ্যাস কর।" প্রভু আরও একটী আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ না করেন।

প্রভু যন্ত্রী, আর সকলেই যন্ত্র। কাহারে কি নিমিত্ত কোথায় নিয়োজিত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ উদাসীন ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বাধ্য করিয়া সংসারী করিলেন। রঘুনাথ ভট্ট যুবক, গৃহী ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন শুনিয়া, রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুর কিছু বিশেষ অভিপ্রায় আছে, তবে সে যে কি, তাহা অবশ্য তখন বুঝিতে পারিলেন না।

অল্প দিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার পিতা মাতার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রঘুনাথ সর্ব্বদাই প্রভুর সঙ্গে থাকেন, তাঁহার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কখন বা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ পাকে বড় সুনিপুণ। প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া ফল এই হইতেছে যে, ক্রমে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন। এইরূপে আবার আট মাস গত হইল, তখন জীববন্ধু প্রভু আর তাঁহাকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না, কারণ বৃন্দাবনে তাঁহার প্রয়োজন। তাই বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, সেখানে সনাতন রূপের আশ্রয়ে বাস করিও।" রঘুনাথ অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটুও ইচ্ছা নাই। কাহারই বা হয়? কিন্তু এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা প্রভুর সমুদায় কার্য্যে বুঝা যায়। প্রভু মহোৎসবে চৌদ্দহাত লম্বা তুলসীর মালা আর ছুটা পানের বীড়া পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই দুই দ্রব্য চিরদিন নিকটে রাখিয়াছিলেন ও পূজা করিতেন।

ভট্ট উপাধিধারী রঘুনাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানকার প্রধান ভাগবতী হইলেন। একে ভাগবতে অগাধ বিদ্যা, তাহাতে কণ্ঠ অমৃতের ধার, সঙ্গীতে বিশেষ নৈপুণ্য, অন্তর ভাবে দ্রবীভূত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বর্ণনা, সেখানে এলাইয়া পড়েন, প্রেমধারা পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ হইয়া অতিশয় মিষ্ট হয়। রঘুনাথের ভাগবত পাঠ শ্রবণ বৃন্দাবনের একটী প্রধান সম্পত্তি হইল। রূপ সনাতনের সভায় ভাগবত পাঠ হইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা কৃষ্ণের, বর্ণনা ভাগবতের, পাঠ রঘুনাথের, ভাব সুর সঙ্গীত শ্রীল মহাপ্রভু দ্বারা সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত। সে দৃশ্য স্মরণ করিলেও জীব পবিত্র হয়।

এইরূপ বৃন্দাবনে তিন গোসাঞি বিরাজ করিতে লাগিলেন, যথা, সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট। তাহার পরে গোপাল ভট্ট তাহার পরে রঘুনাথ দাস এবং সর্ব্বশেষে শ্রীজীব আসিলেন। এই রঘুনাথ দাসের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। রূপ ও সনাতন গম্ভীর, অটল, শাস্ত্র লইয়া বিব্রত। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিতেছেন, বাহিরের লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাঁহাদের ভজনানন্দের অবসর পর্য্যন্ত নাই। বাস

কুটীরে, বৃক্ষতলায় কি গোফায়। গোফা কি না, একটী গর্ত্ত। ভল্লুকের গোফা আছে, তাহাতে ভল্লুক বাস করে। সেইরূপ ভক্তগণ, যেখানে মৃত্তিকার স্তম্ভ আছে, তাহাতে গহ্বর করিয়া একটু আশ্রয় স্থান করিয়া লইতেন। প্রভুর গণ কান্থা করঙ্কধারী, তাঁহাদের আর সম্পত্তি নাই। বৃন্দাবন জঙ্গলময়, অতি অল্প সংখ্যক অসভ্য লোকের বাস। আর কিসের বাস, না হিংস্র জন্তুর। এখানে আহার্য্য সংগ্রহ করাই দায়। রূপ-সনাতন প্রভৃতির আপনাদিগের আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে, আর যাঁহারা যখন আসিতেছেন, তাঁহাদিগের আহার্য্য দ্রব্যও ইঁহাদিগকেই সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য শাস্ত্র প্রচার করা। শাস্ত্র কি না, ভক্তিশাস্ত্র, অর্থাৎ যাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তির ন্যায় সহজ ও শক্তিশালী ভজন আর নাই।

এ শাস্ত্র তখন ছিল না। শাস্ত্রের মধ্যে এখানে ওখানে ভক্তির মাহাত্ম্য মাত্র দেখান হইত বটে, কিন্তু তাহাও পণ্ডিতগণ কূটার্থ দ্বারা অন্যরূপ বুঝাই-তেন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, এমন কি শ্রীভাগবত পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। জগত মায়া, তুমি মায়া, শ্রীকৃষ্ণ মায়া, তিনিও যেই, আমিও সেই, মরিলে আবার জন্মিতে হয়, মোক্ষ অর্থাৎ নাশ জীবের একমাত্র মঙ্গল, ইত্যাদি নাস্তিকের মত তখন ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল।

আবার যাঁহারা অল্প অল্প মানেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে পিশাচ সাজা-ইয়াছেন। তাঁহারা মদ্য মাংস রুধির দিয়া ভগবানকে পূজা করেন। পূজা করেন কেন, না শত্রু দমনের নিমিত্ত, পুত্র লাভের নিমিত্ত, কি ধন ও যশ প্রার্থনা করিয়া। তাঁহারা যে ভগবানের আকৃতি প্রকৃতি রাক্ষস ও পিশাচের ন্যায় করেন, তাঁহারা নিজে কি রাক্ষস ও পিশাচ? শ্রীভগবান্ কি তাহা-দিগের হইতে মন্দ? তাঁহারা কি রুধির পান করিতে পারেন? কিন্তু তাঁহারা শ্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন? তাঁহারা না ভগবানকে গাঁজা খাওয়াইতেছেন? যদি শ্রীভগবান্ জ্ঞানময় হয়েন, তবে তিনি সৌন্দর্য্যময় নয় কেন? সকল বিষয়ে তিনি সর্ব্বোত্তম, তিনি পুরুষোত্তম, জ্ঞানে ও প্রেমে। দেখিতে তাঁহাকে পিশাচের মত কেন হইবে? সমুদায় শুভের আকর তিনি। সৌন্দর্য্যও একটী শুভ, তবে তিনি কেন সৌন্দর্য্যের আকর না হইবেন? অতএব শ্রীভগবান যেমন গুণে ভুবনমোহন, রূপেও সেইরূপ ভুবনমোহন।

এইরূপে ভারতের বিজ্ঞ জ্ঞানবান্ লোকে কিছু মানেন না। আবার যাঁহারা কিছু মানেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে দৈত্য, অসুর, পিশাচ সাজাইয়া পূজা করেন। এইরূপ যখন সমাজের অবস্থা, তখন প্রভুর নিয়োজিত গোস্বামিগণ সমগ্র শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইহাই স্থাপিত করিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান পৃথক বস্তু। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ভক্তি করিলে জীবের আর জন্ম হয় না, নাশও হয় না, ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট বাস করেন,—এই সমুদয় তত্ব, তাঁহাদিগকে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি যত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে; তাহা না করিলে তাঁহাদের কথা কেহ মানিবেন না।

কিন্তু এই গোস্বামিগণের কত বাধা দেখ। প্রথমতঃ গৃহে একটী তণ্ডুলও নাই; রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ে আশ্রয় নাই; শীতের বস্ত্র নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ দ্রব্য—গ্রন্থ। এইরূপ লক্ষ গ্রন্থের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যে অমূল্য গ্রন্থ "চৈতন্যচরিতামৃত" লিখেন, তাহাতে সাতশত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বৃন্দাবনে বসিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। তখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না। একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে একজনের এক বৎসর লাগে। লিখিতে হইবে এরূপ এক সহস্র গ্রন্থ। সেই হস্তলিখিত গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হইবে, পড়িয়া তাহা হইতে শ্লোক লইয়া মত স্থাপন বা খণ্ডন করিতে হইবে। এখন বুঝিয়া দেখুন গোস্বামীদিগের কার্য্য কতদূর কঠিন ও গুরুতর।

বৃন্দাবন জঙ্গলময়। নিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কিন্তু সে নগর ছারে খারে গিয়াছে। মুসলমানগণ মুহুর্মুহু নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেছে, কাজেই ভদ্রলোকে প্রায় ধনোপার্জ্জন ও বিদ্যোপার্জ্জন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মথুরার চোবে দোবেগণ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল কুস্তী করিয়া গুণ্ডা হইয়াছেন, নহিলে জাতি মান থাকে না। নিকটে আর এক নগর আগ্রা। সেখানে মুসলমান আধিপত্যে রাজকার্য্য হইয়া থাকে। সে দিক হইতেও কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। গোস্বামিগণ গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় একজন সাধু কি পণ্ডিত আসিলেন, তাঁহার সহিত বিচার হইতে লাগিল। গোস্বামিগণ বিনয়ের খনি, কেহ যদি প্রণাম করে অমনি তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম করেন। কাহাকেও নিরাশ,

অপ্রতিভ, অপদস্থ কি অনাদর করিতে জানিতেন না। এইরূপে এক জন পণ্ডিত আসিয়া অসার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন, করিয়া তাঁহাদের দশ দিন সময় নষ্ট করিলেন। গোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় ঝড় আসিল, গ্রন্থ লেখা বন্ধ হইল। তবুও এই গোস্বামিগণ সহস্র সহস্র গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার এক এক খানি গ্রন্থ এক একখানি বহুমূল্য ধন। ইহা কি শ্রীভগবানের প্রদত্ত শক্তি ব্যতিরেকে হইতে পারে?

গোস্বামিগণ জঙ্গলময় বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সুযশঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইল। কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে চলিলেন, অমনি গোস্বামিগণের আশ্রমে রহিয়া গেলেন। চারিদিক হইতে সাধু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ গোস্বামিগণকে দর্শন কি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে গমন করিলেন। ধনি লোক, মহাজন ও রাজগণ এইরূপে গোস্বামিগণের নিকটে যাইয়া আপনাদের দেহ স্বজন-সম্পদের সহিত অর্পণ করিলেন। এমন কি, দিল্লীর বাদসাহ পর্য্যন্ত, যদিও মুসলমান, এইরূপে গোস্বামিগণকে দর্শন করিতে গমন করিতেন।

এইরূপে আকবর কুতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত রূপ সনাতনকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। যখন সনাতনের সম্মুখে আকবর জোড়করে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন গোস্বামীর বড় বিপদ হইল। বাদসাহকে নিবারণ করেন এমন সাধ্য নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছেন, বাদসাহ আসিলে মস্তক নত করিলেন, যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিষেধ। কিন্তু আকবর বিনয় করিতে লাগিলেন। আকবর মহাশয় লোক, তাঁহার সম্বন্ধে "রাজদর্শন যে নিষেধ" এ কেবল শাসন-বাক্য বই নয় ইহা বুঝিয়া, সনাতন অগত্যা কথা কহিলেন। যাত্রাকালীন আকবর বলিলেন, "গোসাঞি, আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করিতে চাই।" সনাতন কাতর হইয়া বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তাঁহার লইবার কিছুই নাই। কিন্তু আকবর ছাড়েন না। তখন;—

একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃ পুনঃ কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
"ওই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থল হয়॥

"এই স্থান টুকু মোরে বান্ধাইয়া দেহ।
তব স্থলে মুঞি আর কিছু নাহি চাহ॥"

(ভক্তমাল)

আকবর তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি আপনার ভৃত্যগণকে কি কি করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করিতেছেন, এমন সময় বাদসাহের বাহুদৃষ্টি গেল, এবং নয়নে আধ্যাত্মিক জগতের উদয় হইল। তখন—

দেখে নানা মণি মুক্তা পরম রতন।
মনোহর অলৌকিক পরম মোহন॥
শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।

(ভক্তমাল)

আকবর দেখিলেন যে, যমুনাকূল অমূল্য রত্নে খচিত। তখন চেতন পাইয়া জোড়হাতে সনাতনকে বলিতেছেন :—

"এবে বুঝিলাম তুমি এই ত্রিজগতে।
মহা আঢ্য ধনিগণ নাই তোমা হইতে॥"

(ভক্তমাল)

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া এক খানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, সুতরাং উহা প্রামাণিক। ঐ গ্রন্থে তিনি আপনার জীবন কাহিনী লিখেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, জাহাঙ্গীর একজন হিন্দু-বিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন।

তিনি শ্রবণ করিলেন যে, বৃন্দাবনে একজন গোস্বামী আছেন, তিনি যখন পূজা করেন তখন মোহর-বৃষ্টি হয়। অবশ্য ঐ কাহিনী শুনিয়া সম্রাট হাস্য করিলেন। কিন্তু পরে এই কথা বহুজনের মুখে শুনিলেন, শেষে কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন। মোহর-বৃষ্টি হয় আরতির সময়। সেই সময় পাতসাহ মন্দিরের বাহিরে নিজজন লইয়া দাঁড়াইলেন। দেখেন, গোসাঞী তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া আরতি করিতেছেন, আর শত শত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন। আরতি অন্তে প্রকৃতই মোহর-বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন গোঁসাঞী উহা ভক্তদের নিকট বিতরণ করিতে দিলেন, আর উহার কতক পাতসাহকে দিতে ইঙ্গিত করিলেন। পাতসাহ ইহা স্বচক্ষে দর্শন

করিয়া, একেবারে অবাক্ হইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে উদয় হইল যে, তিনি প্রণাম না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করায় ভাল করেন নাই। ইহাতে ভীত হইয়া যেমন প্রত্যাগমন করিবেন অমনি গোসাঞীর লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, "তিনি যে প্রণাম না করিয়া যাইতেছিলেন, আর তাহাতে তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহা গোস্বামি-ঠাকুরের গোচর হইয়াছে। গোস্বামী বলিয়াছেন যে, আর তাঁহার আসিতে হইবে না; তিনি যে মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছেন ইহাতেই সে অপরাধ ক্ষালন হইয়াছে।"

পাতসাহ তখন বলিতেছেন যে, "গোসাঞীকে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম তিনি ভগবানের ভক্ত, সেই নিমিত্ত তাঁহার ধনের অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্যামী।" তখন পাতসাহ বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান কেবল তাঁহাদের নন, তিনি তাঁহারি যিনি তাঁহার ভক্ত।

অতএব গোস্বামীদের পরিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী মুসলমান সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাদের চরণে শরণ লইয়া ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দু একটি করিয়া ভক্ত ও সাধু, কেহ কেহ বা বহু চেলা কি বহুজন সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। এই সকল লোকের থাকিবার নিমিত্ত কুটীরের প্রয়োজন, কাজেই সেই সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছিল। তাহার পর দুই একটি করিয়া মন্দির হইতে লাগিল। ক্রমে ধনী লোকে বড় বড় মন্দির স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বৃন্দাবন একটি প্রকাণ্ড সহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, দুই চারিটি কন্থা-করঙ্কধারী গৌরাঙ্গ-ভক্ত! তাঁহারা কি জঙ্গল কাটিতেন? না। তাঁহারা কি নিজ হস্তে কোন কার্য্য করিতেন? না। তাঁহারা কি ধন দ্বারা মনুষ্য বশ করিতেন? না। তাঁহাদের কপর্দ্দকও ছিল না। তাঁহাদের কি নিজজন কেহ ছিল? না। তাঁহারা উদাসীন। তবে কোন্ শক্তিতে তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া প্রকাণ্ড নগর করিলেন, আর সে স্থান সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্টালিকা দ্বারা শোভিত করিলেন? তাঁহাদের শক্তি কেবল প্রভুর কৃপা। সেই প্রভু কোথা? তিনি তিন মাসের পথ দূরে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন!

রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে কিছু আরাম লইয়া গেলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ,

ভাবুক, প্রেমে পাগল, সুকণ্ঠ। যিনি তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেন, তিনিই আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। অনেক লোকে তাঁহার চরণাশ্রয় করিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রঘুনাথ ভট্টের দুইটি প্রধান কীর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে একটী কৃষ্ণদাস কবিরাজ।* অনেকের মনে বিশ্বাস, আমাদেরও ছিল যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরু রঘুনাথ দাস; কিন্তু একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভু হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস, ও কৃষ্ণদাস হইতে মুকুন্দদাস।

আর একটী কীর্ত্তি গোবিন্দ দেবের মন্দির। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সে অমূল্য ধন। গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন ঃ—

"রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে এলায় তার মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় কিছু নাহি জানে॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যার প্রাণধন॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহে না শুনে সেই রায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥"

---

* কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের ভণিতায় লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

রঘুনাথের এ শিষ্যটী কে? ইনি রাজা মানসিংহ, যে মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করেন, যিনি আকবরের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় পদস্থ কি হিন্দু কি মুসলমান আর কেহ ছিলেন না।

গোস্বামিগণের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব। যাঁহারা চক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের জীবন বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারাই করুন। নিম্ন লিখিত এই কয়েকটী প্রাচীন পদ পাঠ করিলে পাঠক মহাশয় কতক বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কি প্রকাণ্ড বস্তু ছিলেন। এ সমুদায় পদকর্ত্তা গোস্বামিগণ সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

রূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো অধমে না কৈল মরণে॥
মোর কর্ম্ম-দোষ ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপনে করুণা পাশে, দৃঢ় করি ধরি কেশে,
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে সাঁধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামীলে,
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুঃখ সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনে নাহি হেন আর॥
হেন কালে এক জনে, অলখিতে সনাতনে,
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
পত্রী পড়ি করিলা গোপন॥

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞি,
পাতশার উজীর হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥
ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥
দরবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞি বলে,
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥
অস্পর্শ্য পামর দীন, দুরাচার মন্দ হীন,
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার॥
ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুন পুন চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভু স্থানে পুন আগমন॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে॥
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ গাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস॥
গিয়া গোসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।

ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে,
কহে রূপ গদ্ গদ্ বচন॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে কত দিন থাকে॥
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে,
এইরূপে থাকে কত দিন॥
কতদিন অন্তর্ম্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে॥
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক,
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরু তলে কৈলা বাস,
এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় লোটায় কায়,
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ,
কবে হব তাঁর দাসের দাস॥

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ।
যো দুঁহু প্রেম-ভকতি রসকূপ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজনকে লাগি।
শ্রীবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী॥
শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথ।
মীলল সকল ভকতগণ সাথ॥

সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি।
যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি॥
অনুখন গৌরচন্দ্রগুণ গান।
ভরল প্রেমে ওর নাহি পান॥
কতিহুঁ না হেরি ঐছে উদাস।
মনোহর সদত চরণে করু আশ॥

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞি।
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবারে নাহি ঠাঞি॥ ধ্রু॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,
বারাণসী ছিল যার বাস।
নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিলা দুই মাস॥
শ্রীচৈতন্য নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে॥
মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি,
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি, আসি বৃন্দাবন ভূমি,
মিলিলেন রূপ সনাতন॥
দুই গোসাঞি তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
রাধাকৃষ্ণ প্রেম-রসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশ অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণ-কথার উল্লাসে॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনা পুলিনে রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেম-সুখে।
শ্রীভাগবত কথা, অমৃত সমান গাথা,
নিরবধি শুনে যার মুখে॥

পরম বৈরাগ্য সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু পক্ষী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষাণ হয় পানী॥
শ্রীরূপ সনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বোলে, পড়িলুঁ বিষম ভোলে,
কৃপা করি কর আত্মসাথ॥

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিত্তে,
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মল প্রায় সকল ত্যজিলা॥
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়ানগোচর কবে হবে॥

গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাঁহারে॥
চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিড়ি করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহ ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
দুই গোসাঞি তাঁহারে দেখিলা॥
ধরি রূপ সনাতন, রাখিল তাঁর জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পায়া, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া,
বাস করি নিয়ম করিলা॥

ছেঁড়া কম্বল পরিধান, ব্রজফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধা-পদ ভজন যাহার॥
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণ-গানে,
স্মরণেত সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গ রাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়।
শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদ আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে॥
হে রাধার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা বান্ধব,
রাধিকা-রমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হাহা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
শ্রীরূপ সনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহে রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তার গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব,
সভারে করয়ে পরণাম॥
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুখ রুখ অন্ন মাত্র সার।

গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
কৃষ্ণ-কথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
হাহা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা,
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হাহা প্রভু রূপ সনাতন॥
কান্দে গোসাই রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় তনু মনে,
ক্ষেণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার,
বিরহে হইল জর জর॥
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ॥

অষ্টম অধ্যায়।

পাণিহাটী গ্রামে রাঘবের বাস। রাঘব একজন ধনবান্ লোক, প্রভুর একান্ত ভক্ত। শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথমে তাঁহার বাটীতেই আড্ডা করেন। যখন নিত্যানন্দ সে স্থান মাতাইয়া তুলিলেন, তখন রঘুনাথ দাস বাটীতে আছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দেন না, কিন্তু তিনি অনেক মিনতি করিয়া পিতার নিকট বিদায় লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ দর্শন মানসে পাণিহাটী আসিলেন। নিতাই তাঁহাকে বড় আদর করিলেন, পরে বলিলেন—"রঘুনাথ তুমি ধনী, আমাকে ও আমার ক্ষুধিত ভক্তগণকে একবার উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজন দাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আহ্লাদে পুলকিত হইলেন, ও তাহার মহা উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন দেশময় এ কথা প্রচার হইল ও পাণিহাটীতে যেন কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সবারই নিমন্ত্রণ, যিনি আসিবেন, তিনিই প্রসাদ পাইবেন। যিনি যাহা আনিবেন, তাহাই ক্রয় করা হইবে। এই কথা প্রচার হওয়ায় চিপিটক, দধি, খই, মিষ্টান্ন, আম্র, কাঁটাল, চাঁপাকলা প্রভৃতি সামগ্রী ভারে ভারে আসিতে লাগিল। আষাঢ় মাস আরম্ভ, সুতরাং ফলের কোন অভাব নাই। যে স্থানে মহোৎসব হইবে, সে স্থানটী অতি মনোহর। বটবৃক্ষচ্ছায়ায় গঙ্গার ধারে ভক্তগণ বসিলেন। যিনি যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে আনিতেছেন, তাহা ক্রয় করিয়া আবার সেই দ্রব্য দ্বারায় তাঁহাকে ভুঞ্জান হইতেছে।

মধ্যস্থলে দুই পাতা পড়িল, এক পাতা স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্য, আর এক খানা নিতাইয়ের নিমিত্ত। মহাপ্রভু যদিও তখন নীলাচলে, কিন্তু নিতাইয়ের আকর্ষণে তিনি আসিলেন। তখন সহস্র সহস্র লোকের সাক্ষাতে নিতাই মহাপ্রভুকে অতি আদরের সহিত ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। লোকে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। রঘুনাথ কৃতকৃতার্থ হইলেন। অদ্যাপি সেই স্থানে প্রতি বৎসর চিড়া মহোৎসব হইয়া থাকে।

রাঘবের বিধবা ভগ্নী দময়ন্তী, অতি শুদ্ধা পবিত্রা মহাপ্রভুর ভক্ত।

তাঁহার এক অধিকার ছিল, তিনি "রাঘবের ঝালি" প্রস্তুত করিতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে প্রকট, সুতরাং হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা করিয়া ভক্তগণের তৃপ্তি হইত না। তাই নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, আর দূরের ভক্তগণ ভোগের দ্রব্য সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যান। কেবল শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া যে এইরূপ ভোগ পাঠান তাহা নয়, ভক্তমাত্রেই। কিন্তু দময়ন্তীর সেবা আর এক প্রকার। প্রভু সারা বৎসর ভোগ করিবেন, তিনি এইরূপ আহারীয় প্রস্তুত করেন! ইহা করিতে বিস্তর কারিগরির প্রয়োজন। যেহেতু আহারীয় বস্তু মাত্রেই অতি সত্বর পচিয়া যায়। তাই তিনি এইরূপ সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত করেন, যাহা সত্বর নষ্ট না হয়, কি পাকের গুণে এক বৎসর উত্তম অবস্থায় থাকে। এই সমুদায় স্থায়ী স্বাদু দ্রব্য দিয়া ঝালি সাজান হয়। তাহার পরে তাহাতে মোহর মারা হয়, এবং উহা মকরধ্বজ করের হস্তে ন্যস্ত হয়। যখন ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন, সেই সঙ্গে তিনিও গমন করেন। ঝালী মুটিয়াগণের মাথায় থাকে, আর মকরধ্বজ আপনার প্রাণ দিয়া উহা রক্ষা করেন। ইহাকে বলে "রাঘবের ঝালী।"

শ্রীচরিতামৃতে ঝালীর দ্রব্য এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

আম্র কাসন্দি আদা ঝাল কাসন্দি নাম।
নেম্বু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান॥
আমসী আম্রখণ্ড তৈল আম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ শুকুতা॥
শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
শুক্তায় যে সুখ তাহা নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসন্দিতে মহাসুখ হয়॥
ধরিয়া নোরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥
শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্ত হর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রে কুথলী ভিতর॥
কলিশুণ্ঠি কলিচূর্ণ কলিখণ্ড আর।
কত নাম লব যত প্রকার আছে তার॥

নারিকেল খণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃতকর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের পর কুথলী সব ভরি॥
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে লাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈলা পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাক উখ্ড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতেতে ভাজাইল।
চিনি কর্পূর দিয়া তায় লাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানিলাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া।
পাঁচকুড়ি করিয়া দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃতপাত্রে সোন্দালি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলি॥

জীবের বড় সাধ শ্রীভগবানকে সেবা করেন, আর তাঁহাদের সেই সাধ মিটাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের মায়া অবলম্বন করিতে হয়। যদি শ্রীভগবান পূর্ণ হইয়া বসিয়া থাকেন, তবে আর জীব তাঁহাকে সেবা করিতে পারে না। তাই সকলের ইচ্ছা প্রভুকে খাওয়াইবেন। রাঘব যে ঝালী" সাজাইয়া পাঠাইতেন তাহা সারা বৎসরের নিমিত্ত রাখা হইত। কিন্তু অন্যান্য ভক্তগণও ঐরূপ প্রভুকে উপহার দিতেন। শচী-বিষ্ণু-

প্রিয়া, মালিনী এবং বহুতর ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত উপহার লইয়া গোবিন্দের হাতে দিতেন। "গোবিন্দ, প্রভুকে দিও," সকলেরই এই কথা। গোবিন্দ বলেন "আচ্ছা"। কিন্তু প্রভুকে ঐ সমুদায় ভুঞ্জান অতি কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ ঐ যে সাত শত ভক্ত প্রদত্ত উপহার, ইহা একত্র করিলে প্রকাণ্ড একটি যজ্ঞ হয়। তার পরে ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে প্রত্যহ মহোৎসব হয়। প্রভুর কোন কোন দিন বহু বার নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। সুতরাং তাঁহার ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য আস্বাদনের সময় থাকে না। সকল ভক্তই জিজ্ঞাসা করেন, "গোবিন্দ, প্রভুকে দিয়াছিলে?" গোবিন্দ উত্তরে বলেন, "না, পারি নাই, অপেক্ষা কর।" এইরূপ প্রত্যহ শত শত ভক্ত আসিতেছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গোবিন্দ, আমার দ্রব্য দিয়াছিলে?" গোবিন্দ বলিতেছেন, "না, সুবিধা পাই নাই।" ভক্ত মাত্রেই গোবিন্দকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, অবশ্য অবশ্য আমার দ্রব্য অগ্রে দিও।" গোবিন্দ করেন কি, বলেন "আচ্ছা"।

এইরূপে প্রত্যহ প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিন্দের নিকট আগমন করেন। ভক্ত আসিতেছেন দেখিলে গোবিন্দের মুখ শুখাইয়া যায়। পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্তু তাহার সুবিধা নাই। প্রভুর নিকট সর্ব্বদা থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্দ প্রভুর শরণ লইলেন; বলিলেন, "প্রভো! দাসকে রক্ষা কর।" প্রভু বলিলেন, "কি? তোমার দুঃখ কি?" গোবিন্দ বলিলেন, "সকলে উপহার দিয়াছেন, সকলের ইচ্ছা তুমি আস্বাদ কর। আমি তোমাকে ভুঞ্জাইতে পারি না। সকলে প্রত্যহ আইসেন, আসিয়া আমাকে মিনতি করেন। যখন শুনেন যে আমাদ্বারা তাঁহাদের কার্য্য হয় নাই, তখন আমার মাথা খায়েন।"

প্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই কথা? লইয়া আইস কে কি উপহার আনিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিধারণ করিয়া জলযোগে বসিলেন। গোবিন্দ আনিতেছেন, বলিতেছেন "ইহা মা জননীর"। প্রভু হাত পাতিয়া বলিলেন, "দাও"। ভোজন করিয়া প্রভু আবার হাত পাতিতেছেন। গোবিন্দ বলিতেছেন, "ইহা শ্রীবাসের।" এইরূপে ভক্তের দ্রব্য প্রভুর হাতে দিতেছেন, এবং কাহার দ্রব্য তাহা বলিতেছেন, আর প্রভু আহার করিতেছেন। এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যে সেই এক যজ্ঞের উপযুক্ত

প্রভু সমুদায় সামগ্রী আহার করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "আর আছে?" গোবিন্দ বলিলেন, "রাঘবের ঝালী ছাড়া আর নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহা অদ্য থাকুক।" পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবানের কাচ কাচা যায় না,—মনুষ্যে পারে না।

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাড়ায় বাড়ী, প্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত। যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করেন, তাঁহাদের পাথেয়াদি দিয়া সঙ্গে লইয়া যান, এমন কি কুক্কুর পর্য্যন্ত। একটী কুক্কুর এইরূপে যাত্রিগণের সঙ্গে চলিয়াছেন। কুক্কুর মহাশয় ভক্তসঙ্গে গমন করিতেছেন, কাজেই এই জন্মে কুক্কুর হইলেও তিনি ভক্তির পাত্র। শিবানন্দ প্রত্যহ সেই কুক্কুরকে ডাকিয়া আহার দেন। এক নাবিক কুক্কুরকে পার করিতে অস্বীকার করিল। শিবানন্দ অনুনয় বিনয় করিলেন, নাবিক শুনিল না, তখন দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরকে পার করিলেন। এক দিন প্রভাতে শিবানন্দ কুক্কুরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সেবকের মুখে শুনিলেন যে, সে গত রজনীতে তাহাকে আহার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শিবানন্দ দুঃখিত হইয়া কুক্কুর তল্লাস করিতে দশ জন লোক পাঠাইলেন। কুক্কুর পাওয়া গেল না। শিবানন্দ উহাতে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। এমন কি উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিলেন।

কথা এই, শিবানন্দ সেনের মনে বিশ্বাস এই আছে যে, এই কুক্কুর সামান্য বস্তু নহেন, কোন মহাজন হইবেন, নতুবা বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর নিকটে কেন যাইতেছেন? শিবানন্দ সেন শান্ত হইয়া স্নানাহার করিলেন, পরে ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে প্রভুর ওখানে গমন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে ভক্তগণ একদিন প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন সেই কুক্কুর প্রভুর অল্প দূরে বসিয়া আছেন, আর প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সে কিরূপে? না, প্রভু নিজ হস্তে তাঁহাকে নারিকেল-শস্যখণ্ড ফেলাইয়া দিতেছেন, আর কুক্কুর তাহা ভক্ষণ করিতেছেন। আবার প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বল", আর কুক্কুর প্রকৃতই "কৃষ্ণ" বলিতেছেন। শিবানন্দ সেন অমনি কুক্কুরকে প্রণাম করিয়া আপনার শত অপরাধ জানাইলেন। সেই কুক্কুর তাহার পরে অদর্শন হইলেন, সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগিনা। প্রভুর কৃপাতে তিনি বড় ভাগ্যবান। একবার তিনি প্রভুর নিকট একক গমন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দুই মাস নিকটে রাখিয়া ছিলেন। শিবানন্দ তাঁহার নিয়ম মত যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন। এবার তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য বৈষ্ণব গৃহিণীও আছেন। তাঁহার স্ত্রীকে কেন সঙ্গে লইলেন তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন প্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার এবার একটী পুত্র হইবে, পরমানন্দপুরী গোসাঞির নামে তাহার নাম রাখিবা। তাঁহার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন, শিবানন্দ সেন বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছে। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন।

শিবানন্দ সেনের মনের সাধ এই যে, পুত্রটীকে লইয়া তিনি প্রভুকে দেখাইবেন। কিন্তু শিবানন্দ সেনের এই শেষ পুত্র, তাহার গর্ভধারিণী পুত্রটিকে অত দূরদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। কাজেই শিবানন্দ তাঁহার ঘরণীকে সঙ্গে করিয়া আর শিশু পুত্রটীকে কোলে করিয়া, নীলাচলে প্রভুর দর্শন করিতে চলিলেন। পথে যাইতে স্থানে স্থানে ঘাটিতে দান দিতে হয়। এক ঘাটিতে কয়টী ভক্ত গণিয়া শিবানন্দ সেন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া ওপারে গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, আপনি ঘাটিতে দান বুঝিয়া দিতে জামিন স্বরূপ রহিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে সুতরাং ভক্তগণের বাসা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিবানন্দ সেনের তিনটী পুত্রকে শাপ দিতেছেন। বলিতেছেন, "যেমন শিবা আমাকে ক্ষুধায় ক্লেশ দিতেছে, তেমনি তাহার তিনটি ছেলে ম'রে যাউক।" কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, শিবার কোন অপরাধ নাই। অপরাধের মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে পুরী নগরীতে লইয়া যাইয়া থাকেন, ও যাইতেছেন। তাহার পরে ভক্তগণকে যে বাসা দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র দোষ নাই। ঘাটীরক্ষক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, তিনি সকলকে ছাড়াইয়া সেই ব্যক্তির যে দেয় তাহা দিবার নিমিত্ত আপনি সেখানে ছিলেন। অতএব শিবার কোন অপরাধ নাই। যত অপরাধ সমুদায় আমার ঠাকুর নিতাইয়ের। তাহার পরে শুনুন। নিতাই শিবানন্দের ঘরণীকে শুনাইয়া তাঁহাদের পুত্রকে

শাপিয়াছেন। ঘরণী ইহাতে ভয়ে ও দুঃখে অতি কাতর হইয়াছেন। শিবানন্দ যাত্রিগণ মধ্যে আগমন করিলে তাহার পত্নী ভয় পাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন যে, গোসাঞি তিন পুত্র মরুক বলিয়া শাপ দিয়াছেন। শিবানন্দ হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? আমার তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোসাঞির বালাই লইয়া মরিয়া যাউক।" ইহাই বলিয়া নিতাইয়ের নিকট আসিলেন। নিতাই শিবানন্দকে পাইয়া অমনি উঠিয়া এক লাথি মারিলেন! শিবানন্দ লাথি খাইয়া আর কিছু না বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র বাসা করিয়া ঠাকুরকে সেখানে লইয়া গেলেন। সেখানে স্নানাহার করিয়া সকলে শান্ত হইলেন।

তখন শিবানন্দ সেন গদগদ হইয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার দিন সুপ্রভাত। তোমার চরণরেণু ব্রহ্মার দুর্লভ ধন। আমি তাহা অনায়াসে পাইলাম। আজ আমার জন্ম সার্থক, এ দেহ পবিত্র হইল।" নিত্যানন্দ অগ্রে চঞ্চলতা করিয়াছেন, বাসা পাইয়াই একটু অনুতাপের উদয় হইয়াছে। তাহার পরে শিবানন্দ যখন আবার স্তব আরম্ভ করিলেন, তখন "অভিমান শূন্য, অক্রোধ, পরমানন্দ" নিতাই নিজে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অবশ্য ঠাকুরের অন্যায়, কিন্তু অদ্বৈতের ক্রোধ, কি নিতাইয়ের ক্রোধ কেবল "হাস্যময়" বই নয়! জগতে জানে "নিতাই মারি খাইয়া দয়া করেন।" যে ঠাকুর মারি খাইয়া দয়া করেন, তিনি অবশ্য মারিয়াও দয়া করেন। শিবানন্দ তাহা জানিতেন, আর জানিয়াই লাথি খাইয়া নিত্যানন্দের পায়ে ধরেন। কিন্তু শ্রীকান্ত অল্প বয়স্ক। তাহার মাতুল পিতৃ সম্পর্কীয়, মাতুল দেশ মধ্যে গণ্যমান্য! তিনি শত শত ভক্তের সম্মুখে লাথি খাইলেন, ইহাতে তাহার ক্রোধ হইল। তাই বলিলেন, "গোসাঞি যাঁহাকে লাথি মারিলেন, তিনি সামান্য লোক নহেন, তিনিও মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ। ঠাকুরালী করিবার বুঝি আর স্থান পাইলেন না? আমি যাই, প্রভুর নিকট এ সমুদায় কথা নিবেদন করিব।" এই ভয় দেখাইয়া শ্রীকান্ত সমস্ত সঙ্গী ছাড়িয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

শ্রীকান্ত যাইয়া একবারে প্রভুর নিকট উপস্থিত ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি? গায়ের পেটাঙ্গি না খুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছ?"

কথা এই, অতি বড় গুরুজনকে প্রণাম করিবার আগে যেমন জুতা খুলিতে হয়, তেমনি অঙ্গরক্ষকও খুলিতে হয়। পেটাঙ্গি মানে অঙ্গরক্ষক (আঙ্গরাখা)। যেমন পিরাণ কি মেরজাই। এখন যেমন ভদ্রলোকে পিরাণ গায়ে দেন, তখন পেটাঙ্গি গায়ে দিতেন।

প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ! শ্রীকান্তকে কিছু বলিও না। মনে বড় দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে। উহার যাহাতে সুখ হয় তাঁহাই কর।" এই কথা শুনিয়া শ্রীকান্ত বুঝিলেন যে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহার মনের কি দুঃখ তাহা বলিবার অগ্রে আপনি অবগত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছেন তাহা আর বলিলেন না। বিশেষতঃ অন্তরে যে একটু মলিনতা হইয়াছিল, প্রভুর দর্শনে তাহা তখন অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীকান্ত, কে কে আসিতেছেন?" শ্রীকান্ত নাম বলিতেছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নাম শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "আচার্য্য এখানে কি তামাসা দেখিতে আসিতেছেন?" এ কথা শুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। প্রভুর মুখে কর্কশ বাক্য কেহ কখন শুনিতে পান না। তাহার পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে প্রভু যত ভক্তি করেন এমন আর কাহাকেও নহে, এমন কি পুরী ভারতীকেও নহে। সরূপ প্রভৃতি যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধে ঐরূপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন। কিন্তু প্রভু আপনিই তাঁহাদের মনের তর্কের মীমাংসা করিলেন। কারণ উপরের কর্কশ বাক্য বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "শ্রীকান্ত বলিতে পার, আচার্য্যের এবার রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে?" শ্রীকান্ত এ কথার কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। "রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে" প্রভুর এ কথার তাৎপর্য্য ক্রমে বলিব।

শিবানন্দ সেন ইহার পরে পুত্রকে কোলে করিয়া শত শত ভক্তের সহিত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুও তাঁহার শত শত ভক্তগণ সহ তাঁহাদিগকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লইতে আসিলেন। যখন দুইদলে দেখাদেখি হইল, তখন মহাকলরব উঠিল। পরমানন্দের বয়স তখন সাত বৎসর। তিনি শুনিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। আবার পিতার কোলে থাকিয়া শুনিলেন যে, অগ্রে যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রভু আছেন।

তখন তিনি ব্যগ্র হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ কে, আমাকে দেখাইয়া দাও।" তাহাতে শিবানন্দ সেন কি উত্তর দিলেন, তাহা তিনি (পরমানন্দ দাস) পরে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক নামক যে গ্রন্থ লিখেন তাহার একটী শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

বিদ্যুদ্দাম দ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র,
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ,
শ্রীগৌরাঙ্গস্ফুরতিপুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥

যখন পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ কই?" তখন শিবানন্দ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া ক্রোড়স্থিত পুত্রকে বলিতেছেন, "হে বালক, আমাদের প্রভু কে, তাহা কি দেখাইয়া দিতে হয়? ঐ যে সোণার বরণ, দীর্ঘ তেজোময় বস্তুটী, যাঁহার কমলনয়ন দিয়া অবিরত প্রেমধারা পড়িতেছে, উনিই শ্রীগৌরাঙ্গ। হে পুত্র, উহাঁকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, ও পিতা পুত্রে দূর হইতে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন।

পুত্রটীকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে কিরূপে উপস্থিত করিবেন, শিবানন্দ ইহাই ভাবিতেছেন। যেহেতু প্রভুর বাসায় সর্ব্বদা লোকে পূর্ণ। কয়েক দিন পরে একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাসা করিয়াছিলেন, এক দিবস প্রভু তিনটী ভক্ত সমভিব্যাহারে তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শিবানন্দ সেন ও তাঁহার ঘরণী ইহা দেখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া শিবানন্দ করজোড়ে বলিলেন, "ভগবন্! একবার দাসানুদাসের বাটীতে পদধুলি দিয়া যাইতে আজ্ঞা হয়।"

প্রভুকে শিবানন্দ সেন এরূপ নিবেদন করিলে, প্রভু, "তোমার যাহা অভিরুচি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। এখানে আর একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। প্রভু কখনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেন না। কিন্তু যাঁহাদের উপর বাৎসল্যভাব, কি যাঁহারা গুরুজন, এরূপ স্ত্রীলোকের সহিত তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিবানন্দের পত্নীকে তিনি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং শিবানন্দ সেনের বাড়ীতেও পূর্ব্বে গিয়াছেন।

প্রভুকে বাসায় আনিয়া সেন মহাশয় সেই সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে তাঁহার সমীপে

উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! এই তোমার সেই বরপুত্র, ইহার নাম আপনার আজ্ঞাক্রমে পরমানন্দ দাস রাখিয়াছি, আর আপনি ইহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া এত দূরে শ্রীচরণে আনিয়াছি।" ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম কর।" বালক পরমানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন, প্রভু বলিলেন, "তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্নেহার্ত্ত হইয়া তাহার মস্তকে চরণ দিতে গেলেন। শিশু পরমানন্দ ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মস্তক নত করিলেন না, বরং মুখব্যাদন করিলেন। বাল্য স্বভাববশতঃই হউক, বা প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই হউক, এইরূপে মুখব্যাদন করিলে, প্রভু তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বালক ইহাতে বিরক্ত না হইয়া, কি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, যেমন শিশুসন্তানে স্তনপান করে সেইরূপে দুই হস্তে সেই শ্রীপদ ধরিয়া, অতি সতৃষ্ণ মনে সেই অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিলেন!

প্রভু যখন এই চরণাঙ্গুষ্ঠ মুখের মধ্যে দিলেন, তখন কি বলিলেন তাহা পরমানন্দ দাসের "বৃন্দাবনচম্পূতে" লিখিত আছেঃ-(স্মরণ থাকে, এই পরমানন্দ প্রভুর বরে দৈববিদ্যা পাইয়া কবিরূপে জগতে বিদিত হইলেন। তিনি চৈতন্যচরিত, বৃন্দাবনচম্পূ ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ লিখেন; অতএব এই যে কাহিনী বলিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।)

বৎসাস্বাদ্য মুহুঃস্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাং
দেয়ং ভক্ত জনেষু ভাবিষু সুরৈদু্‌র্প্রাপ্যমেতত্ত্বয়া।

"হে বৎস্য, দেব দুর্লভ বস্তু স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে প্রকাশ করিবে," ইহা বলিয়া পরমানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ আমার মুখে দিয়াছিলেন।"

পরমান্দ পদাঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছেন, প্রভু উহা বালকের মুখ হইতে আনিয়া বলিলেন, "বৎস্য, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" পরমানন্দ কিছু বলিলেন না। তখন আবার বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল"। তবু পরমানন্দ দাস কিছু বলিলেন না। তখন বালকের পিতামাতা ব্যগ্র হইয়া, পুত্রকে কৃষ্ণ বলাইবার নিমিত্ত অনুনয়, তাড়না, ভয় প্রদর্শন, প্রভৃতি নানা মত উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না। ইহাতে বালকের পিতামাতা মর্ম্মাহত ও যেন প্রভু পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তখন প্রভু যেন বিস্ময় ভাব দেখাইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি বিশ্ব-সংসারকে কৃষ্ণ-নাম বলাইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না?" প্রভুর সঙ্গে সরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রভু, আপনি কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্র এই বালককে দিলেন, বালক মনে ভাবিতেছে, যে, সে উহা কিরূপে প্রকাশ করিয়া উচ্চারণ করিবে। এই বালক যে নীরব হইয়াছে সে সেই নিমিত্ত, আমার ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়।"

তখন প্রভু বলিলেন, "তাই কি হবে? ভাল তাই যদি হয়। হে বৎস! যাহা কিছু হয় তাহা বল।"

ইহাতে বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে একটী শ্লোক প্রস্তুত করিয়া বলিল। (মনে থাকে তাহার তখন ক খ পাঠ হইয়াছে কি না তাহা সন্দেহ।) পরমানন্দের শ্লোক যথাঃ—

শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণি দাম।
বৃন্দাবনতরুণীনামমণ্ডনমখিলং হরির্জয়তীতি॥

অর্থাৎ "যিনি ব্রজ যুবতীগণের কর্ণে কর্ণোৎপল, নয়নে সুরস অঞ্জন, বক্ষঃস্থলে নীলকান্তমণিময় হারের স্বরূপ ও তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গের অথবা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভুষণ, সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।"

ইহাতে শিবানন্দ, তাঁহার পত্নী ও প্রভুর সঙ্গী যে দুইজন ভক্ত ছিলেন, সকলে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

তখন প্রভু বলিলেন, "বৎস! তুমি উত্তম কবি হইবে। তুমি এই শ্লোকের প্রথমে ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণভুষণের বর্ণন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম অদ্যাবধি কবি কর্ণপূর হইল।" পূর্ব্বে বলিয়াছি এই কবিকর্ণপূর কৃত পুস্তক এখন বৈষ্ণবজগতে অনন্ত আনন্দ দিতেছে। তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা করিয়া পরে তিনি বলিতেছেন,

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথা বর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাংতৎ প্রিয় মণ্ডলে শিবশিব স্মৃত্যেকশেষং গতে,
কো জানাত শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রায়তাং॥

ইহার ভাবার্থ এই, "আমি অজ্ঞান বালক শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা (অর্থাৎ পদাঙ্গুষ্ঠের রজ) পাইয়া যাহা লিখিলাম ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তাঁহার ভক্তগণ বলিতে পারেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অন্তর্ধান হইলেন।

সুতরাং আমি সত্য লিখিলাম কি মিথ্যা লিখিলাম তাঁহারা ব্যতীত আর কে বলিবে? তবে, হে কৃষ্ণ, তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে আমি সাক্ষী মানিলাম। আমি যদি সত্য লিখিয়া থাকি, তবে তুমি অবশ্য আমার প্রতি তুষ্ট হইবে, (এবং যদি, মিথ্যা লিখিয়া থাকি তবে দণ্ড করিবে)। *

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে মহাপ্রভু যে কর্কশ বাক্য বলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত যখন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন তখন প্রভু তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। তিনি যে কোন কারণে শ্রীঅদ্বৈতের উপরে বিরক্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানিতে দিলেন না। একদিন বাউল বিশ্বাস প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি উঠিয়া গেলে প্রভু গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন যে, "বাউল বিশ্বাসকে আমার এখানে আর আসিতে দিও না।" এই বাউল বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য ও তাঁহার বাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী। অদ্বৈত প্রভুর বৃহৎ পরিবার, ছয় পুত্র, দুই স্ত্রী। শ্রীঅদ্বৈতের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়, তিনি এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করেন। সংসারে সেই নিমিত্ত চিরদিন অনাটন। বিশ্বাস মহাশয় দেখিলেন যে, উড়িষ্যার রাজা গৌড়ীয়গণের নিতান্ত ভক্ত হইয়াছেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অচল সংসার কুলাইবার নিমিত্ত এক উপায় সৃজন করিলেন। তিনি রাজার নিকট এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে, শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং ঈশ্বর, তবে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে, মহারাজের নিকট প্রার্থনা সেই ঋণ শোধের নিমিত্ত সাহায্য। এই পত্র কেমন করিয়া ঘুরিয়া মহাপ্রভুর হাতে পড়িল। তাহাতে প্রভু ক্ষুব্ধ হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে প্রত্যক্ষে কিছুই বলিলেন না, তবে "বাউল বিশ্বাস" মহাশয়কে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। যখন বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ঐ দণ্ড হয়, তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "রাজার নিকট বিশ্বাস যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে ঈশ্বর সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ ঠিক, যেহেতু তিনি প্রকৃতই ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের ঋণ হইয়াছে, এ কথা বলা বড় অপরাধের কথা; এই জন্যই তিনি দণ্ডার্হ, অতএব তিনি যেন আমার এখানে আর না আইসেন।"

---

* এই কবিকর্ণপূর বংশীয় একজন ভক্তকে আমরা দর্শন করিয়াছি। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কন করিতে পারিতেছেন না।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ইহার কিছুই জানেন না। এই যে রাজার নিকট পত্র লেখা হইয়াছে, ইহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অজ্ঞাতসারে। তিনি যখন বিশ্বাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা শুনিলেন, তখন নিতান্ত লজ্জা পাইয়া প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি বিশ্বাসকে দণ্ড করিয়াছ, কিন্তু তাহার অপরাধ কি? আমাকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে, সে আমারই জন্য।" প্রভু তখনি হাসিয়া বিশ্বাসকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কার্য্য ভাল কর নাই। ঐরূপ কার্য্য আর করিও না।" প্রকৃত কথা, যদি প্রভু-পার্ষদগণ রাজার দ্বারস্থ হয়েন, তবে প্রভুর ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনাদর হয়।

শিবানন্দ সেন শুনিলেন যে, অম্বিকা কালনার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে মহাপ্রভুর প্রকাশ হইয়াছেন। প্রভুর লীলালেখকগণ বলেন যে, প্রভু জীব নিস্তারের বহুবিধ উপায় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আচার্য্য সৃষ্টি, যেমন কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী। আপনি তিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন, প্রথমতঃ—সাক্ষাদ্দর্শন দিয়া। শ্রীক্ষেত্রে জগতের লোক গমন করেন, করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ—"আবির্ভূত" হইয়া। যেমন শচীর বাড়ীতে জননীপ্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জন আহার। শচী অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর বলিতেছেন "আমার নিমাই বাড়ী নাই, আমি ইহা কাহাকে দিব?" ইহা বলিতে বলিতে বিহ্বল হইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আসিলেন। তখন বসিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। পরে চেতন পাইলেন, তখন ভাবিলেন "এই সমুদায় স্বপ্ন হইবে। কারণ নিমাই ত আমার এখানে নাই, নিমাই শ্রীক্ষেত্রে।" ইহাকে বলে "আবির্ভাব"। এইরূপ শচীর গৃহে সর্ব্বদা হইত।

আর এক উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন, সে "আবেশ"। প্রভু নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুলের বয়ঃক্রম অল্প, বর্ণ গৌর, অঙ্গের শোভা চমৎকার। প্রভু সেই শরীরে প্রবেশ করাতেই, নবীন ব্রহ্মচারী গ্রহগ্রস্তপ্রায় হইয়া নাচিতে কাঁদিতে ও হাসিতে লাগিলেন। আর সকলকেই বলেন "কৃষ্ণ বল"। দেশে এ কথা প্রচার হইল, নকুলের দেহে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ হইয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া অবশ্য শিবানন্দ তথ্য কি জানিবার জন্য সেখানে চলিলেন। শিবানন্দ দেখেন অসংখ্য লোক জুটিয়াছে, ব্রহ্মচারীর দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। শিবানন্দ মনে মনে প্রভুকে

বলিতেছেন, "যদি সত্যই আমার প্রভু তুমি নকুলের দেহে প্রবেশ করিয়া থাক, তবে আমি যে আসিয়াছি, তাহা অবশ্য তুমি জান। তবে তুমি অবশ্য আমাকে ডাকিবা, ডাকিয়া আমার কি ইষ্টমন্ত্র তাহা বলিবা। প্রভু, তাহা হইলেই আমার মনের সন্দেহ যাইবে।"

শিবানন্দের মনে অবশ্যই গৌরব আছে যে, তিনি প্রভুর উপর দাবি রাখেন। অতএব, সত্য যদি প্রভু নকুলের এ দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে জানিবেন ও তাঁহার নিজের মনস্কাম সিদ্ধি করিবেন। শিবানন্দ লোক সংঘট্টের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রভুর নিকট মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুই চারি জন লোক দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া "শিবানন্দ সেন কে?" বলিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। "শিবানন্দ সেন কে? তাঁহাকে ঠাকুর ডাকিতেছেন।" একথা শুনিয়া শিবানন্দ দৌড়িয়া গিয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও? উত্তম। তোমার চারি অক্ষরের গৌরগোপাল মন্ত্র"।* এই আখ্যায়িকাটি শিবানন্দের পুত্র তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

এইরূপ নকুল ব্রহ্মচারী প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চরিতামৃত বলিতেছেন,—

"এই মত আবেশে তারিল ভুবন।
গৌড়ে দেহে আবেশের দিগদরশন॥"

অর্থাৎ গৌড়ে যেরূপ ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রভু ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন সেইরূপ তিনি সমস্ত দেশে করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নানাস্থানে নানাদেহে প্রবেশ করিয়া, জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত প্রভুর প্রকট কালেই কোটী কোটী ভক্ত তাঁহার পদাশ্রয় করেন। আর এই নিমিত্ত, যদিও তিনি পূর্ব্ববঙ্গ দেশে মোটে আট মাস ছিলেন, এবং সেও অধ্যাপক ভাবে, ভক্ত বা আচার্য্য ভাবে নয়, তবু সে দেশ ভক্তিতে প্লাবিত হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে আর এক ঘটনা বলিব। প্রভু পৌষ মাসে বঙ্গদেশে আসিবেন, এ কথা শিবানন্দ শ্রীকান্তের মুখে শুনিলেন। শুনিবা মাত্র শাকের ক্ষেত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে

* একবার একটী কথা উঠে যে "গৌর-নামের মন্ত্র নাই।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে শিবানন্দের মন্ত্র "গৌরগোপাল।"

চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু আসিলেন না। পৌষ মাসে সংক্রান্তির দিবস জগদানন্দ ও শিবানন্দ দুই জনে প্রভুকে অপেক্ষা করিয়া "ঐ এলো" ভাবে, কি "পড়ে পাতার উপরে পাত, ঐ এলো প্রাণ নাথ", ভাবে, কাটাইলেন। প্রভু আসিলেন না। তখন দুই জনে হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সেখানে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী আসিলেন। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল প্রদ্যুম্ন, প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ, যেহেতু ব্রহ্মচারী প্রহ্লাদের ঠাকুরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।

ঐ ব্রহ্মচারীর ভজন ছিল মানসিক। যোগশাস্ত্রের নামে অনেকে উন্মত্ত হয়েন, কিন্তু যেমন জ্ঞানযোগ, তেমনি ভক্তিযোগ বলিয়া আর একপ্রকার যোগ আছে। সে অতি মধুর সামগ্রী। জ্ঞানযোগের যেরূপ সমাধি আছে, ভক্তিযোগেরও সেইরূপ সমাধি আছে। যেমন প্রভু সন্ন্যাসের পরে চারি দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এই নৃসিংহ মনে মনে প্রভুর ভজনা করিতেন। প্রভু যেবার গৌড় হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন, সেবার প্রভুর ফিরিয়া আসিবার অগ্রেই এই ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন যে, প্রভুর এবার বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না, তিনি কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিয়া আসিবেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদ কিরূপে জানিলেন? নৃসিংহ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, প্রভু যেমন বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন, তিনি (নৃসিংহ) মনে মনে তাঁহার পথ যোজনা করিতেছিলেন। নৃসিংহ ভাবিলেন, পথ হাটিয়া প্রভুর দুঃখ হইবে, অতএব তাঁহাকে ভাল পথে লইয়া যাইবেন। তাই মনে মনে পথ করিতেছেন, সে পথে কঙ্কর ও ধুলা নাই, পথের দু'ধারে কুসুম বৃক্ষ, তাহার উপরে পক্ষিগণ গান গাইতেছে। কুসুমের শোভায় ও গন্ধে দিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পথ মনে মনে করিয়া প্রভুকে মনে মনে সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। প্রভুর অগ্রে মনে মনে ফুল ছড়াইতেছেন, যে তাঁহার শ্রীপদে চলিতে ব্যথা না লাগে। প্রত্যহ প্রভুকে মনে মনে ভোগ দিতেছেন, দিবাভাগে একবার আর সন্ধ্যার পরে একবার, উত্তম কুটীরে শয়ন করাইতেছেন, ও পদ সেবা করিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে নৃসিংহ মনে মনে প্রভুকে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন, কিন্তু আর পারেন না, আর কোন ক্রমে মনে মনে পথ বান্ধিতে পারেন না। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভু

আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না।" এই নৃসিংহ শিবানন্দ ও জগদানন্দের দুঃখের কারণ শুনিয়া দম্ভ করিয়া বলিলেন, "এই কথা? আমি প্রভুকে আনিতেছি, আনিয়া তোমার এখানে তাঁহাকে ভুঞ্জাইব।" ইহা বলিয়া নৃসিংহ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিত্তকে সংযম করিয়া উহা বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক করিলেন। পরে চিত্তকে প্রভুর নিকটে লইয়া চলি-লেন। চিত্ত চলিলেন। চিত্ত কখন আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার যে কার্য্য তাহা ভুলিয়া অন্যদিকে যাইতেছেন, নৃসিংহ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া আবার ঠিক পথে আনিতেছেন। এইরূপ বহু কষ্টে চঞ্চল চিত্তকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। তখন প্রভুর চরণে পড়িলেন, অনুনয় বিনয় করি-লেন, করিয়া প্রভুকে সম্মত ও সঙ্গে করিয়া শিবানন্দ সেনের বাড়ী আনিতে লাগিলেন। আনিবার সময় আবার তাঁহার চিত্ত ঐরূপ চাঞ্চল্য করিতেছেন। কখন নিজ কার্য্য ভুলিয়া গিয়া প্রভুকে একেবারে হারাইতেছেন, আবার তল্লাস করিয়া ধরিতেছেন। কখন চিত্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এইরূপে প্রভুর নিকট যাইতে ও তাঁহাকে আনিতে তাঁহার চিত্তের, দুই দিন গেল। ইহাকে বলে ভক্তিযোগ। যাহা হউক তিন দিনের দিন নৃসিংহ প্রভুকে শিবানন্দের বাড়ী উত্তম রূপে ভুঞ্জাইলেন।

কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই, প্রভু যে আসিয়া সমুদায় আহার করিলেন, নৃসিংহের মুখের কথা ব্যতীত ইহায় আর কোন প্রমাণ রহিল না। প্রভু কিন্তু ইহার প্রমাণ পরে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস নীলাচলে, কথায় কথায় এই সমুদায় কথা অর্থাৎ যেরূপে নৃসিংহ তাঁহাকে লইয়া গিয়া-ছিলেন, বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন, সমুদায় দ্রব্যই অতি চমৎকার পাক হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া তখন শিবানন্দের বিশ্বাস হইল যে, প্রকৃতই প্রভু তাঁহার বাটী যাইয়া তাঁহার দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ইহাকে বলে "আবির্ভাব"। অর্থাৎ প্রভু উদয় হইয়াছেন, কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন, সকলে নহে, কেহ কেহ। এরূপ প্রভুর আবির্ভাব শচীর মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও পুত্র চলিয়াছেন, এবং অন্যান্য ভক্ত গৃহিণীও চলিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও তাঁহার ঘরণী চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিলে প্রভু সচেতন হয়েন, আর যত দিন তাঁহারা সেখানে বাস করেন ততদিন সেইরূপে

থাকেন; থাকিয়া তাঁহার প্রাচীন দেশীয় ও গ্রামস্থ সঙ্গিগণের সহিত আলাপনাদি করেন। পরমেশ্বর যাইয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। ইনি শুদ্ধ যে নবদ্বীপবাসী তাহা নহে, প্রভুর পাড়ায়, এমন কি তাঁহার বাড়ীর নিকট বাস করেন। কাজেই ছোট বেলা পরমেশ্বরের নন্দন মুকুন্দের সহিত প্রভু খেলা করিতেন। আর পরমেশ্বর প্রভুকে অনেক সন্দেশ খাওয়াইয়াছিলেন। এই পরমেশ্বর যখন আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "আমি পরমেশ্বর," তখন প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া তাহাকে সহাস্যে আদর করিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীমুখ দেখিতে আসিয়াছ, বেশ করিয়াছ।" তখন পরমেশ্বর আহ্লাদে আর থাকিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "আমিও আসিয়াছি, মুকুন্দের মাও আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু একটু সশঙ্ক হইলেন, ভাল মানুষ পরমেশ্বর হয় ত "মুকুন্দার মাকে" প্রভুর সম্মুখে আনিয়া ফেলিবে। কিন্তু পরমেশ্বর শুনিয়াছেন যে, প্রভুর নিকট "প্রকৃতির" যাইবার অধিকার নাই, তাই সস্ত্রীক না যাইয়া একক প্রভুর দর্শনে গিয়াছেন। যখন পরমেশ্বর ছোটবেলা প্রভুকে সন্দেশ খাইতে দিতেন, তখন আর জানিতেন না যে কিছু কাল পরে সেই সন্দেশপ্রিয়-বস্তুকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার তিন সপ্তাহের পথ হাটিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অনেক শিষ্য; যেখানে তাঁহার শিষ্য সেইখানেই প্রেম। কেবল সেই প্রেমে একজন বঞ্চিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রপুরী। ইনি যদিও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য,—যে মাধবেন্দ্রপুরী মেঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন, যে মাধবেন্দ্র "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্ধান করেন, যে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি,—তবু রামচন্দ্র চিন্ময় নিরাকার ব্রহ্ম উপাসক। তিনি সোঽহং অর্থাৎ সেই আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণ, কি কৃষ্ণপ্রেম এ সমুদায় তাঁহার নিকট আমোদের সামগ্রী। যখন মাধবেন্দ্র তাঁহার অপ্রকট কালে কৃষ্ণ পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ দিবার এমন সুবিধা পূর্ব্বে কখন পান নাই। মাধবেন্দ্রের তেজে ও ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, কাজেই বড় সুবিধা পাইয়া বলিতেছেন, "গুরো! তুমি

ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া রোদন করিতেছ? কাহার জন্য রোদন কর? তুমি যাহাকে কৃষ্ণ বল তুমিই সেই কৃষ্ণ না? তোমার কি বালকের মত বিচলিত হওয়া উচিত? রোদন না করিয়া সেই তোমার ব্রহ্মকে ধ্যান কর।" তখন মাধবেন্দ্র ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোর উপদেশের প্রয়োজন নাই। একে কৃষ্ণ পাইলাম না সেই জ্বালায় আমি জর্জ্জরিত, তাহার উপরে তুই আসিয়া আবার ক্রমে বাক্য যন্ত্রণা দিতে লাগিলি? তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! তোর ও-সমুদায় কর্কশ নাস্তিক-বাদ শুনিলে আমার পরকাল হইবে না।"

যদিও রামচন্দ্রপুরী তাঁহার গুরুর সহিত এই ব্যবহার করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরপুরী গুরুর অপ্রকট সময়ে তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত অতি যত্ন করিয়া সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে তুষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম দিয়া যান। সে যাহা হউক, সেই রামচন্দ্রপুরী ক্রমে এক অপরূপ সামগ্রী হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সুতরাং কোন কার্য্য মাত্র নাই,—কেবল ভ্রমণ, এক স্থানে বহুদিন থাকিতে পারেন না। আপনার ভরণপোষণের কোন ভাবনা নাই, উহা সমাজের উপর ভার। দেশ, মন্দির ও অতিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই হইল, অন্ন ও দুগ্ধ মিলিবে। সকল স্থানেই আদর। ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ, এমন কি প্রভুর গুরুস্থানীয় পুরী ভারতী পর্য্যন্ত আসিলেও, তাঁহারা প্রভুর সম্মুখে নম্র থাকেন। কিন্তু রামচন্দ্রের সে ভাব নয়। প্রভু উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ তিনি প্রভুর গুরুস্থানীয়, স্বয়ং পুরী গোসাঞিও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের ভাব যেন তিনি স্বয়ং মাধবেন্দ্র। প্রভু প্রণাম করিলে প্রথমে পুরী ও ভারতী ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র সে ধা'তের লোক নহেন।

জগদানন্দ তাঁহাকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। ভয়ে ভয়ে জগদানন্দ রামচন্দ্রকে বড় যত্ন করিলেন। রামচন্দ্রও উদর পূরিয়া ভোজন করিলেন, শেষে জগদানন্দকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া যত্ন করিয়া অনুরোধ করিয়া খুব এক পেট খাওয়াইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, "জগদানন্দ! তোমার রীতি কি? আমি সন্ন্যাসী, আমাকে এত যত্ন করিয়া খাওয়াইলে কেন? আমার ধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে? তোমাদের

চৈতন্যের গণের ভয় নাই যে, সন্ন্যাসিগণকে অধিক খাওইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট কর? তোমরা এত খাও? আমি শুনেছি যে তোমরা চৈতন্যের গণ বড়ই খাওয়ায় মজবুত, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

ফলকথা, "চৈতন্যের গণ" খাওয়ায় মজবুদ তাহার সন্দেহ নাই। কারণ চৈতন্যের গণের শুষ্ক ভজন নয়। তাঁহাদের দেহ ক্লিষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয় বারণ করিতে হয় না। যাঁহারা দেহকে দুঃখ দিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বারণ করেন, তাহাদের কয়লা ধুইয়া উহাকে পরিষ্কার করার মত কার্য্য হয়। মাথা কুটিয়া উপবাস ও দেহে কষ্ট দিয়া পবিত্র হওয়া যায় না। পবিত্র হইতে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণ দেখুন ব্রজগোপীগণ কি ব্রজ-গোপীর শিরোমণি রাধা, তিনি কিরূপে সুন্দরী হয়েন তাহা ত জানেন? তিনি বলিয়াছেন:—

ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,
সোণার বরণ খানি।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম ও ভক্তিতে হৃদয়ে জাগরিত কর, করিয়া তাঁহার স্পর্শ সুখ অনুভব কর, এবং তখন তোমার সোণার বরণ হইবে।

রামাচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়াছেন, তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুকে কোনরূপে জব্দ করা। প্রভুর মহিমা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, যাহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া না মানে তাহারাও বলে যে তিনি পরম মহাজন। রাম-চন্দ্রপুরী হিংস্রক, এ সব সহ্য হয় না। নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকটে রহিলেন, প্রভুর গণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার এক কার্য্য হইল প্রভুর ছিদ্র অন্বেষণ। প্রভু কি ভোজন করেন, কিরূপ শয়ন করেন, কিরূপে দিনযাপন করেন, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন, আর প্রকারান্তরে প্রভুর উপর বিদ্বেষ ভাব ব্যক্ত করেন। এইরূপে প্রভুর নিত্য সঙ্গী যত তাঁহাদিগের নিকট গমন করেন, করিয়া প্রভু সম্বন্ধে সমুদায় গুপ্ত কথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু নাই, তাই পান না। ভক্তগণ যে এত সহ্য করিতেছেন সে কেবল প্রভুর অভিপ্রায়ে। ভক্তগণের নিকট প্রভুর নিন্দা করেন, বলেন যে চৈতন্যের ইন্দ্রিয় বারণ কিরূপে হইবে, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে কি ইন্দ্রিয় বারণ হয়? ভক্তগণ নিতান্ত প্রভুর দিকে চাহিয়া সহ্য করিয়া থাকেন। প্রভু রামচন্দ্রের ব্যবহার যদিও সব জানিতেছেন, তবু তিনি উপস্থিত হইলে অতি নম্র হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন।

রামচন্দ্র আর কোন দোষ না পাইয়া একদিন প্রভুর সম্মুখে ‘বলিতে-ছেন, “এখানে পীপিড়া বেড়ায় কেন? অবশ্য এখানে মিষ্টান্ন ব্যবহার হয়।” এ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রপুরী সাহস করিয়া প্রভুর সম্মুখে কিছু বলিতে পারেন নাই। ক্রমে দেখিলেন যে, প্রভু নিরীহ কিছুই বলেন না। তাই পরি-শেষে প্রভুকে তাঁহার সম্মুখে নিন্দা করিলেন। কথা এই, প্রভু জীবকে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। রামচন্দ্র, সম্বন্ধে গুরুস্থানীয়, তাই তাঁহাকে বাহ্যে ভক্তি করেন। যদিও বাহ্যে ভক্তি করেন, কিন্তু অন্তরে তাঁহার কার্য্যকে ঘৃণা করেন। রামচন্দ্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে প্রভুর সহিত ব্যবহার করিতেন। পরে দেখিলেন যে প্রভু কিছু বলেন না। ক্রমে ভয় ভাঙ্গিতে লাগিল, শেষে প্রভুর সম্মুখে প্রভুকে নিন্দা করিলেন।

নিন্দা কি করিলেন তাহা উপরে বলিলাম। আর কোন দোষ পাইলেন না, পাইলেন যে প্রভুর বাড়ীতে পীপিড়া, অতএব প্রভু মিষ্টান্ন ভোজন করেন। যেহেতু সন্ন্যাসীর মিষ্টান্ন ভোজন করিতে নাই। রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

প্রভু গোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, পূর্ব্বাবধি আমার ভিক্ষার নিয়ম ছিল চারিপণ, তাহাতে তোমার আমার আর কাশীশ্বরের হইত, অদ্যাবধি তাহার সিকি আনিবে। ইহার অন্যথা কর, আমাকে এখানে পাইবে না।

প্রভু যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভক্তগণ মাত্র তাহাই করি-লেন। প্রভু অনশনে, তাঁহারা কিরূপে ভিক্ষা করিবেন? সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন তাঁহারা যাইয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, “আপনি রামচন্দ্রপুরীর কথায় আপনাকে ও আমাদিগকে কেন বধ করিতেছেন? তিনি হিংস্রক, আপনার কিম্বা জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি আপনার ভিক্ষাপদ্ধতি দুষেণ নাই, কেবল তাঁহার কুপ্রবৃত্তি তৃপ্তি করার নিমিত্তই তিনি ঐরূপ নিন্দাবাদ করিয়াছেন।” কিন্তু প্রভু জীবকে শিক্ষা দিতে এই জগতে আসিয়াছেন। সেই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তৃণাদপি শ্লোক করিয়া-ছেন। তিনি আর কি করিবেন? যখন ভক্তগণ রামচন্দ্রপুরীকে গালি দিতে লাগিলেন, তখন প্রভু তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, পুরী গোসাঞির দোষ কি? তিনি সহজ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। সন্ন্যাসী ব্যক্তির জিহ্বা লালসা থাকা ভাল নয়।

এদিকে পুরী গোসাঞি মহা খুসি। এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই, এখন, খানিক অনিষ্ট করিতে যে তাঁহার ক্ষমতা আছে তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রভুর নিকটে আসিয়া মধুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "শুনি তুমি নাকি অর্দ্ধাশন কর? সে ভাল নয়, যাহাতে দেহরক্ষা হয়; এরূপ আহার করা কর্ত্তব্য। শরীর ক্ষীণ হইলে ভজন করিবে, কিরূপে?" প্রভু অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি আপনার বালক, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমার পরম ভাগ্য।" রামচন্দ্রপুরী প্রভুর ছিদ্রান্বেষণ করিয়া কিছু পাইলেন না। আবার প্রভুর চিত্তচাঞ্চল্য পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারিলেন না।

অবস্থা বিবেচনা করুন। তুমি রামচন্দ্র, প্রভুর পিতৃস্থানীয়। তিনি তোমাকে সেই সম্পর্কের নিমিত্ত সেইরূপ ভক্তি করেন। যে প্রভু তোমাকে এত ভক্তি করেন তিনি জগৎ পূজ্য। যেরূপ পুত্রের করা উচিত, তিনি তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু তুমি কর কি? না, কিসে তাহার দোষ পাইবে। আবার প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ, যেরূপ দেহ সেইরূপ ভোজন চাই, কারণ তুমি তোমার নিজের কথায় প্রকাশ কর যে দেহ ক্ষীণ করিলে ভজন চলে না। কিন্তু তুমি তাঁহার ভোজন কমাইয়া তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শুধু তাহা নয় তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে পর্য্যন্ত বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার এইরূপ কুচরিত্র যে, প্রভুর আর কোন ছিদ্র না পাইয়া বাড়ীতে পীপড়া বেড়ায় এই কথা তুলিয়া তাঁহাকে দুষিতে ছাড় নাই। ইহার কিছুতেই প্রভুর চিত্ত বিচলিত হইল না। বরং ভক্তগণ যখন রামচন্দ্রকে দূষিলেন, তখন প্রভু রামচন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। জীবে এরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারে না।

একবার শ্রীল নারদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দেখেন যে দ্বারে এক জন দাঁড়াইয়া, তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। তিনি পরম সুন্দর, ঠিক ঠাকুরের মত। নারদ, ঠাকুর ভাবিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন,. সেই ভদ্র লোক তটস্থ হইয়া নারদকে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি ঠাকুর নন, তাঁহার দাসানুদাস। নারদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, তবে তোমার বপু ঠাকুরের ন্যায় কেন? তিনি বলিলেন, ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিয়াছেন, কারণ তিনি একজন পিপাসাতুরকে জল দিয়াছিলেন। নারদ অগ্রবর্ত্তী হইলেন, দেখেন সকলেই ঐরূপ চতুর্ভুজ; ঠিক

ঠাকুরের মত। ভয়ে আর কাহাকে প্রণাম করেন না। তবে আর দুই চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কি পুণ্যে ঠাকুরের বপু পাইয়াছেন? সকলেই অতি সামান্য কারণ বলিলেন। কেহ বটবৃক্ষে জল দিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার কৃষ্ণনামা পুত্রকে কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন, এই সমুদায় সামান্য কারণে তাঁহারা এত কৃপা পাইয়াছেন। তল্লাস করিতে করিতে শ্রীনারদ, ঠাকুরকে পাইলেন। নারদ বলিলেন, ঠাকুর একি ভঙ্গী? ইঁহাদের প্রতি এত কৃপা কেন? ঠাকুর বলিলেন; ইঁহারা আমাকে ইঁহাদের গুণে ক্রয় করিয়াছেন, তাই আমার বপু পাইয়াছেন। নারদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, ইঁহাদের সঙ্গে কি আপনার কোন বিভিন্নতা নাই? ঠাকুর বলিলেন, কই বিশেষ কিছু নয়। নারদ আবার বলিলেন, তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি? তখন ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া আপনার দেহের ভৃগুপদচিহ্ন দেখাইলেন! বলিলেন, এইটা উহাঁরা পান নাই।

ইহার তাৎপর্য্য পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন। মুনিদের মধ্যে বিচার হইতেছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইঁহাদের মধ্যে কে বড়। ইহা সাব্যস্ত করিবার ভার ভৃগু পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন, ব্রহ্মা তাহাতে ক্রোধ করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। তাহার পরে শিবের নিকট গেলেন। তিনিও গালি সহ্য করিতে পারিলেন না। পরে বৈকুণ্ঠে গেলেন, যাইয়াই কিছু না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তটস্থ হইয়া ভৃগুকে অনেক স্তুতি করিলেন। ভৃগু তখন কৃষ্ণের চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অদ্যাবধি তোমার এই পদচিহ্ন আমার প্রধান ভূষণ হইল। কথা এই, শ্রীভগবানের যে দীনতা ও সহিষ্ণুতা তাহা জীবে অনুকরণ করিতে পারে না।

রামচন্দ্রপুরী পরে নীলাচল ত্যাগ করিলেন, কারণ যাহাদের কোন কার্য্য নাই তাহারা একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি এক কার্য্য করিয়া গেলেন। প্রভুর ভোজন অর্দ্ধেক কমাইয়া গেলেন। পূর্ব্বের নিয়ম ছিল চারিপণ, সেই অবধি নিয়ম হইল দুই পণ। প্রভুর আহার লঘু হইল, কাজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রভু এ লীলা করিলেন কেন, বোধ হয় জীবের কঠিন হৃদয়:দ্রব করিবার নিমিত্ত। কারণ সে পরম সুন্দর যুবাপুরুষ অনাহারে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেন, ইহা যে দেখিত, তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত।

নবম অধ্যায়।

প্রভুর শরীর কৃষ্ণবিরহে জর জর, রোদনে প্রত্যহ কত কলস,—কত শত কলস নয়ন জল ফেলিতেছেন। কত শত কলস বলিলাম ইহা অত্যুক্তি নয়। প্রভু যখন নৃত্য করেন তখন তাঁহার নয়ন দিয়া যেন বর্ষা উপস্থিত হয়, সুতরাং তাঁহার চতুঃপার্শ্বে যাঁহারা থাকেন মহাবৃষ্টিতে লোকে যেরূপ হয় তাঁহারা সেইরূপ আর্দ্র হয়েন। প্রভু একটু নৃত্য করিলে সেই স্থান কর্দ্দমময় হয়। একটী প্রাচীন ছবিতে দেখিবেন যে, প্রভু সমুদ্র-তীরে ভক্তগণ সহিত নৃত্য করিতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়, তবু কর্দ্দমময় হইয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, সেই কর্দ্দমে প্রভুর নৃত্য-কালীন পায়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। পায়ের দাগ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেখানে শত শত কলস নয়ন জল ফেলা হইয়াছে। প্রভু ক্রমে ক্ষীণ হইতেছেন। সেই পরম সুন্দর দেহে অস্থি প্রকাশ পাইতেছে। প্রভু কঠিন মৃত্তিকায় শয়ন করেন, অস্থিতে অঙ্গে ব্যথা লাগে। প্রভু একখানি শুষ্ক কলার পাতায় শয়ন করেন।

জগদানন্দ ইহাতে একটি উপায় ভাবিলেন। প্রভুর পরিত্যক্ত বহির্ব্বাস দ্বারা একটি ক্ষুদ্র বালিশ আর একটি তোষক করাইলেন। এই দুই দ্রব্য সরূপকে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে ইহার উপরে শয়ন করাইও।" সরূপ ইহাতে অতি সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ প্রভু যে দুঃখে শয়ন করেন, ইহা তাঁহার কি কাহার প্রাণেই সহ্য হয় না। প্রভু শয়ন করিতে যাইয়া দেখেন যে, তোষক ও বালিস, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন, বালিস ও তোষক দূরে ফেলিলেন। বলিলেন "এ কে করিল?"

সরূপ বলিলেন, "জগদানন্দ।" তখন প্রভু একটু ভয় পাইলেন। যদি প্রভু বড় বাড়াবাড়ি করেন তবে জগদানন্দ উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। কাজেই প্রভু আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "জগদানন্দের এ বড় অন্যায়। আমাকে তিনি বিষয় ভুঞ্জাইতে চাহেন। যদি তোষক বালিস আনিলে, তবে একখান খাট আনো, পা টিপিবার ভৃত্য আনো, তাহা হইলে

তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।" সরূপ জগদানন্দের উপর দোষ দিয়া বলিতেছেন, "আপনি উপেক্ষা করিলে জগদানন্দ বড় দুঃখিত হইবেন।" কিন্তু প্রভু শুনিলেন না।

তখন সরূপ ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আর একরূপ শয্যা প্রস্তুত করিলেন। শুষ্ক কলার পাতা আনিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম করিয়া চিরিলেন। এই সমুদায় প্রভুর বহির্ব্বাসে পুরিলেন ও এইরূপে তোষক ও বালিস হইল। ভক্তগণ তখন প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন, প্রভু ভক্তের অনুরোধে এই শয্যায় শয়ন করিতে সম্মত হইলেন।

এ দিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে, হৃদয় ব্রজে। প্রভু বাহিরে, অন্যে যাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। আবার প্রভু যাহা দেখেন তাহা অন্যে দেখিতে পায় না। ইহাকে বলে দিব্যোন্মাদ। সম্মুখে নারিকেলের গাছ, প্রভু দেখিতেছেন সেটি কদম্ব বৃক্ষ। লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, প্রভু দেখিতেছেন শ্যামসুন্দর কদম্ব বৃক্ষে শ্রীপাদ ঝোলাইয়া বেণুগান করিতেছেন।

জগদানন্দ গৌড়ে গিয়াছেন। যথা কল্পতরু ৪র্থ শাখা :—

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে,
আইসে জগদানন্দ।
রহি কথোদূরে, দেখে নদীয়ারে,
গোকুলপুরের ছন্দ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। ধ্রু।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে,
এই অনুমানে যায়॥
লতা তরু যত, দেখে শত শত,
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় স্ফুটন,
মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি পাখী, মুদি দুটি আঁখি,
ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি,
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥

ধেনু যুথে যুথে, দাঁড়াইয়া পথে,
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিত,
পড়িল আছা'ড়ে গা॥

ক্ষণেকে রহিয়া, চলিলা উঠিয়া,
পণ্ডিত জগদানন্দ॥
প্রবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে,
লোক সব নিরানন্দ॥
না মেলে পসার, না করে আহার,
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী, কান্দয়ে গুমরি,
থাকয়ে বিরলে বসি॥
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর,
প্রবেশ করিল যাই।
আধ মরা হেন, ভূমে অচেতন,
পড়িয়া আছেন আই॥
প্রভুর রমণী, সেহো অনাথিনী,
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন, মলিন বয়ন,
মুদল নয়ানে ধারা॥
দাসদাসী সব, আছয়ে নীরব,
দেখিয়া পথিকজন।
সুধাইছে তারে, কহ দেখি মোরে,
কোথা হৈতে আগমন॥
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন,
নীলাচল পুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, পাঠাইলা মোরে,
তোমা সভারে দেখিতে॥

শুনিয়া বচন, সজলনয়ন,
শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন, চলিল তখন,
শ্রীবাস মন্দিরে ধাইয়া॥
শুনিয়া শ্রীবাস, মালিনী উল্লাস,
যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল,
পরাণ পাইল আসি॥
মালিনী আসিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া,
উঠাইল যতন করি।
তাহারে কহিল, পণ্ডিত আইল,
পাঠাইল গৌরহরি॥
শুনি শচী আই, চমকিত চাই,
দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তাঁর ঠাই, আমার নিমাই,
আসিয়াছে কত দূরে॥
দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা,
পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি,
তুয়া প্রেমবশ হয়॥
হেন নীত রীত, গৌরাঙ্গ চরিত,
সভাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে,
সভাকারে সুখ দিয়া॥
চন্দ্রশেখর, পশুর সোসর,
বিষয় বিশেষে প্রীত।
গৌরাঙ্গ চরিত, পরম অমৃত,
তাহাতে না লয় চিত॥

এইরূপ জগদানন্দ মাঝে মাঝে গমন করেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। শচী-মাতার নিকট যাইয়া প্রভুর নাম করিয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাটী ও মহাপ্রসাদ দিলেন। এইরূপে নিমাইয়ের কথা আরম্ভ হইল। বক্তা জগদানন্দ, শ্রোতা শচী, আর একটু অন্তরালে প্রিয়া ঠাকুরাণী।

পণ্ডিত বলিতেছেন, "মা, শ্রবণ কর, প্রভু কি বলিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ আসিয়া তোমার চরণ বন্দন করেন। আর যে দিন নিতান্ত তুমি তাঁহাকে ভুঞ্জাইতে ইচ্ছা কর, সেই দিবসই তিনি আসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।" শচী বলিলেন, "সে ঠিক কথা, কিন্তু সে কি সত্য নিমাই আইসে? আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি নানাবিধ শাক, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বসিয়া রোদন করি। এমন সময় দেখি নিমাই আসিল, বসিল, আমি যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলাম। তাহার পরে যেন চেতনা লাভ করি, আর বোধ হয় সমুদায় স্বপ্ন দেখিলাম।" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু তোমাকে তাহাই বলিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি তোমার সেবা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মনে বড় দুঃখ পাইয়াছেন, কিন্তু যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে আর উপায় নাই। তবে এখন যত দূর পারেন তোমার দুঃখ নিবারণ করিবেন। তিনি সেই নিমিত্ত সত্যই তোমার সম্মুখে বসিয়া আহার করেন।" এইরূপ কখন জগদানন্দ কখন বা দামোদর প্রভুর সন্দেশ আনিয়া শচীমাতাকে ও প্রিয়াজী ঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করেন।

জগদানন্দ পরিশেষে ভক্তের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রভু সকলের নিমিত্ত কিছু কিছু মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছেন। পুরীর মন্দিরের মহা-প্রসাদ মহাপ্রভুর প্রতাপের এক সাক্ষী, পুরীর ঠাকুর তাঁহার আর এক সাক্ষী। ঠাকুর কে, না জগন্নাথ অর্থাৎ জগতের নাথ, জীব মাত্রের ঠাকুর, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান বর্ব্বর, সকলের তিনি ঠাকুর। অতএব "একমেবা দ্বিতীয়ং," ঈশ্বর এক, তাহার দ্বিতীয় নাই। তিনি সকলের নাথ বা পিতা। তাই তাঁহার নাম জগন্নাথ, জগতের নাথ।"

অতএব মনুষ্য মনুষ্যের ভ্রাতা। মনুষ্যের মধ্যে পদে ছোট বড় নাই, সমুদায় সমান। সকলেই তাঁহার দাস, তাঁহার ইচ্ছার একান্ত অধীন। অতএব আমি ব্রাহ্মণ এ দম্ভ কেবল বিড়ম্বনা, আর আমি মুচি এ ক্ষোভ

কেবল স্বপ্ন বইত নয়। জীব মাত্রে সমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া যে ভেদ ইহা মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট বিষম অপরাধ। শ্রীজগন্নাথ ঠাকুর জগতে এই সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজস্বী যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইল যে ঈশ্বর এক, জীব মাত্র তাঁহার সন্তান, আর তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ শূদ্র এ ভেদ নাই।

অতএব, হে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের অন্ন তুমি কেন গ্রহণ করিবে না? কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুর ইহার অন্য কোন উত্তর করিতে না পারিয়া বলিলেন, "শূদ্রের অন্ন যে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তাহাদের আচার ভাল নয়।" ব্রাহ্মণ ঠাকুর এইরূপে নানা কারণ দেখাইলেন, কেন তিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন না। শূদ্র যদি শ্রীকৃষ্ণের জীব হইল, তবে শূদ্র যদি তাঁহাকে অন্ন দেয় তবে তিনি, শ্রীকৃষ্ণ, কি তাহা গ্রহণ করেন না? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, "যিনি বিদুরের খুদ খাইয়াছিলেন, যিনি সকলের পিতা, তিনি অবশ্য শূদ্রের দত্ত অন্ন খাইবেন।" তাহা যদি হইল তবে শূদ্রের দত্ত অন্ন সেই পবিত্রের পবিত্র শ্রীভগবান গ্রহণ করেন, তুমি মানব, ব্রাহ্মণ সত্য, তবু কৃষ্ণের দাস, ক্ষুদ্রকীট, তুমি কেন তাহা গ্রহণ করিবে না? এই কথায় ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইলেন। আর ঠাকুরের মহাপ্রসাদ প্রচলিত হইল। শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণকে খাইতে হইল। *

মহাপ্রভু এ লীলা কিরূপে করিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার কর্ত্তব্যে নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলেন, প্রভুর নিকট প্রেম ও ভক্তি পাইলেন, তবু বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বকার যে ব্রাহ্মণ তাহাই রহিলেন, মনের জাড্য গেল না। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা শত সহস্র নিয়ম করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণকে ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে বন্ধন করিয়াছেন, আপনারা সে নিয়ম পালন না করিলে অন্যে মান্য করে না। সুতরাং আপনাদের সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতে হয়। এইরূপে আপনারা সামাজিক নিয়মের এরূপ দাস হইয়াছেন যে, সে সমুদায় বাহিরের নিয়ম পালন করিতেই তাহাদের চির জীবন যায়, প্রকৃত সাধন ভজন হয় না।

---

* একজন খৃষ্টিয়ান মহাপ্রসাদ কিনিয়া একটি ব্রাহ্মণের হস্তে দিল। মনে ইচ্ছা ব্রাহ্মণঠাকুরকে জব্দ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণঠাকুর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া তাহা বদনে দিলেন। এ কথা হণ্টর সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে।

কিন্তু প্রভুর সরল ধর্ম্মে সে সমুদায় বন্ধন থাকিল না। যে প্রকৃত বৈষ্ণব তাহার "বাহ্য-প্রতারণা" নাই। ভারতী ঠাকুর চর্ম্মের বহির্ব্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, তাই প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। এমন কি বৈষ্ণবের সন্ন্যাস নাই। তাই প্রভু আপনার সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।"

কথাটি একবার মনোযোগ দিয়া বিচার করুন। অবতার বলিতে জগতে শ্রীভগবানের কি তাঁহার অংশের উদয়। অবতার আর শাস্ত্র, ইহার মধ্যে অবতার বড়, যেহেতু যদিও শাস্ত্রাজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া গৃহীত হয়, তবু সে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নয়। অবতারবাক্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা, অতএব শাস্ত্র অপেক্ষা অবতারবাক্য বড়। হিন্দুগণ যে শাস্ত্র মানেন, সার্ব্বভৌম সেই শাস্ত্র মানিতেন। কিন্তু মনের জড়তা থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয় না, তাই প্রভু প্রত্যূষে তাঁহার হাতে "মহাপ্রসাদ" অর্থাৎ শুষ্ক গোটা কয়েক পক্কান্ন দিলেন, দিয়া বলিলেন, "গ্রহণ কর।" মনে ভাবুন, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মুখ না ধুইয়া, বস্ত্র ত্যাগ না করিয়া, কি কখন মুখে অন্ন দিতে পারেন? লক্ষবার মরিলেও নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যখন সার্ব্বভৌমের হস্তে মহাপ্রসাদ দিলেন তখন সার্ব্বভৌম উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। তাই মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি আমার সমুদায় সাধ পূর্ণ হইল, যেহেতু মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস হইল। আজি তুমি প্রকৃতই কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে। আজি তোমার বন্ধন ছিন্ন হইল। আজি তোমার মন শুদ্ধ হইল। যেহেতু আজি বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া তুমি মহাপ্রসাদে বিশ্বাস করিলে।" অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ণ বিচার নাই, বৈষ্ণবধর্ম্মে সন্ন্যাস নাই, কঠোরতা নাই, খুটিনাটি নাই।

সনাতন সংসার ত্যাগ করিলেন, করিয়া বারাণসীতে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভু তাঁহার গাত্রে, তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত প্রদত্ত ভোটকম্বল দেখিয়া, বারংবার তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সনাতন, প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া আপনার ভোটকম্বল একজন কান্থাধারীকে দিয়া তাহার কান্থা আপনি লইলেন। প্রভু, সনাতনের গাত্রে কান্থা দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। আবার রামানন্দ রায় বাবু লোক, দোলায় ভ্রমণ করেন, তিনি সাড়ে তিনজনের মধ্যে একজন। অতএব এই দুইটি উদাহরণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বৈষ্ণব বিধির বাহিরে।

যখন এই ধর্ম্ম ভারতে প্রবেশ করিবে, তখন ভারতে জাতি বিচার, বর্ণ বিচার, ছোট বড় বিচার থাকিবে না। হে গৌরভক্তগণ! তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। ভারতের উন্নতি কর। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত সে উন্নতির উপায় নাই। তাই মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েন। ভারতবর্ষীয়গণের এক ঠাকুর লইয়া এক জাতি হওয়া উচিত। তবেই তাঁহারা সজীব হইবেন।

নীলাচলে মহাপ্রসাদকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে না, অন্যস্থানে সে মহাপ্রসাদের অনাদর কেন? যদি ঠাকুরকে নিবেদন করিলে সে দ্রব্য পবিত্র হইল, তবে এরূপ বস্তু সর্ব্বস্থানেই সেইরূপ আদরের হওয়া উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা করেন না, করিতে পারেন না, কারণ সমাজের ভয় করেন। তাঁহাদের মনের জড়তা যায় না। মহাপ্রসাদের গেল এই আদর, আবার মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধার দ্রব্য আছে, যথা :—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান॥"—চরিতামৃত।

ভক্ত, মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া যাহা রাখেন, তাহা মহাপ্রসাদ অপেক্ষা আরো পবিত্র। কবিরাজ গোস্বামী এই বাক্য কালিদাসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন। ইনি কায়স্থ, পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব মাত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। ক্ষুদ্র জাতি বলিয়া উপেক্ষা করেন না। ঝড়ু ঠাকুর জাতিতে ভূমিমালী, পরম বৈষ্ণব। কালিদাস তাঁহার নিকট প্রসাদ চাহিলেন। তিনি দিলেন না। পরে ঝড়ুঠাকুর আম্রভক্ষণ করিয়া যে আঁটি ফেলিয়াছেন, কালিদাস তাহা গোপনে চুষিয়া খাইয়া ছিলেন। এই তাঁহার সেবা, কেবল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া বেড়ান। সেই কালিদাস যখন মহাপ্রভু-দর্শনে নীলাচলে আসিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বড় কৃপ করিলেন। যদি জগন্নাথের প্রসাদ পবিত্র বস্তু হয়, তবে গোপীনাথ কি মদনমোহন ঠাকুরের প্রসাদ উচ্ছিষ্ট কেন হইবে? যদি ঝড়ু ঠাকুরের প্রসাদ মহাপ্রসাদ হইল, তবে আর জাতিভেদ কোথায় থাকিল?

জগদানন্দ শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাইতে অদ্বৈতের নিকট চলিলেন। সেখান হইতে বিদায় হইয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণের সংবাদ সমুদায় বলিলেন।

তাহার পরে বলিতেছেন, "শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আপনাকে একটি তরজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে তরজাটি এই—

"প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

জগদানন্দ এই তরজা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাও হাসিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ঈষৎ হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" সকলে ভাবিলেন এ একটী রহস্য বাক্য বই নয়, কিন্তু সরূপ তাহা ভাবিলেন না। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এ তরজার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না, আপনি বুঝাইয়া বলুন।" মহাপ্রভু বলিলেন, "শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আগম শাস্ত্রে পণ্ডিত। সেই শাস্ত্র বিধি অনুসারে অগ্রে দেবতাকে আহ্বান করা হয়, করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল পূজা করা হয়, পূজা সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আচার্য্য বোধহয় তাহাই বলিতেছেন আর কিছুই নয়। তবে আমিও তাঁহার মন বুঝিতে পারি না।"

এই কথা শুনিয়া সকলে বিশেষতঃ সরূপ অবাক হইলেন, যেহেতু তিনি বুঝিলেন যে এই তরজার মধ্যে "সর্ব্বনাশ" রহিয়াছে।

এই তরজার অর্থ লইয়া মহা মহা পণ্ডিতগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। আমার পাণ্ডিত্য নাই, তবে আমি ইহার সহজ কি মানে বুঝিয়াছি বলিতেছি। শ্রীমহাপ্রভু এক বাউল, মহাজন। আর শ্রীঅদ্বৈত আর এক বাউল, উপরি উক্ত মহাজনের অধীন। শেষোক্ত বাউল অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্বোক্ত মহাজন অর্থাৎ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছেন, "হাটে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চাউল আনা হইয়াছিল। লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না।" এখন ইহার বিচার করুন।

"মহাপ্রভু মহাজন" তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গাদি লইয়া জীবের যে আহার চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি তাহাই বিক্রয় করিতে ভবের হাটে আসিয়াছিলেন। তিনি

কেন আসিয়াছিলেন? যেহেতু দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, লোকের গৃহে তণ্ডুল মাত্র ছিল না, জীবে হাহাকার করিতেছিল। অর্থাৎ জগতে কৃষ্ণভক্তি ছিল না, সেই নিমিত্ত মহাপ্রভু মহাজন, ভবের হাটে সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ আসিয়া অতি অল্পমুল্যে চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বা বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন, কোথাও বুভুক্ষুলোকে চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। লোকের গোলা পূর্ণ হইল। আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই যিনি দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া মহাজন মহাপ্রভুকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে সমাচার দিতেছেন যে, চাউল আর বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পূরিয়া গিয়াছে, এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন, অর্থাৎ এখানে আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এই তরজাটি শ্রীচরিতামৃতে আছে। আর একটি ঘটনা পাঠক মনে করুন। প্রভু উপবীত কালে এক দিবস একটী সুপারী খাইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। তাহার পরে তেজস্কর দেহ ধরিয়া জননীকে বলেন যে, "আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" তাহার পরে প্রভু "প্রকাশ" পর্য্যন্ত এইরূপ মুহুর্ম্মুহু লীলা করিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, পরে বলিলেন "আমি চলিলাম," বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর দেখা গেল যে, নিমাইয়ের দেহে ভগবানের প্রকাশ নাই, তিনি অভ্যন্তরে লুকাইয়াছেন। লীলা-লেখক মহাশয়গণ উপরে যে সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রধান কারণ যে, এই প্রকার ঘটনার কথা কেহ সাজাইতে পারে না, সাজান হইলে আর এক প্রকার হইত। সুপারী চিবাইতে চিবাইতে অচেতন হইলেন, এই রূপ বর্ণনা শুনিলেই বোধহয় লীলা-লেখক প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতের তরজাদিও তদ্রূপ; উহা একটি কল্পিত কথা নয়। পড়িলে বোধ হয়, উহা প্রকৃত ঘটনা। জগদানন্দ বলিলেন, হাসিলেন। প্রভু ব্যাখ্যা করিলেন। স্বরূপ বিমনা হইলেন। এই সমুদায় যে কল্পনা নয়, তাহা পড়িলে মনে আপনি উদয় হয়।

শ্রীরামমোহন রায়ের সহিত খ্রীষ্টিয়ান মিশনারিদিগের যে বিচার হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, যীশু যে শ্রীভগবান, কি শ্রীভগবানের "বিশেষ" কেহ, একথা মোটেই পাওয়া

যায় না। "ঈশ্বরের পুত্র" বলিয়া যীশু আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। রামমোহন রায় এই এক তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিলেন যে, যীশু যে অবতার তাহা তিনি স্বয়ং কোথাও স্বীকার করেন নাই। অতএব যীশু অবতার নহেন।

কিন্তু এইরূপ তর্কে আমার প্রভু কোথায় থাকেন, একবার দেখা যাউক। প্রথম প্রশ্ন এই,—প্রভু যদি স্বয়ং শ্রীভগবান হইতেন, তবে তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈশ্বরের দাস বলিয়া কেন অভিমান করেন?

ইহার উত্তর এই;—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রকাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেবল মুখে শিক্ষা দিলে জীব উহা হৃদয়ঙ্গম, কি উহার অনুকরণ, কি গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ শিক্ষার যে কয়েকটি মোটা কথা তাহা চিরদিনই আছে, তবে মুখে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, "আমি আদি, আমি অন্ত, আমা ব্যতীত জগতে কিছু নাই। আমি তোমাদের হৃদয়ে বাস করি, আমি জীবের মলিন দশা দেখিয়া তোমাদের মধ্যে তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি তোমা-দিগকে প্রেম ও ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিব। কিন্তু সেই ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের সার, অন্য ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়। ইহা মুখে শিক্ষা দিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই আমি আপনি ভক্তভাব ধরিয়া কিরূপে আমাকে ভক্তি করিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। আমি এখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। আমি লুকাইলে এই দেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, তোমরা উহাকে সন্তর্পণ করিও।"

এই কথাগুলি বলিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি এখানে আসিলাম কেন? এ কি দিবস না রাত্রি? আমি কোথা? আমি কিছু প্রলাপ বকিয়াছি?" ভক্তগণ সমুদায় গোপন করিলেন, করিয়া বলিলেন, তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তাই তুমি এখানে।

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের দুই ভাব, ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব; বা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ মিলিত, কি তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর। তাহার পরে

পূর্ব্বের কথা মনে করুন। যীশু কখন আপন মুখে স্বীকার করেন নাই যে, তিনি কোন বিশেষ বস্তু। শ্রীগৌরাঙ্গ কি কখন স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি শ্রীভগবান? তিনি শত বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "প্রকাশ" মানে তাই, আর কিছুই নয়। সেই "প্রকাশ" অবস্থায় সরল ভাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, "তিনি সেই শ্রীভগবান, জীবের হৃদয়ে বাস করেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী।" যিনি সন্দিগ্ধ চিত্ত তিনি বলিতে পারেন যে, "সে তাঁহার প্রলাপ বই নয়। তিনি যে কৃষ্ণ ইহা তিনি অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন। অধিরূঢ় ভাবে গোপীগণ অভিমান করিতেন যে তাঁহারাই কৃষ্ণ। সেইরূপ শ্রীপ্রভু অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন যে তিনিই কৃষ্ণ।" কিন্তু মহাপ্রকাশ বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে প্রভুর যে প্রকাশ উহা প্রলাপ নয়। তাহার পরে মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু কি করিলেন? ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, "অন্য দিন প্রভু বিষ্ণুখট্টায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন যেন না জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে খট্টায় উপবেশন করেন। কিন্তু মহাপ্রকাশের দিনে সে সমুদায় মায়া করিলেন না। সহজ অবস্থায় খট্টায় বসিলেন।

প্রকাশাবস্থায় তিনি বলিতেন, "আমি সেই," আর ভক্তগণ বিশ্বাস করিতেন যে "তিনি সেই।" "আমি সেই" একথা বলা সহজ, কিন্তু একথা উপস্থিত জনগণের বিশ্বাস জন্মান অসম্ভব, কেহ পারে না।

একটু চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে, যদি শ্রীভগবান মনুষ্যের মধ্যে আগমন করেন তবে তাহার সংসার তদ্দণ্ডে ধ্বংস হয়। শ্রীভগবান যদি তাহাদের মধ্যে আগমন করেন তবে জীবগণ কিছু করিবে না,—খাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে। তাই ভগবানের আসিতে হইলে তাঁহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর শ্রীভগবদ্ভাবে প্রকাশ ছিলেন। তাহাতে কি হইল, না ভক্তগণ কাতর হইয়া চরণে পড়িয়া বলিলেন "তুমি যাও, আমরা তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না।" তাই ভগবান, লুকাইলেন। সেই নিমিত্ত প্রভু ক্ষণমাত্র শ্রীভগবদ্ভাব প্রকাশ হইতেন, এবং সেই নিমিত্ত ভক্তগণ তাহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন। অন্যান্য সময় ভক্তভাবে থাকিয়া তিনি ভক্তের কি আচরণ তাহা পালন করিয়া জীবকে শিখাইতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে অবতার তাহার গোটাকতক প্রমাণ দিতেছি ঃ—

১। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীসার্ব্বভৌম,

শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে শত শত বার পরীক্ষা করিয়া উহা মানিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা মহাহিন্দু, তাঁহারা তাঁহার চরণ গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন।

২। প্রভু যে অবতার, ইহা তিনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চিরদিন আপনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিতেন যে, তিনি শ্রীভগবান্, আর আপনার চরণ গঙ্গাজল তুলসীদলে পূজা করিতে দিতেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি যে শ্রীভগবান তাহা তিনি জানিতেন। যথা—যখন শ্রীনিত্যানন্দ আগমন করিবেন, তাহার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন যে, তিনি বলরাম। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন যে, "যদি নিত্যানন্দ অতি মন্দ কার্য্যও করেন, তবু তাঁহার চরণকমল স্বয়ং ব্রহ্মারও বন্দ্য।" শ্রীঅদ্বৈত সম্বন্ধে বলিলেন, "তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, প্রহ্লাদ প্রভৃতির পূর্ব্বেও তিনি ভক্ত, অতএব তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা বড়।" এখন দেখুন যে, সেই অদ্বৈত প্রভু তরজা পাঠাইতেছেন, আর প্রভু সহজ অবস্থায় তাহার অর্থ কি করিতেছেন :—

তরজার অর্থ এই যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ঠাকুরকে আহ্বান করেন, সেই নিমিত্ত তিনি ধরাধামে আগমন করিয়াছেন। ঠাকুরকে কেন আহ্বান করিলেন ? না জীবের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত। প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ২৪ বর্ষ, তখনি তিনি প্রকাশ হইলেন। ইহার পূর্ব্বে যদিও তিনি ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে কার্য্যারম্ভ প্রকাশের পর হইতেই হইল। দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রভু প্রচার করিলেন, সিন্ধু হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ, প্রেমের বন্যায়, ডুবিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ আচার্য্য সৃষ্ট হইল, কোটী কোটী লোক প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন শ্রীঅদ্বৈত (প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ৩৬ বৎসর) এই তরজা পাঠাইলেন। তাহা দ্বারা প্রভুকে জানাইলেন যে, "প্রভু আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। যাহার নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইলাম। এখন আপনি সচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন করিতে পারেন।" আর প্রভু উত্তরে বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" এই তরজার দ্বারা সহজে বিশ্বাস হয় যে গৌরলীলা শ্রীভগবানের কার্য্য। অতএব জীব তোমার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই!

এই সুযোগে একটী কথা বলিয়া রাখি। প্রকাশাবস্থায় শ্রীপ্রভু বৃদ্ধ

জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, এ কথা আমি পূর্ব্বে লিখি ও ইহার প্রমাণ দিই। অর্থাৎ বলি যে, এ কথা আমি শাস্ত্রে পাইয়াছি, আমার মনগড়া কথা নয়। প্রভুর লীলায় যাহা পাইয়াছিলাম তাহা আমি বলিয়াছি। তবু ইহাতে অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাঁহারা বলেন, "প্রভু এমন মাতৃ-ভক্ত, তিনি জননীর মাথায় পদার্পণ করিলেন ইহা কি হইতে পারে? আর তুমি এরূপ কথা লিখিলে কিরূপে?" কিন্তু আমার অপরাধ কি? আমি লীলা সংগ্রাহক, প্রমাণিক যাহা পাইব তাহাই লিখিব। ভাল কি মন্দ, অর্থাৎ প্রভুর গৌরবপোষক কি নিন্দাবর্দ্ধক, তাহা বিচার করিবার আমার অধিকার নাই। তাহা যদি করিতাম তবে আমার পুস্তক পড়িয়া জীবের কোন লাভ হইত না। প্রভু যেরূপ, আমি সেইরূপ দিয়াছি, যাহার ইচ্ছা হয় তিনি গ্রহণ করুন, না হয় না করুন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুর যে জননীর মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম প্রদান, ইহাতে তোমার আমার কি ক্লেশের কিছু আছে? ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। যখন শ্রীঅদ্বৈত শুনিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, তখন বলিলেন, "নিমাই যে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যায় না। নিমাই পণ্ডিতকে আমি তখনি মানিব, যখন তিনি আমার মস্তকে পদার্পণ করিতে সাহসী হইবেন।" শ্রীঅদ্বৈতের বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর, বৈষ্ণবের রাজা, জগতে ঋষির ন্যায় মান্য, তাঁহার মাথায় পা দেয়, তাঁহার গুরু ও শ্রীভগবান ছাড়া অপর কেহ সাহসী হয় না। এই অদ্বৈতের মস্তকে ২৪ বৎসরের নিমাই, যদি মনুষ্য হন, তবে পা দিবেন ইহা কি হইতে পারে? লোকের মনে বিশ্বাস যে লঘুজন গুরুজনের মস্তকে পদ দিলে তাহার সে পা খসিয়া পড়ে, কি তার কুষ্ঠ হয়। শ্রীনিমাই অদ্বৈতের মস্তকে পা দিয়াছিলেন। কোন হিন্দুসন্তান, যত মন্দই হউক, জননীর মস্তকে কি শ্রীপদ দিতে পারে? মনে ভাবুন, নিমাই পণ্ডিতের বয়ঃক্রম ২৪ বর্ষ ও তাঁহার মাতার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধা জননীর মস্তকে শ্রীপদার্পণ করিতে কেহ পারে না। নিতান্ত যে পাষণ্ড, সেও পারে না। এখন নিমাই পণ্ডিতের ভক্তি-বৃত্তি কিরূপ, তাহা মনে করুন। তাঁহার মত বস্তু জননীর মস্তকে কিরূপে পদার্পণ করিবেন? অতএব নিমাই পণ্ডিত যখন তাঁহার জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিমাই পণ্ডিত ছিলেন না। ঘটনা এই, শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"আমি আদি, আমি সকলের পিতা।" শচী সম্মুখে করজোড়ে কাঁপিতেছেন। শ্রীবাস বলিলেন "জননি কর কি? প্রণাম কর। উনি তোমার পুত্র নন, জগতের পিতা।" শচী প্রণাম করিলেন, আর শ্রীভগবান্ তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিলেন। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্ না হইতেন, তবে জননী প্রণাম করিলে ভয় পাইয়া বলিতেন,—"মা! উঠ, কর কি? অকল্যাণ কেন কর?" তাহা হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্রীভগবান্ কি না। কিন্তু তখন নিমাইয়ের প্রকাশ অবস্থা, তখন তাঁহাতে নিমাই-পণ্ডিতত্ব নাই। তখন তিনি জগতের আদি, সকলের কর্ত্তা, শচীরও পিতা। তাই তিনি অনায়াসে শচীর মাথায় পা দিলেন। যখন প্রভু ভয় না পাইয়া শচীর মাথায় পদার্পণ করিলেন, তখন ইহাই প্রমাণিত হইল যে, তিনি সত্য সত্যই শ্রীভগবান্। নিমাই পণ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান্, এই লীলা তাহার এক প্রমাণ। প্রভু জননীর মস্তকে পা দিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা ক্লেশ পান, তাঁহারা একটী কথা ভুলিয়া যান যে, তিনি শ্রীভগবান্। তাঁহারা মনে ভাবুন যে, তিনি শ্রীভগবান্, তবে আর তাঁহাদের মনে ক্লেশ হইবে না। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের কাচ করিতেন, তবে জননী তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তখনি জিহ্বা কাটিয়া শ্রীবিষ্ণু বলিয়া তাঁহার চরণ তলে পড়িতেন! কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্তু, তিনি কেন তাহা করিবেন? তিনি ঐ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিলেন, জগতকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি শচীর তনয় বলিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি শচীর কি জগতের পিতাও বটেন।

যখন শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গকে তরজার দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে এখন তিনি স্বধামে গমন করিতে পারেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" আবার প্রভু যখন শ্রীসরূপকে তরজার অর্থ শুনাইলেন, তখন তিনি বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, এ লীলাখেলা কি এতদিনে ফুরাইল! হায়! এতদিন পরে কি ন'দের প্রেমের হাট ভাঙ্গিল? সরূপের যেরূপ মনের ভাব হইল আমাদেরও তাই হয়। শ্রীঅদ্বৈতের উপর ক্রোধ হয় যে, তিনি কেন প্রভুকে শীঘ্র বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত কি ইচ্ছা করিয়া

প্রভুকে বিদায় দিয়াছিলেন, না ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন? যাঁহার ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করেন, তাঁহারি ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে বিদায় দিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত এক বুঝেন যে জীবের উদ্ধার। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌কে আহ্বান করিয়াছিলেন। জীব উদ্ধার হইল, প্রেমভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, বাকি যে কার্য্য রহিল তাহা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইবে। এখন ঠাকুর স্বধামে গমন করুন। এই অদ্বৈতের মনের ভাব। কিন্তু ঠাকুরের মনের ভাব অন্যরূপ। যদিও শ্রীঅদ্বৈত, ঠাকুরকে বিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাহার পরে দ্বাদশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। কেন? না, তাঁহার একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বাকি ছিল বলিয়া। সেটি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও জানিতেন না। প্রভু প্রথমে ভক্তির চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তাহা যখন শেষ হইল তখন প্রেমের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়া হইলে, প্রভু তবু আর দ্বাদশ বৎসর রহিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য রসাস্বাদন দ্বারা জীবকে রসশিক্ষা দেওয়া। হৃদয়-কূপ হইতে রাধাকৃষ্ণলীলারস, অবিশ্রান্ত উত্থিত করা যাইতে পারে। সামান্য কূপ খনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত পরিষ্কৃত নয়। তদপেক্ষা গভীর করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল জল উঠিবে। আরো গভীর করিলে আরো পবিত্র জল উঠিবে। এইরূপে জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভু দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণলীলারূপ কূপ হইতে সুধা উঠাইতে লাগিলেন। এক উদ্দেশ্য, আপনি আস্বাদ করিবেন, অপর উদ্দেশ্য, উদাহরণ দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিবেন। প্রভু অদ্বৈতের তরজার পর হইতে ক্রমেই আভ্যন্তরিক জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে ক্ষণেক উদ্ধবের ভাব, ক্ষণেক রাধার ভাব গ্রহণ করিতেন, ক্ষণেক বা সচেতন থাকিতেন। কিন্তু এখন প্রভুর অন্য সকল ভাব যাইয়া ক্রমে রাধাভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর সে ভাব রহিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে রাধাভাবে কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে, কি কৃষ্ণের সঙ্গ করিতে করিতে হঠাৎ চেতনা পাইতেন, আবার তখনি চেতনা হারাইতেন। কিন্তু যখন প্রভু গম্ভীরা-লীলা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার রাধাভাব প্রায় আর যাইত না। প্রভু রাধাভাবে স্বরূপের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "ললিতে, আমাকে কৃষ্ণের ওখানে লইয়া চল। তিনি আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন।" প্রভুর আপনাকে রাধা বলিয়া

সম্পূর্ণরূপে বোধ হইয়াছে, আর সেইরূপ সরূপকে ললিতা বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাই ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু রাধাভাবে কৃষ্ণকথা বলিতে-বলিতে হঠাৎ চেতন হইল, তখন বিস্মিত হইয়া সরূপকে বলিতেছেন,—"সরূপ, আমি এইমাত্র কি প্রলাপ করিতেছিলাম? আমার বোধ হইতে-ছিল যেন আমি রাধা। কিন্তু আমি ত রাধা নই, আমি কৃষ্ণচৈতন্য।" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন, আবার রাধাভাবে "প্রলাপ" করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এই রাধাভাব রহিয়া যাইতে লাগিল, চেতনাভাব ক্রমে কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত, আর যতক্ষণ নিদ্রা না যাইতেন ততক্ষণ সে ভাব থাকিত। এখন দিনের বেলায়ও রাধাভাব দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি, কখন কখন এ রাধাভাব দশদিন পাঁচদিন থাকিতে লাগিল, পরে মাসের পর্য্যন্ত, শেষে বৎসরেক পর্য্যন্ত। অর্থাৎ যখন ভক্তগণ রথের সময় নীলাচলে আসিতেন তখনি চেতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিদায় করিয়া দিয়া আবার ভাবসাগরে ডুবিতেন। এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের লীলাকে পুনর্জ্জীবিত করা গৌরলীলার একপ্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহার করিয়া মথুরায় গেলেন, তখন রাধা গোপীগণ সহিত বিরহে বিহ্বল হইলেন। তখন রাধা এই বিরহে যে সমুদায় রস আস্বাদন করেন প্রভু তাহাই করিতে, ও জগতকে আস্বাদন করাইতে, লাগিলেন।

পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, প্রেমিক ভক্তের তিন ভাব,—যথা পূর্ব্ব-রাগ, মিলন ও বিরহ। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব বিরহ। আর সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাব মিলন। মিলন অপেক্ষা পূর্ব্বরাগ ভাল। আবার সেই প্রকার জীবের তিন ভাব,—আনন্দের আশা, আনন্দ ভোগ, আর পূর্ব্বের আনন্দ স্মরণ। আনন্দের আশাকে পূর্ব্বরাগ বলে, আনন্দ ভোগকে বলে মিলন, আর পূর্ব্বানন্দ স্মরণকে বলে বিরহ। ইহার মধ্যে শেষোক্তটি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। মিলন হইতে যে বিরহ মধুর, একথা হঠাৎ লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যাঁহারা রসাস্বাদ করিয়াছেন তাঁহারা, আমরা কি বলি-তেছি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীমতীর শ্লোক শ্রবণ করুন,—

"সঙ্গম-বিরহঃ-বিকল্পে বরমিহ বিরহ ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সর্ব্বথৈকা বিরহে তন্ময় ভূলোকং॥"

যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে আনন্দ, আর যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে মিলনে আনন্দ। প্রভুর কি ভাব তাহার কতক ভাব শ্রীভাগবতের ভ্রমরগীতা পড়িলে জানা যায়। অনেকে অবগত আছেন, "রাই উন্মাদিনী" বলিয়া গীতের পালা সৃষ্টি হয়, আর জীবে উহার অভিনয় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া পবিত্র হয়। এ "রাই উন্মাদিনী" প্রভুর পূর্ব্বে, জগতে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। আর যাহা ছিল তাহা কথায়। কিন্তু প্রভু "রাই উন্মাদিনী" কি, তাহা কার্য্য দ্বারা দেখাইলেন। প্রভু কার্য্যে যাহা দেখাইলেন, তাহা কবিগণ অনুভবও করিতে পারেন নাই। একটী পদের বিচার করিব।

"রাই, কৃষ্ণকথা কইতে ছিল।
কথা কইতে কইতে নীরব হইল॥"

প্রভু কৃষ্ণকথা কইতে গেলেন অমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিল, উঠিয়া কণ্ঠ রোধ ও নিশ্বাস বন্ধ করিল, ও অমনি নয়নতারা স্থির হইয়া গেল।

এরূপ দৃশ্য কোথা ছিল, কে কোথা দেখেছেন বা শুনেছেন? প্রভু আপনি করিয়া, ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রভু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু নয়ন মুদিয়া, যেহেতু হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। তাই নয়ন মেলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু নয়ন মুদিয়া চলিয়াছেন তাই পদস্খলন হইতেছে, আর ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। বলিতেছেন, "প্রভু, নয়ন মেলিয়া চলুন, পড়িয়া যাইবেন।" সেই হইতে "রাই উন্মাদিনীর" গীত হইল;—

"অমন করে যাইস্ না, যাইস্ না, ধীরে চল।
তুই নয়ন মুদে চলে যাবি,
প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি?"

প্রভুর কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে "জয়দেব," "বিদ্যাপতি," "চণ্ডীদাস," ও "বিল্বমঙ্গল" উদিত হয়েন। এই উপরি উক্ত প্রেমিকভক্ত কবিগণ যেরূপ কথার দ্বারা প্রেমের সূক্ষ্ম কণা লইয়া খেলা করিয়া গিয়াছেন, প্রভু আপনার আচরণের দ্বারা উহা জীবের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাই জীবে এখন সেই "প্রেমের সূক্ষ্ম" তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের নায়ক বনমালী—রাখাল। তাহার নায়িকা সেইরূপ বনচারিণী—রাধা। উভয়ে জগতের কুটিলতার কোন ধার ধারেন না, তাঁহারা প্রেমে পাগল। আবার ইহাঁরাই শ্রীভগবান্, তবে ঐশ্বর্য্য-বিবর্জ্জিত।

জয়দেব ইঁহাদের প্রেমের খেলা সুললিত কবিতায় বর্ণনা করিয়া উহাতে অতি মিষ্ট সুর দিলেন। সহজে লোকে সেই গীত শুনিলে পাগল হয়।

কিন্তু শ্রীজগন্নাথ দেবকে এই সমুদায় গীত আরও ভাল করিয়া শুনান হইত। দেবদাসীগণ এই সমুদায় গীত অভ্যাস করিতেন, করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে গান করিতেন ও নৃত্য করিতেন। এ দেবদাসীগণ দক্ষিণ দেশের মন্দিরে প্রতিপালিত হইত। ইহাদিগকে "মুরারী" বলে, আর দক্ষিণ দেশে প্রভু এক মন্দিরের যত মুরারী ছিল সমুদায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও কোন কোন স্থানের দেবদাসীগণের চরিত্র মন্দ, তবু তাহারা যখন সুস্বরে ঠাকুরের নিকট নৃত্য গীত করিত, তখন শ্রোতা ও দর্শকগণকে মোহিত করিত।

প্রভু বিরহ-বিহ্বল অবস্থায় জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে গোবিন্দ। এমন সময় তাঁহার কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। বুঝিলেন জয়দেবের কবিতা গীত হইতেছে, রাগিণী গুজ্জরী। তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ যাইতেছেন, প্রভুর এরূপ হঠাৎ দ্রুতগতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রথমে তিনি প্রভুর দ্রুত-গমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে গমনের কারণ বুঝিলেন, তাহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। যিনি গীত গাহিতেছেন তিনি দেবদাসী—স্ত্রীলোক। প্রভু সন্ন্যাসী, মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চলিয়াছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্গন করিতে। প্রভু যদি বিহ্বল অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তবে চেতন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবেন। তাই গোবিন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌড়িয়া কেহ পারে না, গোবিন্দও পারিতেন না, কিন্তু প্রভুর অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে। পথে সিজের কাঁটা দিয়া অনেক বাগান ঘেরা, সুতরাং যাইতে নানা বাধা পাইতেছেন, গাত্রে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্তময় হইতেছে, কিন্তু তাহাতে প্রভুর ব্যথা বোধ নাই। প্রভু কেবল দৌড়িয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ প্রভুকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি? যিনি গাহিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিবা মাত্র অমনি প্রভুর বাহ্য হইল। তখন ফিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিন্দকে বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে ক্রয় করিলে। আমি যদি প্রকৃতি স্পর্শ করিতাম তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার প্রাণ দিতাম। গোবিন্দ, তুমি আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।"

প্রকৃত কথা, এই ঘটনায় ভক্তগণ বড় ভীত হইলেন, বুঝিলেন যে প্রভুকে সতত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রভু দিবাভাগে রাধাভাবে জগৎ কৃষ্ণময় দেখেন, জগতের সমুদায় কার্য্যে কৃষ্ণলীলা অনুভব করেন, আবার রজনীতেও বটে। স্বপ্নেও তাহাই। কোন কোন দিন স্বপ্নে এরূপ নিমগ্ন হয়েন যে, বেলা হইলেও উঠেন না। একদিন স্বপ্নে রাসলীলা দেখিতেছেন, শয্যা হইতে উঠিতেছেন না। বিলম্ব দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ডাকিলেন। প্রভু উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের আবেশ গেল না। মনে করুন্ প্রভুর মনের ভাব দিবানিশি এই যে, কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, তিনি রাধা, বৃন্দাবনে একাকিনী পড়িয়া আছেন। যথন স্বপ্নে রাসরসে নিমগ্ন হইলেন, তথন "কৃষ্ণবিয়োগিনী" ভাব গিয়াছে। বোধ হইয়াছে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ যথন তাঁহাকে উঠাইলেন, তথন প্রভুর হৃদয় আনন্দে টলমল করিতেছে, বদন প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রভুর আনন্দ ও বিরহ বেদনা এত অধিক যে তাঁহার বদনে তাঁহার মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিত। প্রভু দর্শনে চলিলেন, যাইয়া জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, তিনি ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু প্রভু তথন বৃন্দাবনে, আর সেইভাবে মন তাঁহার গর গর। প্রভু গরুড়ের স্তম্ভে হস্ত দিয়া দর্শন করিতেন, এই তাঁহার নিয়ম। আর অগ্রবর্ত্তী হইতেন না। প্রথমে যে দিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন সে দিবস ঠাকুরকে হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন বলিয়া, পাছে আবার সেইরূপ করেন সেই ভয়ে অনেক দূর হইতে, অর্থাৎ গরুড়ের স্তম্ভের নিকট হইতে, দর্শন করেন। প্রভু স্বপ্নাবেশে গরুড়ের স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া, জগন্নাথ না দেখিয়া মুরলীধর কালাচাঁদকে দেখিতেছেন, এমন সময় কোন একটি স্ত্রীলোক দর্শন করিতে না পারিয়া গরুড়ে উঠিয়াছে, উঠিয়া দর্শন করিতেছে; এক পা গরুড়ের উপর, আর এক পা মহাপ্রভুর স্কন্ধে দিয়াছে। প্রভু বিহ্বল, অবশ্য তাঁহার জ্ঞান নাই। কিন্তু গোবিন্দ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন। স্ত্রীলোক তাহার অপরাধ জানিয়া ভয়ে নামিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে জানিতেন, লোকের ভিড়ে, না জানিয়াই মহাপ্রভুর স্কন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই, প্রভু গরুড়ের নিকট গরুড় পক্ষীর ন্যায়, আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি যে সেথানে আছেন তাঁহা বিদেশীয় যাত্রিগণ জানিতে পারিত না। আর স্বদেশীয় যাহারা, তাহারাও অনেক সময়

লক্ষ্য করিতে পারিত না। সেই নিমিত্তই এরূপ সম্ভব হইত যে, প্রভু দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া অন্য লোকে অগ্রে দর্শন করিতেছে।

যখন গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন, তখন প্রভু কতক বাহ্য পাইলেন, পাইয়া বলিতেছেন,—"গোবিন্দ, কর কি? উনি স্বচ্ছন্দে দর্শন করুন।" কিন্তু স্ত্রীলোক গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়া প্রভুকে দেখিবা মাত্র আস্তে আস্তে নামিলেন, নামিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, তিনি না জানিয়া এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন; আর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আহা মরি কি আর্ত্তি! জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্য আমি যদি এই আর্ত্তিকে পাইতাম তবে কৃতার্থ হইতাম। জগন্নাথে এ স্ত্রীলোকটির মন এরূপ নিবিষ্ট যে আমার স্কন্ধে যে পা দিয়াছে তাহা ইহার জ্ঞান নাই।" সে যাহা হউক, প্রভু এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বনিশির স্বপ্ন প্রভাবে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন, এখন এই স্ত্রীলোকের কাণ্ডে কতক বাহ্য পাইয়া আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিতেছেন, জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা! তখন সন্তাপিত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। মনের ভাব যে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া পাইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে আবার হারাইয়াছেন। বাসায় বসিয়া বামহস্তে বদন রাখিয়া নয়ন মুদিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন; কখন বা নয়ন উন্মীলন করিয়া নখ দিয়া মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি লিখিতে লাগিলেন, আর নয়ন জলে উহা ধৌত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ এই চিত্র লিখিতে লাগিলেন। আহা! যদি প্রভুর তখনকার মুখের এই ছবির একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম তবে জীবন সুখে কাটাইতে পারিতাম। প্রিয়জনের বিরহ বহুদেশে কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভু যেরূপ কৃষ্ণ-বিরহরস প্রকাশ করিলেন, ইহা জগতে কেহ কখন স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। প্রভুর এই অবস্থায় সমস্ত দিবা গেল, ক্রমে সন্ধ্যা আসিতে লাগিল, সেই সঙ্গে প্রভুর বিরহ বেদনা বাড়িতে লাগিল। বিরহ বেদনার কথা সকলে শুনিয়াছেন, কিছু কিছু আপনা আপনিও ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু বিরহ বেদনায় কে কোথায় বাণবিদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় "উহুঃ মরি, উহুঃ মরি" বলিয়া সন্তাপ করে? বৃশ্চিক দংশনে মনুষ্যকে অস্থির করে, দষ্ট ব্যক্তি জ্বালায় গড়াগড়ি দিয়া

থাকেন, কিন্তু কে কোথা বিরহ বেদনায় ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। অবশ্য ভারি শোক পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয়া থাকে, মূর্চ্ছিত হয়, আর শোক কেবল বিরহ হইতে উৎপত্তি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ বিরহ নহে, নিরাশ বিরহ। প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন, আর যিনি শোকী, তিনি ভাবিতেছেন যে শুধু তাঁহাকে হারাইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহাকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত দুঃখকর হয়। যদি শোকিব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার প্রিয়জনকে পরকালে আবার পাইবে তবে অমনি শান্তি লাভ করে।

আমেরিকা দেশে একটি অদ্ভুত ঘটনা লইয়া সংবাদ পত্রের মধ্যে বিপুল বিচার হয়। একটি অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা যুবতী মরিয়াছেন, আর তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃতদেহ লইয়া, সে দেশের নিয়মানুসারে, নিশিতে জাগরণ করিতেছেন। তাঁহারা জন কয়েক স্ত্রীপুরুষে মৃত দেহের নিকট আছেন, এক একজন করিয়া জাগিতেছেন আর সকলেই ঘুমাইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন দেখিতেছেন সেই মৃতদেহের নিকট মৃত যুবতীটি দাঁড়াইয়া যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তখন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্দ শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দশজনে এইরূপ সেই বালিকার পরকালের জন্ম দেখিলেন। যুবতীর জন্য তাঁহার জননী শোকে পাগল হইয়াছিলেন। তিনি অন্য স্থানে দূরে ছিলেন, তাঁহার কন্যাকে পরকালে দেখিতে পান নাই, কিন্তু দর্শকগণের মুখে শুনিলেন, বিশ্বাস করিলেন, তখন শোকে ভুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা মরে নাই, জীবিত আছে, পুনর্ম্মিলনের আশা হইল, তাই শোক গেল।

বিরহ বেদনা পূর্ণরূপে উদয় হইলে "দশ দশা" উপস্থিত হয়। শ্রীরূপ তাঁহার রস শাস্ত্রে "দশদশার" ঐ সমুদায় লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিলেন; যথা,—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশাদশঃ॥"

অর্থাৎ (১) চিন্তা, (২) জাগরণ, (৩) উদ্বেগ, (৪) কৃশাঙ্গতা, (৫) অঙ্গের মালিন্য, (৬) প্রলাপ, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মূর্চ্ছা, (১০) প্রায় মৃত্যু কি মৃত্যু।

বিরহে এই দশটি দশা উপস্থিত হয়। জীবে ইহা পূর্ব্বে জানিতেন

না। মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া ইহা জানিলেন। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহে এরূপ নয়টী দশা প্রত্যহই হইত, আর দশমী দশা মাঝে মাঝে হইত। রজনী উপস্থিত হইলে প্রভু নয়টি দশায় অভিভূত হইয়া ছট্‌ফট করিতেছেন, শেষ দশাটি অর্থাৎ মৃত্যু দশাটি কেবল বাকি রহিয়াছে। সরূপ রামরায় চেষ্টা করিয়া প্রভুকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিতেছেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টিও পরিবর্দ্ধন হইল। মনে ভাবুন বদন অধিকারী যেন রাধাকে লইয়া কৃষ্ণ-যাত্রা করিতেছেন। সে কিরূপ—না, যেরূপ সরূপ রামরায় প্রভুকে লইয়া গম্ভীরা লীলা করিতেন। তবে সরূপ রামরায় প্রকৃত রাধাকে লইয়া কৃষ্ণ-যাত্রা করিতেন, বদন সেই দেখা দেখি প্রকৃত রাধাকে না পাইয়া, রাধা সাজাইয়া তাহাকে প্রভুর উক্ত কথা শিখাইয়া, কৃষ্ণ-যাত্রা করিতেন। প্রভু ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, প্রলাপ করিতেছেন, কখন বা নিজেই বাহ্যলাভ করিতেছেন। যখন ক্ষণিক চেতনা লাভ করিতেছেন, তখন সরূপ রামরায়কে বলিতেছেন, "উপায় কি? বল। আমি আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। রামরায় একটি শ্লোক পড় দেখি যদি আমার হৃদয় শীতল হয়।" কখন বা সরূপকে বলিতেছেন, "একটী কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাও দেখি, যদি প্রাণে বাঁচি।" রামরায় শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিজকৃত শ্লোক সুস্বরে পাঠ করিলেন। সরূপ জয়দেবের রাসের পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল। হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ আসিল, পরে প্রভু দিশেহারা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অধিক রজনী হইতেছে দেখিয়া সরূপ ও রামরায় উভয়ে অনেক যত্ন করিয়া, কতক বল দ্বারা, প্রভুকে শয়ন করাইলেন। শোয়াইয়া, প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, দ্বারে গোবিন্দ কি সরূপ কি উভয়ে শয়ন করিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া কোন দিন নিদ্রা গেলেন, কোন দিন বা উচ্চৈঃস্বরে নাম জপিতে লাগিলেন।

প্রভু একদিন প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেহের সমুদায় কার্য্য অভ্যাস বশতঃ করিলেন। সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন, পরে দর্শনে দাঁড়াইলেন। কখন একবারে বিহ্বল অবস্থা, আপনার ভাবে আছেন; কখন বা লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। সে কথা কি তাহা বুঝুন; বলিতেছেন, "কে গা তুমি বাপ্, কে গা আমার বাপের ঠাকুর, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন বলিতে পার?" সে চুপ করিয়া থাকিল, তখন

আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি বলিতে পার, তিনি কোথা গেলেন?" কেহ বা বলিল, "পারি, আইস আমার সঙ্গে। আমি দেখাইয়া দিব।" ইহা বলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রভু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া প্রভুকে সিংহাসনের অগ্রে রাখিয়া আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে তোমার কৃষ্ণ।" ঠাকুরও কৃষ্ণকে পাইয়া মহাসুখী। যে দিবস প্রভু স্বপ্নে কৃষ্ণকে পাইয়া গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্কন্ধে আরূঢ় স্ত্রীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া আবার কৃষ্ণকে হারাইয়া সমস্ত দিন রাত্রি রোদন করিয়াছিলেন, সেই রজনীতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অধিক রাত্রি দেখিয়া সরূপ ও রামরায় প্রভুকে কতক বল দ্বারা ও কতক বুঝাইয়া শয়ন করাইয়া, আপনারা শয়ন করিলেন। রামরায় গৃহে গেলেন, কিন্তু সরূপ নিজ কুটিরে না যাইয়া প্রভুর দ্বারে শয়ন করিলেন; কারণ দেখিলেন প্রভু যদিও শুইলেন, তবু ঘুমাইলেন না, উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামকীর্ত্তন হইতেছে এমন সময় প্রভু হঠাৎ নীরব হইলেন। প্রভু ঘুমান নাই বলিয়া সরূপও জাগিয়া আছেন। প্রভুকে নীরব দেখিয়া ভাবিলেন, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়া অভ্যন্তর যাইয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! গৃহ শূন্য!! প্রভু নাই!!!

প্রভু কিরূপে কোথায় গেলেন? সদর দরজায় যেরূপ শিকলি দেওয়া ছিল সেইরূপ আছে। সেখানে আবার গোবিন্দ ও সরূপ শয়ন করিয়া। গৃহের মধ্যে দুই দিকে দুই দ্বার আছে, তাহাতেও খিল দেওয়া। তবে প্রভু কিরূপে বাহির হইলেন? কিন্তু সে সামান্য কথা! প্রধান কথা, প্রভু কোথা গেলেন?

তখন কলরব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, সকলে প্রভুর তল্লাসের নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিয়া তল্লাস করিতে করিতে দেখিলেন যে, শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুকে পাইয়া সকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া সকলে মহাভীত ও চিন্তিত হইলেন। দেখিলেন, হস্ত, পদ, কটি ও গ্রীবার যত অস্থিসন্ধি আছে সমুদায় শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, প্রভুর হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভুর

দেহ তখন আর মনুষ্যের দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে না, উহা ৫।৬ হস্ত লম্বা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে আবার উত্তান নয়ন। মুখ দিয়া ফেন পড়িতেছে। এমন কি, প্রভুর দশা দেখিয়া সকলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে কর্ণে নাম প্রবেশ করিল। তখন প্রভু "কাঁহা, কাঁহা," এই শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে "হরিবোল" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আর অস্থিসন্ধি সমুদায়, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ যথা স্থানে আসিয়া জোড়া লাগিল।

প্রভু উঠিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। বিবরণ কি, জিজ্ঞাসু হইয়া প্রভু সরূপের মুখ পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "ব্যাপার কি বল দেখি?" সরূপ বলিলেন, "আগে ঘরে চলুন সেখানে বলিব।" বাসায় আসিয়া সরূপ সমুদায় কথা বলিলেন। প্রভু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার কিছু মনে নাই। কেবল এই টুকু মনে আছে যে, চঞ্চল কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিয়া অদর্শন হইলেন, আর আমি তাঁহার উদ্দেশে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতেছিলাম।"

এই লীলাটী রঘুনাথ দাস তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। তিনি ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, তিনি প্রভুকে তল্লাস করিতে গিয়াছিলেন। যখন গ্রন্থকার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তখন তাঁহার মনে একটী কথা উদয় হইয়াছিল। প্রভুর দেহে যতরূপ অলৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে একটী রহস্য বরাবর দেখা যাইবে। অর্থাৎ যদি তাঁহার দেহে কোনরূপ অলৌকিক ভাব দেখা গিয়াছে, তবে তাহার বিপরীত ভাব তাহার পরে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা প্রভু যদি কান্দিতেছেন, তাহার পরে নিশ্চিত হাসিবেন। প্রভুর শ্বাস বন্ধ হইল, তাহার পরে প্রভুর এরূপ ঝড়ের ন্যায় নিশ্বাস বহিতে লাগিল যে, সম্মুখে উপবেশন করে কাহারও এরূপ সাধ্য হইতেছে না। এই প্রভুর অঙ্গ লৌহদণ্ডের ন্যায় শক্ত, আবার দেখিবেন যে, উহা এত কোমল হইয়াছে যেন উহাতে অস্থি মাত্র নাই। এই প্রভু এত ভার হইলেন যে তাঁহাকে ক্রোড়ে করে এরূপ সাধ্য কাহারও নাই; আবার এরূপ লঘু হইলেন যে, যে সে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইতে পারেন। এ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, প্রভুর অস্থি গ্রন্থি শিথিল হইয়া তাঁহার হস্ত, পদ, দেহ

দৈর্ঘ্যতা পাইয়াছিল, তখন তাঁহার বিপরীত ভাব কি প্রকাশ পাইয়াছিল? দেখিলাম যে, ঠিক তাহাই হইয়াছিল। সে অদ্ভুত কাণ্ড শ্রবণ করুন।

একদিন প্রভু, সরূপ ও রামরায়ের সঙ্গে, নিশি যাপন করিতেছেন। কখন সরূপ গীত গাহিতেছেন, কখন রামরায় শ্লোক বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন। দুই প্রহর নিশি হইল, তখন উভয়ে প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া, শয়ন করাইয়া গৃহে গেলেন। কেবল গোবিন্দ দ্বারে প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রহিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন তাহা নহে, উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ নীরব হইলেন। তখন প্রভু নিদ্রা গিয়াছেন কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত গোবিন্দ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখেন পূর্ব্বকার দিনের মত তিন দ্বারে কপাট, কিন্তু প্রভু নাই! তখন দৌড়িয়া গমন করিয়া সরূপকে সংবাদ দিলেন। ভক্তগণ যিনি যেখানে ছিলেন দৌড়িয়া আসিলেন, আর প্রদীপ জ্বালিয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। সেবার প্রভুকে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে পাইয়াছিলেন। তাই প্রথমে সেখানে তল্লাসের নিমিত্ত গমন করিলেন, কিন্তু ঠিক সেখানে পাইলেন না। দেখেন যে সিংহদ্বারের উত্তর দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুর ঘরে তিন দ্বার, তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘরে নাই! যেখানে প্রভুকে পাওয়া গেল তাহাতে বুঝা গেল যে প্রভু তিনটি অনুন্নত প্রাচীর লংঘন করিয়া আসিয়াছেন। রঘুনাথ দাস সেই তল্লাসকারীর মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি তাঁহার স্তবাবলীতে এই ঘটনা লইয়া বলিতেছেন; যথা—

> "অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচি ভিত্তিত্রয়মহো
> বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
> তনূদ্যৎ সংকোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্
> বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয়েউদয়ন্মাং মদয়তি॥"

সকলে দেখেন যে প্রভু পড়িয়া আছেন। আর তৈলঙ্গী গাভীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, অতি যত্নের সহিত তাঁহার অঙ্গ শুঁকিতেছে, তাহারা যেন তাঁহার অঙ্গরক্ষা করিতেছে। গাভীগণ প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। ভক্তগণ যাইয়া প্রভুকে কিরূপ দেখিলেন?

"পেটের ভিতরে হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দে বিহ্বল॥"

চরিতামৃত।

পূর্ব্বে যখন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা, চরিতামৃতে এইরূপ আছে,

"প্রভু পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে তাতে মাত্র॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥"

এখন উপরের লিখিত দেহের দুই অবস্থা দেখিলে জানা যায়, উহা পরস্পর বিপরীত। প্রভু এইরূপে পড়িয়া আছেন, প্রভুর চতুষ্পার্শে গাভী, তাহারা প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না!

"গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ গন্ধ॥"

ভক্তগণ প্রভুকে চেতন করাইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। পরে প্রভুকে গৃহে আনান হইল। সকলে চিন্তিত, মনের ভাব এইবার বুঝি প্রভুকে হারাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে প্রভুর কর্ণে নাম প্রবেশ করিল, প্রভু হুংকার করিয়া "হরি বোল" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। না, পরে উঠিয়া বসিলেন। প্রভু যেই মাত্র চেতনা লাভ করিলেন, অমনি তাঁহার দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে অষ্ট সাত্বিক ভাবের কথা লেখা আছে। কিন্তু প্রভু দেখাইলেন, অষ্ট কেন, প্রেমভক্তির চর্চ্চাতে, কত অষ্ট সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। যোগ-সাধনে যে ফল, প্রেমভক্তির চর্চ্চাতে তাহা সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ ভগবানকে পাওয়া যায়। প্রেমভক্তি চর্চ্চাকেই বলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায়, নামকীর্ত্তন।

প্রভু চেতনা পাইয়া এদিক ওদিক চাইতে লাগিলেন। যাঁহাকে দেখিতে যান তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতি দুঃখে ও ক্লেশে সরূপকে বলিতেছেন, "তোমরা আমাকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া এখানে আনিলে কেন?" সরূপ বলিলেন, "প্রভু, স্পষ্ট করিয়া বলুন আমরা কিছু বুঝিতেছি না।" প্রভু বলিলেন, "আমি বেণুর গীত শুনিয়া বৃন্দাবনে গেলাম। দেখি, কানাই গোষ্ঠে বেণুবাদন করিতেছেন। তাহার পরে বেণু-সঙ্কেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভৃতনিকুঞ্জে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করিলেন, আর আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কৃষ্ণের শ্রীপদে মঞ্জীর ও কটিতে কিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল। সে মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ মুগ্ধ হইল। গোপী, রাধা, কৃষ্ণ সকলে হাস্য পরিহাস, নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। আমি সুখে এই সমুদয় দর্শন করিতেছি, এমন সময় তোমরা আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিলে। এ কি কাজ ভাল করিলে?" প্রভু ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে প্রভুর অনেক বাহ্য হইল। তখন বুঝিতে পারিলেন যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু মনের বেগ একেবারে গেল না। বলিলেন, "সরূপ! তাপিত অঙ্গ জুড়াও, জুড়াও; আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে।" সরূপ প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া এই শ্লোক পড়িলেন, যথা শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি গোপীর উক্তি:—

"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণু গীতং
সম্মোহিতার্য্য চরিতান্নচলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥"

"হে অঙ্গ! (শ্রীকৃষ্ণ) আপনার কলপদ অমৃতায়মান বেণুগীতে সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন স্ত্রী নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিতা না হয়? অধিক কি, তোমার এই ত্রৈলোক্য সৌভগ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গাভী পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগগণও পুলকসমূহ ধারণ করিয়াছে।"

শ্লোক শুনিবা মাত্র প্রভু শ্লোক বর্ণিত রসে প্রভু নিমগ্ন হইলেন। অর্থাৎ যে গোপী উপরের কথাগুলি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, প্রভু সেই গোপী হইলেন, হইয়া উপরের শ্লোকের ভাব লইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। যেন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে। আরো বিস্তার করিয়া

বলি। কৃষ্ণ রাসের নিশিতে বেণুগান করিলেন। গোপীগণ আসিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও, পতিসেবা কর গিয়া।" সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন, তাহার ভাব "কাস্ত্র্যঙ্গতে" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু এখন সেই গোপী হইয়া কৃষ্ণকে সেইরূপ উত্তর দিতেছেন। গোপী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ত বলিলেন, আর সেই ভাব লইয়া উহা প্রস্ফুটিত করিতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে "প্রলাপ"। প্রভু বলিতেছেন আর সরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া সেই প্রলাপ শুনিতেছেন। প্রভু সেই গোপীভাবে, কি সেই গোপী হইয়া বলিতেছেন, (যেন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে,) "হে কৃষ্ণ, এই কি তোমার উচিত? আমরা কুলবালা, কুটীনাটী জানি না, গৃহধর্ম্ম করিতেছিলাম। এমন সময় তোমার বেণুগীত কর্ণে প্রবেশ করিল। তোমার বেণুকে উপেক্ষা করে ত্রিজগতে এরূপ কেহই নাই। সেই বেণুধ্বনি যাইয়া আমাদের চিত্তকে বন্ধন করিল, করিয়া তোমার চরণে আনিল। আমাদের স্ত্রীলোকের লজ্জা, কুলের ভয়, সংসারের মমতা সমুদয়ই অন্যের ন্যায় ছিল, কিন্তু তোমার বেণুগীতে সমুদয় নষ্ট করিল। আমরা এখন জগতে আমাদের যাহা কিছু প্রিয়-ছিল সমুদয় তোমার নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া, পথের ভিখারী হইয়া, তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল, 'বাড়ী যাও, অধর্ম্ম করিও না।' একথা কি উচিত?" বলিতে বলিতে প্রভুর মুখে ক্ষোভের চিহ্ন আসিল; তখন আবার বলিতেছেন, "তুমি বল বাড়ী যাও! আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বাড়ী কোথায়, আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, বাড়ী গেলেই বা তাহারা লইবে কেন? তোমার নিমিত্ত তাহাদিগকে ছাড়িলাম, এখন তুমি ছাড়িলে কোথা যাইব? তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর কিছু ভাল লাগে না। হে বন্ধো! হে প্রাণ। হে প্রাণের প্রাণ! আমরা উপায়হীন অবলা, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।" প্রভু গোপীভাবে এইরূপ কৃষ্ণকে প্রেম-তিরস্কার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ বাহ্য হইল। তখন সরূপ ও রামরায়ের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "তোমরা ত সরূপ আর রামরায়, আমি ত কৃষ্ণচৈতন্য। আমি এখন কি প্রলাপ

করিলাম? আমার বোধ হইতেছিল যে, যেন আমি সেই গোপী যিনি রাসের রজনীতে কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমি সেই গোপীর ন্যায় তাঁহাকে তিরস্কার করিতে-ছিলাম। এ কি প্রলাপ করিলাম?" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন।

এইরূপে প্রভু যখন তাঁহার কৃষ্ণ-চৈতন্যত্ব সম্পূর্ণ ভাবে লোপ করিয়া গোপীভাবে কৃষ্ণের চর্চ্চা করিতেন, তাহাকে "প্রলাপ" বলে। যেহেতু তিনি তাহাকে প্রলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাঁহার প্রকটের শেষ দ্বাদশ বর্ষ গিয়াছিল।

পরে শুনুন, প্রভু আবার বিহ্বল হইলেন, আবার গোপী কি রাধা হইলেন, তবে ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইল। তখন পূর্ব্বে কৃষ্ণকে যে ওলাহন দিতেছিলেন তাহা ছাড়িয়া, সরূপ রামরায়কে সখী বোধ করিয়া, তাঁহাদিগকে মন উঘাড়িয়া, মনের দুঃখ বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া সখীগণকে সম্বোধন করার মানে আছে। তখন মনের মধ্যে যে ভাব উদয় হইল, তাহা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেক্ষা সখীগণকে বলাই স্বাভাবিক। বলিতেছেন, "সখি! দেখ, কৃষ্ণের অন্যায় দেখ, আমাদিগকে কুলের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমরা যে কুলের বাহির হই সে কি সাধে? কৃষ্ণের মুখের কথা অমৃত হইতেও মধু, কৃষ্ণের কণ্ঠের স্বর কোকিলকে লজ্জা দেয়, কৃষ্ণের গীতে শ্রোতা মূর্চ্ছিত হয়, আর বেণু গানে জগতের চিত্ত এলাইয়া পড়ে। এই কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীগণ তপস্যা করিতেছেন, হায়! যাহার কর্ণ কৃষ্ণের অমৃতভাষা শুনিল না সে কর্ণ বধির।"

প্রভু যত বলিতেছেন ক্রমেই হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িতেছে। "সে বধির" এ কথা বলিতে বলিতে মনে উদয় হইল যে, কৃষ্ণ সেখানে নাই। তখন বিরহিণী ভাবে কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে এই শ্লোক পড়িলেন;—

"কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরংবত লম্বতে॥"

শ্লোকের বিচার দুই প্রকারে করা যায়। পণ্ডিত কবিগণ একটী রাধার

উক্তি শ্লোক আওড়াইয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন, সে একরূপ। প্রভু আপনি রাধা হইয়া বিচার করিতেন, প্রভু রাধা হইয়া কৃষ্ণ-বিরহে মৃতবৎ হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন ;—

"সখি, উপায় বল কি করি, কি করিয়া কৃষ্ণকে পাই। এদিকে তোমরাও আমার মত কাতরা আছ, আবার আমার দুঃখ তোমাদের ছাড়া আর কাহাকে বলি? কৃষ্ণের নিমিত্ত যাহা করিলাম সেই ভাল, আর তাঁরে ভাবনা করিব না। সখি, কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য কথা বল।"

বিল্বমঙ্গল উপরি উক্ত শ্লোকে রাধার বিরহ বর্ণনা করিলেন। প্রভু সেই শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। শ্লোক পড়িবামাত্র প্রভু আপনি রাধা হইলেন, হইয়া শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত কবি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "শ্রীমতী বিরহে কাতরা হইয়া ইহাই বলিলেন ইত্যাদি।" আর প্রভু আপনি রাধা, সুতরাং তিনি আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তাই প্রভু বলিতেছেন, "সখি! আমার অবস্থা শ্রবণ কর ইত্যাদি।" এখন বিল্বমঙ্গলের "কিমিহ কৃণুম" শ্লোকে প্রভু রাধা হইয়া কিরূপ ব্যাখ্যা করিলেন তাহার আভাস বলিতেছি।

প্রভুর মনের ভাব, তিনি আপনি রাধা, আর সরূপ রামরায় কাজেই তাঁহার সখী!- কৃষ্ণকে হারাইয়াছেন, হারাইয়া সকলে বসিয়া হাহাকার করিতেছেন। প্রভুর মনে আশা ও নিরাশা উভয়ে খেলা করিতেছে। যখন আশা আসিতেছে তখন সখীগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন। যথাপদ ঃ—

"তোমরা আমার প্রিয়সখী উপায় বুদ্ধি বল না।
তোমরা জান মন প্রাণ প্রবোধ সে মানে না॥"

বলিতেছেন, "তোমরা নিজ জন, আমার মন জান, তোমাদের আর খুলিয়া কি বলিব? তোমাদের প্রবোধবাক্যে আমার কোন লাভ হইতেছে না, প্রবোধে শান্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল কি করি? কোথা যাবো, কি করিব, কারে মনের ব্যথা বলিব। কিরূপে কৃষ্ণ পাবো, তাই বল।"

আবার এই ভাবের আর এক পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী সখীগণ লইয়া বসিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন ;—

"ধৈর্য্য ধরি, রোদন সম্বরি, শুন আমার বচন শুন।" অর্থাৎ শ্রীমতী

আপনি সখীগণকে বলিতেছেন, "চুপ কর, আর কেঁদো না, এখন আমার পরামর্শ শ্রবণ কর।" বিল্বমঙ্গলের শ্লোক আওড়াইয়া প্রভু চুপ করিলেন, কৃষ্ণের উপর একটু ক্রোধ হইয়াছে; বলিতেছেন, "আমি দেখিতেছি আমাদের পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল, কৃষ্ণের নিমিত্ত বিস্তর করিয়াছি। আমার যাহা কিছু আছে সমুদায় দিয়াছি, তবু তাঁহার কৃপা পাইলাম না। অতএব এরূপ নিষ্ঠুর কৃষ্ণকে ভজনা না করাই ভাল।"

হে কৃপাময় পাঠক, আপনি কি মানভঞ্জন গীত শ্রবণ করিয়াছেন? সেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতীর কৃষ্ণের উপর ক্রোধ হইয়াছে, তাই বলিতেছেন, "কৃষ্ণনাম আর করিব না।"

সখী। কৃষ্ণ ভজিবে না তবে কাহাকে ভজিবে?

রাধা। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কি ভোলা দয়াময় মহেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কৃষ্ণ কুটিল, চঞ্চল, নিষ্ঠুর, তাঁহাকে কি আমাদের ন্যায় অবলার ভজনা সম্ভব হয়? কৃষ্ণ ভজিব না, যাহাতে কৃষ্ণনাম স্মরায় তাহাও নিকটে রাখিব না।

সখী। তোমার কেশ লইয়া কি করিবা? কেশে যে কৃষ্ণনাম স্মরায়।

রাধা। মুণ্ডন করিব।

সখী। তোমার কৃষ্ণবর্ণ শ্যামা সখীর কি করিবা?

রাধা। তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দাও।

কৃষ্ণযাত্রায় মানভঞ্জন পালায় এইরূপ রাধা ও সখীতে কথাবার্ত্তা দেখিবেন। এ কোথা হইতে আসিল? ইহা মহাপ্রভুর প্রলাপ হইতে মহান্তগণ পাইলেন।

তাহার পরে প্রভু বলিলেন যে, "কৃষ্ণকে বিস্তর করা হইয়াছে তাহাকে আর ভজিব না।" প্রভু ইহা বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন কে একজন আছেন। তিনি কে, জানিবার জন্য নয়ন মুদিলেন, মুদিয়া ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, যে কৃষ্ণকে তিনি ত্যাগ করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় মধ্যে আছেন, আর তিনি পরিত্যক্ত না হয়েন, ইহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ বদনে মধুর হাস্যের সহিত তাঁহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন রাধা কৃষ্ণকে ত্যাগ না করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন!

প্রভু ইহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "একি সর্ব্বনাশ! কৃষ্ণকে ত ছাড়া হইল না, হইল না। তিনি যে আমার হৃদয় মধ্যে স্বচ্ছন্দে আছেন। তাঁহাকে হৃদয় হইতে কিরূপে অবসর করিব? হইল না, হইল না!" প্রভু একটু চুপ করিলেন, করিয়া গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "সখি! আবার ও কি হইল! আমার প্রাণ যে কৃষ্ণের নিমিত্ত আরো কান্দিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কথনই না, কথনই না। আমি যে বলেছিলাম তোমাকে ত্যাগ করিব সে মনোগত নয়, রাগ করিয়া। তাহাও নয়, ক্ষুব্ধ হইয়া। তাহাও নয়, তোমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল হইয়াছিলাম, হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? তাহা কি হয়? তুমি আমার ও সব কথা কেন বিশ্বাস কর? তোমাকে ত্যাগ করিব তবে আমার রহিল কি? তোমা ছাড়া আমার কে আছে, বা কি আছে? তুমি না আমার নয়নরঞ্জন, তুমি না আমার প্রাণধন, তুমি না আমার প্রাণের প্রাণ? তুমি যেও না, যেও না।" ইহা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিন্তু এ মূর্চ্ছা ঘোর নহে। অতি অল্প ক্ষণ পরে সম্বিত পাইলেন, পাইয়া দেখিতেছেন কৃষ্ণ নাই, তথন আবার সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "কোথা গেলেন? এই যে এখানে ছিলেন! হা পদ্মলোচন! হা শ্যামসুন্দর! হা অলকাবৃত মুখ! আমাকে ছাড়িও না। কোথা গেলে তোমাকে পাইব? এই আমি এলেম।" ইহা বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে দৌড়িলেন। কিন্তু পারিলেন না, সেখানে ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এই গেল প্রলাপের পরে দিব্যোন্মাদ, অগ্রে প্রলাপ পরে দিব্যোন্মাদ। রাধাভাবে যে সমুদায় কথা সে "প্রলাপ", রাধাভাবে যে কার্য্য সে "দিব্যোন্মাদ।" যখন রাধাভাবে মনের ভাব উঘাড়িয়া বলিতেছিলেন, তখন "প্রলাপ" করিতেছিলেন। যখন কৃষ্ণের অন্বেষণের নিমিত্ত দৌড়িলেন, সে প্রভুর দিব্যোন্মাদ। প্রভু চেতন পাইয়া কৃষ্ণকে ধরিতে আবার যখন দৌড়িলেন, তখন সরূপ উঠিলেন, উঠিয়া প্রভুকে ধরিয়া কতক বল, কতক নানারূপ ছলনা করিয়া, আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। ইহাতে প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হইল, তখন বিষণ্নমনে বলিতেছেন, "সরূপ, মধুর গীত গাও, আমার শরীর শীতল কর।"

স্বরূপ গাইলেন,—

"হামার আঙ্গিনা আওব যবে রসিয়া।
পালটী চাহব হাম ঈষৎ হসিয়া॥"

প্রভুর হৃদয়ে সেই ভাব স্পর্শিল, তখন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু দিব্যোন্মাদের বশীভূত হইলে ভক্তগণকে অনেক সময়ে ভয় দিতেন। প্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অতিদূরে চটক পর্ব্বতের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তখন কাজেই প্রভুর মনে বোধ হইল যে সে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত। প্রভু কেবল এক পর্ব্বত জানেন, তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন। তখন একটী গোবর্দ্ধনের স্তুতিজনক শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিয়া সেই চটক পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলেন। দৌড়িলেন কিরূপে না বিদ্যুৎ গতিতে। গোবিন্দ চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। সেই ধ্বনি কেহ কেহ শুনিলেন। একেবারে প্রচারিত হইল যে, প্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতে পথে কি একটা মন্দ ঘটনা হইয়াছে। সুতরাং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় সমুদ্র-স্নানের স্থানে ছুটিলেন। এইরূপে স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর, রামাই, নন্দাই, নিতাই, শঙ্কর, পুরী, ভারতী, এমন কি খঞ্জ ভগবান পর্য্যন্ত চলিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রভুর লাগ পাইলেন। তাহার কারণ দৈব তাঁহাদের সহায় হইয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের পাওয়া দুর্ঘট হইত। যে বায়ুগতিতে প্রভু প্রথমে দৌড়িয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে কাহারও ধরিতে শক্তি হইত না। কিন্তু প্রভু এইরূপ যাইতে যাইতে স্তম্ভভাবে অভিভূত হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইল, তখন চলিতে পারিলেন না। এক স্থানে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটী পুলকে ব্রণের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে রুধির পড়িতেছে। বর্ণ হইয়াছে শঙ্খের ন্যায়, যেন শরীরে শোণিত নাই। কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর শব্দ হইতেছে। আর নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতেছে। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিতে দৌড়িয়াছেন, এমন সময়ে প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন, আর তখনি গোবিন্দ সর্ব্বাগ্রে নিকটে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ করঙ্গে জল পুরিয়া প্রভুর গাত্রে সিঞ্চন করিয়া বহির্ব্বাস দ্বারা বায়ু বীজন করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ,

রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে প্রভুর চেতন হইল, আর "হরিবোল" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন, আর সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু উঠিয়া বসিয়া বিহ্বলের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন, যাহা দেখিতে চান, দেখিতে পাইতেছেন না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ধরিয়া আনিলে? আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম, যেয়ে দেখি যে, কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। তাহার পর কৃষ্ণ বেণু বাজাইলেন, বেণু শুনিয়া রাধা ঠাকুরাণী আসিলেন। তাঁহার যে রূপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব! কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া নিভৃত স্থানে গেলেন, সখীগণ কুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন, এমন সময় তোমরা কোলাহল করিলে আর আমাকে বলদ্বারা ধরিয়া আনিলে। কেন দুঃখ দিতে আনিলে বুঝিতে পারিলাম না। সুখে কৃষ্ণলীলা দেখিতেছিলাম, তাহা দেখিতে দিলে না।" ইহা বলিয়া মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পুরী ভারতী সেখানে আসিলেন। তাঁহাদিগকে প্রভু গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভু একটু বাহ্য পাইলেন, পাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভু নিপট্ট বাহ্যলাভ করিলেন, বলিতেছেন "আপনারা এতদূর কেন আসিয়াছেন?" তখন সকলের মনে আনন্দ আসিয়াছে তাই পুরী সহাস্যে বলিলেন, "এতদূর আইলাম তোমার নৃত্য দেখিব বলিয়া।" প্রভু তখন লজ্জা পাইলেন। পরে প্রভু সমুদায় ভক্তগণের সহিত সমুদ্র ঘাটে আসিলেন, আসিয়া স্নান করিলেন।

ব্রজলীলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচায়ক লীলা—রাস। শ্রীভাগবতের রাসলীলা জীবে লক্ষবার পাঠ করিলেও তাহার তৃপ্তি হইবে না। শ্রীভগবান পরম সুন্দর, প্রেম পাগল। তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণকে বেণুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন কি, না প্রেমের হাট, সে দেশে প্রীতি বিকি কিনি হয়। আপনি "মদনমোহন গ্রাহক, তাহে পসার যৌবন।"

অর্থাৎ রাসের হাটে গোপীগণ তাহাদের যৌবন বিক্রয় করিতে বসিয়া আছেন, আর মদনমোহন কৃষ্ণ তাহা ক্রয় করিতেছেন!

পূর্ণিমা রাত্রি, তাহাতে শরতের পূর্ণিমা, বন কুসুমে সুশোভিত। কুসুমের

গন্ধে অটবী আমোদিত। কৃষ্ণ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া কলস্বরে বেণু বাদন করিতেছেন। বাঁশী শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—

"মন্দ মন্দ মধুর তান, শুন ওই বাজে তান তরঙ্গ।
ঐ শুন শ্যামের বাঁশী বাজে, বাজে ওই।
শ্যামের বাঁশী বাজে কোথা প্যারি।
আমি একা কুঞ্জে রইতে নারি।
শ্যামের বাঁশী বাজে এসো রাই।"
(তোমা বিনা) আমার বৃন্দাবনের শোভা নাই॥"

গোপীগণের কর্ণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল। তখন উন্মাদিনী হইয়া, তাঁহারা সকলে কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিলেন। যাঁহারা সন্তানকে স্তন পান করাইতে ছিলেন তাঁহারা সন্তান ফেলিয়া, যাঁহারা দুগ্ধ জ্বাল দিতেছিলেন তাঁহারা সেই কটাহ না নামাইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিলেন। তাঁহাদের কর্তৃপক্ষীয়গণ শাসন করিলেন কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। কোন কোন গোপীকে তাঁহাদের স্বামীরা বন্ধন করিয়া রাখিলেন, তাহাতে এই ফল হইল যে, তাঁহাদের চিত্ত তদ্দণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে উপস্থিত হইল।

কেহ বা ভাবিলেন কৃষ্ণের নিকট সুবেশ করিয়া যাইবেন, কিন্তু বিহ্বল হইয়া কর্ণের ভূষণ হস্তে, হস্তের ভূষণ কর্ণে পরিলেন। এইরূপে বিহ্বল অবস্থায় তাঁহারা চলিলেন। যথা পদ :—

"আরে এ কুঞ্জে বাজিল মুরলী। ধ্রু।
বাঁশীর গান, মধুর তান, শুনে ব্রজাঙ্গনা।
সুখে চলে পড়ে ঢলে না জানে আপনা।
গোপনারী সারি গারি (চলে) শ্যাম দরশনে॥"

শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ? ভয় পাইয়া? বল আমি ভয় দূর করিব। কিম্বা বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে? দেখ স্বচ্ছন্দে, আমার বৃন্দাবনের শোভা আস্বাদন কর।"

কথা এই, জীব দুই কারণে শ্রীভগবানকে চায়। প্রথম ভয় পাইয়া, না হয় অন্য স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত। শ্রীভগবান জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরূপ কথা বহুস্থানে শুনা যায়। কিন্তু যেখানে এইরূপ জীবে ও ভগবানে

সাক্ষাৎ সেখানে কেবল স্বার্থ সাধন। জীব বলে আমাকে বর দাও, আর শ্রীভগবান বর দিয়া থাকেন। কিন্তু গোপীগণ স্বার্থ পানে চাহিলেন না, তাঁহারা বর চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম, আমরা কিছু চাহি না, আমরা তোমাকে চাই।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "পতিত্যাগ করিয়া আমাকে উপপতিরূপে গ্রহণ করিবে? এ ত সাধু অর্থাৎ প্রচলিত পথ নয়? ইহাতে তোমাদের সর্ব্বমতে স্বার্থের হানি হইবে। আমার সম্পত্তির মধ্যে এই এক বেণু, কোন সম্পত্তি দিবার আমার নাই। অতএব তোমরা যাহার কাছে বর পাইতে অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারো সেখানে যাও। তাই বলি তোমরা গৃহে যাও, সর্ব্বজন অবলম্বিত পথ ত্যাগ করিও না।"

মনে করুন সর্ব্বজন অবলম্বিত পথ কি? সে পথ এই যে সংসার ধর্ম্ম, কর, পূজা অর্চ্চনা কর, জীবে দয়া কর, পুষ্করিণী দাও, মন্দির স্থাপন কর ইত্যাদি। যিনি বড় সাধুপথ অবলম্বন করিতে পারেন তিনি বনে গমন করেন, চিত্ত সংযম করেন, যোগ করেন, তপস্যা করেন, করিয়া অষ্টসিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু গোপীগণ ইহার কিছু করিলেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি করিতে চাহিলেন। গোপীগণ কতক কতক উদাসীন, তাঁহাদের দান ধর্ম্ম, পূজা অর্চ্চনা, তপস্যা যোগসিদ্ধি এ কিছু নাই, অথচ সংসারী হইয়া যে যে কার্য্য করিতে হয়, কিছু করিতেন না। কি করিতেছেন—না, কৃষ্ণের বেণুগান শুনিয়া ও তাহার রূপে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। আর যখন কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যে নূতন পথ অবলম্বন করিতেছ, ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে না, আর হয়ত নরকে যাইবে।" তখন তাঁহারা কৃষ্ণের নিমিত্ত নরকে যাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। মনে ভাবুন শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করা সাধারণের মতে সাধু মত নয়। বড় লোকে বলেন, "সোঽহং" তিনিও যে আমিও সে, "আমি আমার ভাল মন্দ করি," "আমি আমার কর্ম্ম ফল ভোগ করি," "আমার ভাল মন্দ কেহ করিতে পারে না।" যে ব্যক্তি কৃষ্ণের রূপাস্বাদ করিয়া আনন্দ জল ফেলিতেছে তাহারা, সাধাণের মতে, উন্মাদ। কেহ তান্ত্রিকগণের ন্যায় মন্ত্রৌষধি দ্বারা শ্রীভগবানকে বশীভূত করেন, কেহ বনে গমন করিয়া চিত্ত সংযম করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া শ্রীভগবানের নিমিত্ত তপস্যা করেন। এই সমুদায় সর্ব্ববাদিসম্মত সাধুপথ। ইহা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ

কি করিতেছিলেন, না স্ত্রীলোক যেমন স্বামী ত্যাগ করিয়া উপপতি ভজন করেন তাহাই করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, আমার জন্য তোমরা সাধু পথ ত্যাগ করিয়া কুলের অবলা হইয়া সমাজের বিড়ম্বন সহ্য করিবে? তাহাতে গোপীগণ বলিলেন, "তথাস্তু"। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থলে গোপীগণ দ্বারা দেখাইলেন যে গোপীগণ প্রেমের উপাসক।

আর কি দেখাইলেন বলিতেছি। জগতে সকলেই শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের উপাসক। শ্রীভগবান কীটানু হইতে ব্রাহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিয়া লোকে ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের আর একটী গুণ আছে। তিনি যে শুধু সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা নহে, তিনি মাধুর্য্যময়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দেখাইলেন। জগতের সকলে ঐশ্বর্য্যের উপাসক, বৈষ্ণবগণ মাধুর্য্যের উপাসক।

শ্রীভাগবত গ্রন্থ শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম জীবের প্রধান আশীর্ব্বাদ। শ্রীমহাপ্রভু সেই কৃষ্ণপ্রেম কি দেখাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন। এরূপ পবিত্র মধুর ধর্ম্ম জগতে ছিল না। এই প্রেমধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, "কৃষ্ণ! আমি তোমার, তুমি আমার।" "আমার এক কৃষ্ণ আছেন, আর কৃষ্ণের এক আমি আছি।" রাসে যত গোপী তত কৃষ্ণ বর্ণিত আছে। "হে কৃষ্ণ আমি আর কাহাকে জানি না, তুমিও আর কাহাকে চাও না। তোমায় আমায় চিরদিন প্রেমানন্দে কাটাইব।" "আমি তোমার তুমি আমার" এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ রাসের রজনীতে শিক্ষা দিলেন। কিরূপে বলিতেছি :—

যখন গোপীগণ সমুদায় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইলেন, তখন তিনি "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেতু গোপীগণের দম্ভ হইল। যেই মাত্র গোপীহৃদয়ে দম্ভের সৃষ্টি হইল, অমনি কৃষ্ণ অদর্শন হইলেন। তখন কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া গোপীগণ অচ্যুতকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃক্ষ, লতা, মৃগ প্রভৃতিকে শুধাইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি দেখিয়াছেন? পাঠক মহাশয়, রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবেন, যতই পড়িবেন ততই রস পাইবেন।

মহাপ্রভু এইরূপে গোপী অনুসরণ করিয়া একদিন কৃষ্ণ অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন :—

প্রভু সমুদ্র যাইতে পুষ্পোদ্যান দেখিলেন, অমনি তাঁহার বৃন্দাবন ও রাসের

রজনীর কথা মনে পড়িল। একে সর্ব্বদা কৃষ্ণবিরহে অভিভূত, তাহাতে রাসের রজনীর কথা মনে হইলে স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণ বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রভুর মনে পড়িল। তাহাতে প্রভু সেই কুসুম কাননে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত লীলা আরম্ভ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। প্রভু কার্য্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। প্রথমে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বড় বড় বৃক্ষগণ দর্শন করিলেন। তখন সেই বৃক্ষগণকে বলিতেছেন, "হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস (দশম স্কন্ধে, ত্রিশ অধ্যায়ে, নবম শ্লোকে দেখ) হে কোবিদার, হে অর্জ্জুন, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে অন্যান্য তরুগণ! তোমরাও এই যমুনা কূলে থাক, অতএব তোমরা দুঃখী জন প্রতি দয়ালু। আমরা কৃষ্ণবিরহে কাতর, তোমরা বলিতে পার, কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন?"

হে পাঠক, এক দিন চেষ্টা করিয়া বৃক্ষগণকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া দেখিবেন। এরূপ সম্বোধন করিতে রাধা ব্যতীত অন্য কোন জীবে পারে না। গোপীভাব না পাইলে বা গোপী না হইলে, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা না হইলে নাটকাভিনয় ব্যতিরেকে প্রকৃত পক্ষে জীবে এইরূপ বলিতে পারে না।

এইরূপে প্রভু, ভাগবতে গোপীগণের কার্য্য যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাই কার্য্যে করিতে লাগিলেন। কোন কোন বৃক্ষের শাখা মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ সংলগ্ন হইয়া আছে। প্রভু ইহা দেখিয়া ভাবিতেছেন, কৃষ্ণ অবশ্য এখানে ছিলেন। কৃষ্ণ এই পথে যাইতেছেন দেখিয়া, বৃক্ষগণ প্রণাম করিয়াছিল, বোধ হয় আশীর্ব্বাদ পায় নাই, আর সেই আশায় মস্তক না উঠাইয়া পড়িয়া আছে। প্রভুর অবশ্য মনের ভাব যে, জগতের স্থাবর অস্থাবরের আর কোন কার্য্য নাই, তাহারা সকলে কেবল শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাতেই রত! প্রভুর যখন ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণান্বেষণের সমস্ত কার্য্য করা হইল, তখন কৃষ্ণকে দেখিবার সময় হইল, আর দেখিলেন যে, যমুনা পুলিনে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন রূপ ধরিয়া, অলকাবৃত মুখে বেণুবাদন করিতেছেন। প্রভু ইহা দেখিলেন আর তদ্দণ্ডে ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ দেখেন যে প্রভুর বদন আনন্দময়, দেহ পুলকাবৃত, নয়নে আনন্দজলের স্রোত চলিতেছে। সকলে চেষ্টা করিয়া চেতন করাইলেন। প্রভু এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন, শেষে বলিতেছেন, "কৃষ্ণকে এইমাত্র দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? কৃষ্ণ

চঞ্চল, আমাকে দর্শন দিয়া, পাগল করিয়া, আবার ফেলিয়া গিয়াছেন! আমি এখন কি করি। সরূপ! কি করি বল?" তখন সরূপ গাইলেন—

"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসং॥"

জয়দেবের এই পদ শুনিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু "গাও" গাও" বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর বিরাম নাই, সরূপকেও থামিতে দিবেন না। পরে যখন প্রভু নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন, তখন সরূপ চুপ করিলেন, প্রভু বলিলেও গাহিলেন না, তখন প্রভু থামিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ। শ্রীভগবানের ইচ্ছা ভক্তকে তাঁহার রাজ্যের পরমাধিকারী করিবেন। কিন্তু ভক্তের যে অধিকার, সে কি প্রচুর? তাই জানিবার নিমিত্ত তিনি ভক্তভাব ধরিয়া ভক্তের যে সম্পত্তি, তাহা ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের যে মাধুর্য্য তাহা প্রভু জীবকে অতি অল্প পরিমাণে দেখাইতে পারিলেন বটে, তবে তিনি ভক্তের অধিকার দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন যে, শ্রীভগবানের যে অধিকার, ভক্তের অধিকার তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে।

"ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত অন্য কেবা পায় আর॥"—চরিতামৃত।

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া যে সুখ অনুভব করেন, তাহা কত মধুর, তাহা আস্বাদ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ধারণ করিলেন। দেখিলেন যে কৃষ্ণ হইতে রাধা যে সুখ ভোগ করেন, কৃষ্ণ যে পরমানন্দময় তিনিও তত সুখ ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী প্রভু দুই রূপে জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আপনি আচরিয়া, আর তাহার যেখানে সম্ভাবনা নাই, সেখানে বর্ণনা করিয়া। প্রভু এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত একদিন তাঁহার অধরামৃতের শক্তি দেখাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ, মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করিতেছেন। হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ দেওয়া হইল। দ্বার বন্ধ হইল, ভোগ দেওয়া হইলে, দ্বার খুলিয়া জগন্নাথের সেবকগণ তাহার কিঞ্চিৎ প্রভুকে আনিয়া দিলেন। প্রসাদ দিয়া সেবকগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে তাহার কিছু খাওয়াইলেন। প্রভু আস্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "সুকৃতিলভ্য ফেলালব।"

সেবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার অর্থ কি?" ঠাকুর বলিলেন, "ফেলা মানে কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ। ইহা পরমভাগ্যে মিলে, আর এই যে তোমরা আমাকে প্রসাদ দিলে ইহা ফেলা, যেহেতু ইহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে।"

সেই প্রসাদ ঠাকুর কিছু আস্বাদ করিলেন, আর কিছু গোবিন্দের দ্বারা বাড়ী আনিলেন। সে যে কৃষ্ণের প্রসাদ, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, সেই প্রসাদের অলৌকিক গন্ধ ও অলৌকিক আস্বাদ। প্রভু আপনি আস্বাদ করিলেন, আর আনন্দে তাঁহার নয়নধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু সেই প্রসাদ বাসায় আনিয়া প্রধান ভক্তগণকে ডাকাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বণ্টন করিয়া দিলেন। সকলে দেখিলেন জগতে এরূপ দ্রব্য হয় না। যদিও ইহা সামান্য বস্তু দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু ইহার গন্ধ ও আস্বাদ এ জগতের নয়।

প্রিয় বস্তুর অধর-রস অতি মধুর। শ্রীভগবান প্রিয় হইতে প্রিয়, তাঁহার অধর-রস অমৃত কেন না হইবে? সুগন্ধ আমাদের নাসিকায় কেন আনন্দ দেয়, তাহা আমরা জানি না। কোন কোন দ্রব্য জিহ্বায় দিলে কেন সুখের উদয় হয়, তাহাও আমরা জানি না। আমরা জানি না বটে, কিন্তু "তিনি" জানেন। তাই, যখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চর্ব্বিত তাম্বুল ভিক্ষা করিলেন, তখন তিনি উহাতে নাসিকার ও জিহ্বার আনন্দপ্রদ শক্তি দিয়া প্রদান করিলেন। তাই যখন প্রভুর ইচ্ছা হইল যে, এক দিন ভক্তগণকে কৃষ্ণের অধর রসের মাধুরী দেখাইবেন, তখন গোপালভোগ-প্রসাদে সেই শক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন।

কিন্তু কৃষ্ণের কোন কোন মাধুরী প্রত্যক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে সমুদায় প্রভু বর্ণনা দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন কৃষ্ণের জলকেলী লীলা।

শরৎকাল, শুক্লপক্ষ, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইতেছে। প্রভু রাসরসে বিভোর। প্রভু রাসের এক শ্লোক পড়িতেছেন, আর তাহা কি, কার্য্য দ্বারা দেখাইতেছেন। এই মাত্র একদিনকার লীলা বলিলাম। তখন প্রভু আইটোটায় বিচরণ করিতেছেন। হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন, জ্যোৎস্নায় উহার জল ঝলমল করিতেছে। তখন প্রভু রাসের জলকেলীর শ্লোক পড়িলেন। সেই শ্লোক পড়িয়া জলকেলী কি, তাহা আস্বাদিতে কি জীবগণকে শিখাইতে, সমুদ্রে ঝম্ফ দিলেন। প্রভু এইরূপ দ্রুতগতিতে সমুদ্র দিকে গমন করিলেন যে ভক্তগণ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। দেখেন প্রভু এই আছেন, আর নাই। সকলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে

তাচ্ছিল্যের সহিত তল্লাস করিলেন, পরে মনোযোগের ও আশঙ্কার সহিত। কোথা গেলেন? চারিদিকে ভক্তগণ ছুটিলেন। যখন রজনী তৃতীয় প্রহর, তখনও প্রভুর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, সকলে চিন্তায় মৃতবৎ।

আমার সরূপের অবশ্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। দেখেন একজন ধীবর গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। আর দেখেন যে, সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে। বুঝিলেন এ প্রভুর কার্য্য। সরূপ বলিতেছেন, ধীবর তোমাকে এরূপ বিহ্বল কেন দেখিতেছি?

ধীবর। এতদিন এখানে মৎস্য শিকার করিতেছি কখনও ভূত দেখি নাই। অদ্য জালে একটী মৃতদেহ উঠিল। জাল হইতে সেই দেহ ছাড়াইতে উহা স্পর্শ করিতে হইল, আর স্পর্শমাত্র আমার নয়নে জল, চরণে নৃত্য, আর বদনে কৃষ্ণনাম আসিল। এই দেখ আমার বদন কৃষ্ণনাম আর ছাড়ে না।

ধন্য আমার প্রভু!

তখন সরূপ সমুদায় বুঝিলেন। জেলেকে সঙ্গে করিয়া দেখেন প্রভু সেই লক্ষ্মীর সেবিত দেহ, সমুদ্রতীরে বালুকার উপরে পড়িয়া আছেন। জীবনের চিহ্ন নাই।

কর্ণে হরিনাম করিতে করিতে প্রভুর চেতনা হইল। তাহার পরে অর্দ্ধ বাহ্যদশা আসিল। তখন কৃষ্ণের জলকেলী বর্ণন করিতেছেন। বলিতেছেন, কৃষ্ণ গোপীগণ সহিত যমুনার স্বচ্ছজলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেখিলাম যে, গোপীগণের বদন পদ্মপুষ্পরূপে পরিণত হইল। দেখিলাম, কৃষ্ণের মুখও পদ্ম হইল। তবে গোপীগণের লাল, আর কৃষ্ণের নীল। দেখিলাম, এইরূপে অসংখ্য লালপদ্ম যমুনায় ভাসিতে লাগিল। আর দেখিলাম, অসংখ্য নীলপদ্মও ভাসি-তেছে। এই নীলপদ্ম লালপদ্মকে, ও লালপদ্ম নীলপদ্মকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে নীল ও লালপদ্মে মিলন হইল!

বৃন্দাবন মাধুরী আমি কি বর্ণনা করিব। উঁহা ব্রহ্মা, শিব, শুক, নারদেরও অগোচর। আমার যাহা সাধ্য, আমি "কালাচাঁদ গীতায়" চেষ্টা করিয়াছি। আমার ইংরাজী গ্রন্থে দ্বিতীয় ভাগের শেষে একটী অধ্যায়ে ইহার কিছু আভাস আছে। তাহা পাঠ করিয়া একজন অতি পণ্ডিতা আমেরিকান মহিলা গৌরভক্ত হইয়াছেন।

৫ম খণ্ড সমাপ্ত।